আল-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-৪

কুরআন, মহাবিশ্ব মহাধ্বংস

মুহাম্মাদ আন্‌ওয়ার হুসাইন

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. এস. এম. আজহারুল ইসলাম

"আমি ওদের
জন্য আমার
(বাস্তব উপস্থিতির)
নিদর্শনাবলী
(প্রমাণসমূহ) প্রকাশ করব
মহাবিশ্বে (ওর গঠন ও
ব্যবস্থাপনায়) এবং ওদের নিজেদের
(শারীরিক গঠন কাঠামো ও উপাদানের
ব্যবস্থাপনার) মধ্যে; ফলে ওদের নিকট
সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আল-কুরআন
সত্য। এ বিষয়টি কি তোমার প্রতিপালক
সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি (যেমনি বাস্তবে
আছেন তেমনি আবার) সর্ববিষয়ে অবহিত ?

সূরা ঃ হা-মীম-আস-সিজদা ঃ ৫৩
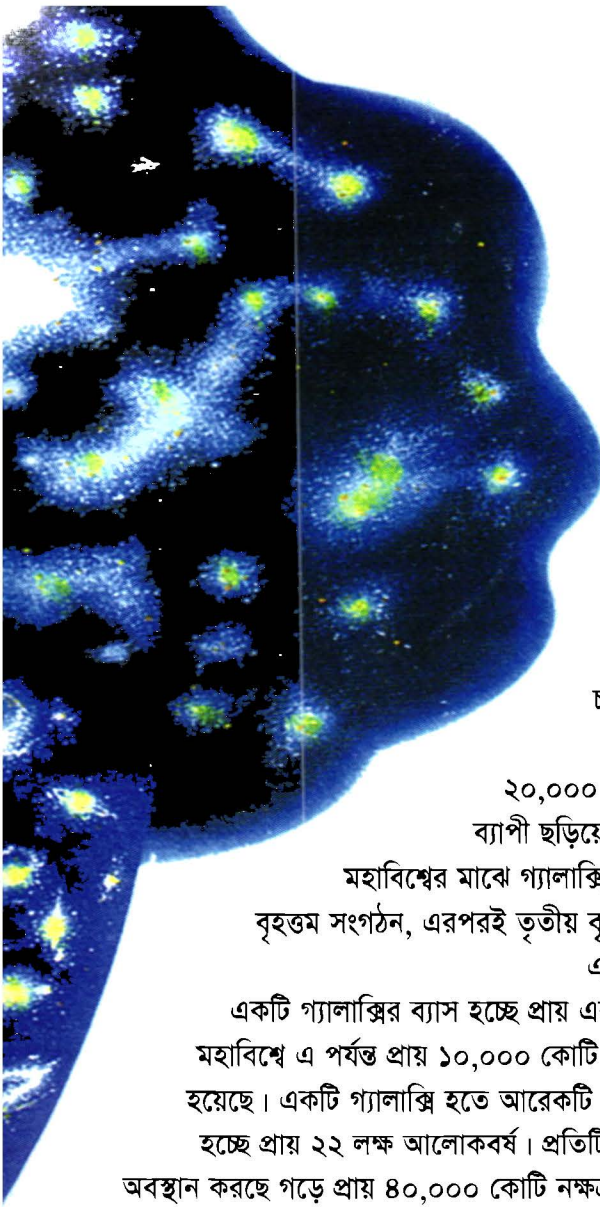
আমাদের এ
মহাবিশ্বটি
সৃষ্টির পর থেকে
মহাসম্প্রসারণের
কারণে
কল্পনাতীতভাবে
চতুর্দিকে সম্প্রসারিত
হয়ে বর্তমানে প্রায়
২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ
ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। বিশাল এ
মহাবিশ্বের মাঝে গ্যালাক্সিগুচ্ছ-ই হচ্ছে দ্বিতীয়
বৃহত্তম সংগঠন, এরপরই তৃতীয় বৃহত্তম সংগঠন হচ্ছে-
এক একটি গ্যালাক্সি।
একটি গ্যালাক্সির ব্যাস হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ।
মহাবিশ্বে এ পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি আবিস্কৃত
হয়েছে। একটি গ্যালাক্সি হতে আরেকটি গ্যালাক্সির গড় দূরত্ব
হচ্ছে প্রায় ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে আবার
অবস্থান করছে গড়ে প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র। এদের অধিকাংশ
নক্ষত্রেরই আছে সৌরপরিবার।
সৌর জগতের তুলনায় আমাদের পৃথিবী অনেক ক্ষুদ্র মহাজাগতিক 'বস্তু'। সমগ্র
মহাবিশ্বের তুলনায় বিন্দুর সমতুল্যও নয়। সে হিসেবে ব্যক্তি মানুষ মহাবিশ্বের
তুলনায় অনুল্লেখযোগ্য। অথচ সেই মানুষকেই আল্লাহ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান
করেছেন। মানুষ সেই মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে সচেষ্ট হবে কী ?

কুরআন, মহাবিশ্ব ও মহাধ্বংস

THE QURAN, THE UNIVERSE AND THE TOTAL DESTRUCTION

কুরআন, মহাবিশ্ব ও মহাধ্বংস

মুহাম্মাদ আনৃওয়ার হুসাইন
পরিচালক,
দ্যা ডিভাইন লাইট রিসার্চ সেন্টার
২৩০ নিউ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৯১৫৩৪০০১৪

ISBN 984-873-001-1

প্রকাশনায়
মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
প্রোপ্রাইটর
র‍্যাকস পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন-মগবাজার-বাংলাবাজার, ঢাকা।
মক্কা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০০৭ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে, ২০১৬ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দীন

কম্পোজ
আহসান কম্পিউটার, ঢাকা।

মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা মাত্র।
$ 10.00

মুদ্রণে
ওয়াসিস প্রিন্টার্স
কাটাবন, ঢাকা

RAQS Publications Series : 06

আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-৪

কুরআন মহাবিশ্ব মহাধ্বংস

(প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক)

মুহাম্মাদ আন্ওয়ার হুসাইন

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. এস. এম. আজহারুল ইসলাম

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

রিসার্চ একাডেমী ফর কুরআন এণ্ড সাইন্স

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

Al-Quran the true Science, Series - 4

The Quran, The Universe and The total Destruction

(Scientific findings Confirmed)

Mohammad Anwar Hussain

Edited by

Dr. S. M. Azharul Islam

Professor, Department of Physics

Jahangirnagar University

Dhaka, Bangladesh

আল্লাহ্,
তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্
নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সকল সত্তার
ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে
না। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত
তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট
সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু
আছে তা তিনি সবই জানেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন
তাছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে
না। তাঁর 'আসন' আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীময়
পরিব্যাপ্ত, এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত
করে না, আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।
(২ ঃ ২৫৫)

এ মহাবিশ্বে সকল যুগে এক ও একক স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামিনকে, একমাত্র প্রভু হিসেবে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যাঁরা নিজেদের জীবনকে বাজী রেখে সার্বক্ষণিক চেষ্টা ও সাধনা করে পৃথিবীর জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের পরকালীন জীবনে মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কামনায়।

পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে নোবেল বিজয়ী যাঁরা

পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক এবং অর্থের দিক থেকে সবচেয়ে মূল্যবান পুরস্কারটি হচ্ছে নোবেল পুরস্কার। সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড বেনহার্ড নোবেল উইল করে তাঁর নিজের অর্থ দ্বারা নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তন করেন। মোট পাঁচটি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য প্রতি বছর নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হয়। এই পাঁচটি ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম দুটি ক্ষেত্র হল পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান। ১৯৯০ সন পর্যন্ত যাঁরা পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখার জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তাঁদের পুরস্কার বিজয়ের সন ও বিষয়ের তালিকা ধারাবাহিকভাবে নিচে দেয়া হল।

পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী

১৯০১ সালে পেয়েছেন প্রফেসর ডব্লিউ সি রন্টজেন, তাঁর আবিষ্কৃত রশ্মির জন্য তাঁর নামানুসারেই যার নাম হয়েছে রঞ্জেন রশ্মি।

১৯০২ সালে পেয়েছেন প্রফেসর এইচ এ লরেঞ্জ (লেইডেন) ও প্রফেসর পি. জিমান (আমস্টারডাম), তেজস্ক্রিয়তার উপর চৌম্বকত্বের প্রভাব বিষয়ে গবেষণার জন্য।

১৯০৩ সালে নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক পেয়েছেন প্যারিসের ইকোলে পলিটেকনিকের প্রফেসর এইচ এ বেকুইরেল– ক্রমিক তেজস্ক্রিয়তার উপর গবেষণার জন্য। বাকি অর্ধেক পেয়েছেন প্যারিসের পি. কুরি ও ম্যাডাম ম্যারি কুরি; প্রফেসর হেনরি বেকুইরেল কর্তৃক আবিষ্কৃত তেজস্ক্রিয়তা বিষয়ে যৌথ গবেষণার জন্য।

১৯০৪ সালে পেয়েছেন লর্ড রেইলি (লন্ডন), গুরুত্বপূর্ণ গ্যাসগুলোর ঘনত্ব বিষয়ে গবেষণা এবং আরগন গ্যাস আবিষ্কারের জন্য।

১৯০৫ সালে পেয়েছেন প্রফেসর পি. লেনার্ড (কিল), ক্যাথোড রে-এর উপর গবেষণাধর্মী কাজের জন্য।

১৯০৬ সালে পেয়েছেন প্রফেসর জে জে থমসন (ক্যামব্রিজ ইংল্যান্ড), গ্যাসের ভিতর দিয়ে তড়িৎ সঞ্চালনের উপর তাত্ত্বিক গবেষণাধর্মী কাজের জন্য।

১৯০৭ সালে পেয়েছেন প্রফেসর এ. এ. মাইকেল সন (শিকাগো) তার আলোকভেদী যন্ত্রাংশ এবং এদের সাহায্যে স্পেকট্রোসকপি এবং মেট্রোলজিক্যাল গবেষণার জন্য।

১৯০৮ সালে পেয়েছেন প্রফেসর জি. লিপম্যান (প্যারিস), অনুমানের ভিত্তিতে আলোক সম্পাত পদ্ধতিতে রং উৎপাদনের জন্য।

১৯০৯ সালে আধাআধি পেয়েছেন জি মার্কনি (লন্ডন) ও প্রফেসর এফ. ব্রাউন (স্ট্রাসবার্গ) বেতারভিত্তিক শব্দ প্রেরণের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য।

১৯১০ সালে পেয়েছেন প্রফেসর জে. উ. ভ্যান ডার ওয়ালস (আমস্টারডাম) গ্যাসের ও তরলের অবস্থার সমীকরণ বিষয়ে গবেষণাধর্মী কাজের জন্য।

রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী

১৯০১ সালে পেয়েছেন প্রফেসর জে. এইচ. ভ্যান্ট হফ (বারলিন) রসায়নিক গতিবিদ্যার সূত্রাবলী আবিষ্কার ও দ্রবণে অসমোটিক চাপের আবিষ্কারের জন্য।

১৯০২ সালে প্রফেসর ই. ফিশার (বারলিন) চিনি এবং পিউরিন সংশ্লেষণের জন্য।

১৯০৩ সালে পেয়েছেন প্রফেসর এস. এ্যারেনিয়াস (স্টকহোম), ইলেক্ট্রোলাইটিক বিভাজন তত্ত্বের মাধ্যমে রসায়নবিদ্যার অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য।

১৯০৪ সালে পেয়েছেন স্যার উইলিয়াম র‍্যামসে (লন্ডন), বাতাসে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের উপাদানসমূহের আবিষ্কার এবং পর্যায় সারণীতে তাদের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য।

১৯০৫ সালে পেয়েছেন প্রফেসর এ. জন. বেয়ার (মিউনিখ) জৈব রসায়ন ও শিল্প রসায়নের অগ্রগতিতে অবদান রাখার জন্য। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল জৈব ডাই এবং হাইড্রোঅ্যারোমেটিক যৌগ।

১৯০৬ সালে পেয়েছেন প্রফেসর এইচ. ময়সান (প্যারিস), ফ্লুরিনের উপর গবেষণা ও এর উপাদান পৃথকীকরণের জন্য এবং ইলেকট্রিক ফার্নেসকে বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত করার জন্য যার নামকরণ তাঁর নামানুসারেই হয়েছে।

১৯০৭ সালে পেয়েছেন প্রফেসর ই. বুখনার (বারলিন) জৈব রাসায়নিক গবেষণা এবং কোষমুক্ত গাঁজন প্রক্রিয়ার আবিষ্কারের জন্য।

১৯০৮ সালে পেয়েছেন ই. রাদারফোর্ড (ম্যানচেস্টার) উপাদানের ডিসইনটিগ্রেশন এবং তেজস্ক্রিয় বস্তুসমূহের উপর রাসায়নিক গবেষণা করার জন্য।

১৯০৯ সালে পেয়েছেন প্রফেসর ডব্লিউ. অসওয়াল্ড (গ্রসবদেন) প্রাভাকরের উপর গবেষণার জন্য এবং রাসায়নিক সাম্যাবস্থা ও বিক্রিয়ার গতি বিষয়ে মৌলিক নীতিমালার উপর গবেষণাকর্মের জন্য।

১৯১০ সালে পেয়েছেন ও. ওয়ালেস (গটিনজেন) অ্যালিসাইক্লিক যৌগের উপর সূচনাধর্মী কাজ করার মাধ্যমে জৈব রসায়ন ও শিল্প-রসায়নের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য।

সম্পাদকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের একান্ত ইচ্ছায় 'আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স' সিরিজে 'সিরিজ-৪' খণ্ডটিও যোগ হল, আল্-হামদুলিল্লাহ্। বইটি সম্পাদনা করতে গিয়ে আমার নিকট মনে হয়েছে, উক্ত খণ্ডটি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে জ্ঞানবান পাঠক সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক মনের চাহিদার সিংহভাগ পূরণে সক্ষম হবে এবং সর্বোপরি এ সিরিজ থেকে অর্জিত স্বর্গীয় আলো, সচেতন পাঠক সমাজকে অন্ধকারের আবর্তে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে। এ খণ্ডটিতেও প্রতিটি অধ্যায়ে উদ্ধৃত মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনের আসমানী বাণীসমূহের স্রোতের অনুকূলে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের একের পর এক উপস্থাপন খণ্ডটির এমনভাবে পূর্ণতা বিধান করেছে যে, পাঠক মাত্রই এতে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব দিবালোকের আলোতে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন এবং আমার বিশ্বাস এর ফলে মহাসত্যের সম্মুখে নিজকে বিনীতভাবে পেশ করতে এখন আর মোটেই কুণ্ঠিত হবেন না।

তাছাড়া বক্ষমান খণ্ডটিতে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজিত হয়েছে, যে বিষয়গুলো ইতোপূর্বে মানুষের জ্ঞানরাজ্যে তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় বলা যায়, মানব সমাজ এ প্রথমবারের মতই উক্ত ৪র্থ খণ্ডের মাধ্যমেই কেবল বিষয়গুলো মহাসত্যতার আলোকে অবহিত হতে যাচ্ছেন। এ জন্য সকল প্রশংসা নিঃসন্দেহে একমাত্র আল্লাহ্র।

বর্তমান উৎকর্ষিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানে মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনকে উত্তরোত্তর আরও গভীরভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা আমাদের সকলের এ পার্থিব জীবনকে মহান আল্লাহ্র নির্দেশিত সঠিক পথে পরিচালিত করে যেন চূড়ান্ত সফলতা লাভ করতে পারি, এ তৌফিক কামনা করছি।

ড. এস. এম. আজহারুল ইসলাম

প্রকাশকের নিবেদন

সকল প্রকার প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র তাঁর জন্যই যিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, মালিক এবং প্রতিপালক। যিনি সৃষ্টির সেরা মানুষের মাঝে উৎকর্ষিত জ্ঞান বিতরণ করেছেন এবং সেই জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগকারীকে সঠিক পথে দৃঢ় ও অবিচল রেখেছেন, আবার যারা সেই জ্ঞানকে অপব্যবহার করেছে, তাদেরকে সত্যপথ থেকে যোজন- যোজন দূরে সরিয়ে দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যহীন করে ফেলে রেখেছেন। আর মানব সমাজে প্রকৃতপক্ষে এরাই হচ্ছে দুর্ভাগা।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে অশেষ করুণা অবতীর্ণ করার কারণে আমরা বর্তমান বিজ্ঞান যুগের চ্যালেঞ্জ 'আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স, সিরিজ–৪' (কুরআন, মহাবিশ্ব ও মহাধ্বংস) প্রকাশ করে সম্মানিত পাঠক সমাজের সম্মুখ টেবিলে সযত্নে উপস্থাপন করতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে মহান প্রভুর সামনে মস্তক অবনত করে দিচ্ছি, এতে আমাদের কোনই কৃতিত্ব নেই। সকল কৃতিত্ব একমাত্র মহান ও পবিত্র সত্তা 'আল্লাহ্'-র জন্যই সংরক্ষিত।

সম্মানিত জ্ঞানবান পাঠক সমাজের ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে এ সিরিজের প্রতিটি খণ্ড সংগ্রহ, অধ্যয়ন এবং এ বিষয়ে নিজ উদ্যোগে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে যাওয়ার কারণে আমরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়ে গেলাম। আমরা আরও আনন্দিত এ কারণে যে, সচেতন পাঠক সমাজও যে এ মহান সিরিজের একজন নিবেদিত খাদেম তা তাঁরা অনুধাবন করে অবিশ্বাস্যভাবে এর সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য নিজ নিজ পরিসরে অবদান রেখে চলেছেন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে এজন্য উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এ প্রার্থনা থাকলো। সাক্ষাতে, টেলিফোনে এবং বিভিন্নভাবে যাঁরা-এ মহৎ কাজে আমাদেরকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করে চলেছেন, তাঁদের প্রতিও থাকলো আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা।

আল্লাহ্ আমাদের সকলের ভালো কাজগুলোর উত্তম প্রতিদান আমাদের ভাগ্য লিপিতে লিখে দিন। আমীন।

প্রকাশক

লেখকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ্! অবশেষে মহান আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে 'আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স' সিরিজের ৪র্থ খণ্ডটিও বর্তমান মানব সমাজের মধ্যে যাঁরা প্রকৃতপক্ষেই মহাসত্যের সন্ধানী, তাঁদের কল্যাণে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পেল। আমরা জানি না এ পৃথিবী পৃষ্ঠে খুবই সংক্ষিপ্ত আমাদের এ জীবনে মহাবিশ্বের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের কতটুকু অবহিত হতে পারবো, তাই সময়ের সাথে এক প্রকার পাল্লা দিয়েই আমরা সার্বিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত তথ্যগুলো, পূর্বেই ঘোষিত মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোর সাথে তুলনামূলক আলোচনা সম্মানিত জ্ঞানী পাঠক সমাজের সম্মুখে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। এ খণ্ডটি সে প্রয়াসের-ই ধারাবাহিকতার একটি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

লেখক হিসেবে আমার বিশ্বাস, বর্তমান খণ্ডটি উল্লেখিত সিরিজ পাঠকদেরকে মহাসত্যের পানে পূর্বের অবস্থান থেকে আরও একধাপ ওপরে আরোহণ করতে সর্বোতভাবে সাহায্য করবে। সাথে সাথে আমাদের সমাজে মহান আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তার বড় বড় অনেক গুণাবলী এবং তাঁর অনেক সিদ্ধান্ত আমাদের অজ্ঞতার কারণে যে চাপা পড়ে আছে, সে বিষয়গুলোর কিছুটা এ খণ্ডের মাধ্যমে স্পষ্ট আলোতে বেরিয়ে আসার কারণে সম্মানিত পাঠক সমাজ তা অবহিত হয়ে বিশেষ কল্যাণের অধিকারী হওয়ার সুযোগ পাবেন।

ইতিমধ্যে ব্যাপকভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকাশিত সিরিজ-১, ২ ও ৩-এর সম্মানিত পাঠক সমাজের পক্ষ থেকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে, টেলিফোন করে এবং বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন, আমি তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং এ মহৎ কাজে তাঁদেরকেও এক একজন অংশ গ্রহণকারী হিসেবে কবুল করার জন্য আল্লাহ্‌র শাহী দরবারে প্রার্থনা পেশ করছি।

মহাসত্যের সন্ধানে আমাদের পদক্ষেপ, আমাদের চেষ্টা-সাধনা ও কর্মতৎপরতা উত্তরোত্তর আরও বলিষ্ঠ ও জোরদার হোক এবং সে সুবাদে অন্ধকারের আবর্তে নিমজ্জিত বিশ্ব মানবতা মুক্তি লাভ করে সত্য ও সুন্দরের কল্যাণে ধন্য হোক, পরিশেষে মনের এতটুকু আকুতি, মিনতির সাথে ব্যক্ত করে এখানেই আপাততঃ ইতি টানছি।

মুহাম্মাদ আনওয়ার হুসাইন

সূচিপত্র

এক অনন্য গ্রন্থ 'আল্-কুরআন'

বর্তমান বিশ্বের সর্বত্রই চলছে অগ্রাযাত্রার পালা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিক ও বিভাগেই 'বিজ্ঞান' মানুষের সীমাবদ্ধ চিন্তা-চেতনাকে পাল্টে দিয়ে নতুন এক উৎকর্ষিত জ্ঞানময় উজ্জ্বল পরিবেশ উপহার দিয়ে চলেছে। সৃষ্টির সেরা মানবজাতিকে 'বিজ্ঞান' ক্রমান্বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সৌর-মণ্ডলে, নভোমণ্ডলে এবং গ্যালাক্সি থেকে গ্যালাক্সিমণ্ডলে। এক কথায় এতদিন যাবৎ মানব সমাজ যা কল্পনাও করতে সক্ষম হয়নি, ইদানিং কি-না 'বিজ্ঞান' মানব জাতিকে দিয়ে তা-ই বাস্তবে সম্পাদন করে চলেছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিজ্ঞানের উল্লেখিত সত্য-সঠিক সাফল্যগুলো বাস্তবে রূপ লাভ করার প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই মহাবিশ্বের একমাত্র মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক 'আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন' ভূপৃষ্ঠে প্রেরিত মানবসম্প্রদায়কে আল্-কুরআনের মাধ্যমে তা অবহিত করেছিলেন। তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি না থাকায় মানব সম্প্রদায় কুরআনের ঐ সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোকে বুঝতে সক্ষম হয়নি, ফলে সমাজের জ্ঞানী-গুণীজনের একটা বড় অংশই 'আল্-কুরআনকে' মহাসত্য আসমানী গ্রন্থরূপে মেনে নিতে তৎপর হয়নি। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কার-ই 'কুরআন'কে আর ডিঙ্গিয়ে যেতে না পারায় এবং 'বিজ্ঞান' কুরআনের অভিন্ন সমর্থক প্রমাণিত হওয়ায় ঐ সকল জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবি মহল প্রকৃত বাস্তবতার প্রচণ্ডতায় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। এটাই স্বাভাবিক, কেননা 'আল্-কুরআন' তো মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা-ই অবতীর্ণ করেছেন এবং বিজ্ঞান বিশ্বের মানুষের জন্য স্রষ্টার উপস্থিতির চিহ্নস্বরূপ তাতে সত্য-সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বসমূহ সন্নিবেশিত করেছেন, যাতে করে একসময় ঐ সকল তথ্যসমূহ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে দেখতে পেয়ে সমাজের প্রকৃত জ্ঞানীজন এক

"আল্-কুরআন মানব সম্প্রদায়ের জন্য এক বার্তা, যেন এর দ্বারা তারা সতর্কতা অবলম্বন করে এবং জানতে পারে যে, তিনি (আল্লাহ্) একমাত্র ইলাহ্ এবং যেন জ্ঞানবানরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (১৪ : ৫২)

"এ কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও রহমত।" (৪৫ : ২০)
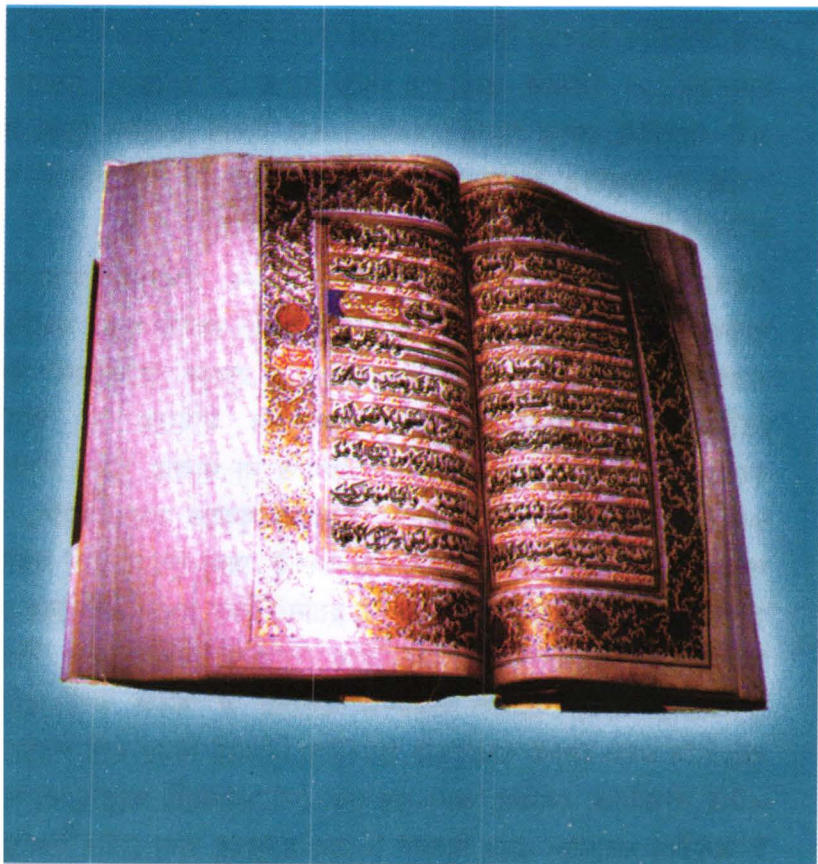
চিত্র-১

সুতরাং মানব জাতির ইহ্জগত ও পরজগতের সার্বিক কল্যাণ নির্ভর করছে এ কুরআনকে ধারণ করে সম্মুখপানে এগিয়ে চলার ওপরই।

আল্লাহ্‌র সম্মুখে মাথা অবনত করে দিয়ে ধন্য হতে পারে। এ দিক থেকে বিজ্ঞান বিশ্বের জন্য 'কুরআন' সত্যি-সত্যি এক অনন্য গ্রন্থ হিসেবে মর্যাদার আসন অলংকৃত করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, যা অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এ ছাড়া আরও অসংখ্য গুণ-বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটিয়ে 'আল্-কুরআন'কে যে অতুলনীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা আল্-কুরআনকে উল্লেখিত অনন্য গুণাবলী সম্পন্ন করে প্রকাশ করতে গিয়ে সর্বমোট ৫৫টি বিশেষ নামে সম্বোধন করেছেন। এখানে পর পর তা অবগতির জন্যই উদ্ধৃত করছি। যেমন ঃ

১. **কিতাব ঃ** এর অর্থ গ্রন্থ। আবার কিতাব অর্থ জমা করা। যেহেতু কুরআনে জীব, উদ্ভিদ, প্রাণীসহ সকল প্রকার জড় জগতের বিস্তারিত তথ্য, তত্ত্ব ও আলোচনা এতে স্থান লাভ করেছে, তাই একে কিতাব নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন–

   "হে নবী! আপনার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি– যা সকল বিষয়ের বর্ণনাকারী এবং মুসলমানদের জন্য বড় হেদায়েত ও রহমত এবং সুসংবাদ জ্ঞাপক।" (১৬ ঃ ৮৯)

২. **মুবীন ঃ** এর অর্থ হচ্ছে- প্রকাশকারী। যেহেতু 'কুরআন' সুস্পষ্টভাবে হক ও বাতিলের মধ্যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে বর্ণনা করেছে, তাই একে 'মুবীন' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন–

   "হা-মীম, শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের (মুবীনের)।" (৪৪ ঃ ১ ও ২)

৩. **কুরআন ঃ** অর্থ হচ্ছে– পঠিত। পৃথিবী নামক এ বিশ্বে মানবসমাজের মধ্যে একমাত্র আল্-কুরআনই একক গ্রন্থ হিসেবে সবচেয়ে বেশী এবং তুলনাহীনভাবে প্রতিদিন-প্রতিক্ষণ-ই পড়া হচ্ছে বিধায় একে 'কুরআন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন– "শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের।' (৩৬ ঃ ২)

৪. **কারীম** ঃ এর অর্থ- মহান, সম্মানিত। যেহেতু 'আল-কুরআন' মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও মর্যাদাসম্পন্ন বাণী বিশেষ, তাই একে 'কারীম' বলা হয়েছে। যেমন– "নিশ্চয় এটা সম্মানীত (কারীম) কুরআন।" (৫৬ ঃ ৭৭)

৫. **কালাম** ঃ অর্থ হচ্ছে- কথা ক্রিয়া। আল্-কুরআনের বাণী স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাঁরই সৃষ্টির প্রতি এক উজ্জ্বল পথ নির্দেশ, যা মানব সমাজের অন্তরে বর্ণনাতীত প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তাই একে 'কালাম' বলা হয়েছে। যেমন– "এমনকি তিনি আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণ করবেন।" (৯ ঃ ৬)

৬. **নূর** ঃ এর অর্থ- জ্যোতি। আলোর মাধ্যমে যেমনিভাবে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়, তেমনিভাবে মানব সমাজের ভেতর আল্লাহ্‌দ্রোহী সকল প্রকার অন্ধত্ব দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ্ 'কুরআন' অবতীর্ণ করেছেন, তাই একে 'নূর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন– "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট নূর।" (৪ ঃ ১৭৪)

৭. **হুদা** ঃ অর্থ হচ্ছে– হিদায়াত বা সঠিক পথ প্রদর্শন। যেহেতু একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালকের প্রেরিত বাণী-ই মানব জাতিকে সত্য-সঠিক পথটি প্রদর্শন করতে পারে, তাই 'কুরআন'কে 'হুদা' বলা হয়েছে। যেমন– "এ কুরআন বিশ্বাসীদের জন্য রহমত ও পথ প্রদর্শক।" (১০ ঃ ৫৭)

৮. **রহমত** ঃ অর্থ– শান্তি। যেহেতু একমাত্র কুরআন-ই মানবজাতিকে ইহ্‌লৌকিক ও পারলৌকিক প্রকৃত শান্তির পথ প্রদর্শন করতে পারে, তাই একে 'রহমত' নামেও চিত্রিত করা হয়েছে। যেমন- "কুরআন বিশ্বাসীদের জন্য শান্তি এবং সঠিক পথ প্রদর্শক (হুদা)।" (১০ ঃ ৫৭)

৯. **ফুরকান** ঃ অর্থ হচ্ছে– পৃথককারী। যেহেতু কুরআন আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে তাই একে 'ফুরকান' বলা হয়েছে। যেমন– "অতঃপর তিনি তাঁর বান্দাহ্‌র ওপর ফুরকান নাযিল

১০. **শিফা** ঃ অর্থ হচ্ছে– আরোগ্য। কুরআন মানুষের আভ্যন্তরীণ অন্তরের রোগসমূহ বিদূরিত করে, তাই একে 'শিফা' বলা হয়েছে। যেমন– "এবং আমি নাযিল করি কুরআন যা রোগমুক্তির উপায় (শিফা)।" (১৭ ঃ ৮২)

১১. **যিকির** ঃ এর অর্থ- আলোচনা। যেহেতু কুরআনে অসংখ্য বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। তাই একে 'যিকির' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন– "এ হলো বরকতময় আলোচনা যা অবতীর্ণ করেছি।" (২১ ঃ ৫০)

১২. **মুবারক** ঃ এর অর্থ হচ্ছে– পবিত্র। যেহেতু মহান স্রষ্টার বাণী পবিত্র ও মুবারকময়, তাই একে 'মুবারক' বলা হয়েছে। যেমন– "এ হলো পবিত্র আলোচনা।" (২১ ঃ ৫০)

১৩. **মাওয়েজা** ঃ অর্থ হচ্ছে- উপদেশ। আল-কুরআন মূলতঃ স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টির জন্য এক উপদেশ নামা, তাই একে 'মাওয়েজা' বলা হয়েছে। যেমন– "তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এসেছে উপদেশ (মাওয়েজা)।" (১০ ঃ ৫৭)

১৪. **আলী** ঃ অর্থ– সু-উচ্চ। যেহেতু কুরআন সু-উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, তাই "আলী" নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন– "নিশ্চয়-ই এ কিতাব সু-উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বিজ্ঞানময়।" (৪৩ ঃ ৪)

১৫. **হিকমাত** ঃ অর্থ হচ্ছে– জ্ঞান, বিজ্ঞান বা যথোপযুক্ত নিয়ম। এ মহাবিশ্বের অসংখ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য, তত্ত্ব ও আলোচনা দিয়ে আল্-কুরআন ভরপুর বিধায় একে 'হিকমত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন– "পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিজ্ঞান (হিকমাত)।" (৫৪ ঃ ৫)

১৬. **হাকীম** ঃ এর অর্থ হচ্ছে– সুদৃঢ় জ্ঞান। যেহেতু কুরআনে বর্ণিত সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বগুলো সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই একে 'হাকীম' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন– "বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ।" (১০ ঃ ১)

১৭. **মুহাইমিন ঃ** অর্থ- সংরক্ষণকারী। যেহেতু কুরআন পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সত্যতা বিধানকারী এবং মৌলিক তথ্য প্রকাশকারী, তাই 'মুহাইমিন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন- "আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে।" (৫ ঃ ৪৮)

১৮. **হাবৃল ঃ** অর্থ– রজ্জু। কুরআন নির্ভুল জ্ঞান লাভের এবং পথ প্রাপ্তির একমাত্র অবলম্বন বিধায় একে 'হাব্‌ল' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন– "তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আঁকড়ে ধর।" (৩ ঃ ১০৩)

১৯. **সিরাতুল মুস্তাকীম ঃ** অর্থ হচ্ছে– সোজা পথ। কুরআন যেহেতু মানব জাতিকে জান্নাত লাভের সোজা পথ প্রদর্শন করে, তাই একে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বলা হয়েছে। যেমন– "আপনি আমাদেরকে সরল, সোজা পথ প্রদর্শন করুন।" (১ ঃ ৫)

২০. **কাওল ঃ** অর্থ– বাণী। কুরআন যেহেতু আল্লাহ্‌র বাণী, তাই 'কাওল' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন– 'নিশ্চয় তা আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট বাণী।" (৮৬ ঃ ১৩)

২১. **ফাসল ঃ** অর্থ হচ্ছে– পৃথককারী। কুরআন সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে বিধায় 'ফাসল' নামেও আখ্যায়িত করেছে। যেমন– "নিশ্চয়ই তা পার্থক্য নির্ণয়কারী বাণী।" (৮৬ ঃ ১৩)

২২. **নাবায়ে আযীম ঃ** অর্থ– মহান সংবাদ। যেহেতু কুরআন সংবাদ প্রদান করে কিয়ামাত, হাশর ও জান্নাত-জাহান্নামের মত বিরাট বিরাট সংবাদের, তাই 'নাবায়ে আজীম' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন– "তারা কি সেই মহা প্রলয়ের ব্যাপারে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে?" (৭৮ ঃ ১, ২)

২৩. **আহসানুল হাদীস ঃ** এর অর্থ হচ্ছে– সর্বোত্তম বাণী। যেহেতু মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র বাণীর ওপর কারও বাণী স্থান পেতে পারে না, তাই কুরআনকে 'আহসানুল হাদীস' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন– "আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব।" (৩৯ ঃ ২৩)

২৪. **কাইয়্যেম ঃ** অর্থ হচ্ছে– সরল, মজবুত । যেহেতু কুরআনে কোন বক্রতা নেই এবং কুরআন সরল পথ প্রদর্শন করে, তাই একে 'কাইয়্যেম' বলা হয়েছে । যেমন– "আমাদেরকে সরল পথ দেখাও ।" (১ ঃ ৫)

২৫. **মাসানী ঃ** অর্থ-পুনরাবৃত্তি । কুরআনে মানবজাতিকে বার বার নছীহত করা হয়েছে বিধায় একে 'মাসানী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে । যেমন- "আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বানী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় ।" (৩৯ ঃ ২৩)

২৬. **মুতাশাবেহ ঃ** অর্থ হচ্ছে– সদৃশ্য । কুরআনের আয়াতসমূহ ভাষার গাম্ভীর্য, অলংকার ও অভিনব বর্ণনা শৈলী এবং সত্যতার দিক দিয়ে পরস্পর একটি অপরটির সদৃশ্য, তাই একে 'মুতাশাবেহ' নামকরণ করা হয়েছে । যেমন- "আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বানী সম্বলিত কিতাব যা সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় ।" (৩৯ ঃ ২৩)

২৭. **তানযিল ঃ** এর অর্থ হচ্ছে– ক্রমশঃ অবতারিত বা অবতীর্ণ । যেহেতু পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে কুরআন ২৪টি বছর পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছে, তাই 'তানযিল' নামে অভিহিত করা হয়েছে । যেমন–"নিশ্চয়ই কুরআন বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্রমশঃ অবতারিত ।" (৬৯ ঃ ৪৩)

২৮. **রূহ ঃ** অর্থ হচ্ছে– প্রাণের সঞ্চার । কুরআন সত্যি-সত্যি গোমরাহ, মৃত হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার করে, তাই এ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে ।

২৯. **অহী ঃ** অর্থ- প্রত্যাদেশ । যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাহর প্রতি প্রেরিত বাণী, তাই 'অহী' নামে অভিহিত করা হয়েছে । যেমন- "আমি তো কেবল অহী দ্বারা তোমাদেরকে সতর্ক করে থাকি ।" (২১ ঃ ৪৫)

৩০. **আরাবী ঃ** আরবী ভাষা । কুরআন অতি উচ্চমানের আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় 'আরাবী' নামে অভিহিত করা হয়েছে । যেমন– "আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় ।" (৪২ ঃ ৭)

৩১. **বাছায়ের** ঃ এর অর্থ হচ্ছে– জ্ঞান। আল্-কুরআন মূলতঃ সঠিক জ্ঞান দিয়ে পরিপূর্ণ। তাই 'বাছায়ের' নামে আখ্যয়িত করা হয়েছে। যেমন- "এই কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল। (৪৫ ঃ ২৫)

৩২. **বায়ান** ঃ অর্থ হচ্ছে- স্পষ্ট বিবরণ। আল্-কুরআন তার সকল বিষয়কে স্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ করেছে বিধায় এর নাম 'বায়ান' রাখা হয়েছে। যেমন– "এটা মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা।" (৩ ঃ ১৩৮)

৩৩. **ইলম** ঃ অর্থ– জ্ঞান। কুরআন বাস্তবপক্ষে বিশাল জ্ঞানের সমারোহে পরিপূর্ণ এক মহাভাণ্ডার। তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'ইলম'। যেমন– "তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর।" (২ ঃ ১৪৫)

৩৪. **হক** ঃ অর্থ হচ্ছে– সত্য। কুরআন পরম সত্যতা-সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানবমণ্ডলীকে সেই সত্যের পানে আহ্বান করে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে 'হক'। যেমন– "সত্য আগমন করেছে, মিথ্যা প্রস্থান করছে এবং মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।" (১৭ ঃ ৮১)

৩৫. **হাদী** ঃ অর্থ– পথ প্রদর্শক। আল্-কুরআন সত্য-সঠিক পথটি প্রদর্শন করে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে 'হাদী'। যেমন– "নিশ্চয়ই এ কুরআন সঠিক পথের দিশা প্রদান করে।" (১৭ ঃ ৯)

৩৬. **আ'জাব** ঃ অর্থ হচ্ছে– বিস্ময়কর। আল্-কুরআন এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ রচনা করতে পারে না বলে একে 'আ'জাব' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন– "বিস্ময়কর কুরআন।" (৭২ ঃ ১)

৩৭. **তাযকিয়া** ঃ অর্থ হচ্ছে– উপদেশ। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্তে কুরআনের প্রতিটি পৃষ্ঠাই উপদেশে পরিপূর্ণ বিধায় এর নাম রাখা হয়েছে 'তাযকিয়া'। যেমন– "নিশ্চয় (এ কুরআন) উহা উপদেশ।" (৬৯ ঃ ৪৮)

৩৮. **আল্-ওরওয়াতুল উসকা** ঃ অর্থ হচ্ছে- মজবুত মাধ্যম। আল্-কুরআন মানবজাতিকে মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছাবার লক্ষ্যে একটা সুদৃঢ় মাধ্যম বিধায় উক্ত নামকরণ করা হয়েছে। যেমন– "যে তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহে ঈমান আনবে সে এক মজবুত

৩৯. **সিদ্ক** ঃ অর্থ হচ্ছে– সত্য। আল্-কুরআন যেহেতু মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্য বাণী সম্ভার, তাই 'সিদ্ক' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন– "যারা সত্য এনেছে।" (৩৯ ঃ ৩৩)

৪০. **আদল** ঃ এর অর্থ হচ্ছে– ন্যায়পরায়ণ। যেহেতু কুরআন ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দেয়, তাই এ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন– "সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ, তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (৬ ঃ ১১৫)

৪১. **আমর** ঃ এর অর্থ হচ্ছে– নির্দেশ। কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের জন্য মানব জাতির প্রতি নির্দেশ বিধায় এ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন– "এটা আল্লাহ্‌র বিধান।" (৬৫ ঃ ৫)

৪২. **মুনাদী** ঃ এর অর্থ হচ্ছে– আহ্বানকারী। আল্-কুরআন যেহেতু মানব সমাজকে এক আল্লাহ্‌র পথে সর্বদা আহ্বান করে তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'মুনাদী'। যেমন– "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি।" (৩ ঃ ১৯৩)

৪৩. **বুশরা** ঃ সুসংবাদ। কুরআন যেহেতু মানবমণ্ডলীকে এক অনাবিল শান্তির জায়গা জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করে, তাই 'বুশরা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন– "নিশ্চয়ই কুরআন হিদায়াত এবং সুসংবাদ।" (সূরা নাহল ঃ ৮৯)

৪৪. **মাজীদ** ঃ অর্থ- মর্যাদাশীল। আল্লাহ্‌র বাণী বিধায় অতীব মর্যাদাশীল, তাই একে মজীদ বলা হয়। যেমন– "বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।" (৮৫ ঃ ২১, ২২)

৪৫. **যাবুর** ঃ এর অর্থ হচ্ছে– গ্রন্থ। মূলতঃ কুরআন একখানা আসমানী গ্রন্থ। তাই একে 'যাবুর' বলা হয়। যেমন– "আমি উপদেশের পর গ্রন্থে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে।" (২১ ঃ ১০৫)

৪৬. **বাশীর ঃ** অর্থ হচ্ছে– সু-সংবাদদাতা, কুরআন প্রকৃতপক্ষেই মানবজাতিকে জান্নাতের খোশ খবর দেয় বিধায় এ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন- "এ কুরআন সু-সংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী।" (২ ঃ ১১৯)

৪৭. **নাজির ঃ** অর্থ– ভীতি প্রদর্শনকারী। কুরআন যেহেতু আল্লাদ্রোহীদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির ভয় প্রদানকারী তাই এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন- "আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি।" (২ ঃ ১১৯)

৪৮. **আযীয ঃ** এর অর্থ হচ্ছে– প্রচণ্ড শক্তিশালী, কঠিন। কুরআন বিশ্বাসীদের ব্যাপারে যেমন নমনীয় তেমনি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন, তাই এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন- "যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, এটা অবশ্যই এক মহিমান্বিত গ্রন্থ।" (৪১ ঃ ৪১)

৪৯. **বালাগ ঃ** পৌঁছানোর মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা, কথা-বার্তা, আদেশ-নিষেধ এ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছেছে বিধায় 'বালাগ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন-

৫০. **কাসাস ঃ** অর্থ হচ্ছে– ঘটনাবলী, কাহিনী। মানব ইতিহাসের আদি থেকে প্রায় সকল ইতিহাস, কাহিনী এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে বিধায় 'কাসাস' নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- "নিশ্চয়ই ইহা এক সত্য কাহিনী।" (৩ ঃ ৬২)

৫১. **সুহুফ ঃ** এর অর্থ হচ্ছে– লিখিত কাগজ। আল কুরআন লিখিত আকারে কাগজের সমষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছে বিধায় এর এক নাম 'সুহুফ'। যেমন- "উহা আছে মর্যাদাসম্পন্ন লিপিসমূহে।" (৮০ ঃ ১৩)

৫২. **মুকাররামা ঃ** অর্থ হচ্ছে– সম্মানিত। কুরআন যেহেতু সম্মানিত ও

মর্যাদাশালী আসমানী বাণী তাই 'মুকাররামা' নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- "উহা আছে মর্যাদাসম্পন্ন লিপিসমূহে।" (৮০ ঃ ১৩)

৫৩. **মারফুয়া** ঃ এর অর্থ হচ্ছে– উচ্চ, উন্নত। যেহেতু কুরআন আল্লাহ্র বাণী, তাই 'মারফুয়া' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন- "উহা আছে মর্যাদাসম্পন্ন লিপিসমূহে, যা উন্নত, পবিত্র।" (৮০ ঃ ১৩, ১৪)

৫৪. **মুতাহ্হারা** ঃ এর অর্থ- পবিত্র। আল্-কুরআন অতি পবিত্র গ্রন্থ বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে– 'মুতাহারা'। যেমন– "উহা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, যা উন্নত, পবিত্র ও মহান।" (৮০ ঃ ১৩, ১৪, ১৫)

৫৫. **মুছাদ্দেকা** ঃ অর্থ হচ্ছে– সত্যায়নকারী। আল্-কুরআন সকল পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী বিধায় উক্ত নাম রাখা হয়েছে। যেমন- "এবং তারা পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সত্যায়নস্বরূপ এবং মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম, তাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো।" (৫ ঃ ৪৬)

বর্তমান পৃথিবীতে মানব রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কোটি কোটি বই-পত্র লিখিত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। কিন্তু 'কুরআনের' অনুরূপ তুলনাবিহীন অসংখ্য বিস্ময়কর মৌলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গ্রন্থ, আর একটিও খুঁজে বের করা মানব জাতির পক্ষে কখনোই সম্ভবপর হবে না। একমাত্র কেবল আল্-কুরআনের পক্ষেই এত বড় বিস্ময় প্রদর্শন করা সম্ভব হয়েছে, কেননা আল্-কুরআন যে মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার-ই পবিত্র বাণী! তাই মানবজাতির প্রত্যেকটি কাজের উৎস হোক এ মহা আসমানী গ্রন্থ কুরআন। তাহলেই কেবল তারা সার্বিকভাবে সফল হতে পারবে।

একের ভেতর অনেক

আল্-কুরআন

"আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।" (৭২ ঃ ৮)

"আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সম্মুখীন হয়।" (৭২ ঃ ৯)

"আমরা জানি না, বিশ্ববাসী নিজেরাই কি অমঙ্গল চায়, না-কি তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চায় না!" (৭২ ঃ ১০)

"এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী।" (৭২ ঃ ১১)

"এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না।" (৭২ ঃ ১২)

ওপরে বর্ণিত পর পর পাঁচটি আয়াত-ই মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনের সূরা 'জিন' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। উক্ত আসমানী বাণীগুলোতে পৃথিবীবাসীর জন্য কত গুরুতর বিপদ এবং কত অজানা তথ্য সম্পর্কে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই এক জ্ঞানপূর্ণ রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। ইতোপূর্বে মানবমণ্ডলী এর গুরুত্ব না দিলেও বর্তমানে বিজ্ঞানের সত্য উদ্‌ঘাটনে তার সত্যতা আবিষ্কৃত হওয়ায় চিন্তাশীল সমাজ দারুণ সঙ্কার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার চিন্তায় সময় অতিবাহিত করছে।

পাঁচটি বাক্য অথচ মহাকাশ বিজ্ঞানের এক বিশাল মহাজাগতিক সৃষ্ট ব্যবস্থার বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যকে এত অল্প কথায় কত সুন্দরভাবেই না উপস্থাপন করা হয়েছে কুরআনে। আমাদের সৌরজগতের ভেতরে এবং বাইরে সংলগ্ন এলাকায় বাস্তবভাবেই মহাজাগতিক পরিবেশে যে ভয়ংকর মহাজাগতিক রশ্মি ও পাথরপূর্ণ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়ে আছে, তা রীতিমত ভীতিকর।

উপরোল্লেখিত বাণীসমূহের মধ্যে যে 'বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ' লুকিয়ে আছে, তা হলো–

১. পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাশূন্যে নিকটবর্তী এলাকায় এবং সৌরজগতের বাইরের দিকে সংলগ্ন এলাকায় ঝুলন্ত পাথর খণ্ড, ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড এবং জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তথা 'গামা-রে' দিয়ে পরিপূর্ণ।

২. ঝুলন্ত এবং উড়ন্ত ঐ সকল পাথর খণ্ড এবং প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তার আঘাতে পৃথিবী যে কোন সময়ই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

৩. পাথর, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড এবং তেজস্ক্রিয়তা দিয়ে পরিপূর্ণ এলাকায় অনবরত উল্কাপাত ঘট্ছে।

৪. মহাকাশে কার্যে নিয়োজিত ফিরিশ্তাদের চলার পথ আছে।

৫. পৃথিবীর নাজুক ব্যবস্থাপনা এবং সৌরজগতের চতুর্দিকে বিরাট এলাকা জুড়ে ব্যাপক পাথরের বহর ও জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিয়ে জিনদের পালিয়ে যাওয়ার রুট (পথ) বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যা স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষ এবং জিনদের প্রতিরোধ করার এক কার্যকর ব্যবস্থা মাত্র।

৬. জিনদের বক্তব্য বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের অস্তিত্ব নিজ থেকেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। তাই জিনদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা মানেই বর্তমান বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করার শামিল মাত্র। তাহলে এবার চলুন! এক এক করে আলোচনায় প্রবেশ করা যাক!

এক

আল্-কুরআন

"আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম প্রহরীর কঠোর পাহারা ও জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।" (৭২ ঃ ৮)

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে।" (৩৭ ঃ ৬ ও ৭)

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ সরবরাহকারী এবং ওদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।" (৬৭ ঃ ৫)

"আমি নিকটকর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওটাকে করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা।" (৪১ ঃ ১২)

এ অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ অধ্যায়সমূহের মধ্যে অন্যতম; যা একই সাথে দীর্ঘদিন থেকে জমে থাকা অনেকগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের জ্ঞানময় প্রসারিত দৃষ্টির সামনে প্রস্ফুটিত গোলাপের মত মেলে ধরবে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যেহেতু পৃথিবীতে বিজ্ঞানের পূর্বে আগমন করেছে, তাই প্রথমেই আমরা উদ্ধৃত বাণীসমূহের সংক্ষিপ্ত মর্মকথা জেনে নেয়ার চেষ্টা করবো এবং পরবর্তীতে তারই আলোকে বর্তমান ফলপ্রসু বিজ্ঞান কি কি আবিষ্কার করে তার কতটুকুন সত্যতা উন্মোচন করতে পেরেছে আমরা তাও পরখ করে দেখার চেষ্টা করবো।

শুরুতে ৭২ ঃ ৮ আয়াতটিতে অগ্নিশিখা (Infrared-ray) দিয়ে সৃষ্ট এবং আলোর গতিতে চলমান 'জিন', সম্প্রদায়ের রিপোর্ট হচ্ছে, তারা পৃথিবীর পরিবেশ থেকে বেরিয়ে মহাশূন্যে দূরবর্তী এলাকার তথ্য সংগ্রহের চেষ্টায় গমনকালে দেখতে পায় যে, সৌরজগতের চতুর্দিকে অগণিত পাহারাদার এবং অসংখ্য-অগণিত পাথর খণ্ড, ও উল্কাপিণ্ড এবং জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তথা মহাজাগতিক 'রশ্মি ও তেজস্ক্রিয়তা' দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সে পরিবেশের ব্যাপকতা এত বেশি যে তা উল্লেখ করার মত নয়। যে কারণে মহাশূন্যের তথ্য সংগ্রহে 'জিন' জাতি কার্যত ব্যর্থ।

উপরে উদ্ধৃত চারটি আয়াতের দ্বিতীয় আয়াতটিতে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন আমাদের সৌরজগতের ভেতরে নয় বরং বাইরের নিকটবর্তী সংলগ্ন এলাকার সীমানায় তাঁর পক্ষ থেকে সৃষ্ট একটা বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, যে এলাকাটিকে তিনি গ্রহ-নক্ষত্র দিয়ে সাজিয়েছেন যাতে দর্শনার্থীগণ অন্ধকার রাতে সৌরজগতের ভেতর থেকে গুমোট অন্ধকারের প্রভাবকে উপেক্ষা করে হাল্‌কা মিষ্টি মধুর আলোর ঝল্‌কানিতে উদ্ভাসিত আকাশকে দর্শন করে পুলকিত হতে পারে।

দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রমের পর রাতের বেলায় নক্ষত্রের মিটমিট্ আলোতে মনের আবেগপ্রবণ ভাবকে যেন মেলে দিয়ে সকল দুঃখ, বেদনা ও ক্লেশকে ঝেড়ে ফেলে নতুন করে সুন্দর সতেজ ও প্রসন্ন মনের অধিকারী হতে পারে এবং আগত নতুন দিনটিতে দ্বিগুন উদ্যোগ নিয়ে নিজ কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, এমনি ধরনের একটি সুন্দর পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে ঐ প্রদীপ সজ্জিত এলাকাটিকে তিনি অভিশপ্ত শয়তানদের (জিনদের) নির্বিঘ্নে চলাচল থেকেও নিরাপদ রেখেছেন।

এই নিরাপদ ব্যবস্থাটা তিনি কিভাবে কার্যকর করেছেন, তার বর্ণনা পেশ করেছেন তৃতীয় আয়াতটিতে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যবস্থাটি তিনি নিয়েছেন তাতে একই সাথে দু'টি কাজ সমাধা হচ্ছে। ব্যবস্থাটি হচ্ছে অসংখ্য অগণিত প্রদীপ সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে দূর থেকে দেখতে অসংখ্য আলোর সমাবেশে পরিবেশটি সুন্দর, মনোরম ও আলো

ঝল মল দেখাচ্ছে, আর অসংখ্য জ্বলন্ত প্রদীপের আয়োজনে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলো থেকে সৃষ্ট 'গামা-রে ও তেজস্ক্রিয়তা' চতুর্দিকে শয়তানদের দিকে নিক্ষেপের কারণে ওদের পক্ষে নির্বিঘ্নে, সহজে ঐ এলাকা পরিভ্রমণ, অতিক্রম কিংবা চলাফেরা খুবই কঠিন হয়ে পড়ায় তারা প্রভুর নাফরমানীমূলক অথবা মানব জাতির জন্য কোন ফিতনামূলক কাজ করতে পারে না। প্রভুর পক্ষ থেকে শয়তানদের (জিনদের) বিরুদ্ধে এটি একটি মোক্ষম ব্যবস্থা যা তারা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না, যেতে চাইলেই তৎক্ষণাত ফিরিশতা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ঐ অগ্নি গোলকের (প্রদীপের) আঘাত এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তথা তেজস্ক্রিয়তার দহনের সম্মুখীন হয়ে ব্যর্থ হয় এবং ফিরে আসে।

চতুর্থ আয়াতটির বক্তব্যে বিষয়টি আরো ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হতে সাহায্য করেছে। মহাবিশ্বের মহান সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্' মানুষ এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই গোলামী করার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে পৃথিবীকে করা হয়েছে 'পরীক্ষা কেন্দ্র'। এই পরীক্ষা কেন্দ্রে মানুষ এবং জিন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন নির্বাহ করার মধ্য দিয়ে কতটুকুন সফলতার সাথে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করছে এবং সফল হচ্ছে অর্থাৎ প্রভুর নির্দেশ পালন করছে, আর কতটুকুন তাঁকে উপেক্ষা করছে তা স্রষ্টা হিসেবে তিনি যাচাই করছেন এবং এরই ওপর ভিত্তি করে পরকালে পরীক্ষায় সফলতা লাভকারীকে সুখময় কাননে ও পরীক্ষায় ব্যর্থতার জন্য বিফলতা লাভকারীকে 'অগ্নিকুণ্ড' নামক শাস্তির স্থানে প্রেরণ করবেন।

এখন এ অবস্থায় 'জিন' জাতি আগুনের (Infrared-ray) তৈরী বিধায় তারা আলোর গতিতে অতি সহজে নিজেদের জন্য নির্ধারিত পৃথিবী ও সৌর এলাকা অতিক্রম করে যদি অন্য কোন জীবনময় জগতে চলে যায় অথবা 'নূরের' (Radiant Energy) তৈরী ফিরিশ্তাদের আকাশময় চলাফেরা ও নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করার পথে তাদের নিকট থেকে কোন বিষয় জিনেরা (শয়তান) যদি চোরাগোপ্তা শুনে ফেলে তাহলে তাদের ওপর নির্ধারিত পরীক্ষার উদ্দেশ্য চরমভাবে ব্যাহত হবে। পরীক্ষা তখন Open book test-এ পর্যবসিত হবে; যা প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষকের কাম্য নয়।

আর সে জন্যেই মহান পরীক্ষক 'আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন' মানুষ এবং জিনের জন্য পৃথিবী নামক পরীক্ষার হলকে এবং তার পারিপার্শ্বিক সৌর এলাকাকে বাদ দিয়ে চতুর্দিকে বিরাট একটা মহাশূন্য এলাকাকে অগণিত অসংখ্য উল্কাপিণ্ড ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নামক মহাজাগতিক রশ্মির তেজস্ক্রিয়তা দিয়ে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। যেখানে অনবরত উল্কাপাত দৃষ্টিগোচর হলে Missile War বলেই মনে হবে। এ Missile বা উল্কাপাত বা জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নামক তেজস্ক্রিয়তা দিয়ে আমাদের সৌরজগতের বাইরের দিকে (Outer region) পরিবেষ্টন সৃষ্টি করা আল্লাহর পক্ষ থেকে জিনদের (শয়তানদের) জন্য সত্যিই এক অজেয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা; যেখানে সৃষ্টিকর্তার কৃতিত্ব এবং মাহাত্ম্য প্রকাশ পাচ্ছে।

সুধী পাঠক, আমাদের সৌরজগতের বেল্টের বাইরে (Outer region-এ) গণনাতীত, অসংখ্য-অগণিত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড দিয়ে সৃষ্ট প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কীয় কুরআনের এ দাবীকে জানার পর এবার আমরা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সর্বশেষ রিপোর্টও অবহিত হওয়ার চেষ্টা করবো। চলুন তাহলে!

বিজ্ঞান

আপনি হয়তো শুনে অবাক হবেন যে, আমাদের সৌরজগতের চতুর্দিকে 'Oort cloud' নামক এক বিরাট-বিশাল এলাকা জুড়ে পাথর, ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ডের এবং 'মহাজাগতিক রশ্মির' জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মহাসাগর সৃষ্টি হয়ে আমাদেরকে ঘিরে আছে। দীর্ঘদিন থেকে বিজ্ঞান বিশ্বে বিজ্ঞানীদের মাঝে একটি প্রশ্ন অমীমাংসিত অবস্থায় বিরাজ করছিল যে, প্রতি বৎসর-ই কমপক্ষে পাঁচটি ধূমকেতু কোথা থেকে উড়ে এসে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়? উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে বিজ্ঞানীকুল কঠোর অধ্যবসায়ের সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে থাকেন। ফলে পঞ্চাশের দশকে বিজ্ঞানী 'Ernst Opik' এবং 'Jan Oort' যৌথভাবে আমাদের সৌরজগতের চতুর্দিকে বিরাট এলাকা নিয়ে পাথর খণ্ড, ধূমকেতু এবং উল্কাপিণ্ডসহ জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পরিবেষ্টিত ভয়ানক মেঘমালার সন্ধান লাভ করেন। বিজ্ঞান বিশ্ব আবিষ্কারক উক্ত বিজ্ঞানী দু'জনের নামানুসারে ঐ মেঘ মালার নামকরণ করে 'Opik-Oort cloud'।

"ওরাই কেবল আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে, যারা তা দর্শন করে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।" (৩২ ঃ ১৫)
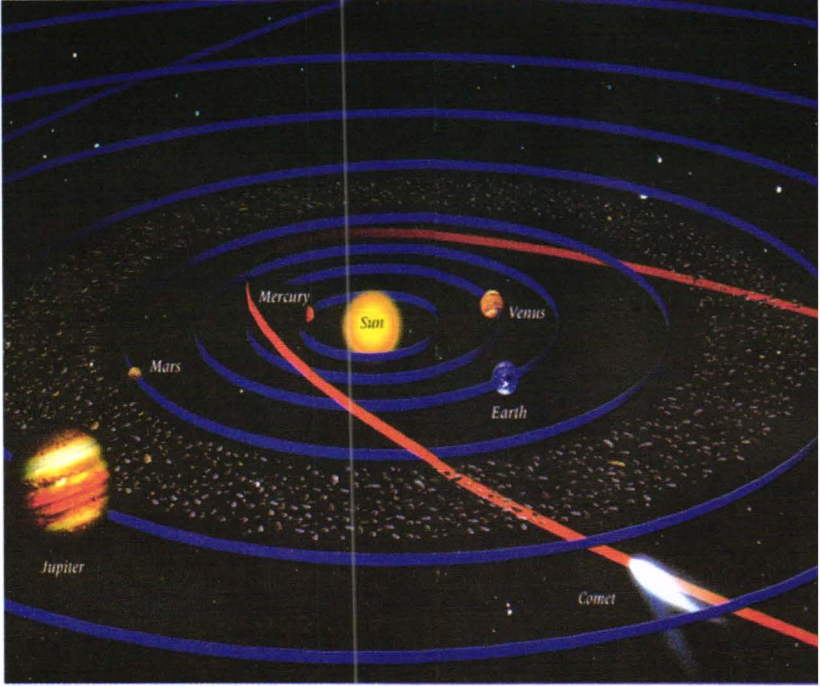
চিত্র-২

– আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিসীমার অগোচরে সৃষ্ট মহাপ্রভুর অদৃশ্য সৃষ্টি কৌশলের নৈপুণ্যতার স্বাক্ষরস্বরূপ প্রতি বৎসরই প্রায় ৫/৬টি ধূমকেতু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে যায় এবং নীরবে যেন পৃথিবীবাসীকে এক মহাজ্ঞানের দিকে ইংগিত করে নতুন আবিষ্কারের দিকে আহ্বান জানায়।

অতি সম্প্রতি বর্তমান বিজ্ঞান তার উদ্ভাবিত উন্নততর প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে 'Oort cloud'-র ওপর জরিপ চালিয়ে যে তথ্য প্রকাশ করে, তাতে দেখানো হয় যে, 'Oort cloud' দৈর্ঘে প্রায় ৩২ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার বা ৩.২ আলোকবর্ষ এবং প্রস্থে প্রায় ২৫ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার বা ২.৫ আলোকবর্ষের বিরাট জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগতের চতুর্দিকেই ছড়িয়ে আছে। এই ৩.২x২.৫ আলোকবর্ষের পরিবেষ্টিত সীমানায় বা আউটার রিজিয়নে (Outer region) প্রায় ১০০ বিলিয়ন হতে ১ ট্রিলিয়ন 'ধূমকেতু' এবং ইনার রিজিয়নে (Inner region) প্রায় ৫০০ বিলিয়ন হতে ১ ট্রিলিয়ন ধূমকেতু বিরাজ করছে; যা শুনতে পিলে চমকে উঠে। এছাড়াও গণনাতীত পাথর খণ্ড ও উল্কাপিণ্ড এবং মহাজাগতিক রশ্মির তেজস্ক্রিয়তা দিয়ে গোটা 'Oort cloud' পরিবেশটি জমজমাট হয়ে আছে।

বিংশ শতাব্দির কয়েকটি বড় আবিষ্কারের মধ্যে মহাজাগতিক বিভিন্ন রশ্মি ও তেজস্ক্রিয়ার আবিষ্কার তার মধ্যে একটি অন্যতম বিষয়। বিজ্ঞান বিশ্ব প্রমাণ করেছে নক্ষত্রের ভেতর প্রতিনিয়ত Proton-Proton chain reaction -এ ব্যাপকভাবে ভয়ংকর 'গামা-রে' (Gamma-ray) উৎপন্ন হয়। পরে সেই 'গামা-রে' সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গামা-রে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। প্রাণী কোষের সংস্পর্শে আসা মাত্র কোষগুলোকে তখনি ধ্বংস করে ফেলে।

'গামা-রে' মহাকাশে পরিভ্রমণের সময় পর্যায়ক্রমে এক্স-রে (X-ray), আল্ট্রা ভায়োলেট-রে (Ultra-violet-ray), দৃশ্যমান আলো (Vissible light), ইনফ্রারেড-রে (Infrared-ray), রেডিও ওয়েভ (Radio-wave) ইত্যাদি রশ্মিতে রূপান্তর ঘটতে থাকে। বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষিত অগ্রযাত্রায় বিজ্ঞান বিশ্বাস করে সমগ্র মহাকাশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের ভয়ংকর মহাজাগতিক রশ্মি ও তেজস্ক্রিয়তা (Cosmic ray & Radiation) ভরপুর হয়ে রয়েছে। প্রাণ সমৃদ্ধ কোন প্রাণীর পক্ষে উল্লেখিত মহাজাগতিক রশ্মি ও তেজস্ক্রিয়তা ডিঙ্গিয়ে সুস্থতাসহ পেরিয়ে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়। মহাজাগতিক রশ্মি ও তেজস্ক্রিয়তা মহাকাশে আলোর গতিতে পরিভ্রমণ করে থাকে।

"তিনিই (আল্লাহ্-ই) তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান।" (৪০ : ১৩)

চিত্র-৩

– ডাচ মহাকাশ বিজ্ঞানী 'জন ওর্ট' (Jan Oort) সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, আমাদের সৌরজগতের চতুর্দিকে বিশাল ভাসমান পাথরের স্তূপ পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। পরবর্তীতে তাঁর নামানুসারে বিজ্ঞান বিশ্ব ঐ পাথরের স্তূপের নামকরণ করেছে 'Oort Cloud'. এবং তিনি এ বিষয়ে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী (দৃশ্য-অদৃশ্য) সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (৪৬ ঃ ৩)
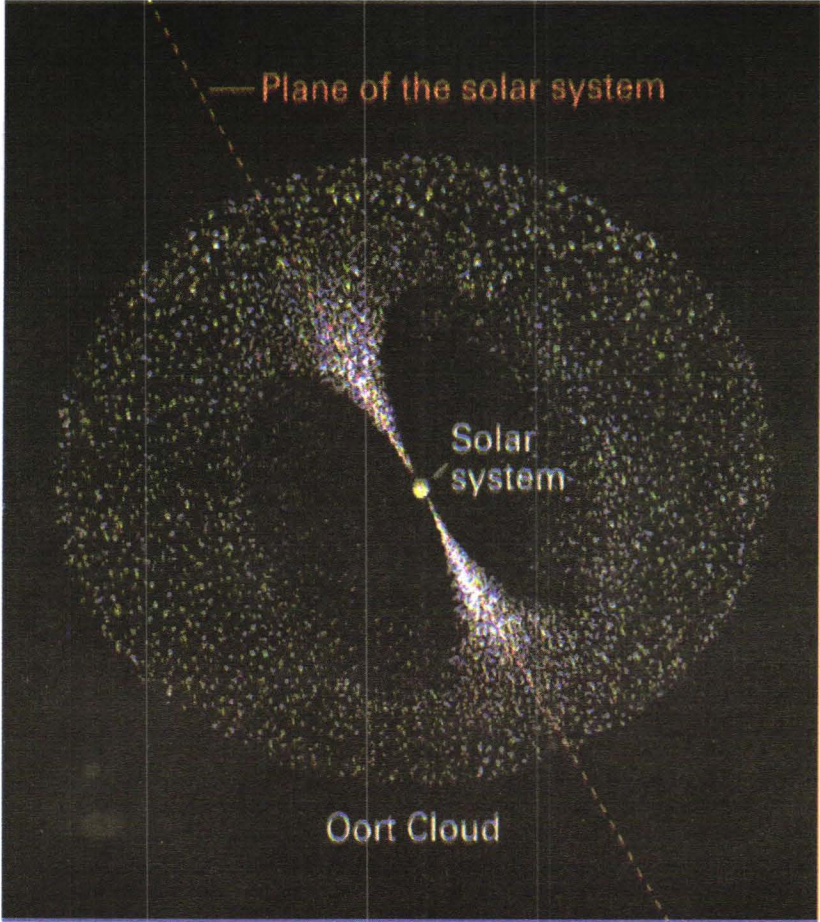
চিত্র-৪

– প্রায় ৩.২ × ২.৫ আলোকবর্ষ (প্রায় ৩০ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে এবং ২৪ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার প্রস্থে) ব্যাপী পাথর, ধূমকেতু ও উল্কা এবং তেজস্ক্রিয়তা সমৃদ্ধ এক বিশাল ভয়ংকর এলাকার মাঝখানে আমাদের সৌরজগত অবস্থিত। আমাদের দৃষ্টির বাইরে মহান স্রষ্টার কি বিস্ময়কর সৃষ্টি, এর রূঢ় বাস্তবতা সত্যি-সত্যি পিলে চমকিয়ে দেয়।

"তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর পাথরের ঝাঁক প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী।" (৬৭ ঃ ১৭)
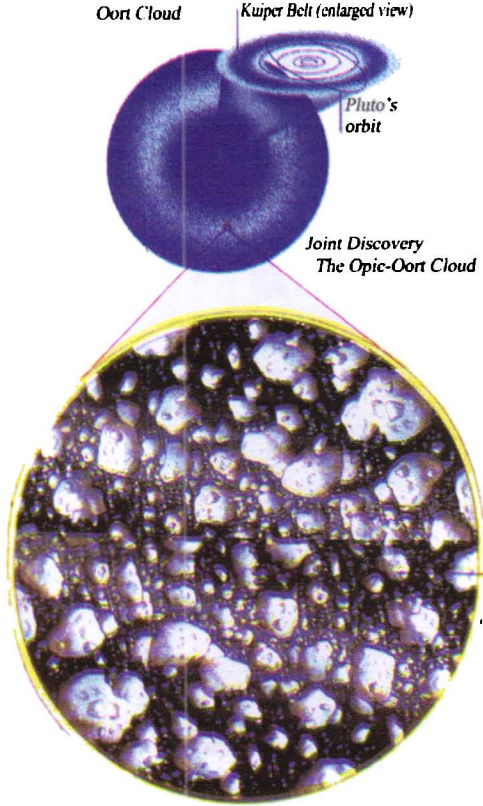
চিত্র-৫

– বিংশ শতাব্দির ৮০'র দশকে বর্তমান বিজ্ঞান 'Opik Oort Cloud'–এর বিশাল পাথর স্তূপ আবিষ্কার করেছে। অথচ কুরআন প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই এ সম্পর্কে পৃথিবীবাসীকে সতর্ক করেছে। অস্বীকার করার কোন পথ আছে কি? মহান আল্লাহর প্রতিটি বাণী যে মহাসত্যতায় মোড়ানো এবং বাস্তবভাবে বিজ্ঞানসম্মত তা-কি আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে?

"আমরা (জিনেরা) চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিয়ে আকাশ পরিপূর্ণ।" (৭২ ঃ ৬)
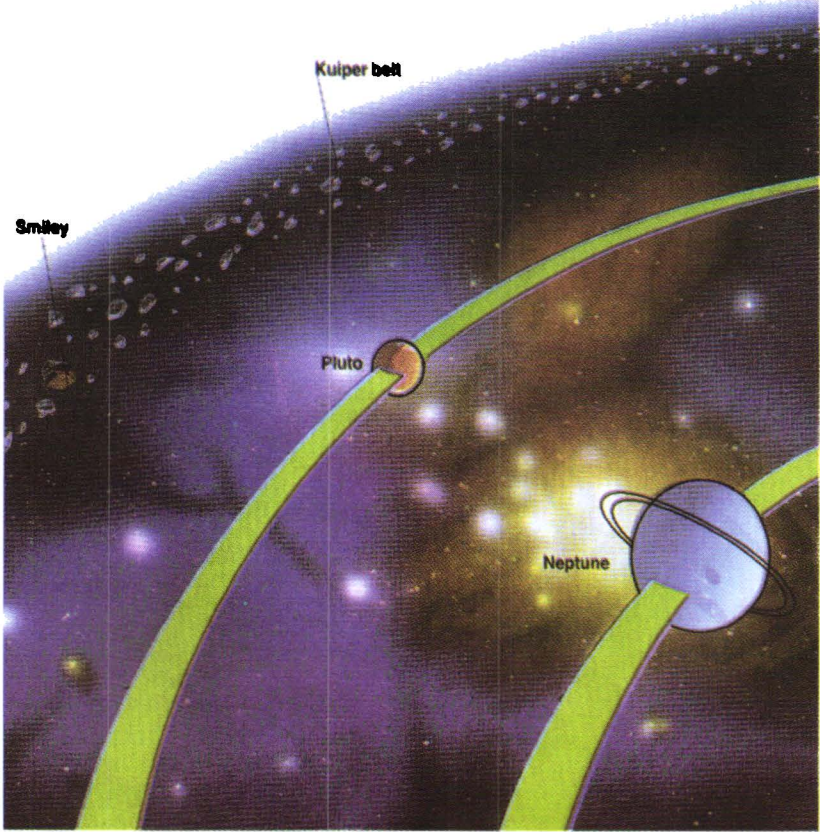
চিত্র-৬

– আমাদের সৌরজগতে আবিষ্কৃত এ পর্যন্ত সর্বশেষ গ্রহ প্লুটোর পরে পাথর সমৃদ্ধ 'কুইপার বেল্ট' (Kuiper Belt) থেকেই 'Oort Cloud' শুরু হয়েছে বিশাল জায়গা নিয়ে। সৌরজগতের ভেতরের পাথরখণ্ডগুলো দিয়েই মূলতঃ সৌর পরিবার সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং আমরা যে, ভয়ংকর পাথর পরিবেষ্টিত অবস্থায় আছি কুরআনের সে দাবী বিজ্ঞান আজ বাস্তবে প্রমাণ করেছে। এতে কি প্রমাণ হয় না যে কুরআন সত্য?

দৃশ্যমান আলোর তুলনায় 'এক্স-রে' তে 'ফোটন' কণিকার ঘনত্ব প্রায় ১০,০০০ গুন বেশী। আবার গামা-রে (Gamma-ray)তে 'ফোটন' (Photon) কণিকার ঘনত্ব দৃশ্যমান আলোর (Visible light) চাইতে প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন গুন বেশী। সে কারণে 'গামা-রে'-এর তেজস্ক্রিয়তার মাঝে অন্য কোন আলো বা তাপমাত্রা সম্পন্ন পদার্থ ও প্রাণী স্বাভাবিকতা নিয়ে বিরাজমান থাকতে পারে না। ব্যাপক বিপর্যয় ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণে তাদের অস্তিত্ব বিপণ্ন হয়ে পড়ে। আর এ সকল রশ্মি সকল, নক্ষত্রের মধ্যেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিজ্ঞান এ পর্যন্ত সৌরজগতের চতুর্দিকে সৃষ্টি হয়ে থাকা এই মহাজাগতিক প্রতিরোধপূর্ণ পরিবেশের পেছনে কি কারণ রয়েছে তার কোন তথ্য যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারেনি, যদিও কোন প্রাণী জাতির পক্ষে উক্ত প্রতিরোধমূলক 'পাথর' ও 'উল্কা' এবং ভয়ংকর 'তেজস্ক্রিয়তা' (Radiation) সমৃদ্ধ মহাজাগতিক বেল্টকে সহজে অতিক্রম করে যাওয়া খুবই দুরূহ বলে স্বীকার করে।

বিংশ শতাব্দিতে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত 'Opik-Oort cloud' এবং প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে একই বিষয়ে আসমানী গ্রন্থ কুরআনের তথ্যের মধ্যে কোন ব্যবধান আছে কি ? কুরআন এ বিষয়ে যা বলেছে, বর্তমান বিজ্ঞান কি হুবহু তাই প্রমাণ করেনি ? তাহলে সৃষ্টিকর্তা মহান 'আল্লাহ্' যেমন দিবালোকের মত 'সত্য', তেমনি তাঁর বাণী সমৃদ্ধ আসমানী গ্রন্থ 'কুরআন'ও 'সত্য', -সে কথা মেনে নিতে আর কি কোন দ্বিধা থাকতে পারে ?

সুতরাং যা এতদিন শুধু 'কুরআন' ছিল তা বর্তমানে সত্য-সঠিক 'বিজ্ঞানে'ও পরিণত হয়েছে। সত্যপন্থীদের জন্য এ এক বড় নিদর্শন বৈ কি!

দুই

আল্-কুরআন

"তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর পাথরবাহী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী।" (৬৭ ঃ ১৭)

"আমরা (জিনেরা) চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।" (৭২ ঃ ৮)

"আমরা (জিনেরা) জানি না, বিশ্ববাসী নিজেরাই কি অমঙ্গল চায়, না-কি তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চায় না!" (৭২ ঃ ১০)

ওপরের প্রথম আসমানী বাণীতে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী পৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, তাদের অবাধ্যতা এবং 'সত্য' গ্রহণে অনীহা তাদেরকে দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী দলে পরিণত করেছে এবং তাদেরকে কেউ মোকাবেলা করতে পারে না বা পরাজিত করতে পারে না এমন একখানা ভাব তারা প্রকাশ করছে। অথচ আকাশ রাজ্যে যে মহান সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে আকাশে রক্ষিত ভাসমান ও চলমান পাথরের স্তূপ থেকে এক ঝাঁক পাথর নিক্ষেপ করেই তাদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরদিনের জন্যই মুছে ফেলতে পারেন। তখন তারা টের পাবে 'আল্লাহ্র' পক্ষ থেকে আগত সাবধান-সতর্ক বাণী অবাধ্যদের জন্য কতটা মারাত্মক হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলার উল্লেখিত বক্তব্যে অবিশ্বাসীদের প্রতি ইহ্-জাগতিক শাস্তির সতর্ক সংকেতের পাশা-পাশি কিন্তু এক বিশাল-বিপুল মহাজাগতিক ব্যবস্থাপনায় মহাকাশে সৃষ্ট পাথরের স্তূপের বৈজ্ঞানিক তথ্যও প্রকাশিত হয়ে পড়েছে; যদিও পৃথিবীবাসী হিসেবে আমরা তা খালি চোখে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে পাই না।

দ্বিতীয় আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা অগ্নি-শিখা (Infrared-ray) দিয়ে সৃষ্ট 'জিন জাতির' মাধ্যমে একই বিষয়ে অর্থাৎ পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাশূন্যে 'গামা-রে' বা জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং অসংখ্য অগণিত পাথরের যে সমারোহ বা আয়োজন রয়েছে তার সংবাদ মানব জাতির কর্ণকুহরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। Infrared-ray-র দ্বারা সৃষ্ট বিধায় জিন সম্প্রদায় প্রায় আলোর গতিতে (প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল) মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে চলার পথে সৌরজগতের ভেতরে এবং বাইরে জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং

পাথরের বর্ণনাতীত স্তূপের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পেয়ে তারই বর্ণনা তুলে ধরেছে। তাদের বক্তব্যে প্রধানতঃ সৌরজগতের চতুর্দিকে বিরাজিত গণনাতীত পাথর, উল্কা ও ধূমকেতুর এবং গামা-রে পরিপূর্ণ পরিবেশটি অনতিক্রমযোগ্য ব্যারিকেড হিসেবে ফুটে ওঠেছে (পূর্বের ১নং অধ্যায়ে আমরা যা জানতে পেরেছি)।

তৃতীয় আয়াতটিতে মহাকাশে বিভিন্ন পরিবেশে অসংখ্য-অগণিত পাথর খণ্ড, উল্কাপিণ্ড, ধূমকেতু এবং গামা-রে এর মহা আয়োজন ও মহড়ার যে বাস্তব চিত্র তারা দর্শন করেছে, তাতে সৌরজগতের প্রাণীকূলের বিশেষ করে পৃথিবীবাসীর নিরাপত্তাহীনতার চিন্তায় তারা তাদের অস্থিরতা ও বেদনাবোধ প্রকাশ করেছে। মহাশূন্যে ঝুলন্ত ও পরিভ্রমণরত পাথরের বহর থেকে যে কোন সময়ই এক বা একাধিক পাথর খণ্ড ছুটে এসে পৃথিবীকে আঘাত করতে পারে এবং তাতে গোটা মানব জাতি পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেতে পারে।

পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাশূন্য জুড়ে ব্যাপক হারে ধ্বংস সাধনকারী 'গামা-রে' এবং এ পাথরের ব্যবস্থাপনা বিশ্ববাসীর জন্য ঘাড়ের ওপর খোলা তরবারি ঝক্মক্ করারই শামিল। যে কোন সময়ই ঘটে যেতে পারে মহাবিপদ। অতএব তারা কি এ মারাত্মক অবস্থা মওজুদ থাকার পরও শুধু নিজেদের অমঙ্গল ঘটাবার মানসেই খোদাদ্রোহিতা করছে, না-কি সৃষ্টিকর্তাই বিশ্ববাসীর কল্যাণ চাননা বিধায় এ মারাত্মক আয়োজন তৈরী করেছেন ? এ মৌলিক প্রশ্নটি জিনদের চিন্তার রাজ্যকে আচ্ছন্ন করে আছে।

ওপরের ৩টি আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে পৃথিবীর চার পার্শ্বে নিকটে এবং দূরে সর্বত্র অসংখ্য পাথরের স্তূপ এবং ঝাঁকে ঝাঁকে পাথরের বহর এবং গামা-রে (Gamma-ray) ও নানান কসমিক-রে (Cosmic-ray)এর পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে আছে। যার একটি বা একাধিক আয়োজন পৃথিবীকে যে কোন সময় আঘাত করতে পারে এবং তাতে মানব জাতি গ্রহ পৃষ্ঠ থেকে মুছে যেতে পারে। (If dia.100 km asteroid hit the earth as a result the total civilization will go to dark ages).

বিজ্ঞান

এখন আমরা উল্লেখিত পাথর খণ্ড (Ateroid) এবং মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic-ray) ও তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) সম্পর্কে বিজ্ঞানের সর্বশেষ রিপোর্ট একটু পর্যালোচনা করে দেখবো- 'কুরআনের' বক্তব্য মহাকাশ বিজ্ঞানে কতটুকুন 'সত্যতা' বহন করে।

বর্তমান বিজ্ঞানীগণ আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহের চতুর্দিকে সর্বপ্রথম ১৮০১ সালে মহাশূন্যে ভাসমান পাথরের সন্ধান লাভ করেন। ইটালিয়ান আকাশ বিজ্ঞানী 'Piazza' টেলিস্কোপ দিয়ে 'Ceres' নামক প্রায় ১০০০ কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন বিরাট পাথর খণ্ডকে মহাশূন্যে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় শনাক্ত করতে সক্ষম হন। এরপর এক এক করে শত শত পাথর খণ্ড সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীবাসীর নিকট নিজেদের অস্তিত্বকে প্রকাশ করে। ১৯৯১ সালে Space Probe 'Galileo'- 'Jasper' নামক পাথর খণ্ড যা ২০ কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন ওর চিত্র নিকট থেকে গ্রহণ করে পৃথিবীতে পাঠাতে সক্ষম হয়। বর্তমান সর্বশেষ পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞান আমাদেরকে অবহিত করছে যে, আমাদের পৃথিবীর নিকটবর্তী মহাশূন্যে প্রায় ৫০০০ পাথর খণ্ড (Asteroids) ভাসমান অবস্থায় প্রতিনিয়ত পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণে রত আছে। এদের যে কোন একটি বা একাধিক যে কোন সময়ই পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের আওতায় চলে আসতে পারে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে পুরো সভ্যতাকে মুহূর্তেই চিরতরে বিলীন করে দিতে পারে।

উক্ত ভয়ংকর দুঃসংবাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে, তার প্রাথমিক জরিপ চালিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য আমেরিকান স্পেস সেন্টার 'NASA' ইতোমধ্যেই 'Near Asteroid' প্রজেক্ট চালু করে বিগত কয়েক বছর থেকে সতর্কতার সাথে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে Asteroid' বা 'পাথর খণ্ডগুলো শনাক্ত করে তাদের তালিকা তৈরী করে চলেছে।

"তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর এমন কোন নিদর্শন তাদের নিকট উপস্থিত হয়নি, যা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি।" (৬ ঃ ৪)
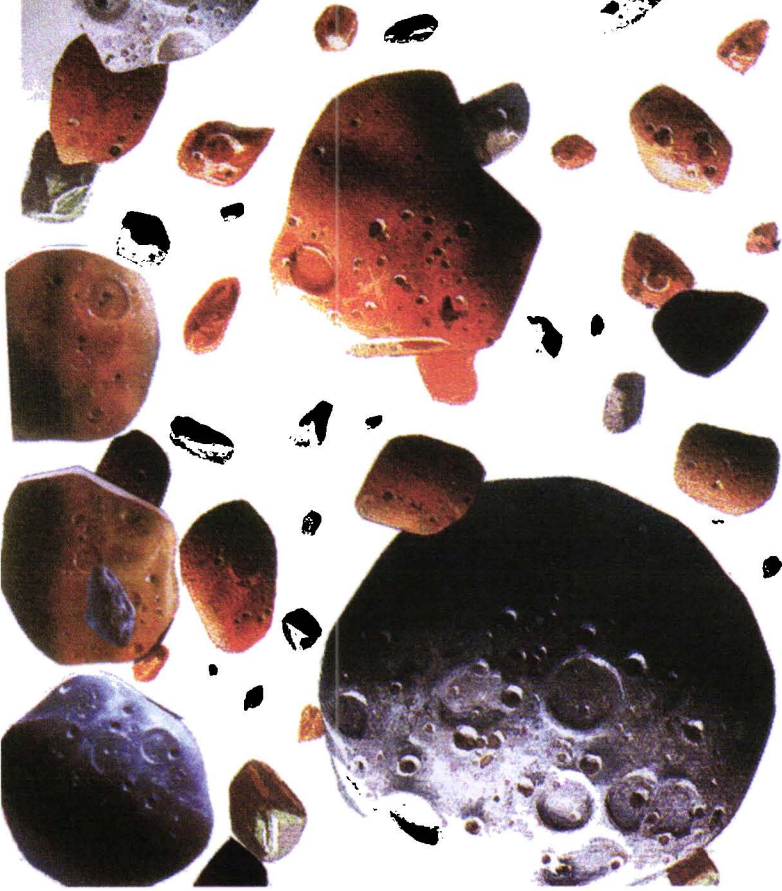
চিত্র-৭

– পৃথিবীর চতুর্দিকে ভাসমান উড়ন্ত পাথর খণ্ডের মধ্যে যেমন আছে এক সেন্টিমিটার ব্যাস সম্পন্ন পাথর কুচি তেমনি আবার প্রায় এক হাজার কিলোমিটার ব্যাসের বিরাট বিরাট পাথর খণ্ডও বর্তমান আছে। বিজ্ঞান এদের শনাক্ত করেছে।

সুতরাং কুরআন যে সত্য গ্রন্থ, তাতে আর সন্দেহ আছে কী? বিজ্ঞানের হাজার বছর পূর্বেই কুরআন এ তথ্য সরবরাহ করে মহাসত্যতার আসন অলংকৃত করে আছে।

"তোমরা আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করতে পারবে না পৃথিবীতে কিংবা আকাশে এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।" (২৯ ঃ ২২)
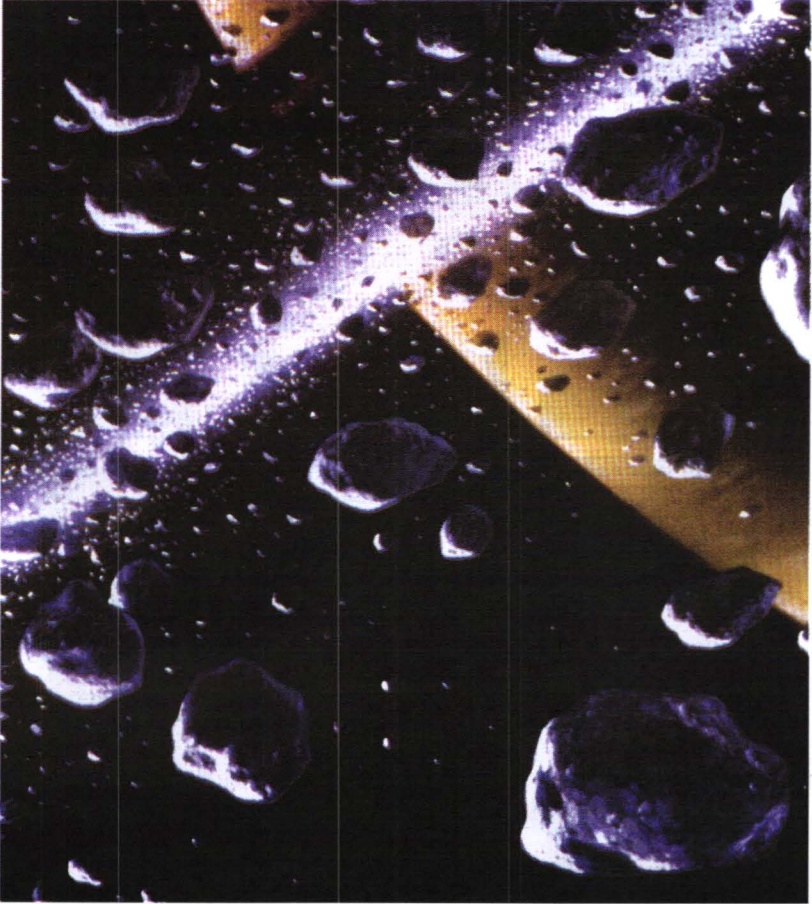
চিত্র-৮

– মানব সমাজ এতদিন তাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এ মহাবিশ্বে অনেক কিছুই দেখতে না পেয়ে কুরআনের অসংখ্য দাবীকে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে উন্নততর প্রযুক্তির টেলিস্কোপ কুরআনের বক্তব্যের আলোকে আবিষ্কার সম্পন্ন করে সে পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। আকাশে ভাসমান পাথরের কুরআনিক দাবী এখন কি অস্বীকার করা চলে? এভাবেই সত্যের বিজয় সূচিত হয়ে থাকে।

"আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।" (২৭ ঃ ৭৫)

চিত্র-৯

– বিজ্ঞান বিশ্বের বর্তমান বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর চারদিকে ভাসমান অবস্থায় পরিভ্রমণরত বড় বড় অসংখ্য পাথর যেমন– Gaspara, Eros, Ceres ইত্যাদিকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এদের যে কোন একটির আঘাতই পৃথিবীকে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দিতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে– কুরআনের দাবী সত্য, সঠিক।

"আমরা (জিনেরা) জানি না বিশ্ববাসী নিজেরাই কি অমঙ্গল চায়, না-কি তাদের প্রতিপালকই তাদের মঙ্গল চান না?" (৭২ : ১০)
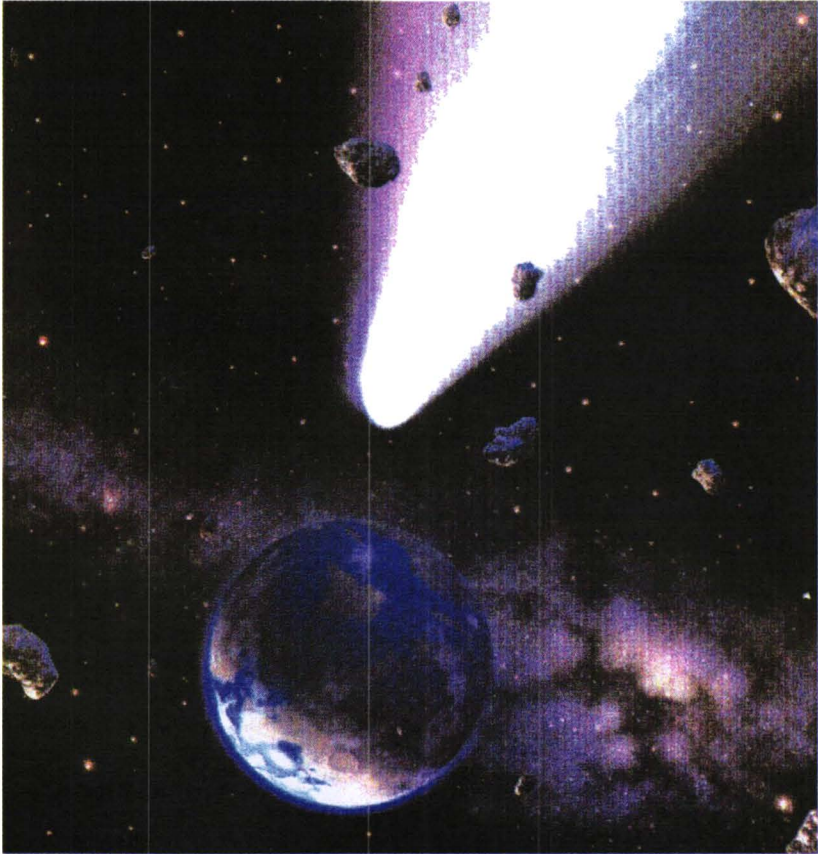
চিত্র-১০

– বাস্তবভাবেই পৃথিবীর চতুর্দিকে ভয়ানকরূপে ভাসমান ও চলমান প্রায় ৫০০০ পাথরের আয়োজন দেখে জিন জাতি মানব সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে, যা কুরআন 'কোড' করেছে। বর্তমান উন্নততর বৈজ্ঞানিক পরিবেশে মানব সমাজও তা বাস্তবে দর্শন করে পুলকিত হচ্ছে।

মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর পবিত্র বাণী যে মহাসত্যতার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত, সে কথা বোঝার জন্য আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে কী?

"যা আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে ও ভূ-গর্ভে, তা তাঁরই।" (২০ ঃ ৬)
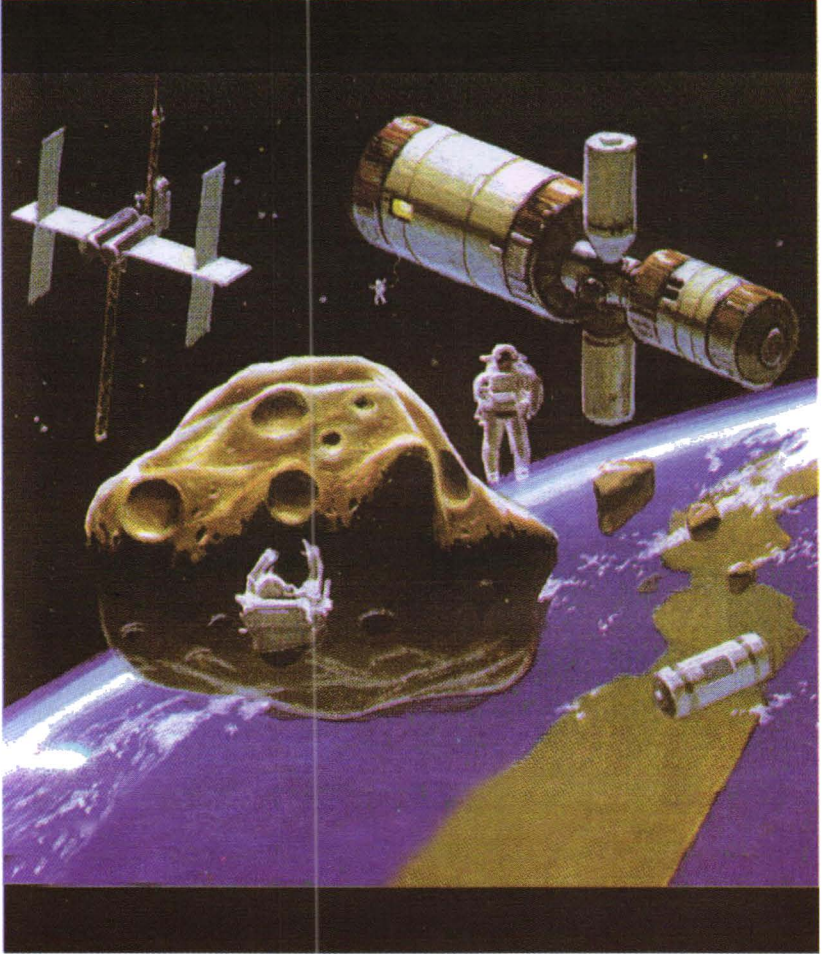
চিত্র-১১

– আল্-কুরআনের দাবী অনুযায়ী বর্তমান অগ্রসরমান বিজ্ঞান আমাদের দৃষ্টির বাইরে মহাশূন্যে শুধু অগণিত পাথর খণ্ড আবিষ্কারই করেনি, সাথে সাথে ঐ সকল বড় বড় পাথর ও শীলা খণ্ড থেকে মূল্যবান খনিজ সম্পদ আহরণের পথেও বহুদূর এগিয়ে গেছে।

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দর্শন লাভ করেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? আমি অবশ্যই এরূপ অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।" (৩২ ঃ ২২)
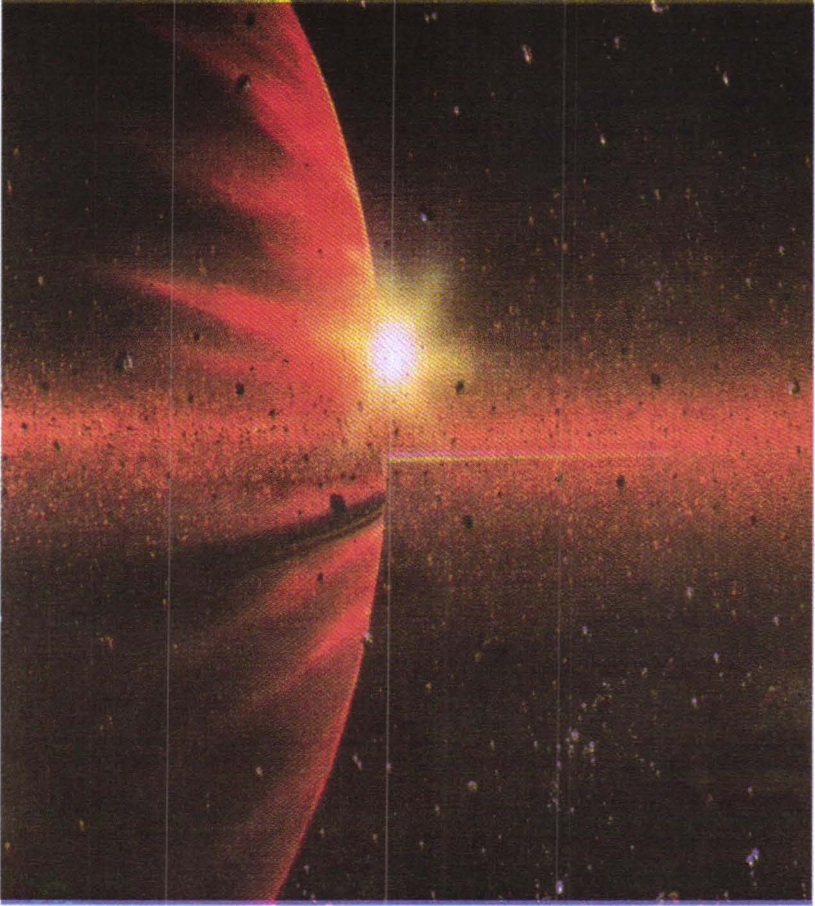
চিত্র-১২

– সূর্যের অভিকর্ষ বলের টানে প্রতি বৎসর প্রায় ৫/৬টি বরফ আচ্ছাদিত পাথর খণ্ড 'ধূমকেতু' নামে 'কুইপার বেল্ট ও এ্যাষ্টিরয়েড বেল্ট' থেকে আমাদের সৌরজগতে আগমন করে থাকে। এদের আঘাতেও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, যদি এরা পৃথিবীর একই তলে আগমন করে।

উল্লেখিত বিক্ষিপ্ত পাথর খণ্ড ছাড়াও বিজ্ঞান 'মঙ্গল' গ্রহ এবং 'বৃহস্পতি' গ্রহের মাঝখানে এবং 'শনি' গ্রহের চতুর্দিকেও যে বিরাট মাপের পাথর খণ্ডের ঝাঁক মহাশূন্যে উড়ন্তাবস্থায় পরিভ্রমণ করছে তা আবিষ্কার করেছে। ঐ পাথর খণ্ডসমূহ পৃথিবীসহ গোটা সৌরজগতের জন্যই বিপদজনক হয়ে আছে। মহাজাগতিক অজানা যে কোন কারণেই ঐ সকল 'Asteroid belt' থেকে পাথর খণ্ড অভিকর্ষ বলের প্রভাবে উড়ে এসে আমাদের পৃথিবীর সর্বনাশ যে কোন সময়ই ঘটিয়ে দিতে পারে বলে বিজ্ঞান বিশ্বাস করে। পূর্বে 'মানুষ' উক্ত তথ্য ব্যাপকভাবে জানার এবং তা থেকে বাঁচার চেষ্টা না করলেও বর্তমানে কিন্তু নিজ অস্তিত্বের কারণেই শুধু জানার চেষ্টায় মশগুল হয়ে আছে।

কথা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত 'Opik-Oort cloud' বিষয়ে যা আমাদের সৌরজগতের চতুর্দিকে ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন কিলোমিটার ব্যাপী ধূমকেতু, পাথর খণ্ড এবং উল্কাপিণ্ড (Comet, Asteroid এবং Meteoroids) দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন ঐ 'Opik-Oort cloud' থেকেও বছরে প্রায় ৫/৬ টি ধূমকেতু (Comet) সূর্যের অভিকর্ষের টানে উড়ে এসে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। ১৯৯৪ সালে ঐ জাতীয় একটি ধূমকেতু গ্রহরাজ বৃহস্পতি গ্রহের অভিকর্ষ বলের টানে আটকা পড়ে যায়; যার পরিণতিতে ২১ খণ্ডে ধূমকেতুটি বিভক্ত হয়ে বৃহস্পতি গ্রহের ওপর আছড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ পারমাণবিক বোমার ন্যায় ধ্বংস সাধন করে। বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে হিসেব-নিকেশ করে দেখেছেন যে, যদি বৃহস্পতি গ্রহ 'স্যুমেকার লেভী-৯' নামক ঐ ধূমকেতুটিকে বন্দী না করতো, তাহলে ধূমকেতুটি যে রুটে আগমন করেছিল তাতে পৃথিবী নির্ঘাত মহাবিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিত। ধূমকেতুর ২১টি খণ্ডের মাত্র ১টি খণ্ডই পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যথেষ্ট ছিল। বলতে হবে এ যাত্রায় পৃথিবী ভাগ্যবান।

ধূমকেতুও মূলতঃ পাথর খণ্ড। তবে ওদের গায়ে বরফ আচ্ছাদিত থাকে বিধায় সূর্যের তাপে গলতে থাকলে তখন বরফ কণা ধোঁয়ার মত দেখায়; যা 'Coma' নামে পরিচিত।

"মানুষের জন্যই আমি এ সকল দৃষ্টান্ত তুলে ধরি। কিন্তু কেবলমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এগুলো অনুধাবন করে থাকে।" (২৯ ঃ ৪৩)
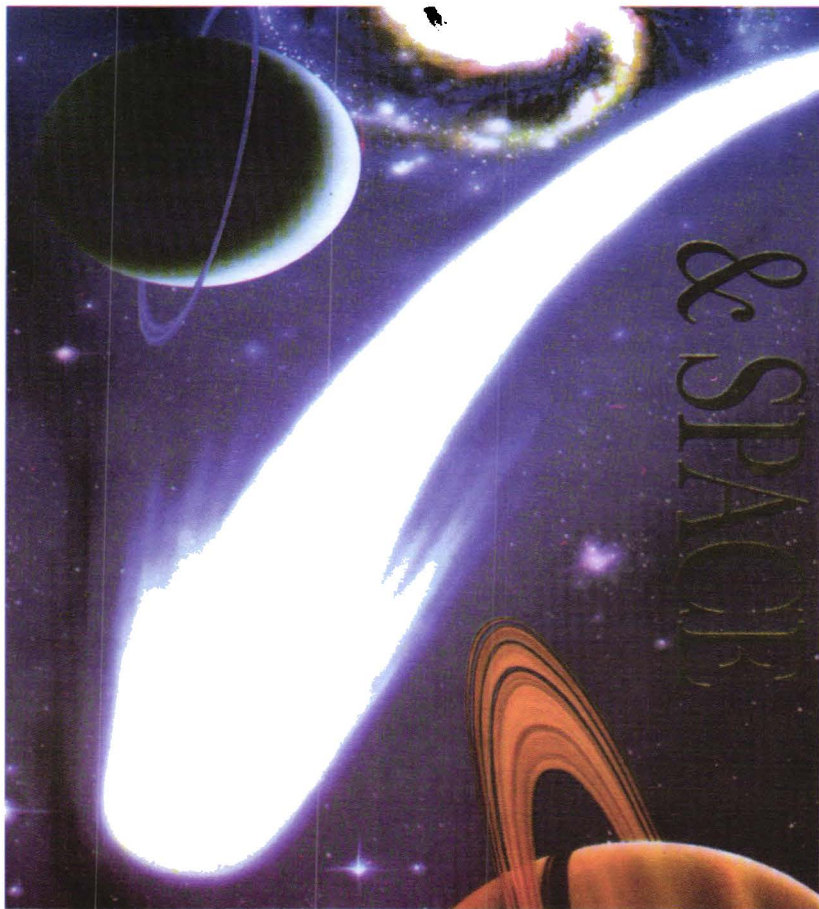
চিত্র-১৩

– সৌরজগতের বাইরের দিকে 'Oort Cloud' –এর মধ্যে ধূমকেতুর ভয়াবহ পরিবেশের সংবাদ বিজ্ঞান অতি সম্প্রতি উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু কুরআন প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই আমাদেরকে অবহিত করেছে। আল্লাহ্‌র সত্যতা প্রমাণের জন্য এরকম একটি নিদর্শনই যথেষ্ট, অথচ কুরআনে হাজার হাজার বাস্তব সত্য দৃষ্টান্ত ও নিদর্শন পেশ করা হয়েছে।

"তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন, তিনি তোমাদের ওপর পাথরবাহী ঝাঁক প্রেরণ করবেন না?" (৬৭ ঃ ১৭)
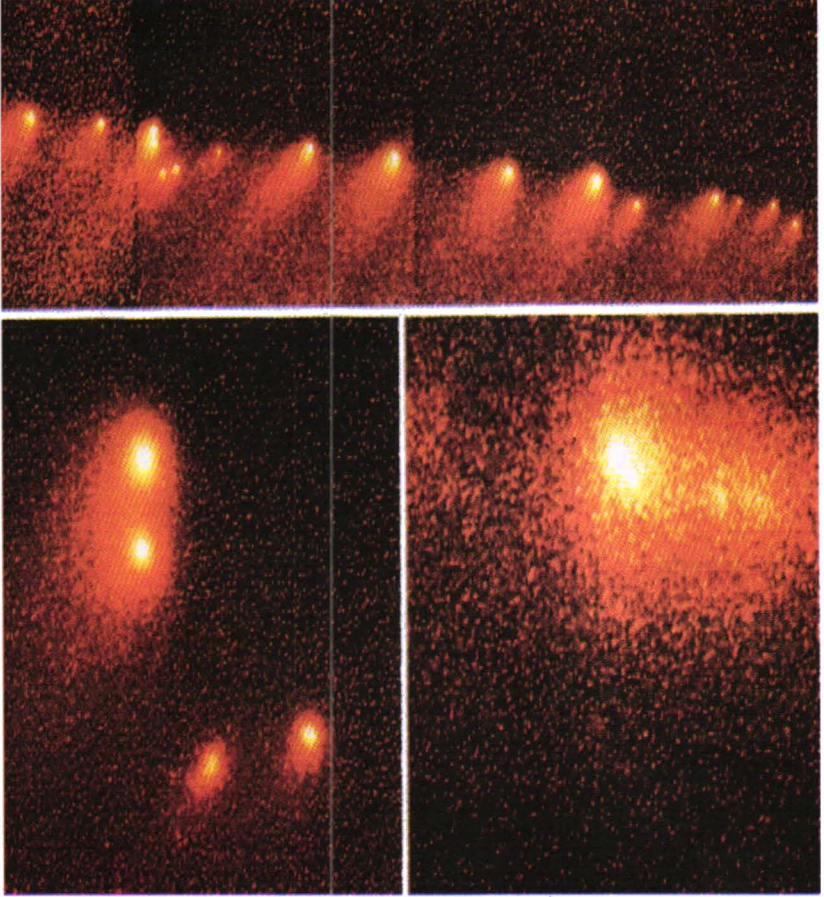
চিত্র-১৪

– 'স্যু মেকার লেভী-৯' নামক ধূমকেতুটি ১৯৯৪ সালে ২১টি বিরাট বিরাট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গ্রহরাজ 'বৃহস্পতিকে' প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। মাত্র একটি খণ্ডের আঘাতেই কয়েকটি পৃথিবীর সমান আয়তন বিশিষ্ট এলাকা ধ্বংস হয়ে যায়। পৃথিবী থেকে মানুষ টেলিস্কোপ দিয়ে এ দৃশ্য সরাসরি দর্শন লাভ করেছিল। 'সত্য' এভাবেই এক এক করে জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

১৪০০ বৎসর পূর্বে মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন' মানব জাতিকে মহাশূন্যে বিরাজমান অদৃশ্য যে পাথর স্তূপের এবং জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তথা মহাজাগতিক রশ্মির ব্যাপারে সতর্ক করেছে, জিন জাতি যে পাথর খণ্ডের এবং ভয়ংকর মহাজাগতিক রশ্মির ব্যাপক আয়োজন মহাকাশে দর্শন করে পৃথিবীবাসীর জন্য দুশ্চিন্তায় ও ভয় বিহ্বলতায় প্রহর গুনছে, বর্তমান বিজ্ঞান কি 'কুরআনের' সেই বক্তব্যের অনুকূলেই উল্লেখিত আবিষ্কারগুলো সম্পন্ন করেনি? পূর্বে কুরআনের ঝুলন্ত পাথর বহরের এবং জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ (Radiation) তথা মহাজাগতিক রশ্মির তথ্যকে উপেক্ষা-অস্বীকার করলেও বর্তমানে কি তা অস্বীকার করা চলে? চলে না। কেননা তাতে বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করা হবে।

সুতরাং 'আল্লাহ্' এবং তাঁর বাণী পবিত্র 'আল-কুরআন' মহাসত্যতায় উদ্ভাসিত। কেননা পূর্বে কুরআন অদৃশ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে যা-ই বলেছে, বিজ্ঞান বর্তমানে হুবহু তা-ই প্রমাণ করেছে।

তিন

আল্‌-কুরআন

"আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সম্মুখীন হয়।" (৭২ ঃ ৯)

"ফলে তারা ঊর্ধ জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি।" (৩৭ ঃ ৮ ও ৯)

"তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তার পশ্চাৎধাবন করে।" (৩৭ ঃ ১০)

ওপরে উদ্ধৃত তিনটি আয়াতই একটি বিশেষ বিষয়কে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করছে; আর তা হলো আকাশ জগতে কার্যনির্বাহী, কার্য-সম্পাদনকারী ফিরিশ্‌তাকুলের নির্বিঘ্ন যাতায়াত রুট বা পথসমূহ। শুনতে নতুন ও চমকপ্রদ মনে হলেও কুরআনের সাথে সাথে বর্তমান বিজ্ঞানও কিন্তু সে রকমই তথ্য প্রকাশ করেছে।

ওপরে উল্লেখিত পবিত্র বাণীসমূহের মর্মকথা হলো- মহাকাশের মহাশূন্যতা জুড়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিষের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনীয় সার্বিক ব্যবস্থাপনাও তিনি তাঁর ফিরিশতাকুল দিয়েই সম্পন্ন করে থাকেন। ফিরিশতারা পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অনুগত এবং বিশ্বস্ত। তাদের মধ্যেও দায়িত্বশীল এবং কার্যসম্পন্নকারী শ্রেণী বিভাগ আছে। শৃংখলাবদ্ধ এবং তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার ভেতর দিয়েই তারা গোটা মহাবিশ্বে আল্লাহ্র নির্দেশকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করে চলেছেন। কখনও তারা প্রভুর নাফরমানি করেন না।

গোটা মহাবিশ্ব জুড়ে ফিরিশতাগণ তাদের কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে বিভিন্ন রুট বা পথ ব্যবহার করেন। আমাদের গ্রহে, সৌরজগতে এবং গ্যালাক্সিতেও আসা-যাওয়া করার জন্য অনুরূপ পথ আছে। যে পথের বাঁকে বাঁকে বা মাঝে মাঝে নির্ধারিত স্থানে ফিরিশ্তাগণের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয় দায়িত্ব বণ্টিত হয়। আর ঐ আলোচনা বা কথোপকথন থেকে দুষ্ট জিনেরা (শয়তানগুলো) চুরি করে কথা সংগ্রহ করতে গেলেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশ্তাদের নজরে পড়ে এবং তখনই ফিরিশতাগণ তাদের দিকে ভয়ংকর মহাজাগতিক রশ্মি পরিচালিত করে এবং শয়তানরা তাতে টিকতে না পেরে পশ্চাদপসারণ করে। ফলে চতুর্দিক হতে ফিরিশ্তাদের নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অবিরাম আঘাতের কারণে শয়তানেরা (দুষ্ট জিন) তাদের অবাঞ্ছিত কাজে সফল হতে পারে না এবং বিফল হয়েই পৃথিবীর দিকে কিংবা সৌরজগতের ভেতরের দিকে ফিরে আসে। সূরা 'জিনে' জিনদের সার্বিক বক্তব্যে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শয়তানদের সাথে ফিরিশ্তাদের উল্লেখিত ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে সৌরজগতের বাইরের দিকে বিশাল এলাকা জুড়ে ভয়ংকর Cosmic-ray, Gamma-ray, পাথর, ধূমকেতু ও উল্কা সমৃদ্ধ 'Oort cloud'-এর ভেতর। আলোর গতিতে চলা-ফেরায় সক্ষম 'জিন' জাতিকে সৌরজগতের ভেতর-ই কেবল নির্বিঘ্নে চলাচল করার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ্ পাক তাদের পার্থিব জীবনের পরীক্ষাকে কার্যকর পরিবেশে বজায় রাখার জন্য সম্ভবত 'Oort cloud' দিয়ে প্রতিরোধমূলক বেড়ী সৃষ্টি

করে থাকবেন। আলোর গতিতে প্রায় ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিটে সূর্যের নিকট থেকে সর্বশেষ গ্রহ প্লুটো পর্যন্ত পৌঁছা গেলেও এবং সৌরজগতের ভেতরের দিকে জিনেরা স্বাচ্ছন্দে কয়েক ঘণ্টায় ব্যাপকভাবে সফর করতে সক্ষম হলেও কল্পনাতীত পাথর, ধূমকেতু ও ফিরিশতা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ভয়ংকর মহাজাগতিক রশ্মি, গামা-রে এবং অগণিত উল্কা সমৃদ্ধ কয়েক আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত ঐ 'Oort cloud'-কে কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করার যোগ্যতা রাখে না। আর এ জন্যই হয়তোবা দুষ্ট জিনেরা সৌরজগতের বাইরের দিকে নিকটবর্তী এলাকায় ফিরিশতাদের চলাচল পথে শুধু ঐ জাতীয় হয়রানি এবং অবাঞ্ছিত ঘটনায় শরীক হয়ে থাকে (প্রকৃত সত্য আল্লাহ-ই ভালো জানেন, ভুল বা বাড়াবাড়িমূলক বক্তব্য থেকে আমি আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্‌ চাই)। মহাগ্রন্থ কুরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে এ ধারণাই বেশী ফুটে উঠে।

এখন ওপরে উল্লেখিত বক্তব্য থেকে আমরা একটা বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, তা হলো মহাবিশ্বের সর্বত্র সহজভাবে যাতায়াতের মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব দ্রুত সম্পাদন করার জন্য ফিরিশতাকুলের নির্ধারিত পথ আছে এবং পথ থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। কেননা একটি গ্যালাক্সিতে গড়ে প্রায় ৩০,০০০ কোটির ওপরে নক্ষত্র আছে, সেই নক্ষত্রের সাথে আছে একাধিক গ্রহ-উপগ্রহ, গ্রহানু, ধূমকেতু ইত্যাদি। আবার এ পর্যন্ত গ্যালাক্সিও আবিষ্কার হয়েছে প্রায় ১০,০০০ কোটির ওপরে। সব মিলিয়ে মহাকাশ মহাশূন্য নয় বরং মহাজাগতিক বস্তু দিয়ে পূর্ণ (Packed) করা আছে। তারই ভেতর দিয়ে নূরের (Radiant Energy) তৈরী ফিরিশ্‌তা আলোর গতিতে বা তার চাইতেও দ্রুত গতিতে কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে নির্দিষ্ট 'মুক্ত পথ' ব্যবহার করাই স্বাভাবিক।

কুরআনে উল্লেখিত 'ঘাঁটিসমূহে' যেখানে দুষ্ট জিনেরা (শয়তানেরা) ঊর্ধ্ব জগতের সংবাদ চুরি করার নিমিত্তে অবস্থান করে, সেই 'ঘাঁটিসমূহ' ফিরিশতাদের চলার পথের ওপরই হয়ে থাকবে।

অতএব, আকাশ জগতে ফিরিশতাদের সহজ যাতায়াতের জন্য আছে 'পথসমূহ'। এবার চলুন এ বিষয়ে বিজ্ঞানের ভাষ্যে, দেখা যাক কি তাদের বক্তব্য!

বিজ্ঞান

দিন যতই যাচ্ছে, বিজ্ঞান ততই যেন সত্য প্রকাশে দৃঢ় এবং নির্ভীক হচ্ছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণে রেজাল্ট যা-ই লাভ করছে, তা-ই মুক্ত মনে প্রকাশ করে চলেছে। এমনি একটি তথ্য বিশ্ববাসীর জ্ঞানের টেবিলের ওপর সযত্নে অর্পণ করেছে বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে, ধন্যবাদ জানাতে হয় বিজ্ঞানকে, তথ্যটি সত্যই বড় চমৎকার।

আকাশ বিজ্ঞানীগণ গ্রাউণ্ড বেইছ টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আমাদের মাতৃ গ্যালাক্সিতে (Milky Way) প্রায় ৩০,০০০ কোটির চেয়েও বেশী নক্ষত্র সমৃদ্ধ থালার ভেতর একদিক থেকে অপর দিক পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গের মত খালি জায়গা দর্শন লাভ করতে সমর্থ হন, যে খালি জায়গার মধ্যে কোন নক্ষত্রের অবস্থান নেই। অনেক দিন থেকেই এই দৃশ্য দেখে দেখে বিজ্ঞানীগণ পুল্কিত হয়ে অবশেষে এ 'সুড়ঙ্গের' ন্যায় খালি স্থানের রহস্য এবং কারণ উদ্‌ঘাটিত করতে না পারলেও মোটামুটি ওর মাপ-ঝোপ নিতে সক্ষম হন। তাতে দেখানো হয়েছে সুড়ঙ্গ পথটির মুখের ব্যাস প্রায় ১০,০০০ আলোকবর্ষ এবং শেষ প্রান্তে ব্যাস প্রায় ৫,০০০ আলোকবর্ষ; যা গ্যালাক্সির এক প্রান্ত হতে শুরু হয়ে অপর প্রান্তে এসে শেষ হয়েছে। প্রথম প্রথম বিজ্ঞানীগণ ভেবেছিলেন 'Hot star'-এর Ultra-violet radiation-ই এ আশ্চর্য জিনিষ সৃষ্টির পেছনে দায়ী। কিন্তু ১৯৯৯ সালের জুনে 'Cosmic gas' পর্যবেক্ষণকারী 'Far Ultra–violet Spectroscopic Explorer' (FUSE) Space craft মহাকাশে উৎক্ষেপণের পর ওর মাধ্যমে NASA-র বিজ্ঞানী 'Blair Sabage' গবেষণা করে মত প্রকাশ করেন যে ঐ সুড়ঙ্গ পথ সৃষ্টি হওয়ার পেছনে ঐ এলাকার নক্ষত্রসমূহের 'সুপারনোভা' বিস্ফোরণই দায়ী।

যেভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকুক, ১০,০০০ ও ৫,০০০ আলোকবর্ষ ব্যাসব্যাপী (এক আলোকবর্ষ সমান ১০ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার) বিরাট-বিশাল এক 'রাজপথ' তৈরী হয়ে আছে ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্র অধ্যুষিত আমাদের

"তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?" (৫৫ : ৩৬)
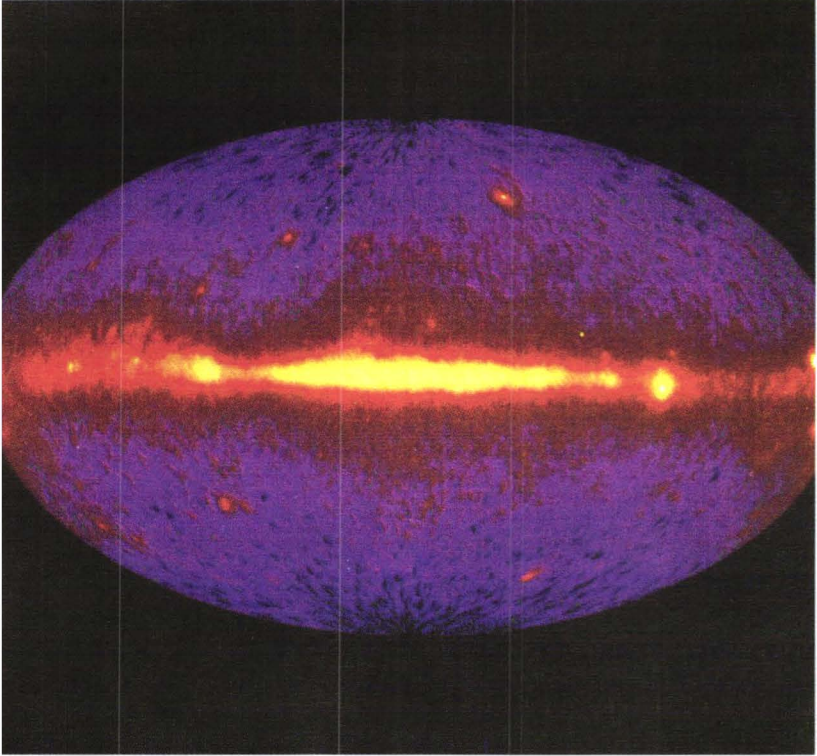
চিত্র-১৫

Thousands of exploding stars left a tell-tale halo of searingly hot gas around the Milky Way, NASA scientists reported.

Asrtronomers have long known about the massive gas halo, but not its cause. Before this, some believed it might have been caused by ultraviolet radiation from hot stars. But scientists working with the new Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE) spacecraft determined that hot stars could not produce the atomic remnants they observed in the halo. Only exploding stars could do that, NASA reported at the annual meeting of the American Astronomical Society in Atlanta.

The football-shaped halo is huge, extending about 5,000 to 10,000 light years above and below the plane of the Milky Way galaxy, which contains Earth. A light year is about 6 trillion miles (10 trillion kms.)

FUSE made the discovery by detecting lots of oxygen VI– oxygen atoms with five of their eight surrounding electrons stripped off– in the halo.

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি।" (২৭ ঃ ৭৫)

চিত্র-১৬

- আকাশে গ্যালাক্সিসমূহ পর্যবেক্ষণকারী অনেক বিজ্ঞানী দীর্ঘদিন থেকেই আমাদের 'মিলকিওয়ে' গ্যালাক্সির ভেতর একটি সুড়ঙ্গকার শূন্যস্থান দর্শন করে আসছেন। কি জন্য এবং কিভাবে এটি গ্যালাক্সির ভেতর সৃষ্টি হয়েছে তা জানার আগ্রহে তারা নান-াভাবে চেষ্টা করেছেন। অতীতে এর সমাধান না পেলেও বর্তমানে কিন্তু বিষয়টি অনেকটা বোধগম্য হয়ে ধরা দিয়েছে।

"আমি আকাশে গ্যালাক্সিসমূহ সৃষ্টি করেছি এবং এদের করেছি সুশোভিত প্রকৃত দর্শকদের জন্য।" (১৫ : ১৬)

চিত্র-১৭

– বিজ্ঞানের বর্তমান সিদ্ধান্তানুযায়ী প্রায় ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্র সমৃদ্ধ আমদের মিল্‌কিওয়ে (Milky Way) গ্যালাক্সিটি প্রায় ১০০,০০০ (এক লক্ষ) আলোকবর্ষ ব্যাস সম্পন্ন এবং প্রায় ১০,০০০ আলোকবর্ষ চওড়া। নক্ষত্র শূন্য সুড়ঙ্গ পথটি এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। গ্যালাক্সির ছবিটি Top View তে দেখানো হয়েছে।

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি।" (১৫ ঃ ৮৫)
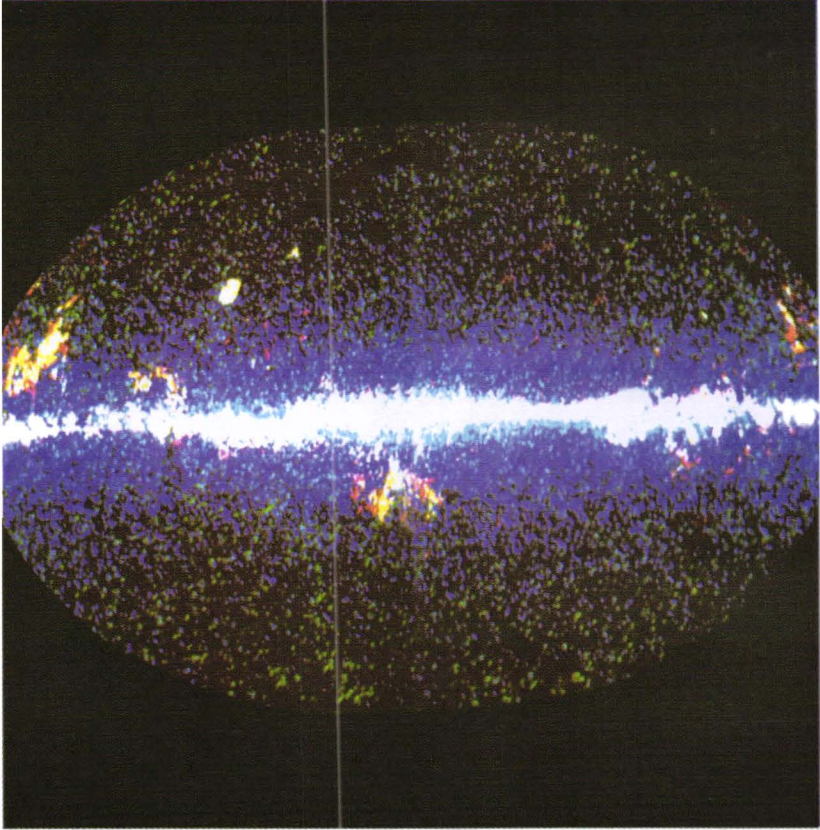
চিত্র-১৮

– আল্লাহ্ দাবী করেছেন অযথা কিছুই তিনি সৃষ্টি করেননি। বিজ্ঞান দাবী করেছে– গ্যালাক্সির মধ্যভাগে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ তৈরী হয়ে আছে। সুতরাং বিশাল সেই পথটি প্রকাণ্ড গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে কর্মরত ফিরিশতাদের দ্রুত চলাচলের জন্য মুক্ত রাজপথ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া যুক্তির দিক থেকে অধিকতর নিকটবর্তী। এ রাজপথ থেকেই পরবর্তীতে আরও বহু ছোট- ছোট পথ বেরিয়ে অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তু পর্যন্ত চলে গিয়ে থাকবে, যেগুলোর নিকটেই জিনেরা বসে থেকে সংবাদ চুরির চেষ্টা করতো।

"ওরা কি ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আকাশমর্গে ও ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না (গবেষণা করে দেখে না)?" (৩০ ঃ ৯)
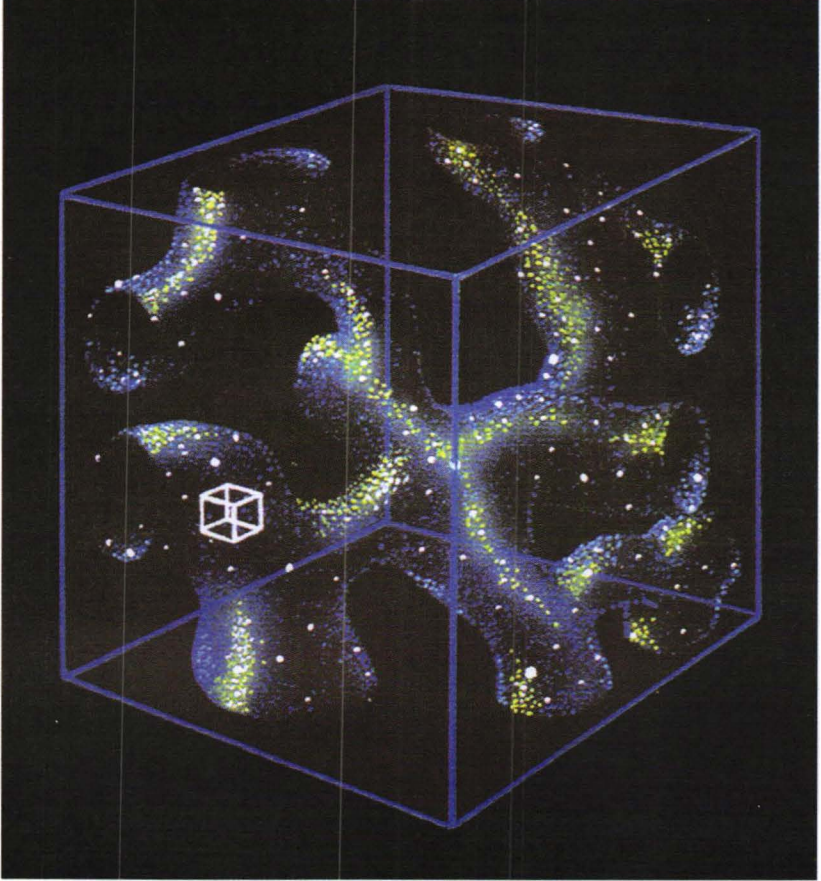
চিত্র-১৯

– বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্ব শুধু গ্যালাক্সিতেই পথের সন্ধান পায়নি, বরং মূল মহাবিশ্বের গঠনাকৃতিতেও বৃহৎ বৃহৎ গ্যালাক্সি গুচ্ছের মাঝে বিরাট বিরাট পথের ধারণা ব্যক্ত করছে। ওপরের ছবিতে তাকালে তা স্পষ্টভাবেই নজরে পড়ে। বিজ্ঞান বিশ্ব এ ছবি সরবরাহ করেছে। সুতরাং সমগ্র মহাবিশ্বের মাঝে সবচেয়ে কম সময়ে আল্লাহ্‌র আদেশ বাস্তবায়নের জন্য ফিরিশতাদের জন্য রয়েছে পথসমূহ, যা বিজ্ঞানও প্রমাণ করছে।

'Milky Way' গ্যালাক্সিতে। বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে তা আজ প্রমাণিত। কুরআন বর্ণিত 'পথের' ধারণার সাথে বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত উক্ত খোলাপথের কোন পার্থক্য আছে কি? কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই কি এক লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাসব্যাপী আমাদের গ্যালাক্সির ভেতর একটি নির্দিষ্ট পথ চিহ্নের কোটি কোটি নক্ষত্র ধ্বংস হয়ে বিরাট-বিশাল, কল্পনাতীত এক সুড়ঙ্গ পথ তৈরী হয়ে আছে?

আশ্চর্য হলেও সত্য যে, এই মহাকাশীয় রাজপথের মুখের যে ব্যাস (১০,০০০ আলোকবর্ষ) আমাদের গ্যালাক্সির প্রস্থও কিন্তু সেই একই ব্যাস সম্পন্ন; অর্থাৎ ১০,০০০ আলোকবর্ষ। আবার পথটি গ্যালাক্সির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। দেখুনতো বিষয়টির পারস্পরিক কত মিল বা অভিন্নতা! কিভাবে মানবমণ্ডলী বাস্তবতার আলোকে প্রমাণিত ও মহাজাগতিক ব্যবস্থায় রচিত ফিরিশ্তাদের নির্বিঘ্ন চলাচলের 'পথকে' অস্বীকার করবে?

সুতরাং Outer Space সম্পর্কে জিনদের বক্তব্য যেমন 'সত্য' তেমনি মহাগ্রন্থ কুরআনও 'সঠিক ও নির্ভুল' বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ ধারণ করে মহাসত্যতার আসনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যা কখনই নড়বড়ে হবে না। সমাজের জ্ঞানীজন বিষয়গুলো ভেবে দেখবেন কি? এর ভেতর দিয়ে একজন মহান স্রষ্টার বাস্তব উপস্থিতি যে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, তা-কি অস্বীকার করা যায়?

চার

আল্-কুরআন

"এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না।" (৭২ ঃ ১২)

ওপরে উল্লেখিত আয়াতটি 'আগুনের' তৈরী জিন জাতির বক্তব্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা 'কোড' করেছেন। তিনি 'জিন' জাতির প্রসঙ্গ টেনে তাদের মাধ্যমেই তাদের দর্শনকৃত এবং পরিভ্রমণকৃত সৌরজগতের বাইরের দিকে

সংলগ্ন একটা 'পাথর আর পাথরের স্তূপ' এবং ভয়ংকর মহাজাগতিক রশ্মির, গামা-রে-এর জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত নির্দিষ্ট স্থানের মহাকাশীয় ব্যবস্থার বাস্তব সত্য ও জ্ঞানপূর্ণ বিবরণ পেশ করেছেন; যাতে করে পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাসরত 'মাটির' তৈরী মানব সম্প্রদায় স্ব-শরীরে ঐ এলাকায় পৌঁছুতে না পারলেও সেই বিশেষভাবে তৈরী ব্যবস্থাটি সম্পর্কে যেন তথ্যগত দিক থেকে হলেও অবহিত হয়ে প্রকৃত অবস্থা বুঝতে সক্ষম হয়।

মহাগ্রন্থ কুরআনের বাণীতে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, আমাদের সৌরজগতের ভেতরে বিক্ষিপ্তভাবে এবং বিশেষ করে সৌরজগতের বাইরের দিকে (৩.২x২.৫ আলোকবর্ষ ব্যাপী) বিরাট-বিশাল এলাকা জুড়ে অগণিত, অসংখ্য পাথর খণ্ড, ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ডের এবং জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মহাজাগতিক রশ্মির ভয়ানক যে ব্যাপক আয়োজন এবং হামলা, তাতে একদিকে পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থান যেমন নিরাপদ নয়, যে কোন সময়ই পাথর খণ্ডের (Asteroid) হামলায় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তেমনি সৌরজগতের বাইরের এলাকায় অনবরত ভয়ানক মহাজাগতিক রশ্মির এবং উল্কাপাতের হামলায় কোথাও পলায়ন করার পথটিও পুরোপুরি রুদ্ধ। উল্কাপাতের হামলার ভেতর দিয়েও হয়তো বা বাইরের দিকে অগ্রসর হওয়া যেত, কিন্তু ৩.২x২.৫ আলোকবর্ষের বিশাল পাথুরে ও ভয়ানক মহাজাগতিক রশ্মিতে পরিপূর্ণ এলাকার ভেতর আত্মরক্ষার কোন সুযোগ তো নেই। উপরন্তু কিভাবে অনবরত প্রায় ৪ বৎসর দৌড়ানো যাবে (দু'টো সৌরজগতের মধ্যে গড় দূরত্ব প্রায় ৪ আলোকবর্ষ)। 'জিন' জাতি অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি হয়েও কিন্তু প্রাণী বিধায় একটানা প্রায় ৪ বৎসর ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্টকে সঙ্গে নিয়ে অনবরত দৌড়াতে অপারগ। আর সেই অপরাগতার কারণেই মহান স্রষ্টার কৌশলের সম্মুখে আলোর গতি প্রাপ্ত জিনেরা একরাশ হতাশা ব্যক্ত করে 'মহাজ্ঞানী সত্তার' সম্মুখে আত্মসমর্পণ করেছে। তারা স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছে যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মৃত্যু থেকে না নিজেদের রক্ষা করতে পারে, আর না এখান থেকে অন্য কোন সৌরজগতে পালিয়ে গিয়ে তাঁর ধর পাকড় থেকে বেঁচে যেতে পারে।

এ তথ্যটুকুন মানব জাতির জ্ঞানের সীমানায় পৌঁছে দিয়ে আল্লাহ্ পাক তাদেরকেও মহাজাগতিক বাস্তব প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সাবধান করতে চান এ বলে যে, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে উক্ত ভয়ংকর আয়োজন দর্শন সীমায় আনতে না পারলেও বর্ণিত মারাত্মক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সত্য এবং বাস্তব, তাই জ্ঞানবান মানবমণ্ডলী মহাসত্যের সামনে আত্মসমর্পণ করে নিজেদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এখন এ দায়িত্ব তাদের-ই।

বিজ্ঞান

বর্তমান বিজ্ঞানের উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য আমরা একটু পূর্বেই আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি-বিজ্ঞান আমাদের পৃথিবীর চতুর্দিকে ভাসমান প্রায় ৫০০০ ঝুলন্ত উড়ন্ত পাথর এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে বিরাট পাথরের বেল্ট, শনি গ্রহের চতুর্দিকে বিরাট পাথরের বেল্ট নামক বহর ভাসমান অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোট ছোট পাথরকুচি থেকে শুরু করে এদের মধ্যে ১০০০ কিঃমিটার ব্যাস সম্পন্ন বিশাল-বিশাল পাথর খণ্ডও রয়েছে। অথচ মাত্র ৫০ কিঃ মিঃ থেকে ১০০ কিঃ মিঃ ব্যাস সম্পন্ন একটি পাথরের আঘাত-ই পৃথিবী থেকে আমাদের মানব সমাজকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

আবার আমাদের সৌরজগতের চতুর্দিকে বাইরের পরিবেশে ৩.২x২.৫ আলোকবর্ষ ব্যাপী 'Oout cloud' নামক পাথর, ধূমকেতু এবং উল্কাপিণ্ড সমৃদ্ধ ভয়ংকর এক বিরাট পরিবেশ তৈরী হয়ে আছে। যেখান থেকে বছরে কমপক্ষে ৫টি ধূমকেতু সৌরজগতের ভেতরের দিকে আগমন করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। কালে-ভদ্রে এদের কোন একটির উড়ন্ত আঘাতও পৃথিবীকে ধ্বংসের অন্ধকার গর্তে নিক্ষেপ করতে পারে। উল্লেখিতসমূহ মহাবিপদের কথা বিবেচনা করে ইতোমধ্যেই NASA এবং European Space Egency কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। কতটুকুন সফল হবে তা কেবল ভবিষ্যৎ-ই বলে দেবে।

"সাবধান! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই, সাবধান! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু ওদের অধিকাংশই অবগত নয়।" (১০ : ৫৫)
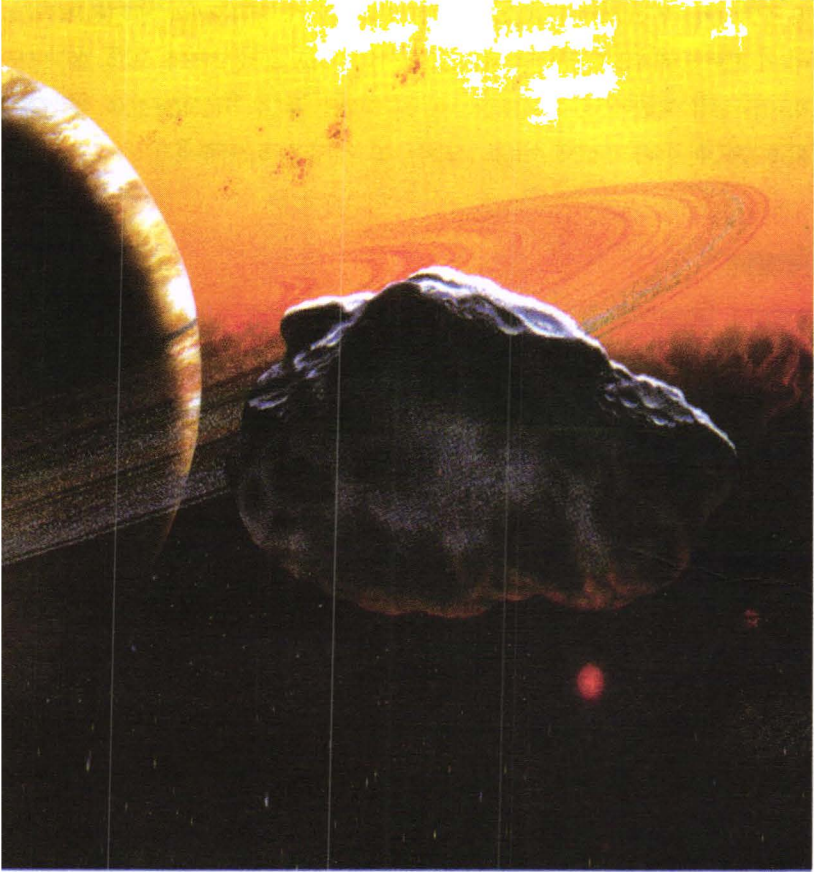
চিত্র-২০

– পৃথিবীর চতুর্দিকে এবং সমগ্র মহাকাশেই ভয়ানক পাথরের উড়ন্ত আঘাতের যে আয়োজন তা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন লাভে সমর্থ হওয়ার কারণেই জিন-জাতি একরাশ হতাশা ব্যক্ত করেছে, যা কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে। বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নততর প্রযুক্তি আজকে তা বাস্তবে প্রমাণ করে কি কুরআনের সত্যতা মানব সমাজের সম্মুখে প্রকট করে তোলেনি?

"যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তারাতো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারা মিথ্যাবাদী।" (১৬ ঃ ১০৫)

"ওরা তারাই, আল্লাহ্‌ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করে দিয়েছেন এবং ওরা গাফিল।" (১৬ ঃ ১০৮)
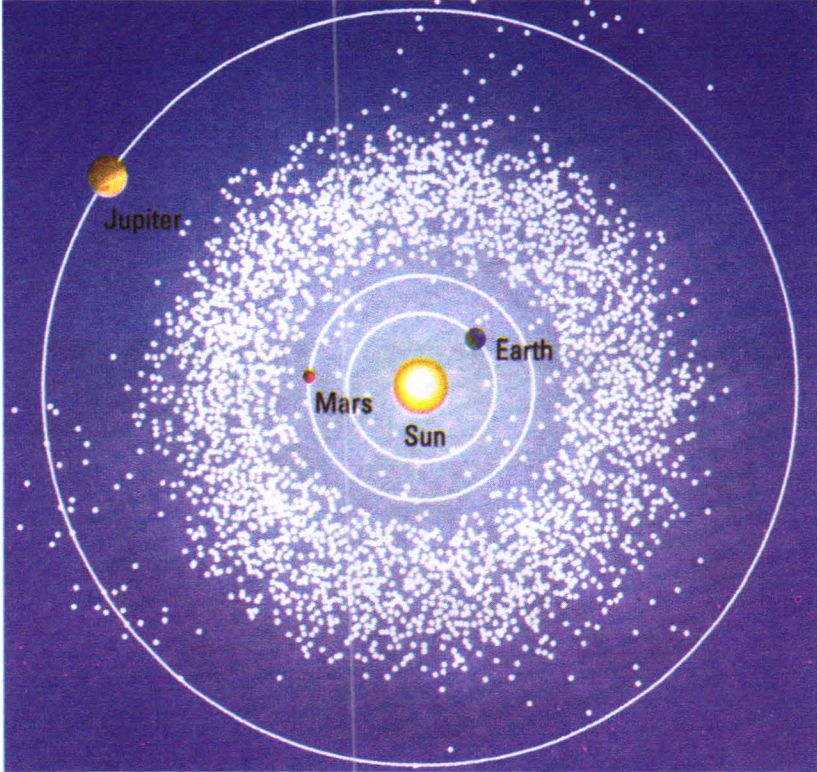
চিত্র-২১

– প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে অবিজ্ঞান যুগে যে কুরআন মহাশূন্যে বিরাজমান অথচ পৃথিবী থেকে অদৃশ্য বিশাল-বিশাল ভাসমান পাথরের সন্ধান দিয়েছে মানব জাতিকে, কোন যুক্তিতে জ্ঞানী সমাজ সেই কুরআনকে এবং তার প্রেরককে অমান্য করতে পারে? অন্তত জ্ঞানী সমাজের জন্য এটা শোভনীয় হতে পারে না। সত্যকে মেনে নেয়াই তাদের কর্তব্য। এতে তাদের মর্যাদা-ই কেবল বৃদ্ধি পাবে।

"তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করে থাকেন (যেন তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর কথামত জীবন নির্বাহ করতে পার) ।" (৪০ ঃ ১৩)
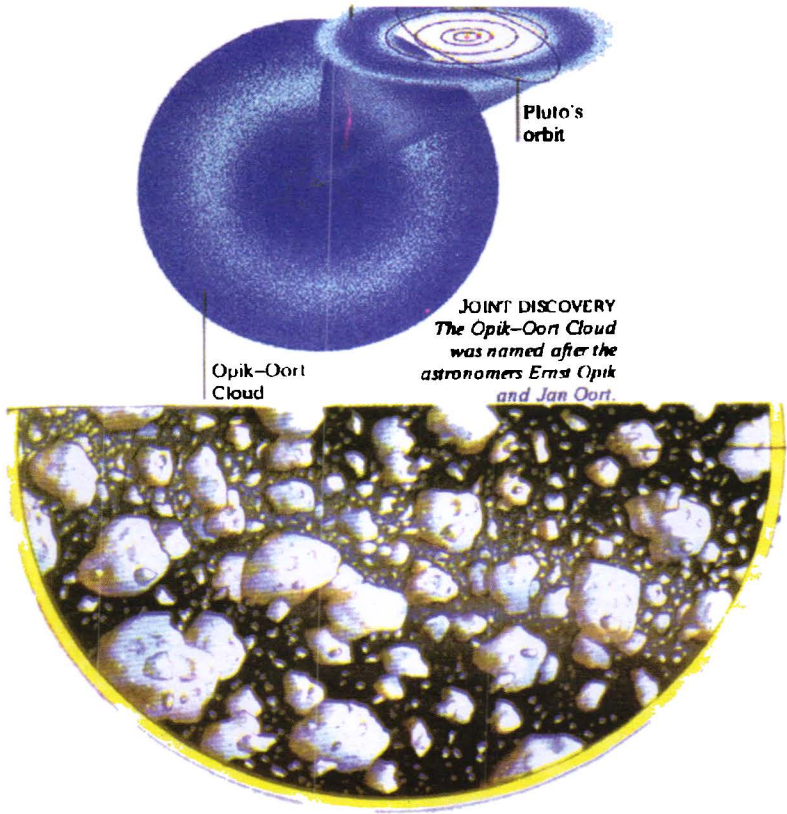
চিত্র-২২

– ভাবতে অবাক লাগে, একটি মাত্র গ্রন্থ অথচ তার প্রতিটি পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রয়েছে বিজ্ঞানের উৎকর্ষিত ও চূড়ান্ত আবিষ্কারসমূহের হাজারো জ্ঞানগর্ভ তথ্য ও তত্ত্ব । যেন সমাজের জ্ঞানীজন অনুধাবন করতে পারেন নিশ্চয় এ বাণী মহান স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহর, কেননা তিনি ছাড়া এ সকল তথ্য অগ্রিম জানা অন্য কারও পক্ষেইতো সম্ভব নয় । ছবিতে দেখুন না! কুরআনের কথা মতই বিজ্ঞান সব উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়ে দিয়েছে । এরপর আর কোন সন্দেহ থাকে কী?

"যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে (তাঁর অগ্রিম কথামত পরবর্তীতে আবিষ্কৃত বিষয়কে) প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, দণ্ডদাতা।" (৩ ঃ ৪)
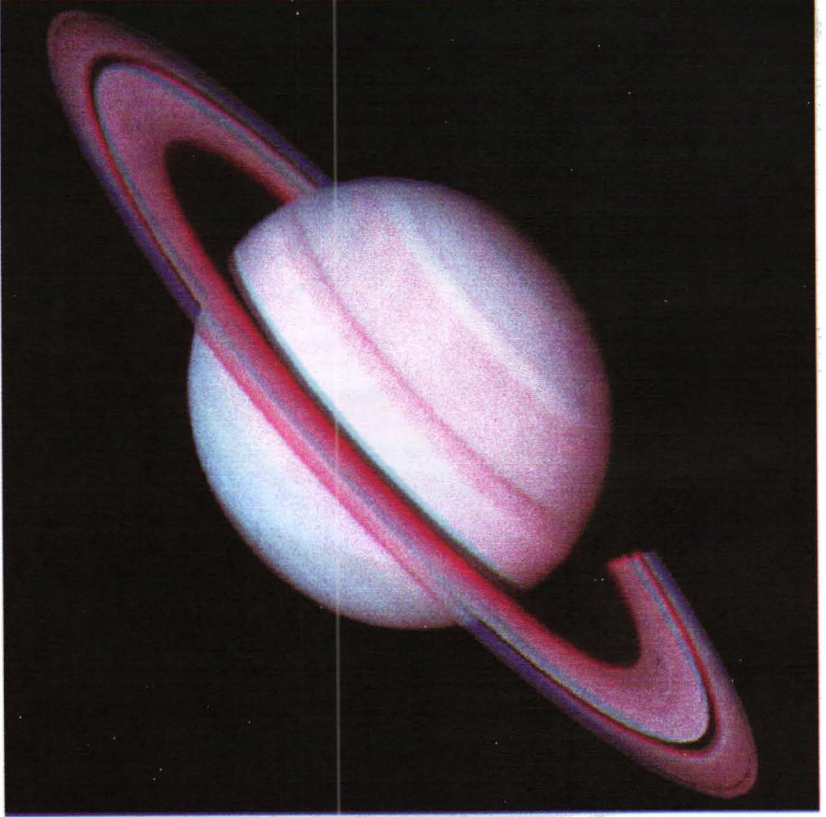
চিত্র-২৩

– শনি গ্রহের চতুর্দিকেও আবিষ্কৃত হয়েছে বিশাল পাথুরে বেল্ট, যা ছবিতে দেখা যাচ্ছে। মহাজাগতিক কারণে এ বিশাল বেল্টের পাথরও মাঝে মধ্যে অন্যান্য গ্রহে আঘাত হেনে থাকে। মাত্র এক কিলোমিটার ব্যাসের একটি পাথরের আঘাতও পৃথিবী থেকে সভ্যতাকে চিরদিনের জন্য গুড়িয়ে দিতে পারে। বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্যে একথা জানা গেছে।

"ওরা (তাদের প্রভুর) কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে 'এতো এক চিরাচরিত যাদু' ।" (৫৪ ঃ ২)
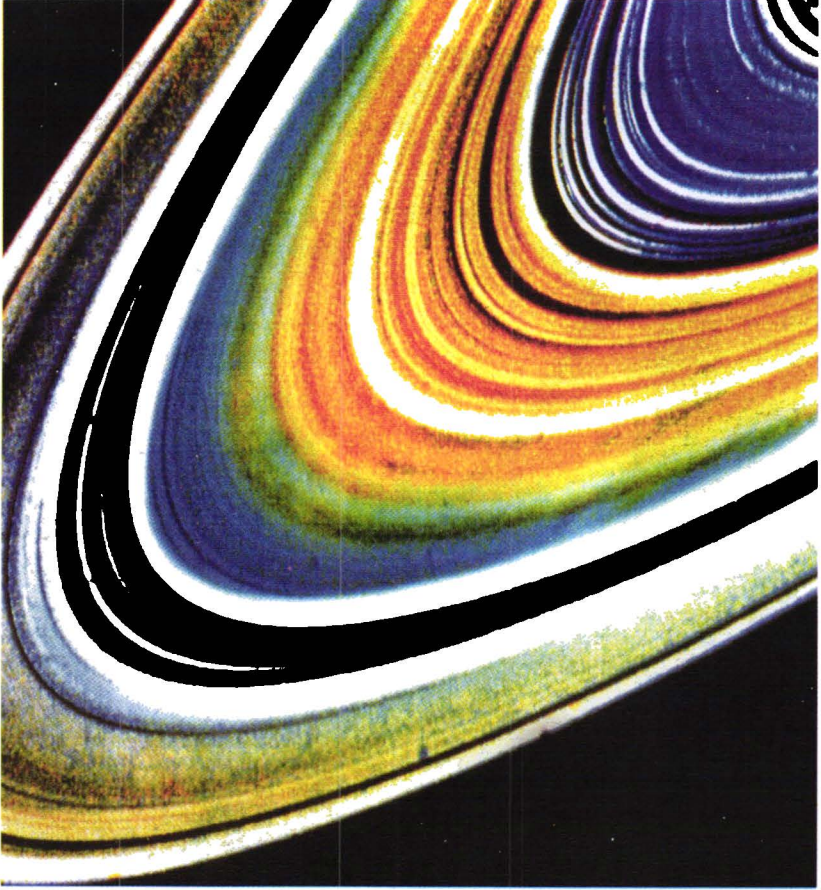
চিত্র-২৪

– বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা অবিজ্ঞান যুগে সম্ভব হলেও বর্তমান চরম উৎকর্ষতায় বিকাশমান বিজ্ঞানের উদ্‌ঘাটিত সত্যকে কিভাবে অস্বীকার করা যাবে? ছবিতে দৃশ্যমান শনি গ্রহের বেল্টের পাথর স্তূপের উপস্থিতি প্রমাণ করছে– মহান আল্লাহ সত্য এবং তাঁর পবিত্র বাণীও সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত । নতুবা এই অদৃশ্য পাথর সম্পর্কে ১৪০০ বৎসর আগে কুরআন তথ্য দিল কিভাবে?

"আমি (আল্লাহ্) ইচ্ছা করলে ওদেরসহ ভূমি ধ্বসায়ে দিতে পারি অথবা ওদের ওপর আকাশ থেকে খণ্ড পতন ঘটাতে পারি। আল্লাহ্ অভিমুখী প্রতিটি–বান্দাহর জন্য এতে অবশ্যই (জ্ঞানময়) নিদর্শন রয়েছে।" (৩৪ ঃ ৯)

চিত্র-২৫

– দূর থেকে গ্রহগুলোর চতুর্দিকে বেল্ট মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু নিকট থেকে এক ভয়ংকর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে। বিশাল জায়গা নিয়ে কোটি কোটি পাথর খণ্ড শুধু দেখা যাবে। এ দৃশ্য মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ এবং তাঁর বাণীর সত্যতা বহন করে চলেছে। এ সত্য উপলব্ধির জন্য নিরপেক্ষ মন ও প্রশস্ত হৃদয়ের প্রয়োজন। মানব সমাজের তা আছে কী?

'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞানের' বক্তব্যের পর একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, উভয়ের একই বিষয়ে বক্তব্যের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ১৪০০ বৎসর হলেও আমাদের সৌরজগতের চতুর্দিকে মহান স্রষ্টার সৃজিত মহাজাগতিক পাথর, ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড এবং মহাজাগতিক রশ্মি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমৃদ্ধ পরিবেশ সত্য, সঠিক এবং বাস্তবভাবে তা প্রমাণিত।

সাথে সাথে আমাদের সৌরজগতের অধিবাসী মাটির তৈরী 'মানব' সম্প্রদায় এবং অগ্নিশিখা দিয়ে সৃষ্ট 'জিন' সম্প্রদায় মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে 'পাথর' ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ (Radiation) দিয়ে তৈরী প্রতিরোধ বেল্টের সামনে যে খুবই অসহায় তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যা Overcome করার যোগ্যতা, ক্ষমতা কোনটাই তাদের নেই।

সুতরাং বক্তব্যের সমাপ্তি রেখা টানার পূর্বে আমাদের স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, পবিত্র মহাগ্রন্থ 'কুরআন'-এ অগ্নিশিখা দিয়ে তৈরী 'জিন' জাতির পক্ষ থেকে বর্ণিত 'পাথর' ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিয়ে সৃষ্ট ভয়ংকর বিপদজনক পরিবেশের বর্ণনা সম্পূর্ণ 'সত্য' এবং বর্তমান বিজ্ঞান কর্তৃক হুবহু প্রমাণিত। 'কুরআন' বিজ্ঞানের বহু শত বৎসর আগে অবস্থান নিয়ে বর্তমান বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শক হয়ে যে কাজ করছে, সে বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যজনক নয় কি? অতএব সমাজের জ্ঞানীরা মহাবিশ্বের জ্ঞানপূর্ণ মহাজাগতিক আবিষ্কারসমূহের মাধ্যমে 'মহান স্রষ্টার' বাস্তব উপস্থিতিকে অনুধাবন করে তাঁর সামনে মস্তক অবনত করে দিয়ে ধন্য হবেন, এটাই আমরা আশা করতে পারি।

পাঁচ

আল্-কুরআন

"আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।" (৭২ঃ৮)

"আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সম্মুখীন হয়।" (৭২ঃ৯)

"আমরা জানি না, বিশ্ববাসী নিজেরাই কি অমঙ্গল চায়, না-কি তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চায় না!" (৭২ ঃ ১০)

"এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী।" (৭২ ঃ ১১)

"এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবোনা।" (৭২ ঃ ১২)

ওপরে বর্ণিত কুরআনের বাণীসমূহ পৃথিবীবাসীর জন্য যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের বাস্তব সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ নিয়ে হাজির হয়েছে, তার প্রায় প্রত্যেকটি আমরা ইতিমধ্যেই সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করেছি।

ঐ আলোচনায় আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, আমাদের পৃথিবীর চতুর্দিকে নিকটে এবং দূরে মহাজাগতিক ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্ তা'আলা' অসংখ্য পাথর, ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড এবং ভয়ংকর ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি সৃষ্টি করে রেখেছেন। সৌরজগতের বাইরের দিকে নিকটবর্তী আকাশে এই ধ্বংসাত্মক আয়োজন একটা বিরাট এলাকা নিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে আছে; যার ভেতর দিয়ে আলোর গতিতে চলামান 'জিন' সম্প্রদায়ের জন্যও অনবরত উল্কাপাত এবং ৩.২x২.৫ আলোকবর্ষ ব্যাপী বিরাট পাথুরে এলাকার কারণে নিশ্চিত ভ্রমণ এবং পারাপার অসম্ভব ব্যাপার। এমনকি ফিরিশতাদের চলাচলের পথের বিভিন্ন বাঁকে বাঁকে বা ঘাঁটিতে গমন করেও সংবাদ চুরি করে আনা জিনদের পক্ষে এক অসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ একটাই কল্পনাতীত উল্কাপতন ও জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-তে (Radiation) পরিপূর্ণ এলাকা।

এরপর আরও জানা সম্ভবপর হয়েছে যে, পৃথিবীর নিকটে এবং দূরে ঝুলন্ত ও চলমান পাথর বহর থেকে পাথর খণ্ড উড়ে এসে যে কোন সময়ই পৃথিবীকে আঘাত করতে পারে; যা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর তাতে মানব জাতির চূড়ান্ত সর্বনাশ সাধন ঘটে যাবে। যে বিপদের চিন্তায় জিনেরাও উদ্বিগ্ন।

'জিন'দের ঐ বক্তব্যে একথাও ব্যক্ত হয়েছে যে, যদিও তারা আগুনের শিখা (Infrared-ray) দিয়ে সৃষ্টি হওয়ার কারণে আলোর গতিতে দ্রুত চলার ক্ষমতা রাখে, তথাপিও পাথর, ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড এবং ভয়ংকর মহাজাগতিক রশ্মির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ (Radiation) দিয়ে সৃষ্ট দীর্ঘ ও বিরাট ৩.২x২.৫ আলোকবর্ষ ব্যাপী প্রতিরোধ বাঁধকে অতিক্রম করার যোগ্যতা রাখে না। ফলে নাজুক এক ব্যবস্থায় ব্যবস্থিত পৃথিবীতে যেমন স্রষ্টার পাকড়াও থেকে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না, তেমনি পৃথিবী থেকে পালিয়েও দূরে কোথাও আশ্রয় নেয়া যাবে না। পালানোর সকল পথই দুর্গম পাথরের দীর্ঘ বহর এবং জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ (Cosmic-ray ও Gamma-ray) দিয়ে পরিপূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। 'জিন' জাতি স্বচক্ষে দর্শনকৃত এবং স্বশরীরে ঐ এলাকাসমূহ পরিভ্রমণের পর যে বিবরণ (statement) তারা পেশ করেছে; তাতে আমাদের নিকট ওপরে বর্ণিত চিত্রটি ভেসে উঠেছে, যদিও পৃথিবী থেকে আমরা খালি চোখে এর একটি বিষয়ও দেখি না বা জানি না।

বিজ্ঞান

'কুরআন' ১৪০০ বৎসর পূর্বে উক্ত তথ্য নিয়ে আসার পর প্রায় সাড়ে তেরশত বৎসর পর অর্থাৎ মাত্র ৫০ বছর আগে বর্তমান বিজ্ঞান তার আবিষ্কৃত সকল প্রযুক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে ঐ একই বিষয়ে একই তথ্য আমাদেরকে অবহিত করতে সমর্থ হয়েছে। বিজ্ঞানও প্রকাশ করেছে যে পৃথিবীর চারদিকে ছোট ছোট মার্বেল পাথরের ন্যায় থেকে শুরু করে প্রায় ১০০০ কিঃ মিঃ ব্যাসের অসংখ্য পাথর অনবরত পরিভ্রমণ করছে। তাছাড়া 'মঙ্গল' গ্রহ ও 'বৃহস্পতি' গ্রহের মাঝে এবং শনি গ্রহের চতুর্দিকেও বিরাট বিরাট পাথরের বেল্ট তৈরী হয়ে আছে। যেখান থেকে মহাজাগতিক কারণে পাথর খণ্ড মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করতে গিয়ে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণে বন্দী হয়ে পড়লে যে কোন সময়ই ভূ-পৃষ্ঠে নেমে এসে আছড়ে পড়তে পারে। আর তাতে মানব সভ্যতা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

"আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এ এক মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)
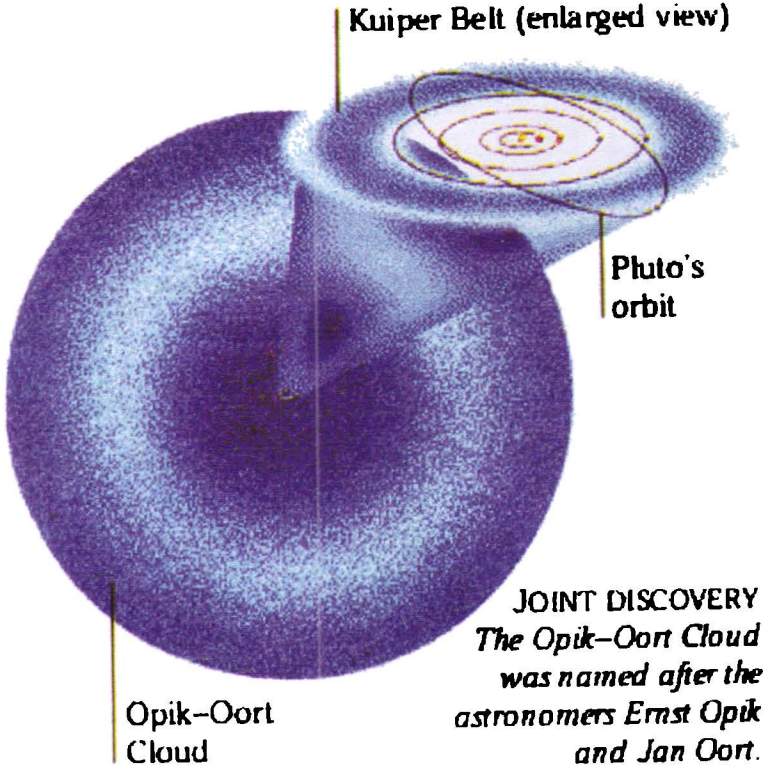
চিত্র-২৬

– ছবিতে দৃশ্যমান প্রায় ৩.২×২.৫ আলোকবর্ষ ব্যাপী বিশাল জায়গা নিয়ে পাথর, ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড দিয়ে পরিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যস্থানে সৌরজগত সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলা কার্যত মানুষ এবং জিন জাতিকে ঘিরে ফেলেছেন, যেন এ পরীক্ষার হল থেকে তারা পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে না পারে।

সুতরাং জিনদের পালাবার ব্যর্থতার সংবাদ এবং বিজ্ঞানের প্রদত্ত চিত্র ও তথ্য প্রমাণ করছে আল্-কুরআন সত্য গ্রন্থ।

"আমরা (জিনেরা) এখন বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবো না এবং (পৃথিবী থেকে) পলায়ন করেও তাঁকে (কৈফিয়ত তলব করা থেকে) ব্যর্থ করতে পারবো না।" (৭২ ঃ ১২)
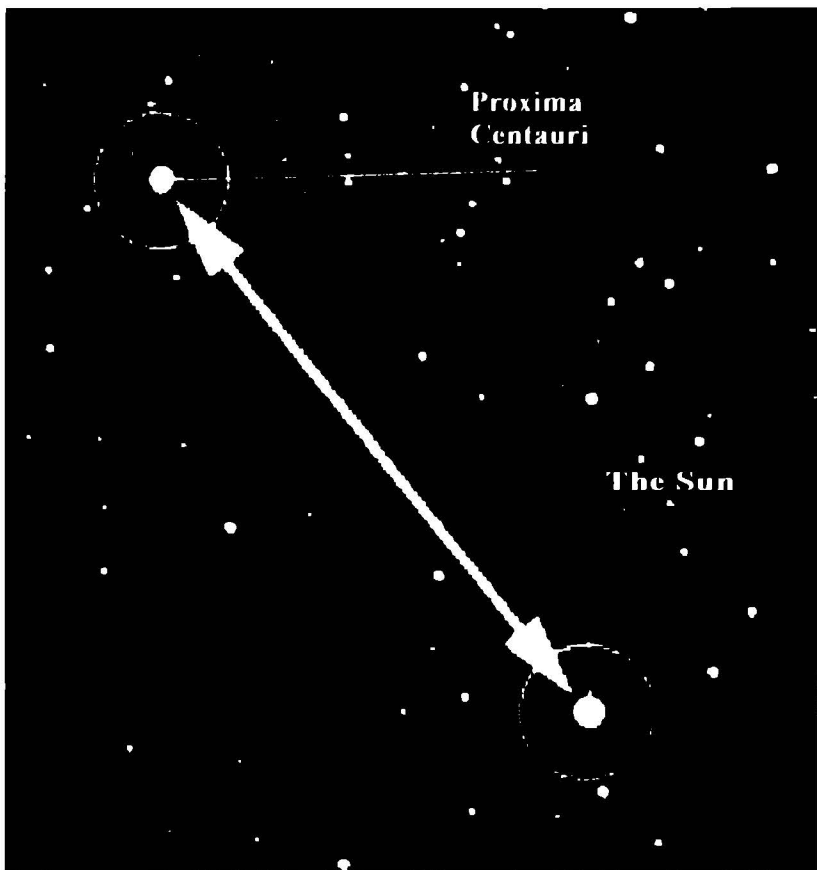
চিত্র-২৭

- ছবিতে আমাদের সৌরজগতের এবং নিকটবর্তী সৌরজগতের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। উভয়ের মাঝে গড় দূরত্ব হচ্ছে প্রায় চার আলোকবর্ষ। এর মাঝে আর কোন সৌর ব্যবস্থা না থাকায় মানুষ বা জিন কারও পক্ষেই এ পাথরময় ভয়ংকর দূরত্ব অনবরত চার বৎসর আলোর গতিতে ছুটে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব প্রমাণিত হচ্ছে আল্-কুরআন সত্য ভাষণ পেশ করেছে।

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন।" (৯২ ঃ ১০৫)
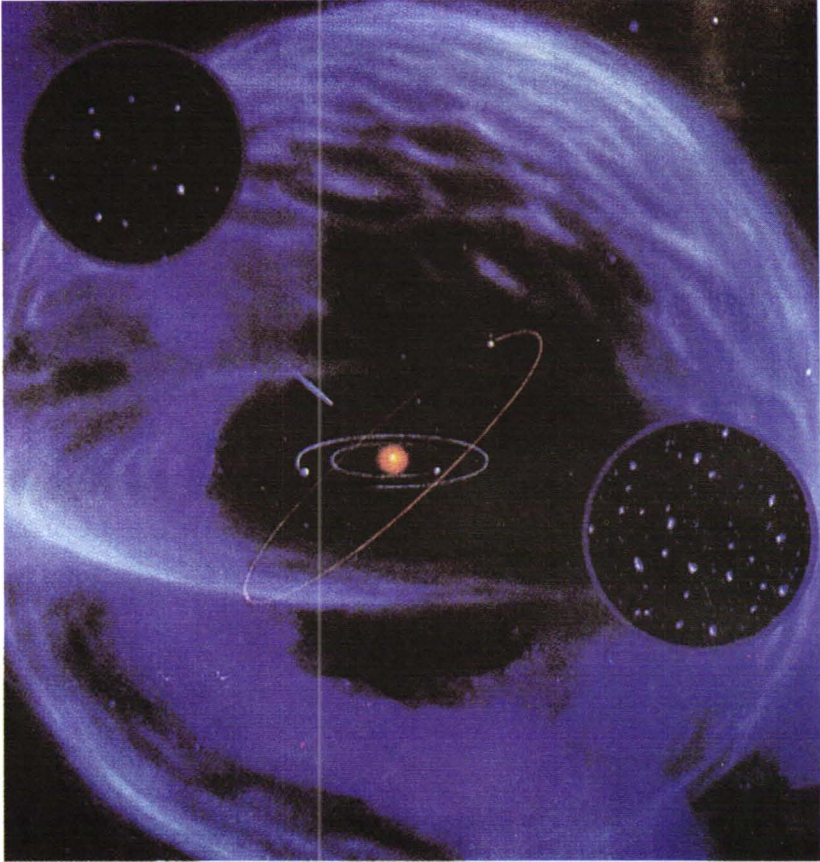
চিত্র-২৮

– একটি গ্যালাক্সির ভেতর মূলতঃ পুরোটাই পাথর খণ্ড দিয়ে ভরপুর। এ ভাসমান পাথরের স্তূপের ভেতরই অসংখ্য পাথর খণ্ড সঙ্কোচন প্রক্রিয়ায় জমাটবদ্ধ হয়ে সৌরপরিবার জন্ম নিয়েছে। বাকী সবটাই পাথর খণ্ড দিয়ে পরিপূর্ণ। তাই কার্যত মানুষ বা জিন জাতির পক্ষে এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে চলে যাওয়াটা আসলেই অসম্ভব ব্যাপার।

এতে প্রমাণিত হচ্ছে কুরআন এবং বিজ্ঞানের বর্ণনা এক ও অভিন্ন এবং সত্যতায়মণ্ডিত। তাই কুরআনকে মেনে নেয়াই হচ্ছে বিশ্ববাসীর কর্তব্য।

"ওরা ঊর্ধ্বজগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং ওদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে বিতাড়নের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং ওদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি।"

(৩৭ ঃ ৮, ৯)
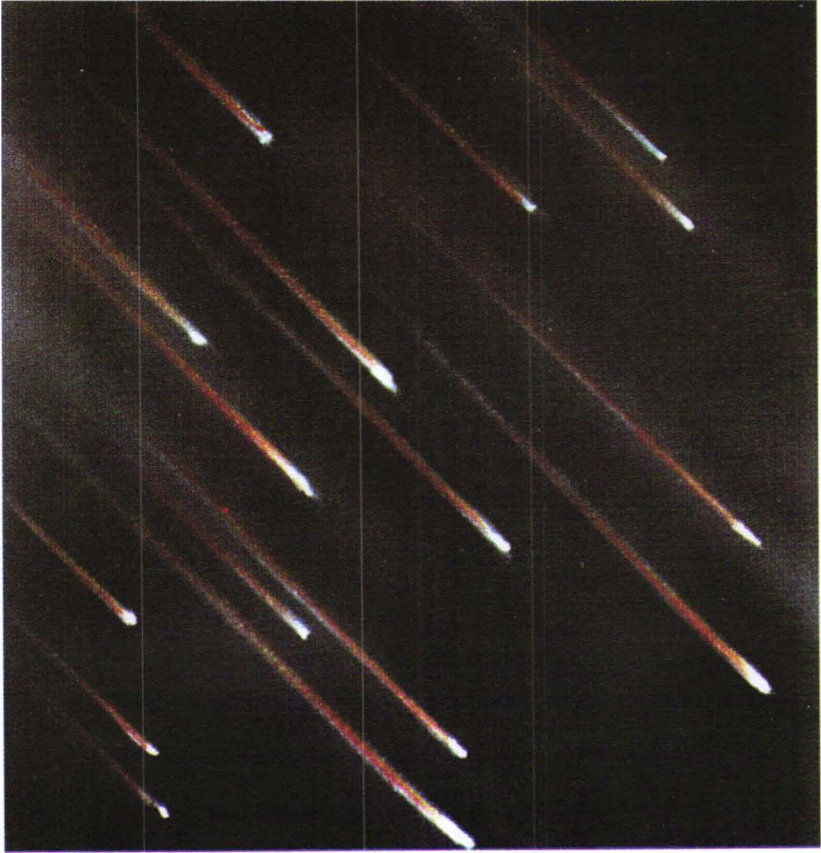
চিত্র-২৯

– পৃথিবী থেকে অদৃশ্য মহাকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের যে বর্ষণের দাবী কুরআন তুলে ধরেছিল প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে, বর্তমান বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ অগ্রযাত্রায় আজকে তা হুবহু বাস্তবে প্রমাণ করেছে 'Opick Oort Cloud' এবং সেখানে অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আবিষ্কারের দৃশ্য। সুতরাং কুরআন এবং সঠিক বিজ্ঞানে কোন ভিন্নতা নেই। আছে এক ও অভিন্ন বক্তব্য।

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে, সুতরাং কেউ তা দেখলে ওর দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে। আর কেউ তা না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (৬ ঃ ১০৪)
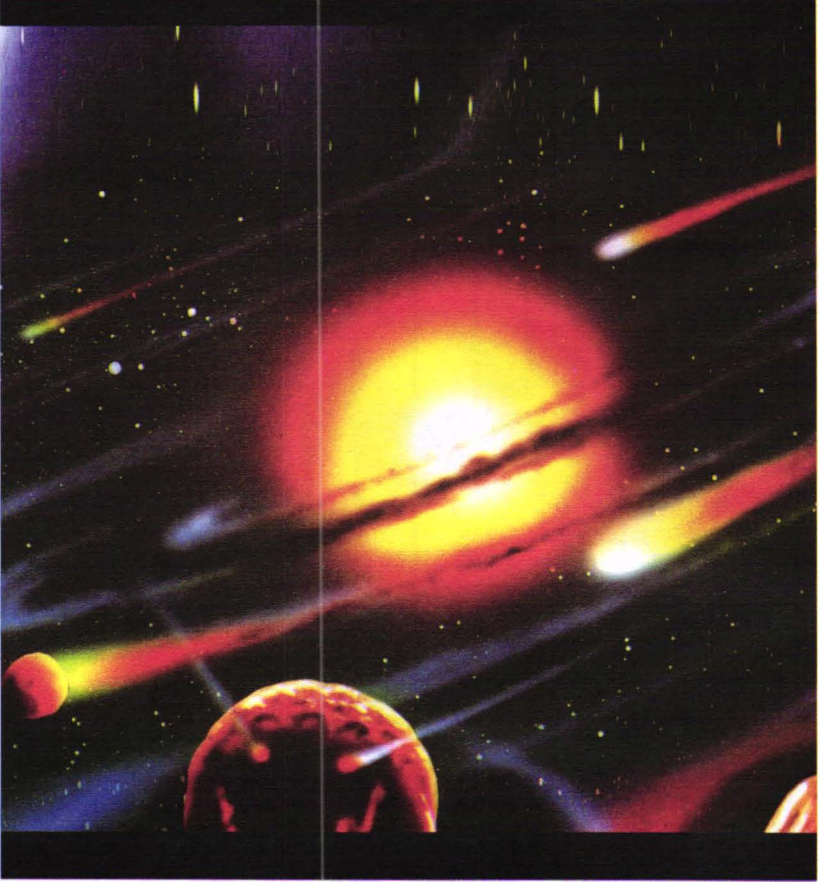
চিত্র-৩০

– অশিক্ষা-কুশিক্ষায় অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে, কুরআন যে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান করেছে, আজকের সভ্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান যদি সে তথ্যই হুবহু আবিষ্কার করে প্রমাণ করে, তাহলে কুরআন যে সত্যই মহান আল্লাহর বাণী তা জ্ঞানীজনের মেনে নিতে আপত্তি না থাকারই কথা। সমাজে এরূপ জ্ঞানীজন আছেন কী?

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং ওদের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি।" (৩৮ ঃ ২৭)। "আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) অদৃশ্য বস্তুকে প্রকাশ করে থাকেন।" (২৭ ঃ ২৫)
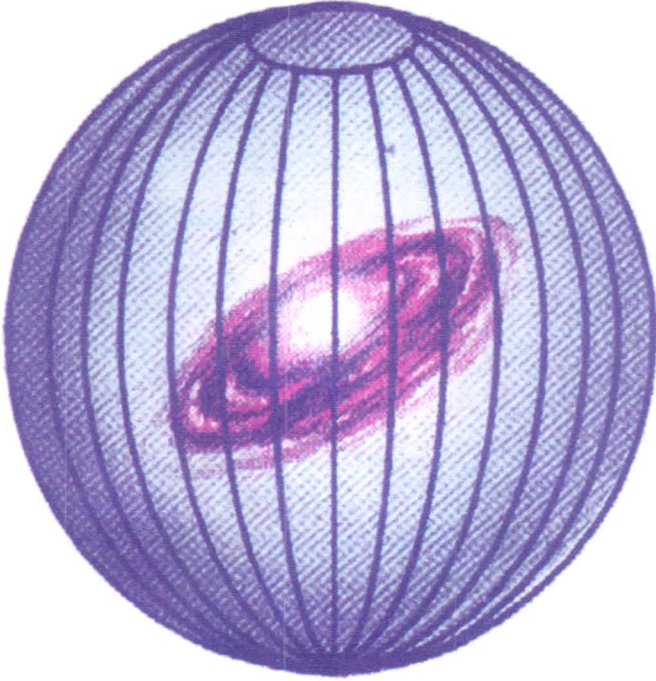
চিত্র-৩১

– ছবিতে 'Oort Cloud' পরিবেষ্টিত সৌরজগত দেখা যাচ্ছে। মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্কে মানব জাতির জ্ঞানের রাজ্যে বাস্তব সত্য প্রভু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, সত্য গ্রন্থ হিসেবে নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য, আকাশ রাজ্যে ফিরিশতাদের চলাচলের পথ ও জিন জাতির উপস্থিতির সত্যতা প্রমাণের জন্য যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য সূরা জিনে তুলে ধরেছিল, বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রযাত্রা তা হুবহু প্রমাণ করে মানব সমাজে তা দৃঢ়ভাবে গেড়ে দিয়েছে।

সুতরাং এক আল্লাহ আছেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন নির্বাহ করেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করা যেতে পারে।

এরপর বতর্মান বিজ্ঞান মানব জাতিকে তাক লাগিয়ে দিয়ে সৌরজগতের বাইরে সংলগ্ন এলাকায় ৩.২ x ২.৫ আলোকবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃত পাথর, ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড এবং ভয়ংকর মহাজাগতিক রশ্মির জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমৃদ্ধ 'Oort could'-এর সন্ধান দিয়েছে। যা অতিক্রম করার জ্ঞান মানুষ এখনো জানে না। সেখানে প্রতি মুহূর্তেই কল্পনাতীত উল্কাপাত সকল প্রকার যাতায়াত রূদ্ধ করে দিয়েছে। প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গলেই যেখানে মানুষ এখনো পৌঁছুতে পারেনি, সেখানে 'Oort could'-এর তো প্রশ্নই আসে না।

এবার আমরা আলোচনার মূল বিষয়ে আসতে চাই। ১৪০০ বৎসর পূর্বে 'জিনদের' (শয়তানদের) যে বক্তব্য আল্লাহ্ পাক কুরআনে 'কোড' করেছিলেন ঐ বক্তব্যের মাঝে সৌরজগতের ভেতর এবং বাইরে মারাত্মক ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মির এবং পাথরের যে বিরূপ পরিবেশের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, ঠিক হুবহু সেই পরিবেশই বর্তমান 'বিজ্ঞান' তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণে উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। এতে স্পষ্ট আলোতে প্রমাণিত হয়েছে যে–

১. 'জিন'দের বক্তব্য 'সত্য' এবং 'সঠিক'।

২. 'কুরআন' একমাত্র সত্য ধর্ম গ্রন্থ; যা স্রষ্টা কর্তৃক অবতীর্ণ।

৩. মহাবিশ্বের স্রষ্টা এক ও একক মহান সত্তা 'আল্লাহ্' সত্য, তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তিনি চিরঞ্জীব। নতুবা কুরআন এসব সঠিক তথ্য বিজ্ঞানের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে পাওয়ার কথা ছিল না।

৪. আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীতে ফিরিশতাদের চলাচলের নির্দিষ্ট পথ আছে, এবং সবশেষে 'জিন'দের বক্তব্য সঠিক প্রমাণ হওয়ায়–

৫. 'জিন' সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও যে সত্য-সঠিক ও বাস্তবতায় মণ্ডিত তা আবারও প্রমাণিত হল। বিষয়টি অস্বীকার করার আর কোন পথ থাকলোনা। বিজ্ঞান তার 'Asteroid belt' ও 'Oort cloud' এবং জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে দৃঢ়ভাবে তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

'কুরআন' প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে বাস্তবভাবে মহাকাশ বিজ্ঞানের যাই প্রকাশ করেছে, বিজ্ঞান তার উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দিয়ে আবিষ্কারের মাধ্যমে তাই প্রমাণ করেছে। কারণ উভয়-ই যে একই উৎস থেকে উৎসারিত!

সুতরাং বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটন মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা 'আল্লাহ্' কে দৃঢ় প্রমাণের ভেতর দিয়ে মেনে নেয়ার যে আহ্বান পেশ করছে, মানব সমাজের জ্ঞানীজন চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে তা না দেখার ভান করার সুযোগ আর থাকছে না। আশা করা যায় এবার তাঁরা মিথ্যার আবরণ ঝেড়ে ফেলে, মহাসত্যকে আলিঙ্গন করে এগিয়ে আসবেন শুধু নিজ স্বার্থেই। এবার সমগ্র আলোচিত অধ্যায়টিকে আমরা এক নজরে দেখে নিই।

এক নজরে

আল্-কুরআন

১. "পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সম্মুখীন হয়।" (৭২ ঃ ৯)

"ফলে এরা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারেনা এবং ওদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে বিতাড়নের জন্য এবং ওদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি।" (৩৭ ঃ

বর্তমান বিজ্ঞান

১. বর্তমান বিজ্ঞানবিশ্ব দীর্ঘদিন থেকে ধূমকেতুদের সম্পর্কে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আসছে, একটি মৌলিক বিষয়ে প্রকৃত তথ্য লাভ করার জন্য। আর তা হচ্ছে আমাদের সৌরজগতের বহিঃশূন্য থেকে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৫টি ধূমকেতু আগমন করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়, এদের সৃষ্টি এবং সৃষ্টিস্থল কিভাবে এবং কোথায়, তা অবহিত হওয়া।

পঞ্চাশের দশকে বিজ্ঞানী; 'Ernest Opik' এবং 'Jan Oort' একই সাথে আবিষ্কার করেন যে, আমাদের সৌরজগতের বাইরের দিকে গণনাতীত পাথর খণ্ড, উল্কাপিণ্ড এবং ধূমকেতুর ভয়ংকর মেঘমালার সৃষ্টি হয়ে গোটা সৌরজগতকে ঘিরে

"তবে কেউ হঠাৎ করে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তার পশ্চাৎ ধাবণ করে।" (৩৭ ঃ ১০)

আছে। যেখানে বর্ণনাতীত উল্কাপাত ঘটে চলেছে এবং ঐ এলাকা থেকেই আমাদের সৌরজগতে ধূমকেতুদের আগমন ঘটে থাকে। ঐ ভয়ংকর পাথর, উল্কা ও ধূমকেতু এবং জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমৃদ্ধ এলাকার পরিমাপ হচ্ছে, প্রায় ৩.২x২.৫ আলোকবর্ষ বা ৩০ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দৈর্ঘ এবং ২৫ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার প্রস্থ। আর তাতে প্রায় ১০০ বিলিয়ন হতে ১ ট্রিলিয়ন ধূমকেতু বিরাজ করছে। বিজ্ঞানীগণের নামানুসারে ঐ ভয়ংকর মেঘপুঞ্জের নামকরণ করা হয়েছে 'Opik-Oort cloud' হিসেবে। গোটা বিজ্ঞান বিশ্বে এ তথ্য আজকে সত্যে প্রমাণিত হয়ে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. *"আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী এবং জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।" (৭২ ঃ ৮)*

২. বিগত পঞ্চাশের দশকে সৌরজগতের বাইরে সংলগ্ন এলাকায় 'Opik-Oort cloud' আবিস্কৃত হলেও কিন্তু ১৮০১ সাল থেকেই বর্তমান বিজ্ঞান সৌরজগতের ভিতরের দিকে অসংখ্য ঝুলন্ত পাথরের সন্ধান আমাদেরকে সরবরাহ করতে সমর্থ হয়েছে।

"আমরা জানি না বিশ্ববাসী নিজেরাই কি অমঙ্গল চায়, নাকি তাদের প্রতিপালকই তাদের মঙ্গল চায় না?" (৭২ ঃ ১০)

এ ব্যাপারে বর্তমান সময় পর্যন্ত বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিজ্ঞান তার উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে 'মঙ্গল গ্রহ' এবং 'বৃহস্পতি' গ্রহের মধ্যস্থানে বিরাট এক পাথরের বেল্ট আবিষ্কার করেছে। যেখানে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন পাথর বিভিন্ন পরিমাপের অবস্থান করছে এবং গ্রহদের ন্যায় সূর্যের চতুর্দিকে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করছে।

"তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর পাথরবাহী ঝঞ্ঝা

এছাড়া শনি গ্রহের চতুর্দিকেও বিজ্ঞানীগণ পাথরের বেল্ট উদ্ঘাটন করতে পেরেছে। মহাকর্ষ

প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী!" (৬৭ ঃ ১৭)

বলের (Gravity) কারণে উভয় স্থান থেকেই যে কোন সময় যে কোন সাইজের পাথর উড়ে এসে পৃথিবীকে আঘাত করতে পারে। ১ সেঃ মিটার থেকে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন পাথর ঐ বেল্টসমূহে মওজুদ আছে। মাত্র ৫০ কিঃ মিটার থেকে ১০০ কিঃ মিটার ব্যাস সম্পন্ন একটি পাথরের আঘাত-ই ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বর্তমান সভ্যতাকে চিরদিনের জন্য মুছে দিতে পারে।

শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও বিজ্ঞান আরো প্রমাণ করেছে যে পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রায় ৫০০০ বড় বড় পাথর খণ্ড ভাসমান অবস্থায় পরিভ্রমণ করছে। ওদের যে কোনটি যে কোন সময় বিনা নোটিশেই পৃথিবীকে আঘাত করে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে।

এছাড়াও আছে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভয়াবহ ও ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয়তা এবং মহাজাগতিক অজানা রশ্মির উপস্থিতি। পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র, ওজোন লেয়ার ও বায়ূমণ্ডল, এদের প্রতিনিয়ত প্রতিহত করছে বিধায় আমরা এখনও বেঁচে আছি। নতুবা বহু পূর্বেই আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।

পরিশেষে একটি বাক্যেই বিষয়টির ইতিটানা যায়, আর তা হলো– মহাজাগতিক ব্যবস্থায় আমাদের জীবনময় গ্রহ এই 'পৃথিবী' ধ্বংসের এক নাজুক অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

৩. "পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে

৩. বিংশ শতাব্দিতেই বিজ্ঞানীগণ আমাদের 'মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সি' পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আশ্চর্য করার মত এক বিরাট সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান লাভ করেন, যা গ্যালাক্সির এক প্রান্ত হতে শুরু

তার ওপর নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সম্মুখীন হয়।" (৭২ ঃ ৯)

হয়ে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। সুড়ঙ্গের মুখের ব্যাস প্রায় ১০,০০০ আলোকবর্ষ এবং প্রান্তের ব্যাস প্রায় ৫,০০০ আলোকবর্ষ।

প্রথম প্রথম বিজ্ঞানীগণ এই শূন্যস্থান সম্পন্ন সুড়ঙ্গ পথের সৃষ্টি হওয়ার পিছনে মূলতঃ 'hot star'-ই দায়ী বলে ভাবতে ছিলেন, কিন্তু ১৯৯৯ সালে Cosmic gas পর্যবেক্ষণকারী 'Far ultraviolet Spectroscopic explorer (FUSE) Spacecraft' মহাকাশে পাঠানোর পর 'NASA' নিশ্চিত হয় যে ঐ সুড়ঙ্গপথ গ্যালাক্সির ভিতর সৃষ্টি হওয়ার পিছনে 'সুপার নোভার' বিস্ফোরণই দায়ী।

"ফলে তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং ওদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে বিতাড়নের জন্য এবং ওদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি।" (৩৭ ঃ ৮ ও ৯)

প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাপী ব্যাসের গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে মহাজাগতিকভাবে প্রায় ১০,০০০ আলোকবর্ষ ব্যাসের বিরাট শূন্যস্থান নামক 'সুড়ঙ্গ পথ' মহাকাশের মহাশূন্যতায় একটি 'রাজ পথের'-ই তুলনা হতে পারে অন্য কিছু নয়।

৪. "এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারব-না এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না। (৭২ ঃ ১২)

৪. বর্তমান বিজ্ঞান তার উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর চারদিকে ভয়ংকর মহাজাগতিক রশ্মির তেজস্ক্রিয়তা এবং বিক্ষিপ্তভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় ভাসমান প্রায় ৫০০০ থেকে বেশী বিভিন্ন পরিমাপের পাথর খণ্ড উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছে এবং পৃথিবীবাসীকেও সাবধান-সতর্ক করেছে এই বলে যে, ঐ তেজস্ক্রিয়তার আক্রমণ বা পাথর খণ্ডগুলো থেকে বড় আকারের একটি পাথরের আঘাত-ই পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাকে চির অন্ধকারে নিয়ে যেতে পারে।

"আমরা জানি না বিশ্ববাসী নিজেরাই কি অমঙ্গল চায়, না-কি তাদের প্রতিপালকই তাদের মঙ্গল চায় না?" (৭২ ঃ ১০)

এ ছাড়া 'মঙ্গল' গ্রহ ও 'বৃহস্পতি' গ্রহের মাঝখানে এবং 'শনি' গ্রহের চতুর্দিকেও পাথরের বিরাট বহর (fleet) আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। মহাকাশে 'মহাকর্ষ বলের' প্রভাবে উক্ত পাথর বেল্টদ্বয় থেকে আগত পাথরও আমাদের পৃথিবীর জন্য মহাবিপদের কারণ হতে পারে।

একথা এখানেই শেষ নয়, আমাদের সৌরজগতের বাইরের দিকে দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩.২ আলোকবর্ষ এবং প্রস্থে প্রায় ২.৫ আলোকবর্ষ ব্যাপী পাথর খণ্ড, উল্কাপিণ্ড ও ধূমকেতু (Comet) দিয়ে সৃষ্ট বিরাট-বিশাল ভয়ংকর 'Opik Oort cloud' সৃষ্টি হয়ে আছে। যেখান থেকে বৎসরে প্রায় ৫টি ধূমকেতু আগমন করে সৌরজগতের কেন্দ্র সূর্যকে উপবৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। তাদের এই আগমন পথে কখনও যদি পৃথিবী একই তলে নিজ কক্ষপথে চলার পথে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে যায় তাহলে পৃথিবী নির্ঘাত ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবে।

"তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর পাথরবাহী ঝঞ্চা প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী!" (৬৭ ঃ ১৭)

এক কথায় পৃথিবী প্রতিটি মুহূর্তেই এক মহাসঙ্কটজনক অবস্থার ভিতর দিয়ে মহাশূন্যে নিজ কক্ষপথে এগিয়ে যাচ্ছে।

আবার 'Opik–Oort cloud'ও ভয়ংকর তেজস্ক্রিয়তা এবং উল্কা, ধূমকেতু, পাথর ইত্যাদি দিয়ে এতই ভয়ানক পরিবেশ সৃষ্টি করে আছে যে, সৌরজগত থেকে কোন প্রাণী পালিয়ে যেতে

চাইলেও তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হতে বাধ্য। ঐ পরিবেশকে সফল করে তোলার ব্যবস্থা প্রাণীকুলের ('জিন' এবং মানবের) পক্ষে হয়তো বা সম্ভব হবে না।

সুতরাং 'একের ভেতর অনেক' অধ্যায়টিতে উদ্ধৃত পবিত্র কুরআনের বাণীসমূহের অদৃশ্য অথচ বাস্তবসম্মত যে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে মানব সভ্যতার সামনে সযত্নে পেশ করেছিল, সময়ের আবর্তনে আজ এক লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগেই তা প্রমাণ করা সম্ভব হলো, এর পূর্বে তা অনুমান করাও ছিল দুঃসাধ্য।

অতএব, আল্লাহ্ সত্য, তাঁর প্রেরিত রাসূল (সা) সত্য এবং রাসূলের (সা) ওপর অবতীর্ণ 'কুরআন'ও সত্য।

প্রকৃত জ্ঞানের ধারকদের জন্য সুসংবাদ। কেউ আছে কি সেই পুরস্কার গ্রহণ করার যা আল্লাহ্ তাঁর নিকট সত্যবাদী জ্ঞানীদের জন্য জমা রেখেছেন?

"সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত এবং মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।" (১৭ ঃ ৮১)

United States
X-33
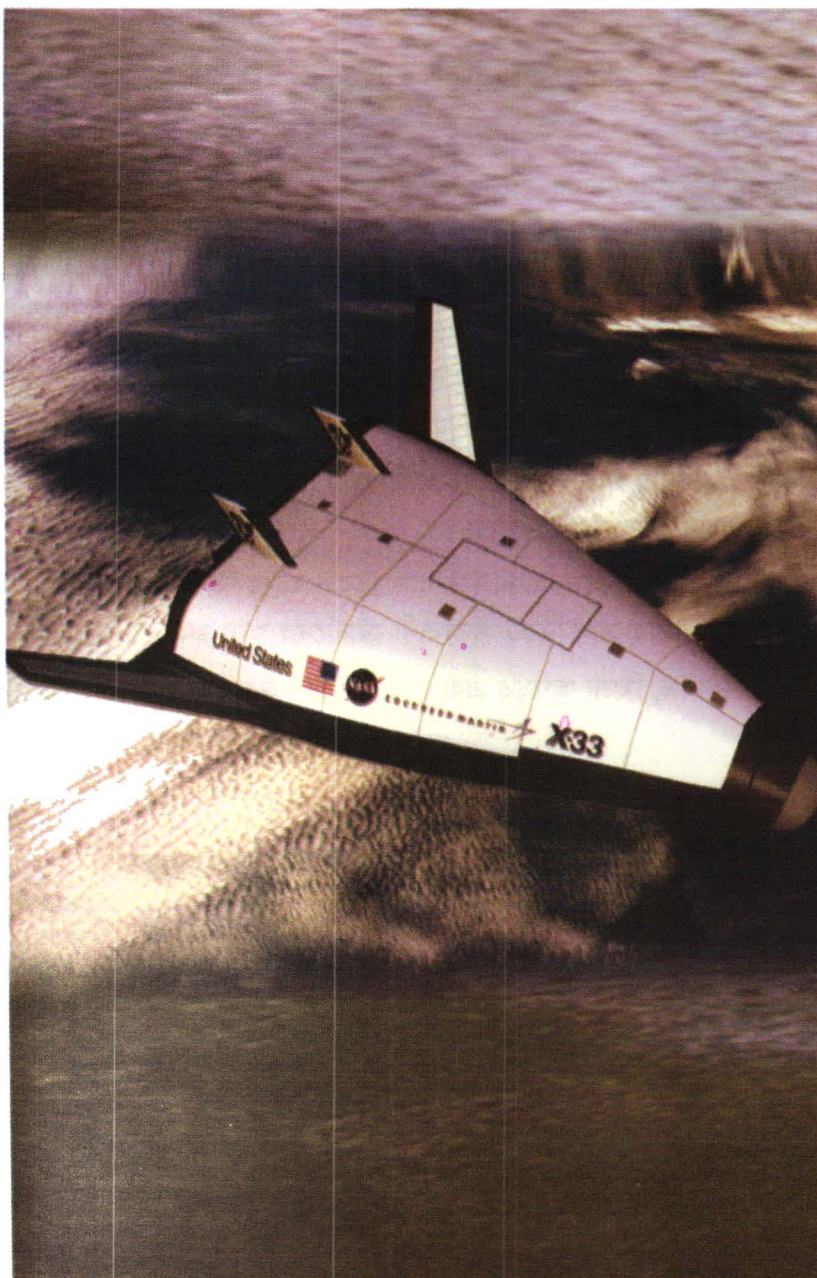
এক দিন সমান পঞ্চাশ হাজার বৎসর

আল্-কুর্আন

"যদি আল্লাহ্ মানুষকে তার কার্যাবলীর দরুন পাকড়াও করতেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠের একটি প্রাণীকেও ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। সুতরাং যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় এসে পড়বে, তখন আল্লাহ্ নিজ বান্দাহগণকে দেখে নেবেন।"
(৩৫ ঃ ৪৫)

"নিশ্চয় কিয়ামাত আসবে, আমি ওটাকে গোপন রাখতে চাই যেন প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের বিনিময় প্রাপ্ত হয়।" (২০ ঃ ১৫)

"তোমাদেরকে যে বস্তু ও বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অবধারিত।"
(৭৭ ঃ ৭)

"আপনি বলে দিন, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণ সকলকে একত্রিত করা হবে এক স্থিরিকৃত দিবসে নির্দিষ্ট সময়ে।" (৫৬ ঃ ৪৯, ৫০)

"তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবৃত্তি ঘটান।" (৮৫ ঃ ১৩)

"সেই দিন আকাশমণ্ডলীকে গুটায়ে ফেলবো যেভাবে লিখিত দফতর গুটানো হয়। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই।" (২১ ঃ ১০৪)

"সেই দিন পৃথিবীকে পরিবর্তন করে ভিন্নরূপে সৃষ্টি করা হবে এবং তদ্রূপ করা হবে ঐ আকাশমণ্ডলীকেও।" (১৪ ঃ ৪৮)

"বিশ্ব ওর প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে।" (৩৯ ঃ ৬৯)

"পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী ওর অভ্যন্তরে যা আছে

তা বের করে দেবে ও শূন্য গর্ভ হবে এবং ওর প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে, আর ওর তাই করণীয়। তখন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" (৮৪ ঃ ৩-৫)

"যে দিন সমস্ত প্রাণী ও ফিরিশ্‌তাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে, কেউই কথা বলতে পারবে না, সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাকে দয়াময় অনুমতি দেবেন এবং সে কথাও ঠিক ঠিক বলবে। এটা সুনিশ্চিত দিন, অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের নিকট আশ্রয়স্থল করে রাখুক।" (৭৮ ঃ ৩৮, ৩৯)

"আর সে দিনটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন, যেদিন আল্লাহ্‌ তাদেরকে এরূপ অবস্থায় একত্রিত করবেন যেন তারা পূর্ণ দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র অবস্থান করেছিল এবং তারা পরস্পর একে অন্যকে চিনবে।" (১০ ঃ ৪৫)

"তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁর সমীপে সমুত্থিত হবে- যে দিনের পরিমাণ তোমাদের গণনায় সহস্র বৎসরের সমান।" (৩২ ঃ ৫)

"ফিরিশ্‌তা এবং রূহ্‌ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যে দিনের হিসেব পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান।" (৭০ ঃ ৪)

"প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হলো সেই সকল লোক, যারা আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না।" (১০ ঃ ৪৫)

উদ্ধৃত গুরুত্বপূর্ণ এবং জ্ঞান হরণকারী বিষয়টি পর্যায়ক্রমে সহজভাবে বোধগোম্য করে তোলার নিমিত্তে বিষয় ভিত্তিক বাণীসমূহের সাথে বিষয়ের নিকটবর্তী বাণীগুলোও জুড়ে নেয়া হয়েছে। এতে আশা করছি নির্দিষ্ট বিষয়টি সকলের নিকট খুব সহজভাবেই ধরা দেবে। বর্তমান বিজ্ঞানের দোরগোড়ায় পৌঁছার পূর্বেই চলুন তাহলে এক নিরেট সত্য এবং বাস্তব তথ্য সরবরাহকারী গ্রন্থ আল্‌-কুরআনের উল্লেখিত মুক্তাতুল্য বাণীসমূহের মর্মকথা জেনে নেয়ার চেষ্টা করি!

উল্লেখিত আয়াতগুলোর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মর্মবাণীর যে বক্তব্য, তা হলো– মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নিজ থেকে তৈরী একটা মাষ্টার প্ল্যানের আওতায় সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, একটি নির্দিষ্ট

লক্ষ্যে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার জন্য। পৃথিবীর মানব সম্প্রদায়ও সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বহির্ভূত নয়, কিন্তু বাস্তবভাবে মানব সম্প্রদায়ের আচরণ ঐ মাষ্টার প্ল্যানকেই চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করতে চায়। তাদের এ বিদ্রোহিতামূলক আচরণ স্বাভাবিকভাবেই শাস্তি দাবী করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই একটি নির্দিষ্ট সময় এ ব্যাপারে নির্ধারণ করেছেন, তাই আপাতত সাময়িকভাবে অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তির জন্য পাকড়াও করছেন না। তবে প্রতিশ্রুত নির্দিষ্ট সময়টি এসে হানা দিলেই তখন কিন্তু তাদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ের শাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত করে দেবেন। তখন আল্লাহ্ তাঁর এই উদ্ভ্রান্ত অহংকারী বান্দাহ্দের ভালো করেই খবর নেবেন।

উক্ত নির্ধারিত সময়টির ব্যাপারে কেউ যেন সামান্যতমও সন্দেহ পোষণ না করে, তা একদিন অবশ্যই এসে হাজির হবে যদিও পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীর এই অবস্থানকাল একটা পরীক্ষাকালিন পিরিয়ড বিধায় তা গোপন করে রাখা হয়েছে। যেহেতু পরীক্ষায় সফলতা এবং ব্যর্থতার বিষয়টি সরাসরি জড়িত, তাই পৃথিবী ধ্বংসের দিনটিকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

পৃথিবীতে আগত মানবমণ্ডলীর প্রথম মানুষটি থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ধ্বংসের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আগত সর্বশেষ মানুষটিও ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক বিচারের দিন হাশরের মাঠে অন্য সবাইর সাথে অবশ্যই একত্রিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই।

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন বিচারের দিন হাশরের মাঠ তৈরী করবেন- তা তাঁর জন্য কোন ব্যাপার-ই না, মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টি কার্য তিনি যে পদ্ধতিতে সম্পন্ন করেছিলেন, সেই একই পদ্ধতিতেই তিনি আবার নতুন করে বিচারের মাঠ তৈরী করবেন, এ ব্যাপারে তিনি তাঁর কৃত ওয়াদা অবশ্যই পূরণ করবেন। সেদিন আল্লাহ্র জ্যোতিতে নতুন জগত উদ্ভাসিত হবে। চন্দ্র-সূর্যের প্রয়োজন হবে না।

যখন দ্বিতীয় বার শিংগায় ফুৎকার দিয়ে বিকট শব্দের সৃষ্টি করা হবে তখন হাশরের মাঠ সৃষ্টি হয়ে মানুষ 'কবর' থেকে দলে দলে বের হবে এবং ঐ শব্দের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তাঁর সম্মানিত ফিরিশ্তাদের সাথে নিয়ে বিচার কার্য সম্পাদন করার নিমিত্তে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবেন। এ ব্যাপারে সকল প্রকার দলীল প্রমাণ বিচারের মাঠে হাজির করা হবে। সেদিন কারও ওপরই সামান্যতম যুলুমও করা হবে না।

পরকালে হাশরের মাঠে অনুষ্ঠিত এই চূড়ান্ত বিচার কার্য চলাকালীন সময়ের প্রশস্ততা কল্পনাতীত এত দীর্ঘ হবে যে মানুষেরা ভাবতে থাকবে তারা হাশরের মাঠে এই ব্যয়িত সময়ের তুলনায় পৃথিবীতে মাত্র এক কাতরা বা একটি মুহূর্ত মাত্র অবস্থান করেছিল, এর বেশী নয়। কথাটি এভাবেও বুঝে নেয়া যেতে পারে যে, যেদিন সকল ফিরিশতা এবং রূহ্ একত্রিত হয়ে মহান আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত হবে, সেই দিনটি পৃথিবীর তুলনায় এত লম্বা দিন হবে যে, তাদের গণনায় তা হাজার হাজার বৎসরের সমান হবে। এরপরও যদি মানব সম্প্রদায়ের মাঝে কেউ এই হাজার হাজার কথাটির সঠিকতা বাস্তবে কতটুকুন তা অনুমান করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তারা এতটুকুন জেনে রাখা ভালো হবে যে, বিচারের দিনটি পৃথিবীর পৃষ্ঠে মানুষের গণনায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বৎসরের সমান হবে। নিঃসন্দেহে মানবমণ্ডলীর জন্য তা একটি কঠিন ও ভয়ংকর দিনে পরিণত হবে। শত-সহস্র গুন দুঃখ, দৈন্য, পেরেশানী ও লাঞ্ছনা সেই দিন মানুষকে ঘিরে ফেলবে।

বিচারের দিন এ অবিশ্বাস্য রকমের প্রশস্ততাকে যতই পৃথিবীর মানবমণ্ডলী মিথ্যা, অসম্ভব ও কাল্পনিক আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করুক না কেন সময়ের আবর্তনে তা একদিন মানুষের সামনে এসে দাঁড়াবেই এবং ওর নিদর্শন দুনিয়ার মানুষের সামনে পূর্বেই আল্লাহ্ অবশ্যই বাস্তবতার আলোকে পেশ করবেন-ই। তখন তাদের উপায় কি হবে? প্রকৃত রহস্য না বুঝার কারণে এ রকম ঘটতে পারে না, একথা বললেই কি তারা পার পেয়ে যাবে? আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর নিদর্শন সহসাই পেশ করবেন, তখন আর তারা অস্বীকার করতে পারবে না, যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে।

এবার বিষয়টিকে চলুন বিজ্ঞানের ঘরে নিয়ে যাই!

বিজ্ঞান

বর্তমান বিজ্ঞান বিগত বিংশ শতাব্দিতে বলতে গেলে বিশ্বব্যাপী আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। মহাবিশ্বের প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই অংগুলি হেলাবার সুযোগ পেয়েছিল। অবশ্য এখনো সে ধারা অব্যাহত আছে। আর সেই সুযোগে আমাদের নিজস্ব সৌরজগতে আবিষ্কৃত নয়টি গ্রহসহ উপগ্রহদেরও দিন-রাত্রির স্থানীয় পরিমাণ এবং বৎসরের হিসেব ভিন্ন ভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক মাত্রায় উদ্‌ঘাটন করে একেবারে সরাসরি টেবিলের ওপর পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছে। যা ভাবতে গেলে সত্যি সত্যি অবাক না হয়ে পারা যায় না। বিজ্ঞানের সরবরাহকৃত এই নির্ভুল চার্টটি মহাকাশ বিজ্ঞানের অনেক অজানা তথ্য এবং অনেক জটিল প্রশ্নের অসংখ্য উত্তর আমাদের জ্ঞানরাজ্যে পৌঁছে দিয়ে আমাদেরকে বস্তুজগত এবং পরজগতের অনেক বিষয়েরই স্পষ্ট ধারণা দিয়ে গেছে।

বিজ্ঞানের অবদানে আমাদের সূর্যসহ সৌরজগতে আবিষ্কৃত মোট ৯টি গ্রহ ও চাঁদের দিন-রাত্রির এবং বৎসরের হিসেবসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও এবার পর্যায়ক্রমে লক্ষ্য করুন। এতে কুরআনের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

মানব সমাজে যাঁরা প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানী তাঁরা দিবালোকের আলোর মত স্পষ্টভাবে দেখতে পারেন কুরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো মহাসত্যতার দৃঢ় আসনে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। যদিও বিজ্ঞানের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআন মানব সমাজে অবতীর্ণ হয়েছে।

নিরপেক্ষ মন-মানসিকতাসম্পন্ন জ্ঞানীজনের জন্য এ বিষয়গুলো মণি-মুক্তা সমতুল্য, যা তাঁরা কখন-ই হারাতে রাজী নন। চলুন তাহলে!

আমরা এক এক করে নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ যা যা আমাদের পর্যবেক্ষণের আওতায় আছে, তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন দিবা-রাত্রির সময়ের বাস্তব পরিমাণ জানার চেষ্টা করি।

"সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। (৩৯ ঃ ৫)
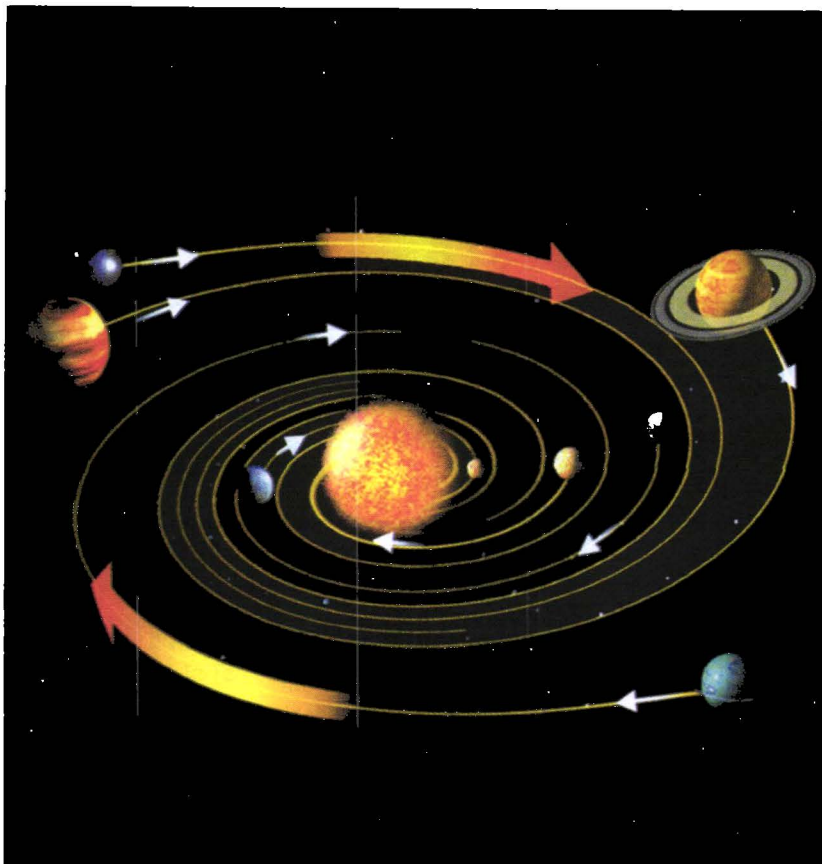
চিত্র-৩২

– আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট এ মহাবিশ্বে গ্যালাক্সির পরেই কাঠামোগত বড় মহাজাগতিক বস্তু হচ্ছে নক্ষত্রসমূহ। এরপর অবস্থান হচ্ছে পর্যায়ক্রমে গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানু, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড, ইত্যাদির। মহাজাগতিক উল্লেখিত কোন বস্তুই স্থির নেই। সবাই নিজ নিজ আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির হিসেবে ভাসমান এবং চলমান। আল্লাহ্ স্রষ্টা হিসেবে নিজ ইচ্ছামত যাকে যেভাবে কক্ষপথে স্থাপন করেছেন, সে ঠিক সেভাবেই পরিভ্রমণ করছে। সবারই স্থানীয় সময় ও গতি ভিন্ন-ভিন্ন তথা আপেক্ষিক।

"তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং ওদের গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসেব জানতে পার। আল্লাহ্ এগুলো নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ সমস্ত বাস্তব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।" (১০ : ৫)
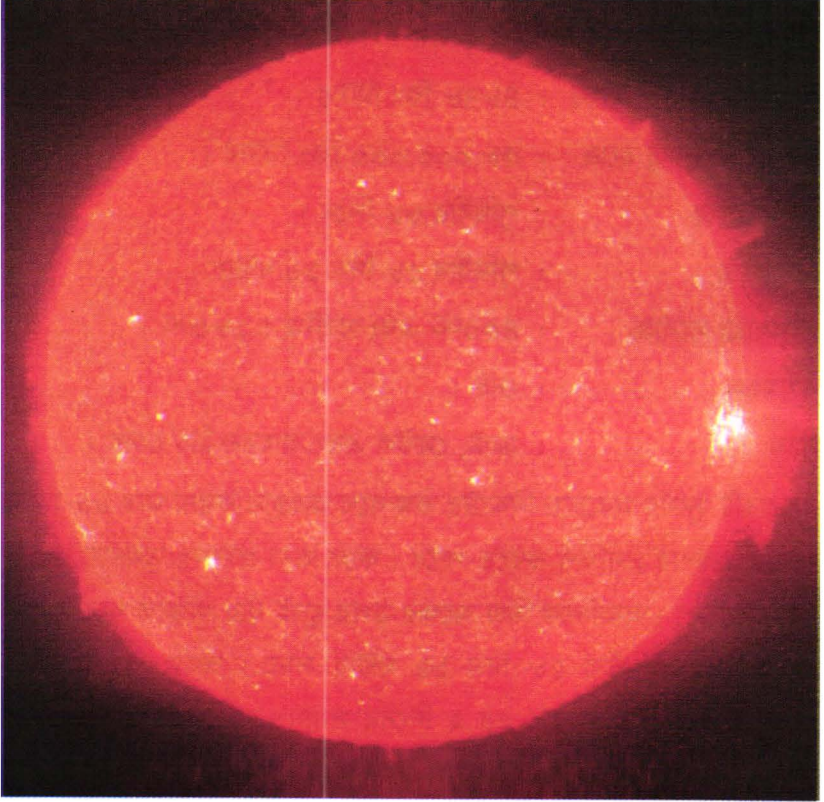
চিত্র-৩৩

– আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্র হচ্ছে সূর্য, প্রায় ৮৬ লক্ষ মাইল ব্যাস সম্পন্ন। বিশাল বস্তু পিণ্ডটির সমগ্র সৌর পরিবারে ব্যাপক প্রভাব থাকার পরও 'স্থান এবং কাল' এর মান সবার পৃথক পৃথক অর্থাৎ আপেক্ষিক। এর কারণ হচ্ছে– আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পরিকল্পনার আলোকে এদেরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। অতএব মানুষ কিভাবে সেই মহান প্রভুকে অস্বীকার করবে?

বুধ (MARCURY)

'বুধ' গ্রহটি আমাদের সূর্য নামক নক্ষত্রের সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ। দেখতে অনেকটা আমাদের চাঁদের মতই অসংখ্য মহাজাগতিক বস্তুর আঘাতজনিত ক্ষতচিহ্ন বুকে ধারণ করে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করে চলেছে। এর দিন এবং বৎসরের হিসেব বড়ই অদ্ভুত প্রকৃতির।

'বুধ' গ্রহের ব্যাস হচ্ছে	: ৪৮৭৮ কিঃ মিটার।
সূর্য থেকে দূরত্ব হচ্ছে	: ৫৮,০০০,০০০ কিঃ মিটার।
বৎসর হচ্ছে	: পৃথিবীর ৮৮ দিনে।
দিন হচ্ছে	: পৃথিবীর ৫৮ দিন ১৬ ঘণ্টায়।
তাপমাত্রা সর্বোচ্চ	: ৪৫০^{0}C এবং সর্বনিম্ন ঃ ১৮৩^{0}C।
বায়ুমণ্ডল	: নেই।
গঠন	: ক্রাষ্ট, মেন্টল এবং আয়রন রীচ কোর।

বুধ গ্রহটি সূর্যের সবচেয়ে নিকটের কক্ষপথে অবস্থান করায় মাত্র ৮৮ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পারে। ফলে অন্য গ্রহদের তুলনায় বৎসর খুবই সংক্ষিপ্ত। অন্যদিকে নিজ অক্ষের উপর খুবই ধীর গতিতে ঘুরে বিধায় ওর ১ দিন পৃথিবীর ৫৮ দিন ১৬ ঘণ্টার সময়। অর্থাৎ আপেক্ষিতার বিচিত্রতায় গ্রহটির বৎসরে ওর ২ দিনের সমানও নয়। মাত্র ১$\frac{১}{২}$ দিনের চেয়ে কিছুটা বেশী। এভাবে সমগ্র মহাবিশ্বেই অগণিত বিস্ময়কর বিষয় বর্তমান বিজ্ঞানের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হচ্ছে।

"অবিশ্বাসীরাই আল্লাহর (পক্ষ থেকে সাজানো ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে উদঘাটিত) নিদর্শনসমূহ (বাস্তব চর্ম চক্ষু দিয়ে দর্শন লাভ করেও সে) সম্বন্ধে বিতর্ক করে। সুতরাং দেশে দেশে (এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে) তাদের অবাধ বিচরণ (ও সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স এবং একতরফা বিজ্ঞান মেলা) যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে (সাবধান থেকো)।" (৪০ ঃ ৪)
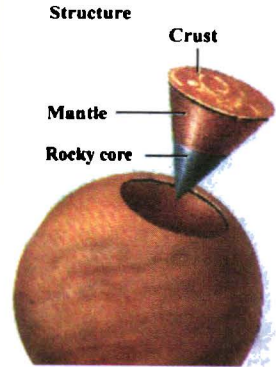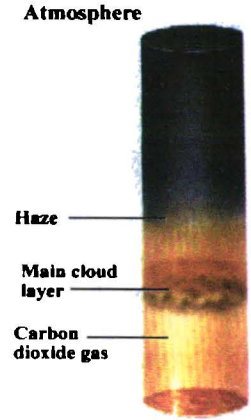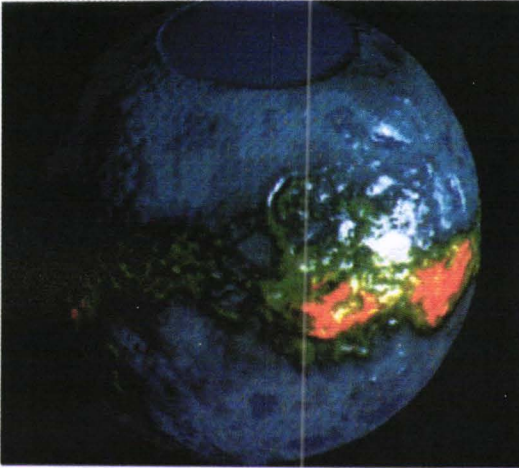
চিত্র-৩৪

– সূর্যের একেবারে নিকটতম প্রতিবেশী 'বুধ' গ্রহটিকে আল্লাহ্ পাক এমনভাবে কক্ষপথে সংস্থাপন করেছেন যে, তার প্রায় দেড় দিনেই এক বৎসর পূর্ণ হয়ে যায়। কি বিচিত্র আল্লাহর এ সৃষ্টি জগত। মানুষ ইচ্ছা করেও এর মাঝে কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়। সত্য নয় কী?

শুক্র গ্রহ (VENUS)

আমরা কখনো কখনো পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়ার পর আবার কখনো কখনো ভোরের আকাশে সূর্য উদয়ের পূর্বে তারার মত যে বস্তুটিকে খুবই উজ্জ্বলতার সাথে দেখতে পাই, ওটাই 'শুক্র' গ্রহ। ওর ঐ উজ্জ্বলতার প্রথম কারণ হলো– গ্রহটি আমাদের পৃথিবীর খুবই নিকটবর্তী। দ্বিতীয় কারণ হলো– শুক্র গ্রহটি সর্বদা সাদা মেঘে ঢাকা থাকে বলে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে উজ্জ্বল দেখায়। গ্রহটি আকারে প্রায় পৃথিবীর সমান। শুনতে অবাক লাগলেও সত্য যে ওর বৎসরের চেয়ে দিন বড়।

'শুক্র' গ্রহের ব্যাস হচ্ছে	:	১২,১০৪ কিঃ মিটার।
সূর্য থেকে দূরত্ব হচ্ছে	:	১০৮,০০০,০০০ কিঃ মিটার।
বৎসর হচ্ছে	:	পৃথিবীর ২২৪ দিন ১৭ ঘণ্টায়।
দিন হচ্ছে	:	পৃথিবীর ২৪৩ দিন ৪ ঘণ্টায়।
তাপমাত্রা	:	সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন গড়ে ৪৮০°C।
চাঁদ/ উপগ্রহ	:	নেই।
বায়ুমণ্ডল	:	আছে, হেজ (hage), মেঘের স্তর এবং মূলতঃ কার্বনডাই অক্সাইড দিয়ে ভরপুর।
গঠন	:	ক্রাষ্ট, (Crust), মেন্টল (Mantle) এবং রকি কোর (Rocky core) দিয়ে গঠিত।

আমাদের সৌরজগতে ব্যতিক্রমধর্মী ও অবিশ্বাস্য ঘটনা হচ্ছে শুক্র, গ্রহের বৎসর এবং দিনের হিসাব। এ গ্রহের বৎসরের চেয়ে দিন বড়, কারণ হচ্ছে গ্রহটি নিজ অক্ষের উপর পূর্ণ এক ঘূর্ণন সম্পন্ন করার পূর্বেই সূর্যের চতুর্দিকে পূর্ণ এক ঘূর্ণন সম্পন্ন করে ফেলে। বিষয়টি বিস্ময়কর নয় কী?

"আমি তো মানুষের জন্য এ কুরআনে সর্বপ্রকার (ভূ-মণ্ডল, নভোমণ্ডল, মহাশূন্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার বাস্তব বর্ণনাসহ) দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তুমি যদি ওদের নিকট কোন নিদর্শন (তাদের বোধগম্য হয় এমন সৃষ্টি ও তাদের কর্মকাণ্ড এবং এসবের ভেতর দিয়ে একমাত্র আল্লাহকে দর্শন লাভ করা যায় এমন কিছু) উপস্থিত কর, তাহলে অবিশ্বাসীরা অবশ্যই (তাদের অন্তরের ব্যাধি এবং সংকীর্ণতার কারণে প্রকৃত সত্যের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে সাথে সাথেই) বলবে, তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী।" (৩০ ঃ ৫৮)
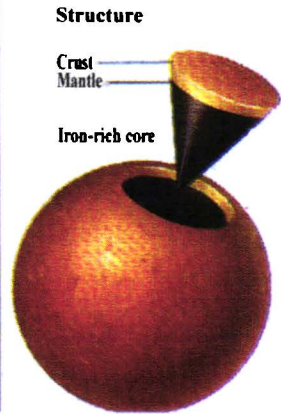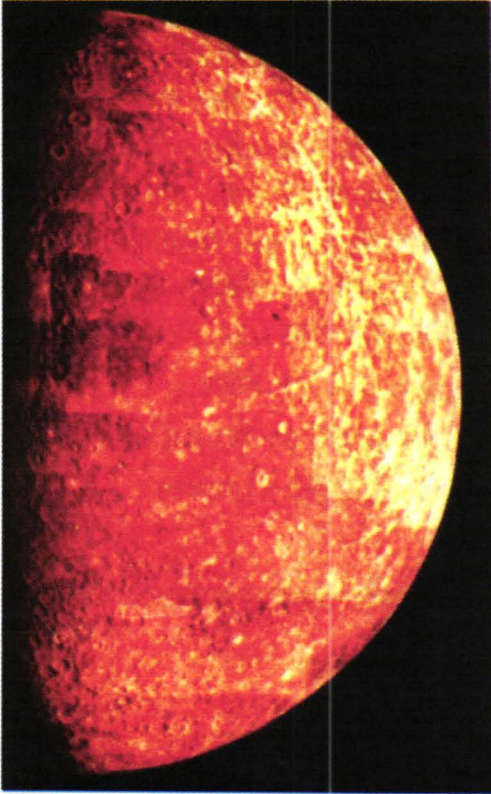
চিত্র-৩৫

– দেখুন তো! এর বৎসরের চেয়ে দিন বড়। মূলতঃ আল্লাহ্ যা চান, তা-ই হয়ে থাকে। নিরপেক্ষ মনের অধিকারী ও সত্য-সঠিক জ্ঞান অন্বেষণকারী, অবশ্যই এক মহাসত্য 'আল্লাহ্' এবং তাঁর 'সত্য বাণীকে' জ্ঞানের মাধ্যমে মেনে নিতে বাধ্য। মহাবিশ্বব্যাপী এই আপেক্ষিকতার স্রষ্টা হচ্ছেন– এক আল্লাহ্। মানুষ কখনই এ কাজ করতে পারে না।

পৃথিবী (EARTH)

আমাদের এই সুন্দর জীবনময় গ্রহটি সূর্যের দিক থেকে গণনায় তৃতীয় স্থানে আছে। আবিষ্কৃত সর্বমোট ৯টি গ্রহের মধ্যে একমাত্র আমাদের এই পৃথিবীতেই জীবনের স্পন্দন এবং চারন বিরাজমান আছে। এর জলে-স্থলে এবং আকাশে লক্ষ লক্ষ ধরনের প্রাণ তাদের লাইফ সাইকেল নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে। জীব জগত, উদ্ভিদ জগত এবং প্রাণী জগতের সমারোহে গ্রহটি সদা মুখরিত। এর পৃষ্ঠদেশ ঘনসবুজ এবং নীলের সংমিশ্রণে এত বর্ণনাতীত সৌন্দর্যে লীলায়িত যে তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন বৈ কি!

পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ঋতুর পরিবর্তন যেন তার পৃষ্ঠদেশের সকল প্রকার প্রাণের জন্য এক স্বর্গীয় আমেজে পরশ বুলিয়ে যায়। এর 'চাঁদ' নামক উপগ্রহটি প্রতি মাসেই একবার করে মৃদু আলতো আলোর পরশ দিয়ে গ্রহটিকে নববধূতে সাজিয়ে যায়। রং-বেরং-এর পরিবেশ দিয়ে অতুলনীয় ভাবে সাজানো আমাদের এই পৃথিবীর ব্যাস হচ্ছে : ১২,৭৫৬ কিঃ মিটার।

সূর্য থেকে দূরত্ব হচ্ছে	:	১৪৯,৬০০,০০০ কিঃ মিটার।
বৎসর হচ্ছে	:	৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৪৮ মিঃ ৪৭ সেকেণ্ডে।
দিন হচ্ছে	:	২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে।
চাঁদ	:	১টি।
বায়ুমণ্ডল	:	আছে, পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রায় ৬০০ কিঃ মিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত।
তাপমাত্রা সর্বোচ্চ	:	১০৪^{O}F।
গঠন	:	ক্রাষ্ট (Crust), মেন্টল (Mantle) এবং ইনার কোর দ্বারা গঠিত।

অদ্যবদি আবিষ্কৃত কোন গ্রহের সাথেই এ পৃথিবীর দিন এবং বৎসরের হিসাব হুবহু একই রকম হচ্ছে না মহাবিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত আপেক্ষিকতার কারণে। আপেক্ষিকতা এক বাস্তব সত্য ঘটনা। এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের সর্বত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

"তাদের প্রতিপালকের (উপস্থিতি এবং তাঁর কর্ম তৎপরতা সম্পন্ন) নিদর্শনাবলীর এমন কোন নিদর্শন তাদের নিকট উপস্থিত হয়নি (যার ভেতর দিয়ে স্রষ্টাকে দেখা যায়), তা থেকে তারা মুখ ফিরায়নি!" (৬ ঃ ৪)
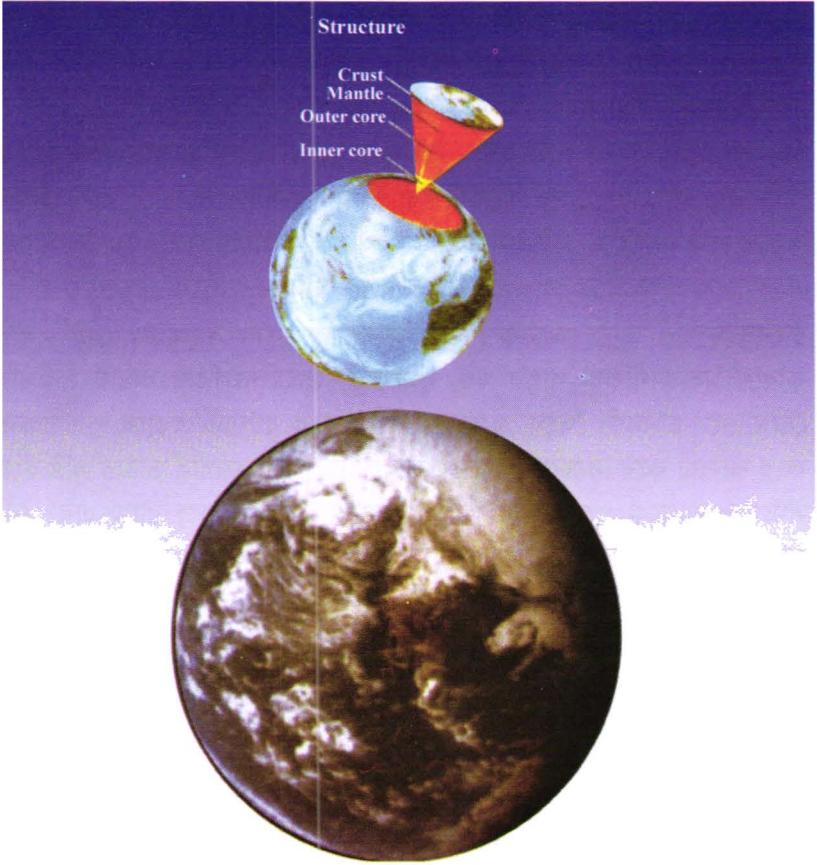
চিত্র-৩৬

– একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্ই আমাদের পৃথিবীর আহ্নিক গতি ২৪ ঘণ্টায় এবং বার্ষিক গতি ৩৬৫ দিনে বেঁধে দিয়েছেন আমাদের আবাসযোগ্যতাকে স্বাচ্ছন্দ করে তোলার জন্য। যদি তিনি আহ্নিক গতিকে ১০০০ ঘণ্টায় এবং বার্ষিক গতিকে ৫০০০ দিনে সেট আপ করে দিতেন, তাহলে তা-ই কার্যকরী হত, আমাদের কিছুই করার থাকতো না। মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। কেননা আল্লাহর বিধান অপরিবর্তনীয়, অলঙ্ঘনীয়। এতে কোন আল্লাহ্র কর্তৃত্ব কি ফুটে উঠেনি?

চাঁদ (MOON)

চাঁদ আমাদের এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপগ্রহ। আকৃতিতে চাঁদ পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ সমান। চাঁদ প্রতি মাসে একবার করে আমাদের গ্রহের চারদিকে ঘুরে আসে। আবার নিজ অক্ষের ওপরও চাঁদ প্রতি মাসে একপাক ঘুরতে পারে মাত্র। যার কারণে পৃথিবী থেকে আমরা সবসময় চাঁদের এক দিক-ই দর্শন করে থাকি, অপর দিক (পৃষ্ঠ) দেখতে পাই না।

চাঁদ আমাদের উত্তম প্রতিবেশী। অন্ধকার রাতে কালো গুমোট পরিবেশকে মিষ্টি আলোর মাধ্যমে দূর করে বিশ্বব্যাপী মানব সমাজের ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যদিওবা তার নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলো গ্রহণ করে পরবর্তীতে তা প্রতিফলিত করে আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

চাঁদের দুঃখও আছে অনেক। তার চারদিকে কোন বায়ুমণ্ডল নেই। যার কারণে মহাজাগতিক পাথর খণ্ড, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড বিনা বাধায় সরাসরি নেমে এসে চানমারি খেলে খেলে ওর পৃষ্ঠদেশকে বর্ণনাতীতভাবে ক্ষতবিক্ষত করে ঝাঁজরা করে দিয়েছে। চাঁদের কারণে ভূ-পৃষ্ঠে জোয়ার ভাটার সৃষ্টি হয়ে সমগ্র ভূ-ভাগকে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করে সতেজ রাখে এবং নৌ পরিবহনে বর্ণনাতীত কল্যাণ সাধন করে থাকে। চাঁদের পিঠে কালো বিরাট-বিরাট গর্তগুলো 'মৃত সাগর' যা সৃষ্টি হয়েছে বৃহৎ-বৃহৎ পাথরের আঘাতে। এখন ঐ গর্তগুলোতে কোন পানি নেই। আছে জমাটবদ্ধ কঠিন লাভা। উক্ত গর্তগুলোর কোন কোনটি প্রায় ১০০০ মাইল ব্যাস সম্পন্ন।

চাঁদের ব্যাস হচ্ছে	:	৩৪৭৬ কিঃ মিটার।
পৃথিবী থেকে দূরত্ব হচ্ছে	:	৩৮৪০০০ কিঃ মিটার।
পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসে	:	২৭ দিন ৮ ঘণ্টায়।
নিজ অক্ষের ওপরও একবার ঘুরে	:	২৭ দিন ৮ ঘণ্টায়।
তাপমাত্রা সর্বোচ্চ	:	১২০°C।
তাপমাত্রা সর্বনিম্ন	:	-১৬০°C।
বায়ুমণ্ডল	:	নেই।
গঠন	:	ক্রাষ্ট, মেন্টল এবং আয়রন

"সূর্য ও চন্দ্র (একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত) গণনায় নিয়ন্ত্রিত রয়েছে।" (৫৫ : ৪)
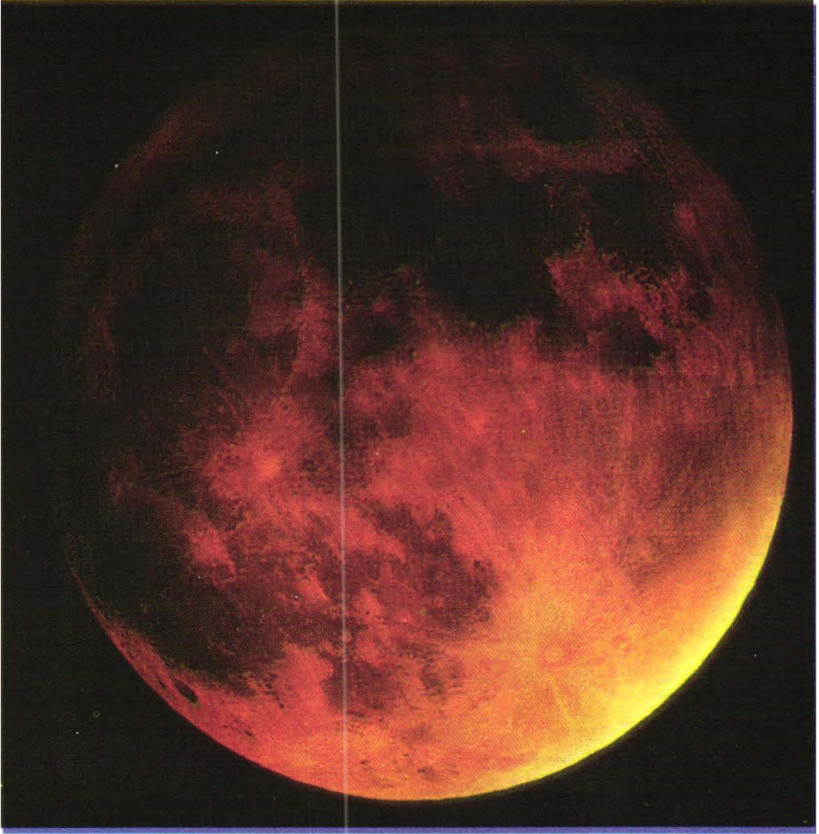
চিত্র-৩৭

– চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী থেকে আমরা চাঁদের একটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠদেশকেই সবসময় দেখতে পাই। এর কারণ হচ্ছে– চাঁদ তার অক্ষের ওপর পূর্ণ একটি ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে সময় নেয় পৃথিবীর হিসেবে ২৭$\frac{১}{২}$ দিন। আবার পৃথিবীর চারদিকেও একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় ২৭$\frac{১}{২}$ দিন। আমরা ইচ্ছা করলেও এর ব্যতিক্রম ঘটাতে পারবো না। এখানেই এক আল্লাহ্‌র কৃতিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি যাকে যে গতি দান করেছেন, সে সেই নির্দিষ্ট গতিতেই নিয়মিত পরিভ্রমণ করে যাচ্ছে এবং যাবে। আল্লাহ মহান নয় কী? তাই তাঁকে অস্বীকার করা মানেই মূর্খতা প্রকাশ করা।

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে (যেগুলোর মাধ্যমে একজন মহান স্রষ্টাকে চিহ্নিত করতে উদ্ভাবিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটন যথেষ্ট), তারা এ সমস্ত (জ্ঞানগর্ভ নিদর্শন) প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি (উদভ্রান্তের ন্যায়) উদাসীন।" (১২ ঃ ১০৫)
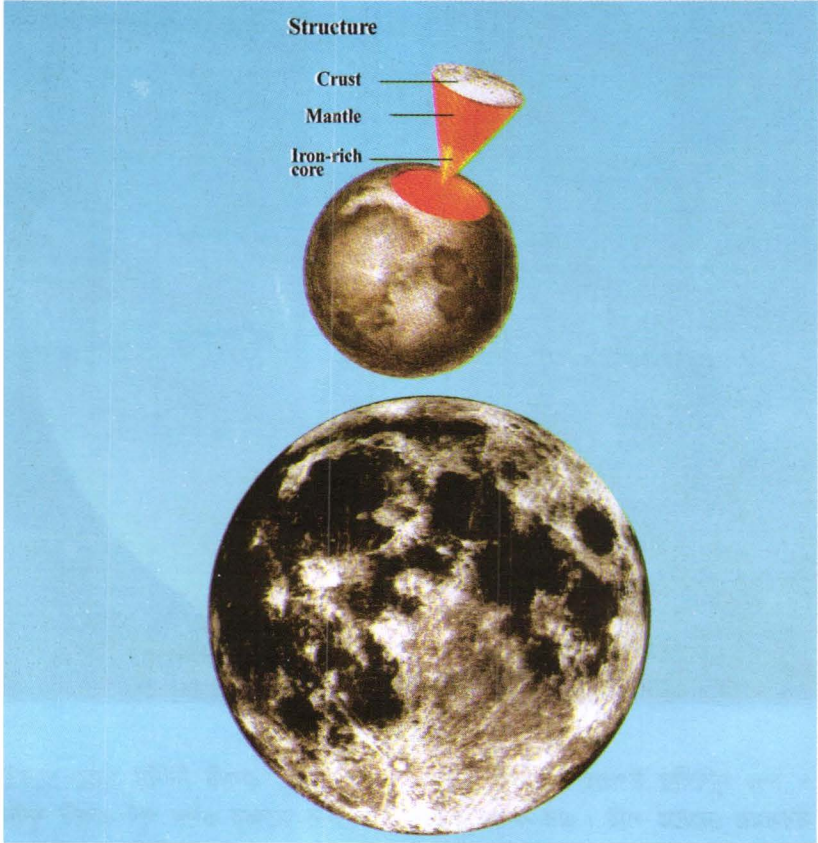
চিত্র-৩৮

– পৃথিবীবাসী চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলেও বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে যে কোন মহাজাগতিক বস্তু বা জগতকে তার অক্ষের ওপর পূর্ণ একটি ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে পৃথিবীর হিসেবে যদি ৫০,০০০ বৎসরের সমান 'সময়' নির্ধারণ করে দেন, তাহলে তা-ই কার্যকর হতে বাধ্য। আমাদের চতুর্দিকে এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। এটা খুবই সম্ভব। সুতরাং আল্লাহ্‌র উপস্থিতি স্পষ্ট।

মঙ্গল গ্রহ (MARS)

'শুক্র' গ্রহের পরে পৃথিবীর নিকটবর্তী দ্বিতীয় গ্রহটি হচ্ছে 'মঙ্গল গ্রহ' (Red Planet 'Mars'), এই গ্রহটিও আকৃতিতে প্রায় পৃথিবীর কাছাকাছি। মঙ্গল গ্রহের দু'টি চাঁদ (উপগ্রহ) আছে। প্রথম প্রথম পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানীগণ অনুমান করছিলেন যে, হয়তোবা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পরিবেশের কারণে জীব এবং প্রাণের অস্তিত্ব মঙ্গলে খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে এখনও পর্যন্ত সেখানে জীবন্ত কোন প্রাণের অস্থিত্ব উদ্ঘাটন করতে পারেনি। তবে হাল ছাড়েনি, নতুন উদ্যোগে দ্বিগুন উৎসাহে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দির শুরুতেই মানুষ পৃথিবীর মাটি থেকে স্বশরীরে Space Ship-এ করে মঙ্গলে পৌঁছে মানুষের পদচিহ্ন মঙ্গলের মাটিতে অঙ্কিত করার চেষ্টায় এখন পুরোদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'মঙ্গল' গ্রহের ব্যাস হচ্ছে	:	৬৭৯৪ কিঃ মিটার।
সূর্য থেকে দূরত্ব হচ্ছে	:	২২৭,৯০০,০০০ কিঃ মিটার।
বৎসর হচ্ছে	:	পৃথিবীর ৬৮৭ দিনে।
দিন হচ্ছে	:	পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে।
তাপমাত্রা	:	গড়ে ২৩^{OC}।
চাঁদ	:	২টি (Phobos এবং Deimos)।
বায়ুমণ্ডল	:	আছে, পুরোটাই কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস এবং সামান্য পরিমাণে ধূলা-বালি তাতে মিশ্রিত আছে।
গঠন	:	ক্রাষ্ট (Crust), মেন্টল (Mantle) এবং রকি কোর (Rocky core) দিয়ে গঠিত।

এই লাল গ্রহ মঙ্গলে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর ৬৮৭ দিনে ১ বৎসর এবং ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে ১ দিন সম্পন্ন হচ্ছে। এ হিসাবটি অন্য কোন গ্রহের সাথে হুবহু মিলছে না।

"তিনি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে তাঁর (বাস্তব উপস্থিতির জ্ঞানময়) নিদর্শন দেখায়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?" (৪০ ঃ ৮১)
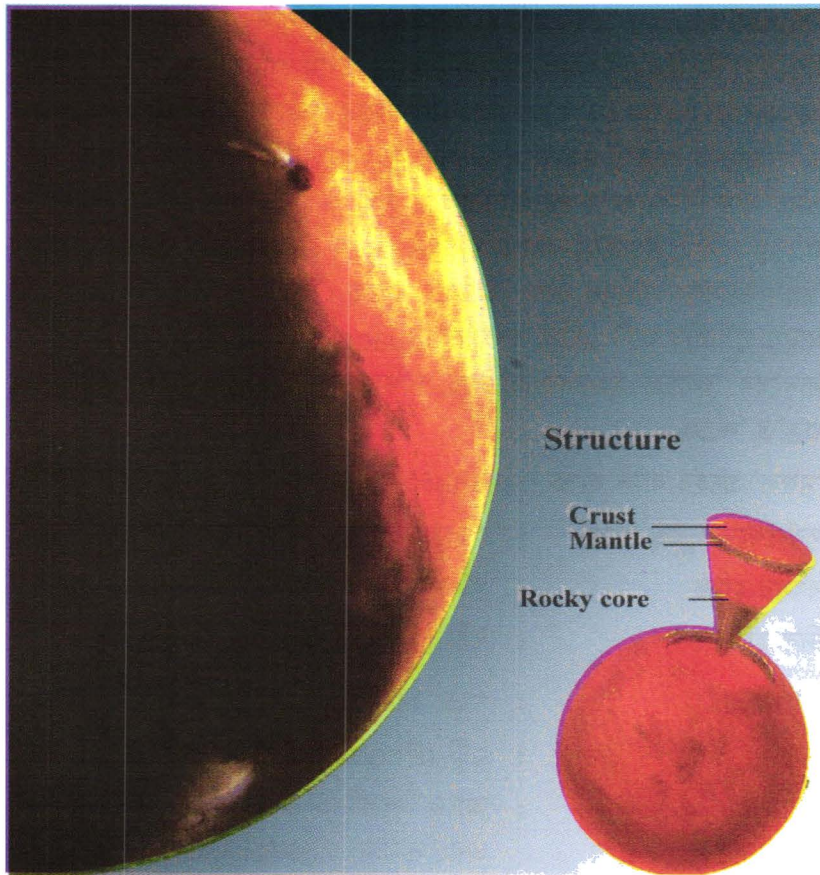
চিত্র-৩৯

– ছবিতে মঙ্গল গ্রহকে দেখা যাচ্ছে। গ্রহটি আকৃতিতে এবং আহ্নিক গতিতে প্রায় পৃথিবীর সমান হলেও ওর বার্ষিক গতি পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুন। এর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্রষ্টা চেয়েছেন এবং সেভাবে সেট আপ করেছেন। তিনি যাকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সে সেভাবেই চলতে বাধ্য। পৃথিবীর সকল মানুষ একযোগে চেষ্টা করলেও এর কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটানো সম্ভব নয়। অতএব বিনাবাক্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব মেনে নেয়া উচিত। তাতেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।

বৃহস্পতি গ্রহ (JUPITER)

'বৃহস্পতি'কে গ্রহরাজ বলা হয়, তার বৃহত্তর গঠনাকৃতির জন্য। প্রায় গড়ে ১৩০০ পৃথিবীর সমান আয়তন সম্পন্ন 'বৃহস্পতি' গ্রহ। 'মঙ্গল' গ্রহের পরেই বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থান। 'বৃহস্পতি' গ্রহ বৃহদাকার হাইড্রোজেন গ্যাসের বল বৈ-কি। আমাদের সৌরজগতের সকল গ্রহকে একত্রিত করলে সামষ্টিক আয়তন যত বড় হবে, 'বৃহস্পতি' গ্রহ একাই সেই আয়তনের দুইশত গুন বড় একটা গ্যাসীয় বল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, যদি কোন প্রকারে 'বৃহস্পতি' গ্রহের কেন্দ্রে 'পারমানবিক চুল্লী' চালু হতে পারতো তাহলে ওটা গ্রহ না হয়ে নক্ষত্রে রূপ নিত। বৃহস্পতি গ্রহ একাই ১৬টি উপগ্রহকে (চাঁদকে) তার চতুর্দিকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছে।

'বৃহস্পতির' গ্রহের ব্যাস হচ্ছে	:	১৪২,৮০০ কিঃ মিটার।
সূর্য থেকে দূরত্ব হচ্ছে	:	৭৭৮,৩০০,০০০ কিঃ মিটার।
বৎসর হচ্ছে	:	পৃথিবীর ১১ বৎসর ১০ মাসে।
দিন হচ্ছে	:	পৃথিবীর ০৯ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে।
তাপমাত্রা	:	গড়ে–১৫০^{o}C।
বায়ুমণ্ডল	:	আছে, হাইড্রোজেন গ্যাস, এ্যামোনিয়া, এ্যামোনিয়া সালফাইড, ওয়াটার আইস ক্লাউড্ড ইত্যাদি দিয়ে গঠিত।
চাঁদ	:	সর্বমোট ১৬টি।
গঠন	:	লিকুইড হাইড্রোজেন, লিকুইড মেটালিক হাইড্রোজেন এবং রকি কোর দ্বারা গঠিত।

বৃহস্পতি গ্রহের বেলায় আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পৃথিবীর ১১ বৎসর ১০ মাসে সেখানে মাত্র ১ বৎসর পূর্ণ হচ্ছে। আবার পৃথিবীর ০৯ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে বৃহস্পতি গ্রহে ১ দিন পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যা আবিষ্কৃত কোন গ্রহের সাথে মিল নেই।

"আমি (আমাকে প্রকাশিত করার জন্য এবং আমার কাজের নজির তুলে ধরার জন্য) সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি (তবুও কেন মানুষ তা উপলব্ধি করে না?)। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।" (২৪ ঃ ৪৬)
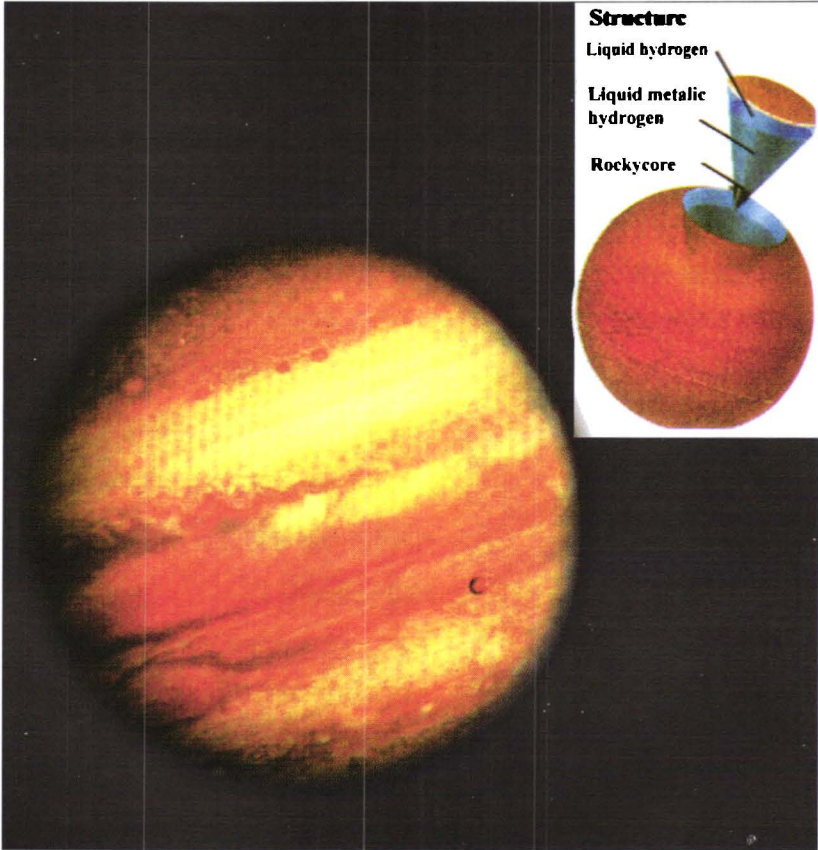
চিত্র-৪০

– সৌরজগতে গ্রহরাজ হিসেবে পরিচিত বৃহস্পতি গ্রহকে দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর চাইতে প্রায় ১৩০০ গুন বড় হওয়ার পরও এর আহ্নিক গতির মান প্রায় ১০ ঘন্টার মত। ওর বার্ষিক গতি কিন্তু প্রায় ১২ বৎসরের সমান। স্রষ্টা ওর সৃষ্টির সময় উক্ত গতি বেঁধে দিয়েছেন, তাই ওর এ অবস্থা। এ গতি সে মেনে চলতে বাধ্য। মানব সমাজ এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে কখনই সক্ষম হবে না। তাহলে আল্লাহ্কে অস্বীকার কেন?

শনি গ্রহ (SATURN)

আমাদের সৌরজগতে গ্রহ রাজ 'বৃহস্পতির' পরেই আয়তনের দিক হতে দ্বিতীয় বড় গ্রহ হচ্ছে- 'শনি'। তরল গ্যাসের জমানো বল বিধায় ওজনে তুলনামূলক হাল্কা। ওর চতুর্দিকে ভাসমান পাথরের বেল্ট থাকায় দেখতে বড়ই চমৎকার হলেও ওর পৃষ্ঠ দেশের বায়ুমণ্ডলে বাতাস ঘণ্টায় প্রায় ১৮০০ কিঃ মিটার বেগে ধাবিত হওয়ার কারণে সর্বত্র হ্যারিক্যান (তুফান) লেগেই থাকে।

'শনি' গ্রহের ব্যাস হচ্ছে	:	১২০,০০০ কিঃ মিটার।
সূর্য থেকে দূরত্ব হচ্ছে	:	১৪২৭,০০০,০০০ কিঃ মিটার।
বৎসর হচ্ছে	:	পৃথিবীর হিসেবে ২৯ বৎসরে।
দিন হচ্ছে	:	পৃথিবীর হিসেবে ১০ ঘণ্টা ২৯ মিনিটে।
চাঁদ	:	সর্বমোট ২২ টি।
তাপমাত্রা	:	গড়ে- ১৮০^{0}C।
বায়ুমণ্ডল	:	আছে, এ্যামোনিয়া হেজ, এ্যামোনিয়া আইস ক্লাউড, এ্যামোনিয়া সালফাইড ক্লাউড ও ওয়াটার আইস ক্লাউড ইত্যাদি দিয়ে গঠিত।
গঠন	:	লিকুইড হাইড্রোজেন, লিকুইড মেটালিক হাইড্রোজেন এবং মেটালিক কোর দ্বারা গঠিত।

এখানে শনি গ্রহের বেলায় দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর ২৯ বৎসরে শনি গ্রহের ১ বৎসর। আবার পৃথিবীর মাত্র ১০ ঘণ্টা সময়ে শনি গ্রহে ১ দিন পূর্ণ হয়ে যায়। কারণ গ্রহটি নিজ অক্ষের উপর খুবই দ্রুত গতিতে ঘুরছে। স্থানী-য়ভাবে ঘটে চলা এ জাতীয় বিভিন্নতাই হচ্ছে আপেক্ষিকতা।

"মানুষের জন্য আমি এ সকল (জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ ও বিস্ময়কর) দৃষ্টান্ত তুলে ধরি, কিন্তু কেবল সত্যিকার জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এ সকল নিদর্শন উপলব্ধি করে থাকে।" (২৯ ঃ ৪৩)
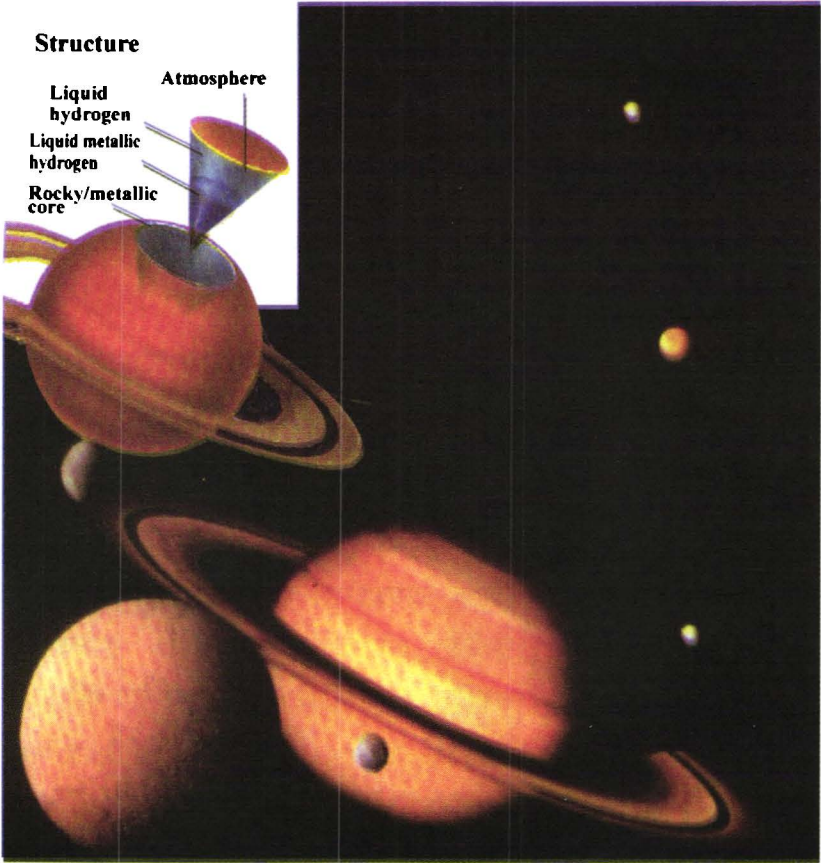
চিত্র-৪১

– ছবিতে শনি গ্রহকে তার উপগ্রহ সহ দেখা যাচ্ছে, মহাবিশ্বে সর্বত্র আপেক্ষিকতার কারণে উক্ত গ্রহটিও অন্যান্য গ্রহের তুলনায় ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করে চলেছে। স্রষ্টা একে যে গতি দিয়ে একবার চালিয়ে দিয়েছেন, সে তার ব্যতিক্রম ঘটাচ্ছে না। এ সকল বাস্তব নিদর্শন দেখার পরও কেন মানুষ আল্লাহ্‌কে মেনে নিচ্ছে না? সত্যকে অস্বীকার করা জ্ঞানীদের জন্য অনুচিত।

ইউরেনাস (URANUS)

এ গ্রহটিও গ্যাস এবং তরল গ্যাস দিয়ে তৈরী। 'ইউরেনাসের' প্রায় ১৮টির মত চাঁদ (উপগ্রহ) আছে। গ্রহটিকে দেখতে হাল্‌কা নীল বলের মত মনে হয়। বিজ্ঞানী William Hersshel ১৩ই মার্চ ১৭৮১ সালে 'ইউরেনাস' গ্রহটি আবিষ্কার করেন।

ইউরেনাস গ্রহের ব্যাস হচ্ছে	:	৫১,৮০০ কিঃ মিটার।
সূর্য থেকে দূরত্ব হচ্ছে	:	২৮৬৯,৬০০,০০০ কিঃ মিটার।
বৎসর হচ্ছে	:	পৃথিবীর হিসেবে ৮৪ বৎসরে প্রায় ।
দিন হচ্ছে	:	পৃথিবীর হিসেবে ১৭ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে।
চাঁদ	:	প্রায় ১৮টি।
তাপমাত্রা	:	গড়ে- ২১৪oC।
বায়ুমণ্ডল	:	আছে, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং মিথেন গ্যাস দিয়ে গঠিত।
গঠন	:	ওয়াটার, এ্যামোনিয়া ওশান (Ammonia Ocean) এবং আয়রন কোর দিয়ে গঠিত।

'ইউরেনাস' গ্রহের বেলায়ও দেখা যাচ্ছে দিন ও বৎসরের হিসাব পৃথিবীর সাথে বড় ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এর ১ বৎসর পৃথিবীর ৮৪ বৎসরের সমান। অর্থাৎ সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে গ্রহটির ৮৪ বৎসর সময় লাগছে। কিন্তু খুবই দ্রুত গতিতে নিজ অক্ষের উপর ঘুরায় মাত্র ১৭ ঘণ্টায় ১ দিন পূর্ণ করে ফেলছে। আপেক্ষিকতাই এ রহস্যের মূল। মহাবিশ্বে প্রতিটি বস্তুই আপেক্ষিকতার বাঁধনে আবদ্ধ।

"যারা তাদের প্রতিপালকের (স্পষ্ট ও জ্ঞানপূর্ণ) নিদর্শনাবলী (অযৌক্তিকভাবে) প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় কঠিন শাস্তি।" (৪৫ ঃ ১১)
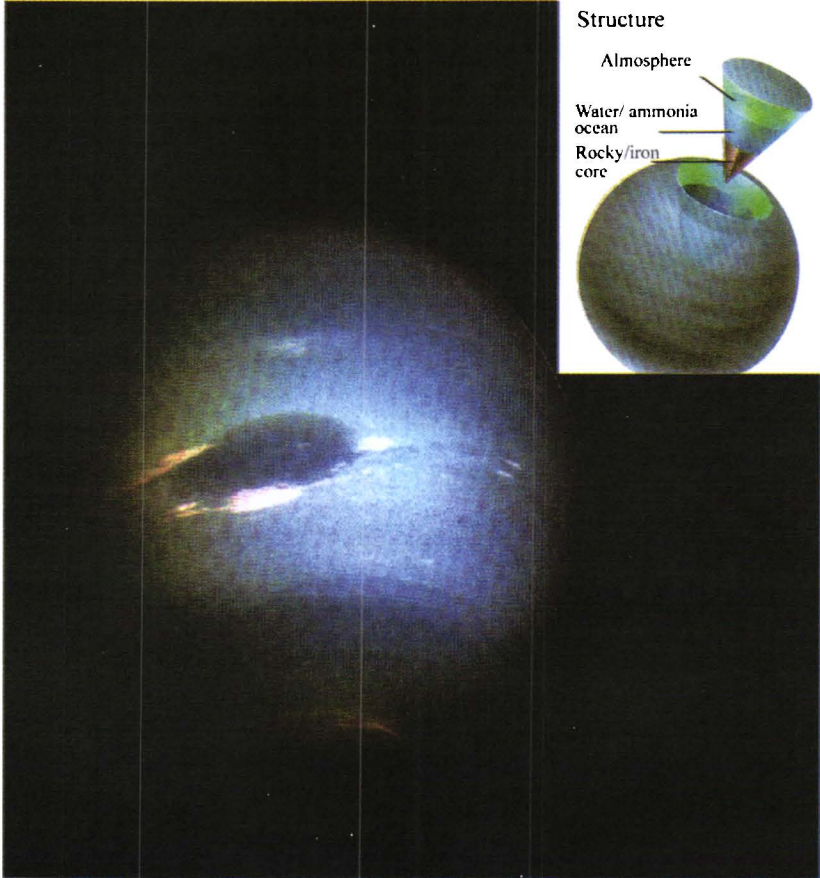
চিত্র-৪২

— ওপরে ইউরেনাস গ্রহের ছবি দেখা যাচ্ছে। আপেক্ষিকতার বেড়াজালে বন্দি এ গ্রহটিও নিজস্ব পরিবেশে একটি ভিন্ন গতিতে পরিভ্রমণ করে স্রষ্টার নির্দেশ পালন করে যাচ্ছে। স্রষ্টার নির্ধারিত বিধান ছাড়া আর কারও নির্দেশই সে পালন করছে না। প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্ যাকে যে গতি বেঁধে দিয়েছেন সে তার রদবদল ঘটাতে পারে না। এখানে আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকৃত। মানুষ কখনো একাজে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে না।

নেপচুন (NEPTUNE)

১৮৪৬ সালে জার্মান এ্যাসট্রোনোমার 'Jahaun Galle' এই গ্রহটিকে আবিষ্কার করেন। 'নেপচুন' গ্রহটিও নীল রংয়ের গ্যাসীয় বল, সূর্যের আলো সামান্য পরিমাণে লাভ করে বিধায় খুবই শীতল গ্রহ। আয়তনে প্রায় ইউরেনাসের সমান।

নেপচুন গ্রহের ব্যাস হচ্ছে	:	৪৯,৫০০ কিঃ মিটার।
সূর্য থেকে দূরত্ব হচ্ছে	:	৪৪৯৬,৭০০,০০০ কিঃ মিটার।
বৎসর হচ্ছে	:	পৃথিবীর গণনায় ১৬৪ বৎসর ১০ মাসে।
দিন হচ্ছে	:	পৃথিবীর গণনায় মাত্র ১৬ ঘণ্টায়।
চাঁদ	:	সর্বমোট ৮টি।
তাপমাত্রা	:	গড়ে-২২০^{o}C।
বায়ুমণ্ডল	:	আছে।
গঠন	:	ওয়াটার, এ্যামোনিয়া ওশান (Ammonia Ocean) এবং আয়রন কোর দিয়ে গঠিত।

বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন এরা সবাই মূলতঃই গ্যাসীয় বল এবং আয়তনে বিশাল বিশাল। ফলে এদের নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণন খুবই দ্রুত তবে কক্ষপথ এদের সূর্য থেকে বহু বহু দূরে বিধায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে অনেক সময় লাগে। এখানে দেখা যাচ্ছে ১৬৪ বৎসর ১০ মাসে নেপচুনে এক বৎসর পূর্ণ হয়। অথচ দিন পূর্ণ হয় মাত্র ১৬ ঘণ্টায়। যা বড়ই বিচিত্র।

এখানে প্রমাণিত হচ্ছে– গ্রহের ঘূর্ণন গতির (নিজ অক্ষের) উপর দিন রাত্রির পরিমাণ নির্ভর করে। ঘূর্ণন গতি কম হলে দিন লম্বা হবে আবার ঘূর্ণন গতি বেশী হলে দিন ছোট হবে।

"আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করবো বিশ্বজগতে (মহাকাশীয় ব্যবস্থাপনায় মহাজাগতিক বস্তুদের সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে) এবং ওদের নিজেদের (শারীরিক মহাসূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনার) মধ্যে। ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা সত্য (আল-কুরআন)। এটা কি যথেষ্ট নয় যে তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত!" (৪১ ঃ ৫৩)

চিত্র-৪৩

– 'নেপচুন' গ্রহটিও তার নিজস্ব ভিন্ন আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির মাধ্যমে পৃথিবীবাসীকে যেন জানিয়ে দিচ্ছে- মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌ই নিজ পরিকল্পনায় প্রত্যেকটি মহাজাগতিক বস্তুকে কম বা বেশী গতি দিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন। ফলে কারও দিন ও বছর খুবই স্বল্প সময়ে পূর্ণ হচ্ছে আবার কারও খুব লম্বা সময় পরে পূর্ণ হচ্ছে। এটা স্রষ্টারই খেলা। এর পরওকি তাঁকে অস্বীকার করা যাবে?

প্লোটো (PLOTO)

আপাততঃ সৌরজগতের প্রান্ত সীমানায় আবিষ্কৃত সর্বশেষ গ্রহ। ১৯৩০ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী 'Clyde Tombaugh' প্লোটোকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এই গ্রহটি আমাদের চাঁদের তুলনায় আয়তনে ছোট।

প্লোটো গ্রহের ব্যাস হচ্ছে	:	২২৮৪ কিঃ মিটার।
সূর্য থেকে দূরত্ব হচ্ছে	:	৫৯০০,০০০,০০০ কিঃ মিটার।
বৎসর হচ্ছে	:	পৃথিবীর গণনায় ২৪৭ বৎসর ৮ মাসে।
দিন হচ্ছে	:	পৃথিবীর হিসাবে ৬ দিন ৯ ঘণ্টায়।
চাঁদ	:	সর্বমোট ১টি। (Charon)
তাপমাত্রা	:	গড়ে-২৩০^{0}C।
বায়ুমণ্ডল	:	এখনো অনুসন্ধান চলছে।
গঠন	:	ওয়াটার ও রকি কোর দিয়ে গঠিত।

খুবই আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে পৃথিবীর ২৪৭ বৎসর ৮ মাসে প্লুটো গ্রহে মাত্র ১ বৎসর পূর্ণ হয়। কিন্তু আকৃতিতে তুলনামূলক ক্ষুদ্র হওয়ায় এবং ধীর গতিতে নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণনের ফলে ৬ দিন ৯ ঘণ্টায় মাত্র ১ দিন পূর্ণ হয়। গ্রহটির বৎসর যেমন খুবই দীর্ঘ তেমনি দিনও বেশ কয়েক দিনের পরিমাণ লম্বা।

মহাকাশীয় সকল বস্তুই আপেক্ষিকতায় মোড়ানো ফলে সবার স্থানীয় দিন ও বৎসরের হিসাব ভিন্ন ভিন্ন।

"তোমার প্রভুর বাণী সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায় সংগত। তাঁর বাণী কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয় অবগত রয়েছেন।" (৬ ঃ ১১৫)

"আল্লাহ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ আছে কি যে তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা?" (১৪ ঃ ১০)

চিত্র-৪৪

– ছবিতে প্লুটো গ্রহকে দেখা যাচ্ছে। সৌরজগতে পৃথিবীর দিনের সাথে অন্য কোন গ্রহের দিনের মিল নেই। সুতরাং পৃথিবীর ৫০,০০০ বৎসর সমান অন্য কোন জগতের স্থানীয় একদিন হওয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই সম্ভব আপেক্ষিকতার কারণে। অতএব আল্লাহ্ যেমন সত্য, তাঁর পবিত্র বাণীও তেমনি সত্য। প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ এ তথ্য বর্তমান চৌকুষ বিজ্ঞান প্রমাণ করে কি এক আল্লাহ্‌র পক্ষে অবস্থান নেয়নি?

সুধী পাঠক, ওপরে বর্ণিত আমাদের সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের দিন-রাত্রির উক্ত হিসেব আজকে গোটা বিজ্ঞান বিশ্বে এক বাক্যে স্বীকৃত। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উল্লেখিত হিসেবের কোন তারতম্য এ যাবৎ পরিলক্ষিত হয়নি। বর্তমান বিজ্ঞান সত্যি সত্যি আশীর্বাদ পাওয়ার দাবীদার। কারণ বিশ্ব প্রভুর নিদর্শনসমূহের ওপর থেকে সে এক এক করে আবরণ অপসারণ করে এক আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং তাঁর মহাজ্ঞান ও ক্ষমতা গোটা বিশ্বের মানবমণ্ডলীর দৃষ্টির সামনে সম্মানের সাথে তুলে ধরছে। বিশ্ব প্রভুর গৌরব-গরিমা প্রকাশে যেন বিজ্ঞান আজকে আত্মবিভোর হয়ে পড়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের শুভ্র আলোতে উদ্ভাসিত বর্তমান পরিবর্তিত পৃথিবীর বিজ্ঞান নির্দ্বিধায় স্বীকার করছে যে, যে কার্যকারণ অদৃশ্য থেকে আমাদের সৌরজগতের এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত নয়টি (৯) গ্রহকে শুরুতে ভিন্ন ভিন্ন সময় স্কেলে নির্দিষ্ট করে চালিয়ে দিয়েছেন, সেই একই কার্যকারণ যদি কোন গ্রহকে তার অক্ষের ওপর এক পাক ঘুরে আসতে ৫০,০০০ বৎসর সময় নেয় মতো ব্যবস্থা করে চালিয়ে দেন, তাহলে নিঃসন্দেহে ঐ গ্রহের দিনের পরিমাণ লম্বা হয়ে পৃথিবীর হিসেবে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান হয়ে যেতে বাধ্য হবে। বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনেষ্টাইনের 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' ও উক্ত বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করছে।

অতএব পূর্বে যা কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব, অবাস্তব, বর্তমানে বিজ্ঞানের বদৌলতে তা শুধু বাস্তবই নয় প্রমাণিত সত্যও বটে। আশা করা যায় সত্যপ্রিয় জ্ঞানীজন এ সকল জ্ঞানময় বিষয়গুলো অবহিত হওয়ার পর অন্ধকারে পথ চলা ছেড়ে দিয়ে উজ্জ্বল আলোকময় পথ ধরে সম্মুখপানে এগিয়ে যাবেন। কারণ বিজ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন উন্মুক্ত হওয়ার পর অন্ধকারে পথ চলা মোটেই শোভনীয় নয়। তখন আলো ঝলমল পথেই তাদের এগিয়ে চলা উচিত। এবার সমগ্র বিষয়টি এক নজরে দেখে নিই।

এক নজর

আল্ কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
১. তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন 'ছয়টি' সময়কালে।" (২৫ ঃ ৫৯)	১. এ মহাবিশ্ব প্রায় 'শূন্য' থেকে 'Big Bang' নামক প্রচণ্ড এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে পর্যায়ক্রমে ৬টি সময়কাল অতিক্রম করে 'অটল পদার্থ' (Stable atoms) সৃষ্টির পরই অস্তিত্ব ধারণ করতে সমর্থ হয়। (দেখুন সিরিজ-১ 'কুরআন, সৃষ্টি-তত্ত্ব ও বিগ-ব্যাংগ')
২. "তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য এবং চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিবসকে।" (১৪ ঃ ৩৩)	২. সূর্য ও চন্দ্র এবং দিন ও রাত্রির একই নিয়মে আবর্তন পৃথিবী নামক গ্রহে উদ্ভিদ, জীব ও প্রাণীকুলের স্বাচ্ছন্দময় 'লাইফ সাইকেল' নির্বাহকল্পে এক বর্ণনাতীত সুষম ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। যার তুলনা আপাততঃ পৃথিবী একা নিজেই। দিন ও রাত্রির পরিবর্তনের কারণেই ভূ-পৃষ্ঠে মানব সমাজে দিন, মাস ও বছর গণনা সম্ভব হচ্ছে এবং অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করে সবাই ধন্য হচ্ছে।
৩. "তিনিই (আল্লাহ্) রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে।" (৫৭ ঃ ৬) *"আল্লাহ্-ই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবস, সূর্য*	৩. মহাবিশ্বের সৃষ্টি নৈপুণ্যতা এবং ওর সার্বিক ব্যবস্থাপনার বৈচিত্রতা বিজ্ঞানের ক্ষমতা বহির্ভূত অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার এক কঠিন এবং সুশৃংখল নিয়মে ব্যবস্থিত, যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান জানে না। তবে এ কার্যের পেছনে 'কর্তা'র উপস্থিতিকে 'কার্যকারণ' নীতির আলোকে স্বীকার করে।

জ্ঞানের যতই প্রসার ঘটছে বিষয়টি ক্রমান্বয়ে ততই স্পষ্ট হচ্ছে।

নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করে।" (১১ ঃ ৩৩)

৪. আমাদের সৌরপরিবারে গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি, ওদের গঠন ও ওদের নিজ নিজ কর্মতৎপরতাসহ সকল কিছুই পৃথিবীর মানবমণ্ডলীর বা বিজ্ঞানের মাধমে নিঃসন্দেহে এই পর্যায়ে আসেনি। মানুষ বা বিজ্ঞান চেষ্টা করলেও মহাজাগতিক বস্তুদের দৃশ্যমান এই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে চুল পরিমাণও পরিবর্তন করার জ্ঞান বা ক্ষমতা কোনটাই রাখে না।

৪. "তিনিই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথভাবে।" (২৫ ঃ ২)

"তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন; এ সবই মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নির্ধারিত হিসেবে পরিচালিত।" (৬ ঃ ৯৬)

উপরোক্ত কঠিন নিয়মে ব্যবস্থিত ব্যবস্থাপনা যে অদৃশ্য কোন এক শক্তির 'উৎস' থেকে নিয়ন্ত্রিত তাও এখন অকপটে স্বীকার করে।

৫. যে 'সত্তা' বা 'শক্তি' একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আমাদের সৌরজগতের ৯টি গ্রহ এবং অসংখ্য উপগ্রহের দিন-রাত্রির পরিমাণে সময়ের ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেই একই 'সত্তা' বা 'শক্তি' কোন গ্রহকে তার অক্ষের উপর এক পাক ঘুরে আসতে পৃথিবীর হিসেবে ৫০,০০০ বৎসর নির্ধারণ করে দিতেও সামর্থ্য রাখেন। এটা সম্ভব। তখন ঐ গ্রহটিতে ১দিন হবে পৃথিবীর ৫০,০০০ বৎসরের সমান।

৫. "তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁর সমীপে সমুত্থিত হয়- যে দিনের পরিমাণ তোমাদের গণনায় সহস্র বৎসরের সমান।" (৩২ ঃ ৫)

"ফিরিশ্‌তা এবং রূহ্ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে- যে দিনের হিসেব পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান।" (৭০ ঃ ৪)

আমাদের নিজস্ব সৌরপরিবারের গ্রহদের দিন-রাত্রির উল্লেখিত ব্যবধান-ই তার বাস্তবতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করছে।

আগামীতে আরও সৌরজগত আবিষ্কৃত হয়ে তা আরও ব্যাপকভাবে প্রমাণিত হবে এ বিশ্বাসে বিজ্ঞানী সম্প্রদায় আশাবাদী।

৬. "যিনি (আল্লাহ) প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর ওদের পথ (ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম, সীমা ও ধর্মরীতি ইত্যাদি) নির্দেশ করেছেন।" (২০ ঃ ২৫) এ কারণেই মূলতঃ মহাজাগতিক প্রত্যেকটি বস্তুরই আকৃতি, গতি, প্রকৃতি, সময় ইত্যাদি নিজ নিজ পরিবেশে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থাৎ 'আপেক্ষিক'।

৭. ওপরে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আল কুরআন পেশ করেছে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে, যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ভূ-পৃষ্ঠে তেমন ছড়ায়নি। চিরন্তন, শাশ্বত ও কালজয়ী এক ও একক সত্তা মহাপ্রভু 'আল্লাহ্' বলেই বর্তমান আছেন বলেইতো বিজ্ঞানের অনেক অনেক পূর্বেই কুরআন এসকল বৈজ্ঞানিক তথ্য সর্বপ্রথম মানবজাতিকে অবহিত করতে পেরেছে।

৬. আমাদের এ মহাবিশ্বের বস্তু সম্ভারের প্রত্যেকেরই 'গতিজড়তা' ও 'সময়' আপেক্ষিক। বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 'আইনষ্টাইন' এ তথ্য প্রমাণ করে তা বিজ্ঞান বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

উক্ত থিউরির মূল কথা হলো– মহাবিশ্বে প্রতিটি বস্তুর তার স্থানীয় অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির ওপরই তার গতি, সময় ইত্যাদি নির্ভর করে, সবাইর অবস্থা একই রকম হবে এটা পুরো মাত্রায় অবাস্তব। তাই কারও একদিন কারও পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান হওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়।

৭. বিজ্ঞান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানীকুল শিরমণি 'আইনষ্টাইন' একই তথ্য পেশ করেন, ('Theory of relativity') ১৯০৫ সালে এবং ('Special Theory of relativity') ১৯১৬ সালে। বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্ব উক্ত 'থিউরী' ২টির ওপরই তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে।

আমাদের বর্তমান বিজ্ঞান ১৯০৫ সালের পূর্বে মহাবিশ্বে আমাদের পরিচিত এই 'সময়' (Time) যে আপেক্ষিক অবস্থানে অবস্থান করে সর্বত্র গোপন খেলা খেলে যাচ্ছে, তা ঘূণাক্ষরেও জানতো না। সত্যিই বড় আশ্চর্য করার মত বিচিত্র তথ্য বৈ কি। দীর্ঘ সময় ধরে মানব সমাজের যে লোকগুলো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত সময়ের স্কেলের বিভিন্নতার বক্তব্য নিয়ে হাসি-তামাশা করতো, তারা বিজ্ঞানী 'আইনষ্টাইনের' এ

অপ্রত্যাশিত ঘোষণায় রীতি মতো চমকে উঠলো, ভাবলো স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সত্যি কি তাহলে সময়ের তারতম্য বর্তমান বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সাফল্যজনক পরিবেশে বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তি মূলের ওপর প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল? হ্যাঁ, ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, বিষয়টি কিন্তু ঠিক তা-ই ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে- স্থান-কাল-পাত্র ভেদে 'সময়ের' স্কেলের বিভিন্ন অস্তিত্বের সূত্র ব্যক্ত করে ১৯০৫ সালে বিজ্ঞানী 'আইনষ্টাইন' যদি শতাব্দির শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্বময় খ্যাতি-সম্মান কুড়াবার যোগ্য বিবেচিত হন, তাহলে সেই একই তথ্য বিজ্ঞানের আবিষ্কারের প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে 'কুরআন' তার পবিত্র বাণী সম্ভার দিয়ে প্রকাশ করেও কি সমগ্র বিশ্বব্যাপী গৌরব ও সম্মানের সার্বজনীন স্বীকৃতি পেতে পারেনা? সময়ের আপেক্ষিকতা নিয়ে 'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞানের' বক্তব্যে কোন পার্থক্য বা ব্যবধান আছে কি? আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে কিয়ামাত এবং হাশরের মাঠে অনুষ্ঠিত বিচার দিবসকে টেনে পৃথিবীর গণনায় ৫০,০০০ বৎসরের সমান দীর্ঘ করতে পারেন– এ কথা কি এখন আর অস্বীকার করা যায়? যায় না ।

মহান স্রষ্টা আল্লাহর জন্য বিষয়টি খুবই সহজ, শুধু বিচার দিবসের জন্য তৈরী নতুন গ্রহটিকে নিজ অক্ষের ওপর এক বার ঘুর-পাক খেতে পৃথিবীর স্থানীয় ৫০,০০০ বৎসরের সমান 'সময়' নির্দিষ্ট করে দিলেই সব সমাধান হয়ে গেল । সুবহানাল্লাহ্ ।

সুতরাং কুরআন এবং বিজ্ঞানের মাঝে কোন ভিন্নতা নেই, কোন বৈপরিত্য নেই, বরং সত্য সঠিক বিজ্ঞানের, কুরআনের সাথে আছে অকল্পনীয় মিল এবং সাদৃশ্যতা, কারণ উভয়ের আগমন উৎস হচ্ছেন যে স্বয়ং 'আল্লাহ্' ।

তাই বিজ্ঞানের মাধ্যমে কুরআনের মালিককে অন্তর চক্ষু দিয়ে দর্শন করার পর পরকালের সেই ভয়াবহ ৫০,০০০ বৎসরের কঠিন পরিস্থিতি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশিত পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া-ই হবে বুদ্ধিমানের কাজ । সমাজের জ্ঞানীজন, এবার সে পথে এগিয়ে যাবেন, এটাই আশার বিষয় ।
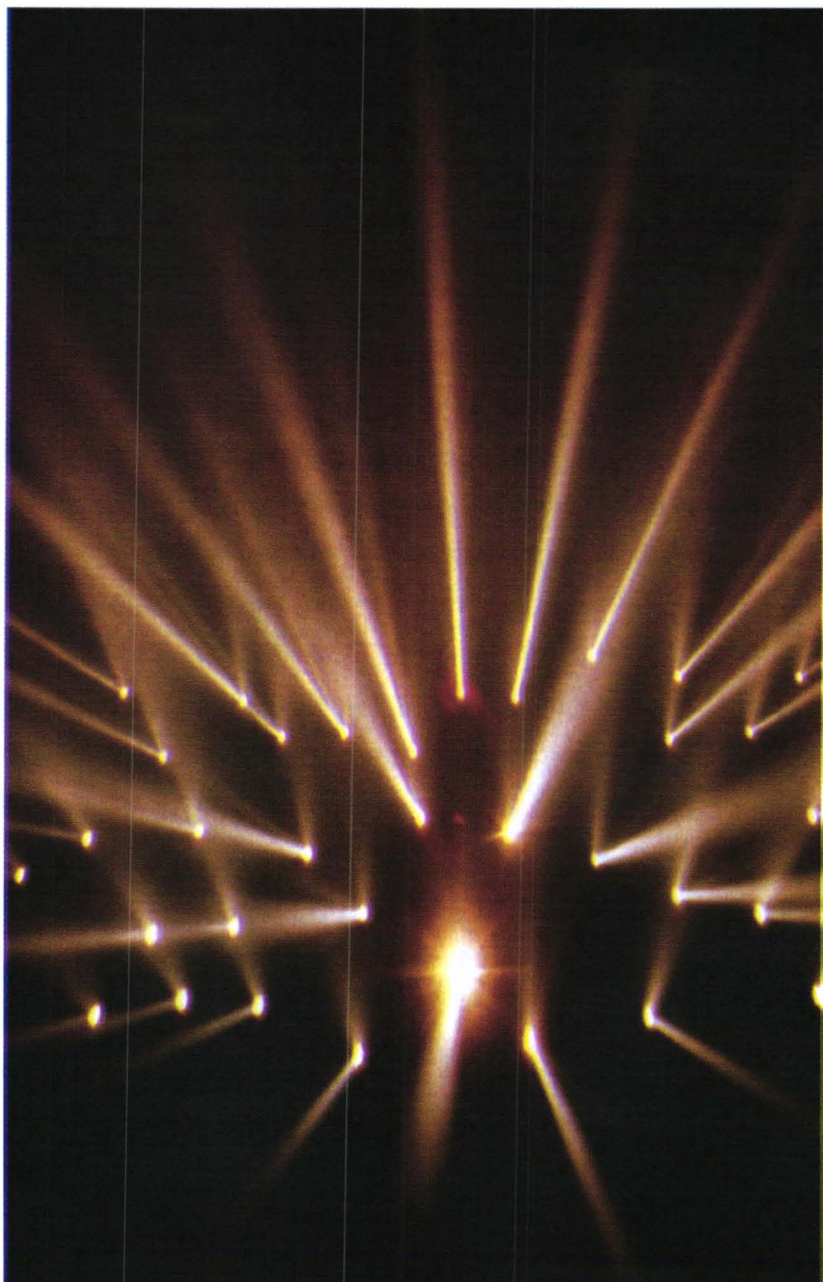
‘মহাবিস্ময়কর স্রষ্টা’
(১)

আল্‌-কুরআন

“আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী।” (৮ ঃ ৪৯)

“তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথাযথ করেছেন নির্দিষ্ট অনুপাতে।” (২৫ ঃ ২)

“দয়াময়ের সৃষ্টিতে কখনো সামঞ্জস্য ও অনুপাতের ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না।” (৬৭ ঃ ৩)

“মহান আল্লাহ্‌ কত নিপুণ স্রষ্টা।” (২৩ ঃ ১৪)

“তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সকল বস্তুর সকল অবস্থা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।” (৬ ঃ ১০২)

“যিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর ওদের পথ (ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম, সীমা ও ধর্মরীতি ইত্যাদি) নির্দেশ করেছেন।”
(২০ ঃ ২৫)

“তারা কি আসমান ও জমিনের ব্যবস্থার দিকে তাকায় না এবং তাদের প্রতি যা আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন।” (৭ ঃ ১৮৫)

“তিনি এই মহাবিশ্বের সকল কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।” (৬৪ ঃ ৪)

“আকাশজগত ও পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বস্তু কণাও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নয় এবং উহা হতে ক্ষুদ্রতর কিংবা তদপেক্ষা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট ও জ্ঞানময় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই।” (১০ ঃ ৬১)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) যাবতীয় বস্তুই আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্ সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" (৪ ঃ ১২৬)

"পালনকর্তা নিজ জ্ঞানের বিস্তৃতিতে প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছেন, তা কি তোমরা বুঝতে পার না?" (৬ ঃ ৮০)

"প্রতিক্ষণ তিনি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে সু-প্রতিষ্ঠিত"। (৫৫ ঃ ২৯)

"তোমার প্রতিপালক সকল বস্তুর রক্ষণা-বেক্ষণ করেন। (১১ ঃ ৫৭)

"প্রভু তাঁর জ্ঞানে সমস্ত বস্তু ঘিরে রেখেছেন।" (৭ ঃ ৮৯)

"সতর্ক হও, তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" (৪১ ঃ ৫৪)

"তাঁর হস্তেই সকল বস্তুর কর্তৃত্ব।" (৩৬ ঃ ২)

"মহা বিজ্ঞানময় এই কুরআন।" (৩৬ ঃ ২)

"এগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ ঃ ১)

"ওরা কি অজ্ঞ যুগের নিদর্শন খুঁজছে?" (৫ ঃ ৫০)

"বিশ্ববাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন।" (৫১ ঃ ২০)

"বল, আল্লাহ্‌র যুক্তি চূড়ান্ত ও অবিনশ্বর।" (৬ ঃ ১৪৯)

"তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করবার নয়।" (১২ ঃ ১০৩)

"তোমরা যে যেখানেই অবস্থান কর, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে টেনে আনবেন।" (২ ঃ ১৪৮)

"আল্লাহ্‌ই তাদের অনুভবকে, শ্রবণ শক্তিকে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন, আর দৃষ্টি শক্তিকে করে দিয়েছেন আচ্ছাদিত, তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।" (২ ঃ ৯)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) মাঝে একমাত্র তিনিই আল্লাহ্।"(৬ ঃ ৩)

আমাদের এই সীমা-পরিসীমাহীন, বিরাট-বিশাল মহাবিশ্বের সৃষ্টি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণসহ এর ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও কর্তৃত্ব সম্বলিত বক্তব্য একমাত্র 'কুরআন' ছাড়া আর কোন লেখা বা গ্রন্থে এত

সুনির্দিষ্ট, বিজ্ঞানময় ও আকর্ষণীয়ভাবে দেখতে পাওয়া যাবে না। কুরআনের অসংখ্য মু'জেযার (Miracles) মধ্যে এটিও একটি বাড়তি নিদর্শন বৈ-কি!

মানুষের বর্তমান জ্ঞানে পরিপূর্ণরূপে অনুমান অসাধ্য এমন অকল্পনীয় বিরাট-বিশাল মহাবিশ্বকে প্রতি মুহূর্তে শৃংখলাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ এমনি একজন প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বশালী প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্' ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এক মুহূর্তের জন্যও সম্ভবপর নয়। বিষয়টি মহান সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব, কৃতিত্ব ও মাহাত্মসহ সকল গুণাবলীকে মানব সমাজের সামনে মেলে ধরেছে, যা বর্তমান বিজ্ঞান হাতে-কলমে প্রমাণও করেছে।

অধ্যায়ের শুরুতে উদ্ধৃত প্রথম আয়াতটি থেকে নিয়ে সর্বশেষ আয়াত পর্যন্ত বিষয়ের মূল বক্তব্য হলো- আমাদের এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রভু হচ্ছেন একমাত্র 'আল্লাহ্ তা'আলা', যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অতুলনীয় শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী। এই চূড়ান্ত জ্ঞান এবং শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকটি জিনিষ বা বস্তুকে তার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী যা-যা দরকার ঠিক তা-তা দিয়েই ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। এই ভারসাম্যের বিপরীতে অনুপাতের অসামঞ্জস্যতা বা পরিমিতির কোন ব্যতিক্রম মানুষ কখনও খুঁজে পাবে না, বরং যতই তালাশ করবে-যতই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান-পর্যবেক্ষণ চালাবে, ততই সর্বত্র অনুপাত ও পরিমিতির সঠিক সামঞ্জস্যতা প্রত্যক্ষ করে, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কৌশল অবলোকন করে, তাঁর সামনে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় জ্ঞানবান মানুষ মাথা নুইয়ে দেবে।

সকল কিছুর সৃষ্টি পর্যন্তই বক্তব্য শেষ নয়, বরং তিনি প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর আকার-আকৃতি সুনির্দিষ্ট করার পর তাদের প্রত্যেকের জন্যই ভিন্ন-ভিন্ন কার্যক্রম, ধর্মরীতি, ব্যবস্থাপনা এবং সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে করে সবাই নিজ নিজ কার্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পাদনের মাধ্যমে একমাত্র 'প্রভুর' গোলামীর নজরানা পেশ করতে পারে। এখন কেউ যদি এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য মাথার ওপরে অবস্থিত আকাশমণ্ডলী এবং এ

তাহলে তার প্রসারিত অনুসন্ধানী দৃষ্টির সমান্তরালে বর্ণিত বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হবেই। প্রতিটি বস্তুই নীরবভাবে দর্শককে বলে দেবে যে, তারা তাদের অদৃশ্য প্রভুর সৃষ্টি কৌশলের কৃতিত্বকে স্বীকার করে এবং তাঁর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ব্যবস্থার পদ্ধতি অনুযায়ী তারা তাদের জীবন পরিক্রমা-সম্পন্ন করে থাকে। এর বাইরে অন্য কোন সূত্রের যে কোন বিধি বিধানকেই তারা উপেক্ষা করে, অস্বীকার করে এবং চ্যালেঞ্জ করে থাকে। উল্লেখিত এই বিষয়টি পৃথিবীর মানবমণ্ডলীর সামনে সৃষ্টির শুরু থেকেই ১০০ ভাগ সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়ে চলে আসছে। বর্তমান বিশ্বের সমগ্র মানবমণ্ডলী (প্রায় ৬০০ কোটি) যদি তাদের সকল প্রকার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল প্রকার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এক যোগে চন্দ্র-সূর্য ও তারকাদের উদয়-অস্ত পরিবর্তন করে দিতে চায়, কিংবা দিনকে রাত অথবা রাতকে দিন বানিয়ে দিতে চায়, ভূ-পৃষ্ঠে পানির জোয়ার-ভাটা বন্ধ করে দিতে চায়, কিংবা মধ্যাকর্ষণ চিরতরে নিঃশেষ করে দিতে চায়, অথবা চন্দ্র-সূর্যের আলোকে বিদূরিত করতে চায়, তাহলে কি তা সম্ভব করে তুলতে পারবে? কখনই পারবে না। দৃশ্য-অদৃশ্য সৃষ্টির সকল কিছুই ওদের এক ও একক স্রষ্টার বিধানের বাইরে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটাতে রাজী নয়। এর অনেক কারণের মধ্যে একটি বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে, ওদের সৃষ্টিকর্তা, প্রভু একমাত্র 'আল্লাহ্' মহাবিশ্বের একেবারে ক্ষুদ্র-নগণ্য ধূলা-বালির ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে বৃহৎ-বৃহৎ 'নক্ষত্র শহর' (গ্যালাক্সি)সহ সৃষ্টির সকল কিছুকে নখদর্পণে রেখেছেন। প্রতিটি মুহূর্তেই ওদের অভাব অভিযোগ শুনছেন ও দেখছেন, ওদের চাহিদা পূরণ করছেন এবং ওদের ওপর বেঁধে দেয়া কর্মকাণ্ড একেবারে নিকট থেকেই প্রত্যক্ষ করছেন। প্রতিটি বিষয়ের ন্যায় এ ব্যাপারেও তাঁর জ্ঞান এতই প্রভাব বিস্তার করে আছে যে, তাঁর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া এই কর্মকাণ্ড, পদ্ধতি, নিয়ম-নীতি, শৃংখলা উপেক্ষা করে কেউ মুহূর্তের জন্যও দাড়িয়ে যেতে পরে না বা তাঁর বিদ্রোহিতামূলক কোন আচরণ পর্যন্ত প্রদর্শন করতে পারে না। সৃষ্টির পক্ষে কখনই তা সম্ভবপর নয়। 'আল্লাহ্' তাঁর জ্ঞানের বেল্টে সৃষ্টির একেবারে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম এবং বড় থেকে বড় সকল কিছুই সুকৌশলে

পরিবেষ্টন করে আছেন যে, সুনিয়ন্ত্রণ বলতে যা বোঝায় তা-ই প্রকাশ করে থাকে, যার বাইরে কোন কিছুই কখনও ঘটতে পারে না। তাঁর কুদ্‌রতি হাতের মুঠোয় সকল বস্তুর কর্তৃত্ব-স্বাধীনতা, ইখতিয়ার দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। অতএব মহাবিশ্বের যেখানেই যাওয়া হোক, সেখানেই সকল বিষয়ের একই কার্যকারণ, একই নিয়ম-শৃংখলা, একই পদ্ধতি পরিলক্ষিত হবে, যা মহান সৃষ্টিকর্তার গোটা মহাবিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অভাবনীয় গৌরব বহন করে চলেছে। উল্লেখিত 'বিজ্ঞান' বিষয়ক এই বাণীসমূহ পবিত্র 'কুরআনে' সমাদৃত হয়ে 'কুরআন'কেও 'বিজ্ঞানময়' গ্রন্থ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছে, যে কারণে কুরআন 'জ্ঞানগর্ভ' গ্রন্থের উপাধি খেতাবেরও সুনামধারী।

এরপর শেষের দিকে বলা হচ্ছে– এক আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীব হয়ে, তাঁর দেয়া বিবেককে উপেক্ষা করে, প্রাপ্ত শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তিকে নিষিদ্ধ খাতে প্রবাহিত করে যারা অবাধ্যতার রাজপথ মাড়িয়ে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরতে থাকে, তাদের বিবেককে অবরুদ্ধ করে দেয়া, শ্রবণ শক্তিকে মোহরাঙ্কিত করে দেয়া এবং সেই দৃষ্টিশক্তিকে ঢেকে দিয়ে সর্বপরি তাদের জন্য গুরুতর শাস্তির স্থান প্রস্তুত করা আল্লাহ্‌র জন্য অবশ্য করণীয় হয়ে যায়।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) সত্য-সঠিক, এক ও একক 'সৃষ্টিকর্তা' এবং দয়াময় 'প্রভু' হচ্ছেন- 'আল্লাহ্‌'। এ এক মহাসত্য, বাস্তব এবং স্বীকার্য বিষয়। যারা সত্যের পূজারী তারা সকল সময় সকল অবস্থায় এ ব্যাপারে একমত, দৃঢ়-মজবুত এবং অপরিবর্তনীয়। তাদের সকল প্রকার গোলামী একমাত্র সেই 'আল্লাহ্‌'র জন্যই উৎসর্গীকৃত হয়ে থাকে। আর এরাই সকল প্রকার কল্যাণ ও সৌভাগ্যের অধিকারী।

বিজ্ঞান

বিংশ শতাব্দির অগ্রসরমান পদার্থ বিজ্ঞান মানুষের দৃষ্টি চমকানো অন্যান্য বহু আবিষ্কারের সাথে সাথে বড় ধরনের দু'টি অকল্পনীয় আবিষ্কারের কৃতিত্বও অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। তার একটি হচ্ছে শক্তিশালী টেলিস্কোপ (Telescope) দিয়ে মহাবিশ্বে দৃষ্টির প্রান্তঃসীমানা পর্যন্ত দৃশ্য-

অদৃশ্য মহাকাশীয় বস্তু সম্ভার– গ্যালাক্সি, কোয়াসার, পালসার, ব্ল্যাক হোল, নেবুলা, সুপার নোভা ইত্যাদি আবিষ্কার করে ওদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মানবমণ্ডলীর জ্ঞানের টেবিলে উপস্থাপন করেছে, এবং অপরটি হচ্ছে, মাইক্রোস্কোপ (Microscope) দিয়ে মহাবিশ্বে পদার্থের মাইক্রোকস্‌মস (Microcosmos) জগতের 'অণু-পরমাণু' নামক বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশের (Atoms and Subatomic Particles) আরো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পদার্থ রহস্য উদ্‌ঘাটন করে বিশ্বময় তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

১৯৩১ সালে সর্বপ্রথম 'ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ' (Electron microscope) দিয়ে পৃথিবীর মানুষ মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম প্রাণী 'ভাইরাস' (Virus) জগত উন্মুক্ত করে, যে ভাইরাসের ব্যাস হচ্ছে মাত্র $১০^{-২৭}$ মিটার। পরবর্তীতে 'ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের' ব্যাপক উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র $১০^{-১০}$ মিটার, ব্যাসের পরমাণুর (Atom) অর্থাৎ এক মিটারের ১০০ মিলিয়ন তারও মিলিয়ন-এর মাত্র ১ ভাগ সমান ব্যাসের পরমাণুর আভ্যন্ত রীণ গঠন প্রণালীর অদৃশ্য রহস্য অনাবৃত করতে সমর্থ হয়। তাতে জানানো হয় যে, পরমাণুর কেন্দ্র 'নিউক্লিয়াস' ক্ষুদ্র কণিকা 'প্রোটন' (Proton) এবং নিউট্রন (Neutron) দিয়ে গঠিত। এই নিউক্লিয়াসের ব্যাস হচ্ছে-$১০^{-১৭}$ মিটার, নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে আবর্তন করতে থাকে 'ইলেকট্রন' (Electron) নামক ক্ষুদ্র কণিকা। এই আবিষ্কারের পর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই বিজ্ঞানবিশ্ব পূর্বের তুলনায় আরো উন্নত যন্ত্র 'পার্টিক্যাল এ্যাকসিলারেটর (Particle Accelerator) আবিষ্কার করে সূক্ষ্ম রহস্য উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করে যে, 'কোয়ার্ক' নামক এক প্রকার সূক্ষ্ম কণিকা দিয়ে এই 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' গঠিত। উল্লেখিত কোয়ার্কের ব্যাস হচ্ছে $১০^{-২০}$ মিটার-এর চেয়েও কম। তবে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ এই কোয়ার্কের ব্যাস মাত্র $১০^{-৩৩}$ মিটার বলে দাবী করেন, যা 'Big-Bang'–এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুর মুহূর্তের তুলনামূলক পদার্থের ব্যাসের সমান। এই আবিষ্কার প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃত প্রকাণ্ড এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির পিছনে লুকায়িত পদার্থের মূল গোপন

"যিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। তুমি আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?" (৬৭ ঃ ৩)

চিত্র-৪৫

– মানব সম্প্রদায় Telescope আবিষ্কারের মাধ্যমে, মাথার ওপর বিরাজমান মহাশূন্যের মাঝে দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে অদৃশ্য হয়ে থাকা হাজারো বিস্ময়কর বিষয়ের ওপর থেকে আবরণ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র মহাকীর্তির যৎসামান্য কিছুটা হলেও জ্ঞানচক্ষু দিয়ে উপলব্ধির সুযোগ পেয়েছে মানব জাতি। আশা করা যায় মানব জাতিকে একসময় মহাসত্যের নিকটবর্তী হতে বিশেষ অবদান রাখবে এ Telescope।

"অদৃশ্য বিষয় (মানব সম্প্রদায় যা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে পায় না) সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) তাঁর অগোচরে নেই সূক্ষ্মানু পরিমাণ কিংবা তদাপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহত্তর কিছু। প্রত্যেকটি বিষয়ে তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে।" (৩৪ ঃ ৩)

চিত্র-৪৬

– বর্তমান বিশ্বে Microscope-এর ব্যাপক উন্নতি পৃথিবী এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিরাজমান অসংখ্য, অগণিত মহাসূক্ষ্ম জগতকে উন্মোচিত করে মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করে চলেছে।

অতি সম্প্রতি মানবজাতি প্রাণী কোষের জেনেটিক কোডের রহস্যও ভেদ করতে সমর্থ হয়েছে। এ সকল রহস্য উন্মোচন করা হচ্ছে শুধু 'আল্লাহ্'কে চেনা ও জানার জন্যই!

রহস্য সম্পর্কে মানব জগতকে জ্ঞানের আল্‌তো পরশ বুলিয়ে যায়। সাথে সাথে একথাও বলে যায়– একটু ভাবতে, একটুখানি কল্পনা করতে, কি করে কোন্ পদ্ধতিতে এত ক্ষুদ্র-সূক্ষ্ম পদার্থ কণা দিয়ে জ্ঞানের অবোধগম্য এক বিরাট-বিশাল প্রকাণ্ড বস্তুগত জগত (Material World) দাঁড় করানো হয়েছে।

জ্ঞানী পাঠক, বিংশ শতাব্দির চল্লিশের দশকে বিজ্ঞান এই মহাবিশ্ব ও সকল বস্তু সৃষ্টি হওয়ার পেছনে-ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন পদার্থ কণিকা সমন্বয়ে যে 'অটল পদার্থ' (Stable Atom) মূল ভূমিকা পালন করেছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে। 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকা পরস্পর জড়াজড়িভাবে অবস্থান করে পরমাণুর 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) তৈরী করে এবং 'ইলেকট্রন' কণিকাগুলো এই 'নিউক্লিয়াস' নামক কেন্দ্রের চতুর্দিকে অনবরত আবর্তন করতে থাকে। প্রোটন কণিকাগুলো পজেটিভ চার্জযুক্ত, নিউট্রন কণিকাগুলো কোন প্রকার চার্জবিহীন-নিরপেক্ষ এবং ইলেকট্রন কণিকাসমূহ সবসময়ই নেগেটিভ চার্জযুক্ত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় বিজ্ঞান-জগত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা নিয়ে লক্ষ্য করেছে যে, **মহাবিশ্বের যে কোন স্থানের পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ এই পরমাণুর (Atom) ভেতর প্রোটন কণিকাসমূহ পজেটিভ চার্জযুক্ত এবং নিউট্রন কণিকাগুলো-নিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও ওদের মাঝে কোন এক অজ্ঞাত শক্তির হস্তক্ষেপে বস্তুজগতের পদার্থ বিজ্ঞানের সকল প্রকার নিয়ম-নীতিকে উপেক্ষা করে এক প্রকার মেসন (Meson) কণিকার মাধ্যমে 'আকর্ষণ বল' পরিমিত পরিমাণে সৃষ্টি হয় এবং প্রোটন ও নিউট্রন কণিকাগুলোকে নিবিড়ভাবে পাশাপাশি অবস্থান করায়ে 'নিউক্লিয়াস' গঠনের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে। অথচ স্বাভাবিকভাবে পজেটিভ কণিকা ও নিরপেক্ষ কণিকাসমূহের মধ্যে কোন প্রকার আকর্ষণ না থাকার এবং পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে দূরে থাকার-ই কথা ছিল। হতবাক করার মত বিষয় আরো হচ্ছে যে, পরমাণুর 'নিউক্লিয়াসে' একাধিক প্রোটন কণিকাগুলোর সবগুলোই পজেটিভ চার্জসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পদার্থ বিজ্ঞানের আইনকে**

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব) এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু (ক্ষুদ্র, বৃহৎ) আছে, দৃশ্য-অদৃশ্য (অণু-পরমাণু, মহাসূক্ষ্ম কণিকা কিংবা দূর-দুরান্তের মহাজাগতিক বস্তুসমূহ) সকল কিছুই।" (২৫ ঃ ২৯)
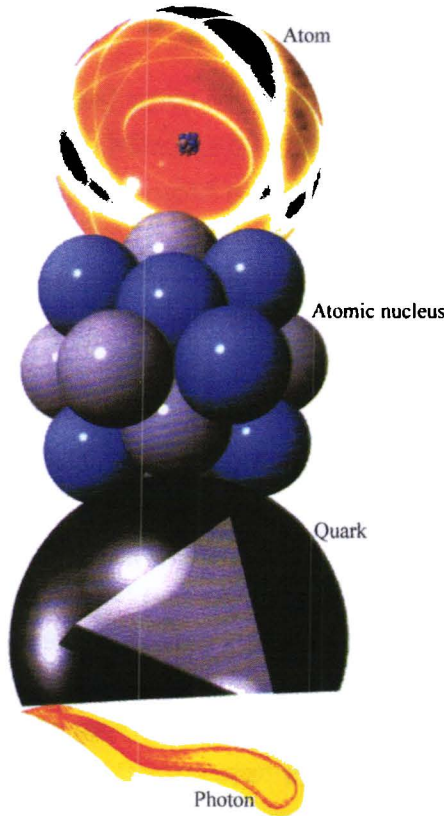
চিত্র-৪৭

– এ বিশাল মহাবিশ্বের মূল 'বিল্ডিং ব্লক' আলোর কণা 'ফোটন'। পরে ফোটন থেকে ' 'কোয়ার্ক' এবং একাধিক কোয়ার্ক মিলিত হয়ে 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকার সৃষ্টি করে। প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা পাশাপাশি অবস্থান গ্রহণ করে নিউক্লিয়াসে, আর সবশেষে নিউক্লিয়াস তার চারপাশ ইলেকট্রন কণিকা ধারণ করে অটল পরমাণুতে রূপ নেয়। স্রষ্টার এই সুন্দর Chain of system কে মানুষ কিভাবে উপেক্ষা করতে পারে? মানুষের পক্ষে এ কাজ সমাধা করা কি আদৌ সম্ভব? কক্ষণই না। তাহলে কেন তাঁকে অস্বীকার করা হবে?

ঘটিয়ে) নিজেদের ভেতরকার সমজাতীয় চার্জে সৃষ্ট বিকর্ষণ বলকে ধ্বংস করে দিয়ে প্রোটন কণিকাগুলো 'নিউক্লিয়াসের' মধ্যে একেবারে কাছাকাছি খুবই নিবীড় সম্পর্ক নিয়ে এক সাথে অবস্থান করে। পরমাণুর অভ্যন্তরে পদার্থের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম কণিকাদের এই অস্বাভাবিক আচরণ সমচার্জের প্রোটন কণিকাদের মধ্যে বিস্ফোরণ না ঘটা বিজ্ঞান মস্তিষ্ককে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানীগণ ল্যাবরেটরিতে বিভিন্নভাবে এই সমচার্জযুক্ত প্রোটন কণিকাগুলোকে পরস্পর থেকে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে তাদের বন্ধন শক্তি (Binding Energy) এমন এক পর্যায়ে বিরাজমান; যার ফলে বিপুল পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করা ছাড়া পজেটিভ চার্জযুক্ত ঐ প্রোটন কণিকাগুলোকে আলাদা করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীগণ আরো প্রমাণ করেন যে, প্রোটন কণিকাদের নিজেদের মধ্যে মধ্যাকর্ষণ বল উল্লেখিত বন্ধন শক্তির তুলনায় খুবই নগণ্য। **অজ্ঞাত শক্তির অদৃশ্য হস্তক্ষেপমূলক রহস্যের এখানেই শেষ নয়। উল্লেখিত প্রোটন কণিকাগুলো 'নিউক্লিয়াসে' খুবই নিবীড়ভাবে কাছাকাছি অবস্থান করে ঠিকই কিন্তু তাদের মাঝখানে খুবই সূক্ষ্ম একটা দূরত্ব তারা সবসময়ই বজায় রাখে যা ১০$^{-১৩}$ সেঃ মিঃ এর অর্ধেকের চাইতেও কম। ঐ সূক্ষ্ম দূরত্বকে ডিঙ্গিয়ে যখনই প্রোটন কণিকাগুলো আরো কাছাকাছি হয়ে একাত্ম হয়ে যেতে চায়, আর তখনই কণিকাগুলোর মাঝখানে অজ্ঞাত সেই 'শক্তি' আকর্ষণ বলের বিপরীতে বিকর্ষণ বল সৃষ্টি করে কণিকাদের আসক্তি ধূলোয় মিটিয়ে দিয়ে তাদেরকে উল্লেখিত নির্দিষ্ট দূরত্বে সরিয়ে রাখে। এভাবে প্রতিটি পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ 'নিউক্লিয়াসের' মধ্যে পজেটিভ চার্জযুক্ত প্রোটন কণিকাগুলোর নিজেদের মধ্যে এক অজ্ঞাত 'শক্তির' প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এক প্রকার প্রবল আকর্ষণ বল সৃষ্টি করে তার মাঝেই আবার প্রয়োজনে বিকর্ষী বলের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়ে প্রতিনিয়ত টানা-টানির মাধ্যমে নিউক্লিয়াসের ভারসাম্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।** অন্যথায় প্রোটন কণিকাদের নিজেদের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ বল হেতু গভীর সম্পৃক্ততার কারণে পরমাণুর নিউক্লিয়াস অবশ্যই জমাটবদ্ধ

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) যা কিছু মানবীয় দৃষ্টিতে অদৃশ্য (ক্ষুদ্রত্বের কারণে কিংবা দূরত্বের কারণে) তা সকলই আল্লাহ্‌র।" (১১ ঃ ১২৩)
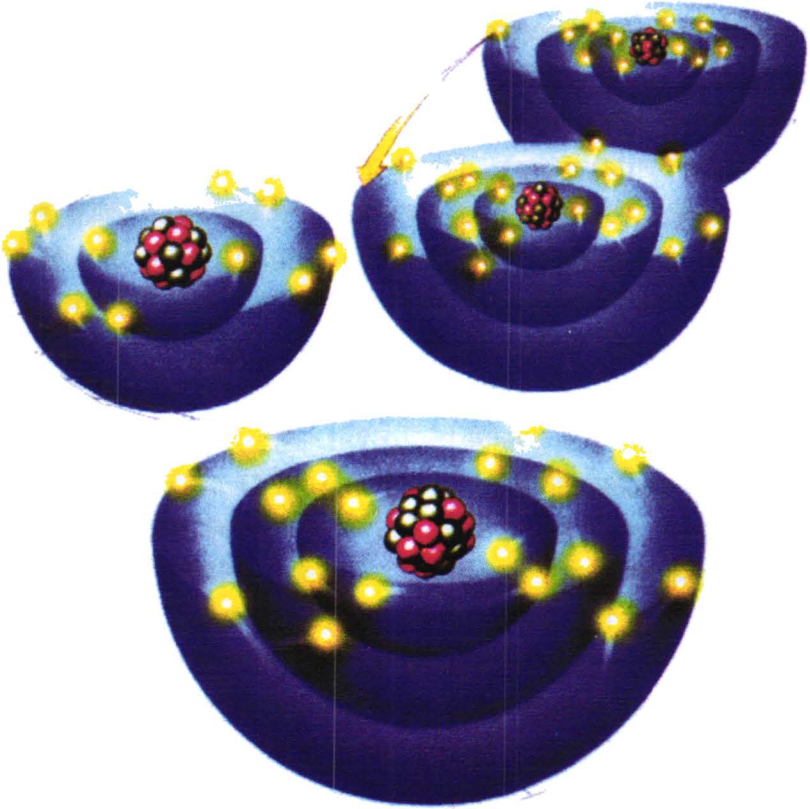
চিত্র-৪৮

– ছবিতে দৃশ্যমান 'পরমাণু' কেই সাধারণতঃ বস্তুর প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ 'পরমাণু' ঠিক আছে তো 'অণু' ঠিক থাকবে, 'অণু' ঠিক থাকলে বস্তু ঠিক থাকবে। বস্তু ঠিক থাকলে বিশ্ব থাকবে। একাধিক বিশ্ব ঠিক থাকলে মহাবিশ্বটিও থাকবে। তাই মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌ এ 'পরমাণু' তে তাঁর উল্লেখযোগ্য ও বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রয়োগ করেছেন। যে কৃতিত্ব বিজ্ঞান বিশ্বকে ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং এক আল্লাহ্‌কে দর্শন সীমায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দেখার কেউ আছে কী?

"বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কোন (বিস্ময়কর ও অত্যাশ্চর্য) কিছুর সংবাদ দিতে চাও, যা তিনি অবগত নন? নিশ্চয় তিনি অজ্ঞানতা হতে অতি পবিত্র (বরং এ সকল বিস্ময়কর কাজ তো তিনিই করেন)।" (১০ ঃ ১৮)
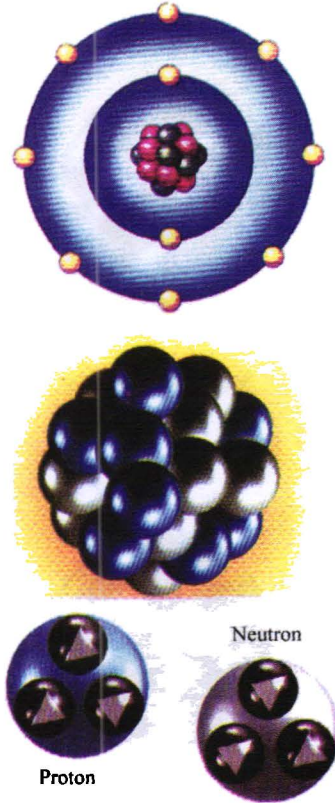
চিত্র-৪৯

– বস্তুজগতের পদার্থ বিজ্ঞানের আইনকে অমান্য করেই পজেটিভ চার্জযুক্ত প্রোটন চার্জহীন নিউট্রনকে আকর্ষণ করছে, আবার একই পজেটিভ চার্জযুক্ত প্রোটনগুলো সমচার্জের কারণে পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ না করে বরং পাশাপাশি নিবিড়ভাবে মিলিত হয়ে পরমাণুর 'নিউক্লিয়াস' গঠন করছে। এ নিয়ম পদার্থ বিজ্ঞান বহির্ভূত। পদার্থ বিজ্ঞান এ নিয়ম জানে না। তাহলে পদার্থ জগতের গোড়াতেই কে এই অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ করলো? জ্ঞানীজন! এবার আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন কী?

"তিনি তোমাদেরকে (জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়, প্রতিটি কাজের ভেতর) বহু নিদর্শন দেখায়ে থাকেন। অতঃপর তোমরা (যারা জ্ঞানের অহংকার কর) আল্লাহ্‌র (জ্ঞানময়) কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?" (৪০ ঃ ৮১)
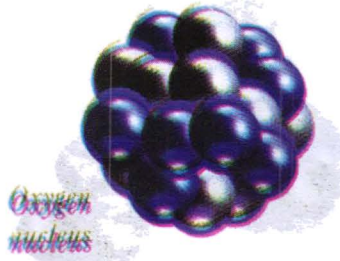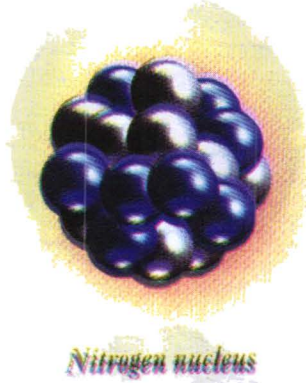
চিত্র-৫০

– ছবিতে অক্সিজেন নিউক্লিয়াস এবং নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াস দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে। পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম কাজ করলে এখানে নিরপেক্ষ নিউট্রন কণিকা থাকতে পারতো না, আবার পজেটিভ চার্জযুক্ত প্রোটন কণিকাগুলো পরস্পরের সংস্পর্শে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বহুদূরে ছিটকে পড়ার কথা ছিল কিন্তু তা হয়নি। মহান আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী। এখানে পরমাণুর ভিতর তাই পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম নীরবতা অবলম্বন করছে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে। আল্লাহ্‌ নিজকে প্রকাশের জন্যই এ ব্যবস্থা করেছেন শুরুতে।

"যারা (চরম বাস্তবতার আলোকে মহাবিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা) আমার (বাস্তব উপস্থিতির) নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে (অজ্ঞতা ও সংকীর্ণ মানসিকতার জন্য) তাদের কার্য নিষ্ফল হয়। তারা যা করে সে অনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।" (৭ ঃ ১৪৭)
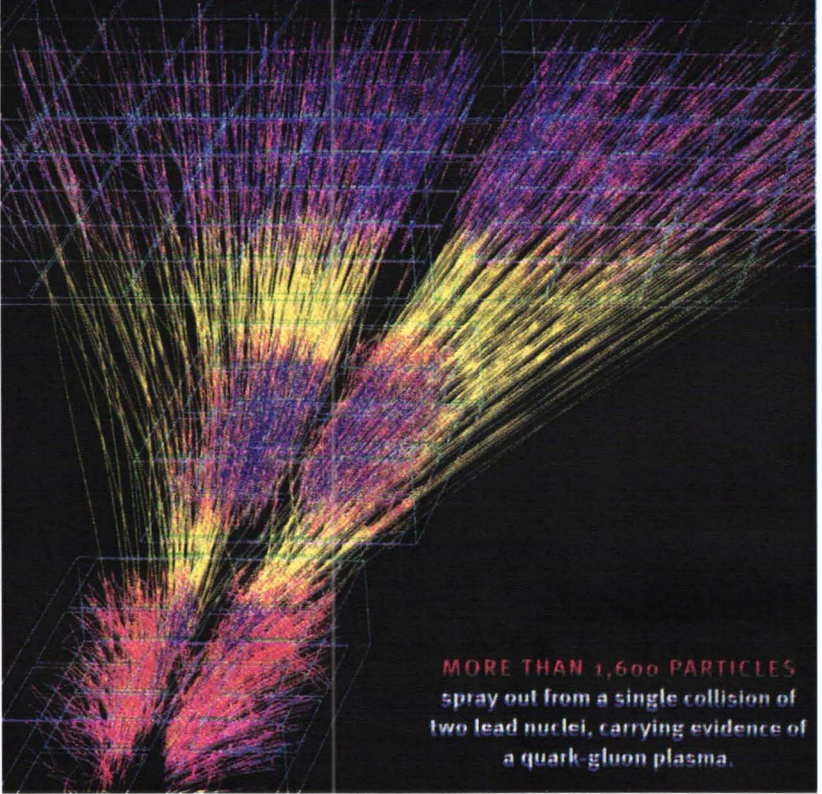
চিত্র-৫১

– Electron Microscope দিয়ে উদ্‌ঘাটিত পারমাণবিক জগতকে আরও গভীরভাবে জ্ঞানগত উচ্চমানে উপলব্ধির জন্য বিজ্ঞান Particle Accelerator তৈরী করে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা মূলতঃ ৩টি করে 'কোয়ার্ক' দিয়ে গঠিত। কোয়ার্কের সজ্জিতকরণের ওপরই চার্জ নির্ভর করে। এ ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তা'আলা-ই করেছেন। মানুষ শুধু বিষয়টি অবহিত হতে পেরেছে, এর বেশী কিছু নয়, সত্য নয় কী? তাহলে কেন আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা হচ্ছে?

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) অণু-পরমাণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নেই এবং তা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর (কোয়ার্ক ও ফোটন কণিকাও) অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।" (১০ ঃ ৬১)
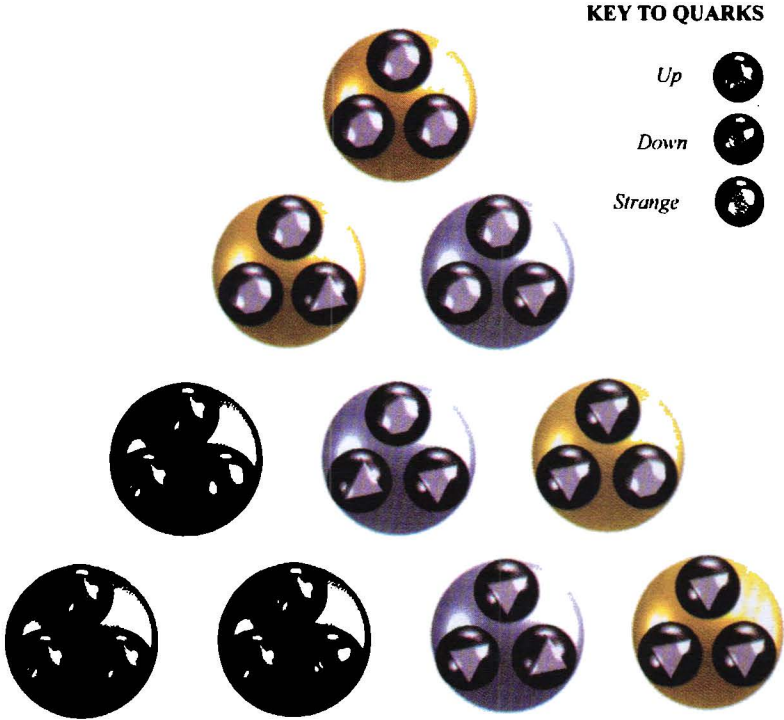
চিত্র-৫২

– ওপরের ছবিতে তিন প্রকারের কোয়ার্ক-এর সজ্জিতকরণ দেখানো হয়েছে, যদিও এ যাবত ৬ প্রকার কোয়ার্ক আবিষ্কৃত হয়েছে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আল্লাহ্ (সর্বশক্তিমান) অন্য এক প্রকার শক্তির মাধ্যমে এই কোয়ার্ককে প্রভাবিত করে প্রতিটি মুহূর্তে চার্জকে রদবদল করে করে ভারসাম্য সৃষ্টির মাধ্যমে একই জাতীয় চার্জযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রোটনগুলোকে জড়াজড়ি করে থাকতে বাধ্য করছেন এবং নিউট্রনকেও একই অবস্থা দান করছেন। সুতরাং আল্লাহ্ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকা জ্ঞানীদের জন্য সমীচীন নয়।

"এতে (মহান স্রষ্টা পরাক্রমশালী আল্লাহর বাস্তব উপস্থিতি এবং তাঁর সার্বক্ষণিক সক্রিয় তদারকির) তো নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।" (১৪ ঃ ৫)
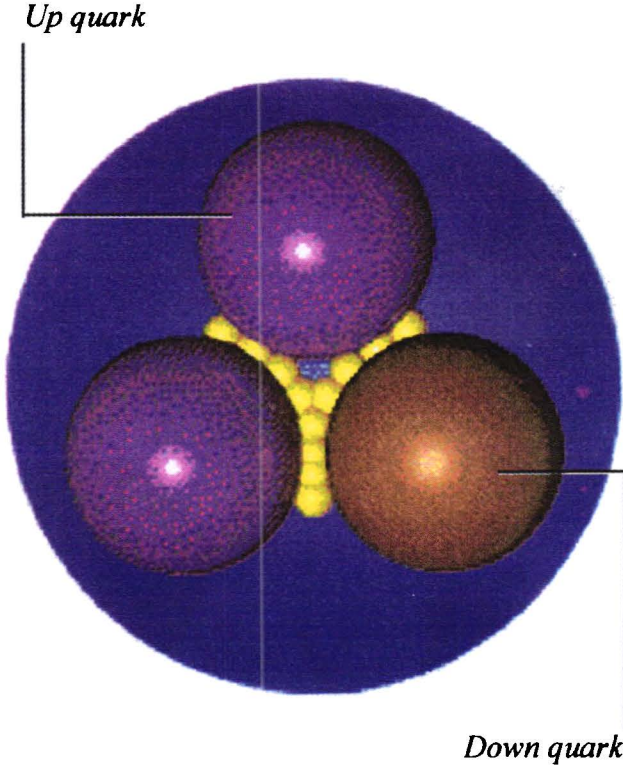
চিত্র-৫৩

– প্রতিটি প্রোটন ও প্রতিটি নিউট্রন কণিকার ভেতর রয়েছে তিনটি করে কোয়ার্ক কণিকা এবং বাইন্ডিং এনার্জি রূপে 'গ্লুওন' নামক মহাসূক্ষ্ম কণিকা, ২টি Up Quark এবং ১টি Down Quark থাকলে প্রোটন কণিকায় রূপ নেবে, এবং ২টি Down Quark ও ১টি Up Quark থাকলে তা নিউট্রন কণিকায় পরিণত হবে।

আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছায় এ ব্যবস্থা চালু করেছেন, সত্য নয় কী? মানব সমাজের এ ব্যাপারে কোন ভূমিকা আছে কী? তাহলে কেন তাঁর উপস্থিতি মেনে নিতে দ্বিধা?

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) লুকায়িত বিষয় কিংবা (মহাসূক্ষ্মতার কারণে) অদৃশ্য বস্তুকে (বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার আর উদঘাটনের মাধ্যমে) প্রকাশ করে থাকেন।" (২৭ ঃ ২৫)
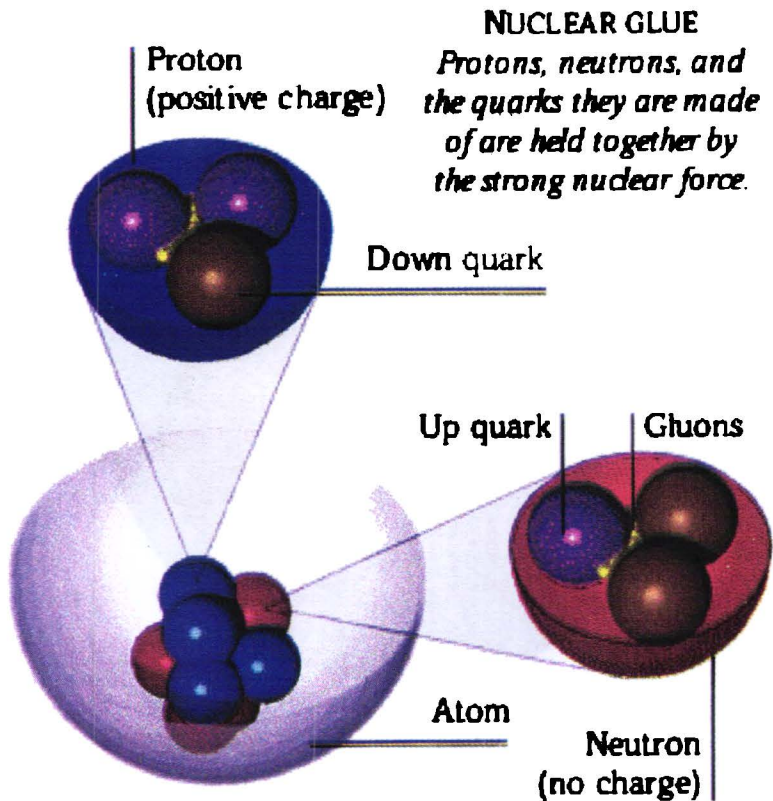
চিত্র-৫৪

– আমাদের এ মহাবিশ্বে সকল প্রকার বস্তুর একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ ইউনিট হচ্ছে 'পরমাণু'। আল্লাহ্ তাঁর নিজ মহান সত্তার উপস্থিতি এবং প্রভাব মানবমণ্ডলীকে প্রদর্শনের জন্য এ প্রথম ইউনিটকে, সমগ্র বস্তু জগতে কার্যরত স্থায়ী বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা দিয়ে ভারসাম্য সৃষ্টি করেছেন। যাদের জ্ঞানচক্ষু আছে তারা যেন এর ভেতর দিয়ে আল্লাহ্‌কে দেখতে পায়। অস্বীকার করার যুক্তিসঙ্গত কোন পথ নেই।

"মানুষের (বুঝার জন্য যে, আল্লাহ্ একজন স্রষ্টা হিসেবে বর্তমান আছেন, তিনি সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী 'পরমাণু'র ভেতর এ ব্যবস্থা সেট-আপ করেছেন, নতুবা এত জটিল সব বিজ্ঞানময় বিধান কিভাবে চালু হয়ে কার্যরত থাকতে পারে? এ কথা উপলব্ধির) জন্য আমি এ সকল দৃষ্টান্ত দেই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে থাকে।" (২৯ ঃ ৪৩)
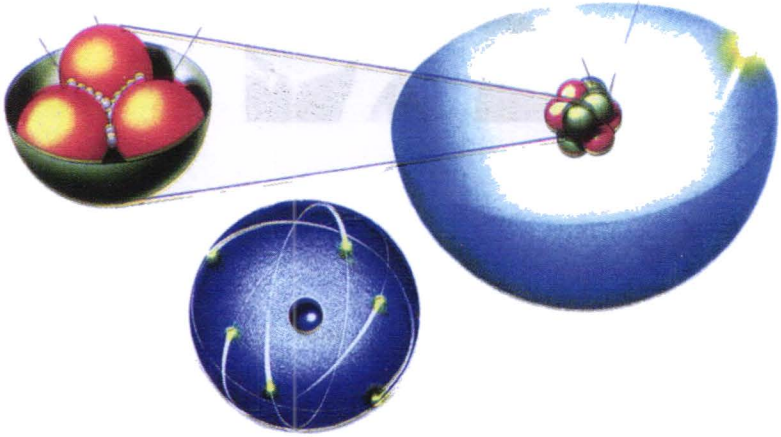
চিত্র-৫৫

– পরমাণুর নিউক্লিয়াসের আলোচিত রহস্য প্রমাণ করছে 'আল্লাহ্' আছেন। যদি 'আল্লাহ না থাকতেন' এবং প্রতি মুহূর্তে এ কাজ পর্যবেক্ষণ ও তদারকি না করতেন তাহলে সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী পদার্থ বিজ্ঞানের যে বিধান চলছে, পরমাণুর ভেতরও সেই বিধান কার্যকরী হওয়ার দরুন 'নিউক্লিয়াস' থেকে সমজাতীয় চার্জযুক্ত প্রোটনগুলো বিকর্ষণের কারণে বিক্ষিপ্ত হয়ে চতুর্দিকে ছিটকে চলে যেত, অদৃশ্য হয়ে যেত মহাবিশ্বের সকল বস্তু কিংবা মহাবিশ্ব সৃষ্টিই হতো না। সত্য নয় কী? 'এগুলোই প্রমাণ আল্লাহ্ সত্য"। (৩১ ঃ ৩০)

"অদৃশ্যের পরিপূর্ণ জ্ঞান কেবল তাঁরই (কেননা বাদ বাকী সবাই সীমাবদ্ধ জ্ঞান, শক্তি ও দৃষ্টির অধিকারী এবং এ জাতীয় দুর্বলতা নিয়ে) তাঁর জ্ঞানের নিরূপণ কারও সাধ্যে নেই।" (৭২ ঃ ২৬)
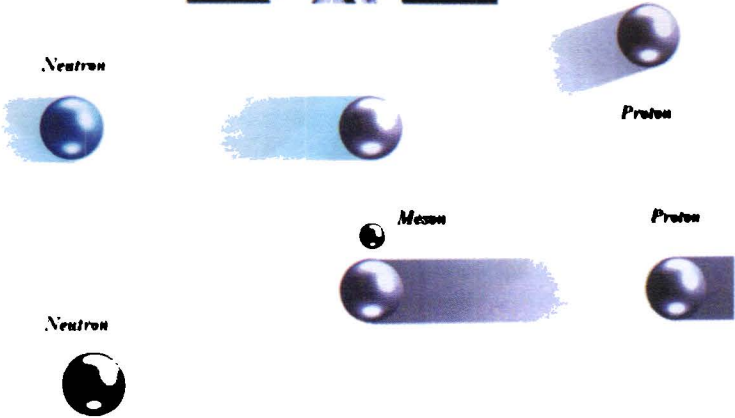
চিত্র-৫৬

– পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মের সরাসরি লংঘনে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট বিস্ময়কর কৌশলী শক্তিকে 'Pi-Meson' 'Nuclear binding energy' নামে আখ্যায়িত করেছেন ১৯৩৪ সালে জাপানি বিজ্ঞানী Hediki Yukawa.

সমগ্র মহাবিশ্বে সার্বিকভাবে ব্যাপক আকারে কার্যরত আছে Physical Law. অথচ এরই ভেতর দিয়ে শুরুতেই পরমাণুতে চলছে Anti Physical Law. এ যেন জ্ঞানীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর নিজ সত্তাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। সত্য নয় কী? যারা প্রকৃতই জ্ঞানী, তারা ব্যাপারটি ঠিকই উপলব্ধি করতে সক্ষম।

"প্রকৃত ব্যাপার হলো যে, আমার (পক্ষ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ) নিদর্শন (বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে) তোমার নিকট এসেছিল। তুমি (হঠকারিতা করে) এগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে এবং অহংকার করেছিলে (অজ্ঞদের মত), আর তুমি তো ছিলে অবিশ্বাসীদের একজন।" (৩৯ ঃ ৫৯)
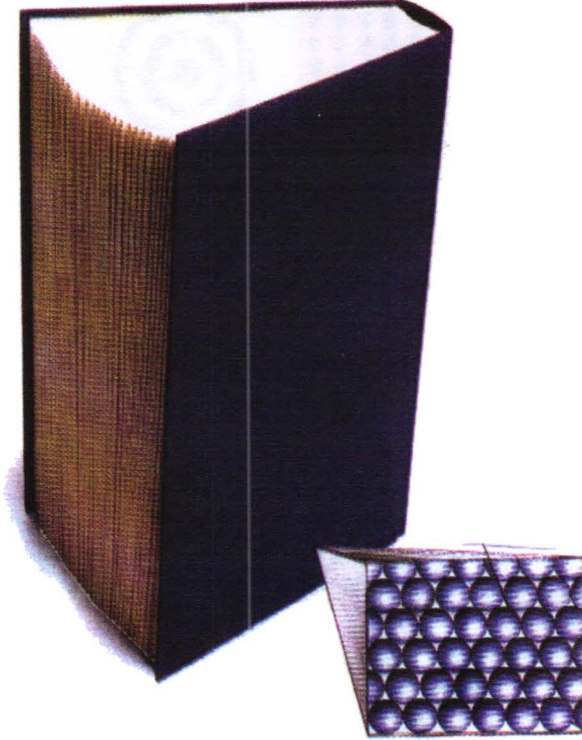
চিত্র-৫৭

– পরমাণুতে Anti Physical Law কার্যকর হওয়াতে পরমাণু অটল পদার্থ হতে পেরেছে। ফলে একাধিক পরমাণু মিলিত হয়ে 'অণু' সৃষ্টি সম্ভব করে তুলেছে। আবার বহু সংখ্যক 'অণু' মিলিত হয়ে বস্তু সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ঃ ছবির 'বই'টি। বক্ষ্যস্থিত চোখ এবার খুলবে কী? এখন এক মুহূর্তের জন্য যদি আল্লাহ্ তাঁর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেন, তাহলে পরমাণু ভেঙ্গে যাওয়ায় মহাবিশ্ব অদৃশ্য হয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যেই। আল্লাহ্ যে মহাজ্ঞানী, তা আর বলার প্রয়োজন আছে কী?

"তুমি কি জাননা যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) যা কিছু রয়েছে (দৃশ্য-অদৃশ্য মহাসূক্ষ্ম আর বৃহৎ) আল্লাহ্ তার সবই অবগত আছেন (পরিপূর্ণরূপে)। এ সকলই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে (প্রতিটি বস্তু ও শক্তি কণিকা পর্যন্ত কে কিভাবে সৃষ্টি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত হবে সব কথাই), এটা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ (একটি ব্যবস্থা, যে কারণে সমগ্র মহাবিশ্ব তাঁর নখদর্পণে)।" (২২ ঃ ৭০)
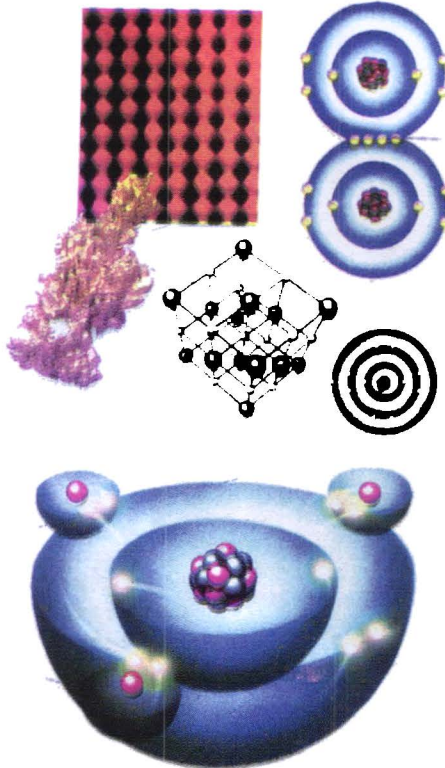
চিত্র-৫৮

– মহাশক্তিধর 'আল্লাহ্' সত্যিই মহান। তাঁর পক্ষ থেকে যদি আলোচিত ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা না হতো, তাহলে 'প্রচলিত পদার্থ বিজ্ঞান' শুরুতেই হয়তো 'পরমাণু' সৃষ্টি হতে দিত না। নয়তো সমগ্র মহাবিশ্বকে একটি জমাটবদ্ধ পিণ্ডে পরিণত করে ফেলতো। ওপরে ছবিতে দৃশ্যমান পদার্থ তৈরীর Chain of system কার্যকরী হতো না। সব অস্তিত্বহীন থেকে যেত। আল্লাহ সে অবস্থাকে প্রতিরোধ করেছেন Anti Physical Law দিয়ে। মানুষ তা খুব কমই উপলব্ধি করে।

"অতএব হে জ্ঞানী সমাজ" (জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত অসংখ্য বাস্তব নিদর্শনের আলোকে) আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো, যাতে (আসন্ন ভয়াবহ বিপদ হতে) পরিত্রাণ পেতে পার।" (৫ ঃ ১০০)
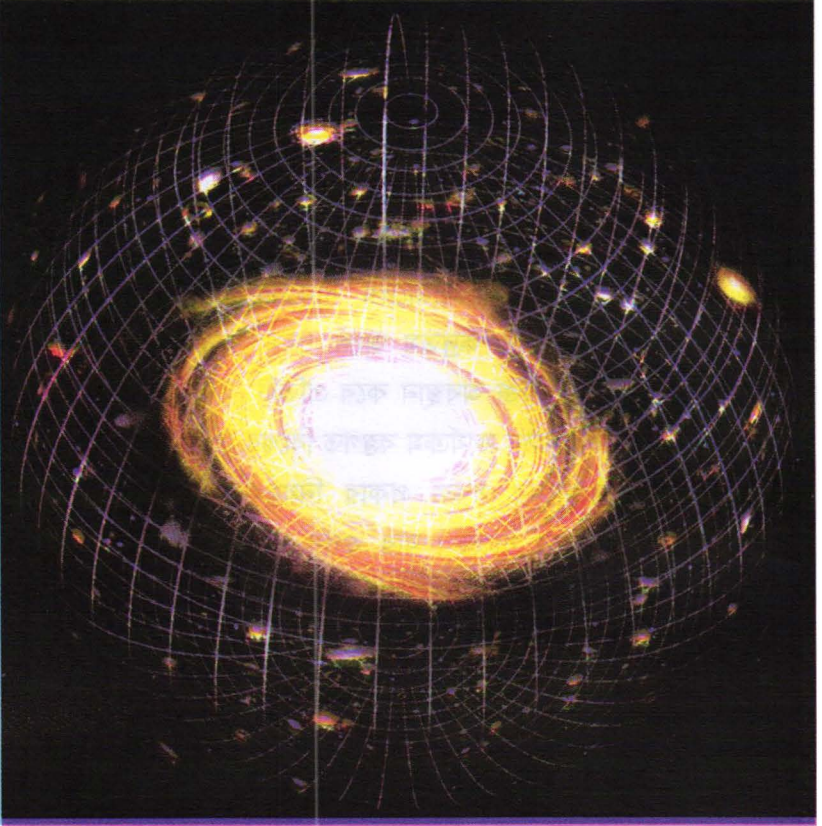
চিত্র-৫৯

– মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা 'আল্লাহ্'র বিস্ময়কর কর্মকাণ্ডের ফলে একদিকে যেমন সুন্দর এবং চমৎকার সমগ্র মহাবিশ্বটি অস্তিত্ব ধারণ করা সম্ভবপর হয়েছে, তেমনিভাবে এ কাজের ভেতর দিয়ে তাঁর বাস্তব উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ সমাজের জ্ঞানীদের নিকট স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। এ অবস্থায় জ্ঞানীদের জন্য শোভনীয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র সম্মুখে মাথা অবনত করা। সত্যপন্থী হয়ে জীবন-যাপন করা। তা না হলে জ্ঞানপাপী হিসেবে অবশ্যই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

ফলে কোন পদার্থই তার আকার-আকৃতি, গুণাগুণ, গঠন কোন কিছুই লাভ করতে পারতো না। আর এ অবস্থা যদি সৃষ্টির শুরুতেই ঘটতো, তাহলে আমরা আজকের দৃশ্যমান জগত (বর্তমানরূপে) দেখতে পেতাম না, তা নিরেট একটা বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়ে যেত। আমরা প্রাণীজগতসহ সকল কিছুই অস্তিত্বহীন থাকতাম। এই মহাবিশ্বের গোড়া পত্তনের পেছনে যে মূল পদার্থ কণা তথা 'পরমাণুর' অভ্যন্তরে যে গোপন রহস্যের জাল বুনা হয়েছে 'অজ্ঞাত শক্তির' সক্রিয় হস্তক্ষেপে, তা ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক হতে হয়, জ্ঞানের দৃষ্টি যেন আর সামনে এগুতে পারে না। বিজ্ঞানের আজ একটিই প্রশ্ন এ অজ্ঞাত শক্তির উৎস কোথায়?

ওপরের আলোচনায় বিজ্ঞান আমাদের সামনে তুলে ধরেছে যে, এই মহাবিশ্বে মৌলিক পদার্থের ক্ষদ্রতম অংশ পরমাণুর কেন্দ্র 'নিউক্লিয়াসে' বিস্ময়কর এক সক্রিয় শক্তি অবস্থান করে প্রতিটি মৌলিক পদার্থের মূল কণিকাসমূহের সার্বিক গঠন কার্যক্রম বস্তুগত বিশ্বের (Material World-র) প্রচলিত পদার্থ বিজ্ঞানের সকল প্রকার নিয়ম-নীতিকে উপেক্ষা করে প্রতিনিয়ত নিশ্চিত করে যাচ্ছে। যার ওপর পদার্থের গঠন, আকৃতিসহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ গুণাগুণসমূহ নির্ভর করছে। বর্তমান বিজ্ঞান বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে অজ্ঞাত এই বলের প্রত্যক্ষ নিদর্শন বাস্তব চোখেই অবলোকন করছে, তারা এ ব্যাপারে লিকুইড-ড্রপ মডেল, শেল মডেল ও যৌথ মডেল ইত্যাদিতে পরমাণুর কেন্দ্রস্থ নিউক্লিয়াসের অজ্ঞাত বন্ধন শক্তিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু পৃথিবীর পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম-নীতিতে বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ ও সমমেরুতে বিকর্ষণ কোন 'সত্তা' ধুলিস্মাৎ করে দিয়ে একেবারে বিপরীত নীতিকে সেখানে কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত করলেন (যা মহাবিশ্বের আর কোন ব্যাপারে পরিলক্ষিত হয় না) তাঁর সন্ধান বিজ্ঞান সরাসরি বলতে পারেনি।

আমাদের গোটা মহাবিশ্বের প্রতিটি পদার্থের গঠন প্রক্রিয়ার মূল যে পরমাণু কেন্দ্র 'নিউক্লিয়াস', সেই নিউক্লিয়াসের উপাদান প্রোটন এবং নিউট্রন

কণিকাসমূহ কেন প্রচলিত পদার্থ বিজ্ঞানের সকল নিয়ম-নীতিকে লংঘন করে বস্তুগত এই মহাবিশ্বে একতরফাভাবে প্রশ্নবোধক চিহ্নের সৃষ্টি করেছে? কেন তাদের এ জাতীয় অচিন্তনীয় অকল্পনীয় আচরণ? অথচ পরবর্তী সকল পর্যায় এবং ধাপে, পদার্থ নিবিড়ভাবে বস্তুজগতের সকল নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি সমমেরুতে বিকর্ষণ ও বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছে। তাহলে আমরা কি ধরে নেব যে, বর্তমান বিজ্ঞান মস্তিষ্কসহ জ্ঞানী সমাজের সকলের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পরিকল্পনা করেই তা সৃষ্টি করা হয়েছে? যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে কে তিনি; যিনি বিস্ময়াভূত এই বন্ধন শক্তি এবং বিকর্ষণ সৃষ্টির শক্তির মাধ্যমে সকল প্রকার পদার্থের মূল 'পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে' নিজের সরাসরি সক্রিয় তত্ত্বাবধানের আওতায় রেখে মহাবিশ্বের গোড়া পত্তন করেছেন এবং তার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ কার্যও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছেন?

পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুর 'নিউক্লিয়াসে' যে 'পবিত্র সত্তা' শক্তির এত বিচিত্র এবং বিস্ময়কর কার্য সম্পাদন করে চলেছেন; তিনি কি বিশ্বজাহানের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা-প্রভু-মালিক 'এক আল্লাহ্' নন্? গোটা মহাবিশ্বের যে কোন স্থানের পরমাণুর 'নিউক্লিয়াস' একই রকম আচরণ করায় কি একথা প্রমাণ হয় না যে, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে দাবীকৃত তথ্য মহাবিশ্বের সকল বস্তুকে যে পরিবেষ্টন করে আছেন তা চিরসত্য কথা? যিনি প্রতি মুহূর্তে তাদের কার্যক্রম এক বিপরীতধর্মী নিয়ম দিয়ে নিশ্চিত করছেন? পরমাণুর নিউক্লিয়াসে তাঁর পক্ষ থেকে– বর্ণিত মেসন তত্ত্ব দিয়ে হস্তক্ষেপ যদি না করা হতো- তাহলে দৃশ্য-অদৃশ্য মিলে যে, এ মহাবিশ্ব এবং তার সকল প্রকার মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ তা-কি সৃষ্টি হতে পারতো?

এমন বিস্ময়কর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক দ্বিতীয় আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কি? Why not flee to him now?

এবার আমরা পুরো বিষয়টি পাশাপাশি এক নজরে দেখে নিই।

এক নজরে

আল্-কুরআন

বর্তমান বিজ্ঞান

১. *"আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।" (৮ ঃ ৪৯) "তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সকল বস্তুর সকল অবস্থা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।" (৬ ঃ ১০২)*

১. বিজ্ঞান ভূ-পৃষ্ঠে জ্ঞানের সকল বিভাগেই নিজ যোগ্যতায় ব্যাপক সাফল্য অর্জনে সফল হলেও কিন্তু কখনই মহাপরাক্রমশালী কিংবা মহাজ্ঞানের ধারক হিসেবে নিজ পক্ষ থেকে মোটেই দাবী করেনি। সাথে সাথে কোন ব্যাপারেই কখনও সৃষ্টিকর্তার দাবীও উত্থাপন করেনি। যা দাবী করে তা হলো- আবিষ্কার বা উদ্‌ঘাটনের কৃতিত্বটুকুন শুধু। অধিকন্তু এ মহাবিশ্বের পরতে পরতে প্রতিটি বিষয়ে অদৃশ্য জ্ঞানের অবোধগম্য কর্মকাণ্ড দেখে বিনা দ্বিধায় এর পেছনে অদৃশ্য 'মহাশক্তির' উপস্থিতিকে বিজ্ঞান পরোক্ষভাবে স্বীকার করছে।

২. *"তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথাযথ করেছেন নির্দিষ্ট অনুপাতে।" (২৫ ঃ ২) "দয়াময়ের সৃষ্টিতে কখনো সামঞ্জস্য ও অনুপাতের ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না।" (৬৭ ঃ ৩)*

২. বিজ্ঞান মহাবিশ্বের এ পর্যন্ত যতটুকুন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে তার ভেতর কোন একটি বিষয়েরই সৃষ্টি, গঠন, আকৃতি, কর্মকাণ্ড, পরিণতি, কোন কিছুতেই একই জিনিষের মধ্যে ভিন্নতা উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। সর্বত্রই যেন সূক্ষ্ম পরিমাণমিতির আশ্চর্য করার মত একই ধরনের সুসামঞ্জস্যতা বিরাজমান।

প্রতিটি বস্তুই মহাবিশ্বের যে কোন স্থানে তার নিজস্ব একই জাতীয় আচরণ, তৎপরতা, কর্মকাণ্ড ও নিয়ম-নীতি প্রদর্শন করে (একই স্রষ্টার যেন

গোলামী করে) চলেছে। কোথাও কোন ব্যতিক্রম বা ভিন্নতা নেই।

৩. "তারা কি আসমান ও জমিনের ব্যবস্থার দিকে তাকায় না এবং তাদের প্রতি যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন?" (৭ ঃ ১৮৫)

"(আল্লাহ্) যিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর এদের পথ (ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম, সীমা ও ধর্মরীতি ইত্যাদি) নির্দেশ করেছেন।" (২০ ঃ ২৫)

৩. চরম উৎকর্ষতায় মোড়ানো বর্তমান বিজ্ঞান মহাবিশ্বের প্রায় প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টি, আকৃতি, গঠন, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সকল বিষয়ের রহস্য উদঘাটনের জন্য প্রতিনিয়তই পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।

ফলে ইতিমধ্যেই অগণিত আবিষ্কারের মাধ্যমে মানবমণ্ডলীর জ্ঞানের সম্মুখে হাজারো জ্ঞানপূর্ণ তথ্য এবং বাস্তব নিদর্শন উন্মুক্ত অবস্থায় মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

যদিও বিজ্ঞান বাস্তব প্রমাণ ছাড়া কোন বিষয়ে সরাসরি বিশ্বাস স্থাপন সচরাচর করে না, তথাপিও মহাবিশ্বের সর্বত্রই প্রতিনিয়ত নিয়ম-শৃংখলা ও ক্রমধারা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে এর পেছনে যে মহাজ্ঞানী ও প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন কোন মহান 'সত্তা' অবশ্যই যে অদৃশ্য থেকে সকল কিছু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকবেন সেকথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করছে। 'নিজ থেকেই কিংবা এমনি-এমনি সব হচ্ছে' সে হাস্যকর কথা বর্তমান সাফল্যজনক বিজ্ঞান বাস্তবতার আলোকে কোনভাবেই মেনে নিতে রাজী নয়।

৪. "তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সকল বস্তুর সকল অবস্থা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।" (৬ ঃ ১০২)

"তিনি এ মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সকল কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।" (৬৪ ঃ ৪)

৪. যেহেতু বিজ্ঞান মহাবিশ্বের মহাজাগতিক কোন কিছুই সৃষ্টি করেনি তাই মহাবিশ্বের সকল কিছু সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অবগত নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে যখন যতটুকুন উদ্‌ঘাটিত হয় কেবল ততটুকুনের উদঘাটিত সীমা পর্যন্তই অবগত থাকে, এর বাইরে চুল পরিমাণও বিজ্ঞান জানে না।

৫. "প্রতিক্ষণ তিনি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে সু-প্রতিষ্ঠিত"
(৫৫ ঃ ২৯)
"তোমার প্রতিপালক সকল বস্তুর রক্ষণা-বেক্ষণ করেন। (১১ ঃ ৫৭)

৫. বিজ্ঞান মহাবিশ্বের সকল বস্তুকে একই সাথে জ্ঞানের বেল্টে পরিবেষ্টন করে রাখার কোন যোগ্যতা রাখে না এবং সে দাবী উত্থাপনও করে না।

সমগ্র মহাবিশ্বের কথা তো অনেক দূরে, ওদের ভগ্নাংশের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণেও বিজ্ঞান সকল সময় সকল অবস্থায় অপারগ। এ এক অকল্পনীয় ব্যাপার, বিজ্ঞান মস্তিষ্ক সুস্থাবস্থায় যা কখনো কল্পনাও করতে পারে না।

৬. "প্রভু তাঁর জ্ঞানে সমস্ত বস্তু ঘিরে রেখেছেন।"
(৭ ঃ ৮৯)

৬. চূড়ান্ত সফলতায় পৌঁছার পরও বিজ্ঞান কখনই মহাবিশ্বের সকল বস্তুকে জ্ঞানের মাপ-কাঠিতে আবদ্ধ করার যোগ্যতা রাখে না। প্রতিনিয়ত পরিবেষ্টন করে রাখা তো অনেক দূরের কথা। বিজ্ঞান স্রষ্টা নয়, আবিষ্কারক মাত্র।

"পালনকর্তা নিজ জ্ঞানের বিস্তৃতিতে প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছেন, তা কি তোমরা দেখতে পাওনা?" (৬ ঃ ৮০)

বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ 'পরমাণু' আশ্চর্য করার মত বস্তু জগতের পদার্থ বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে যে ৩টি ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ প্রদর্শন করছে, তাতে প্রতীয়মান হয় অদৃশ্য থেকে কোন প্রচণ্ড শক্তির উৎস 'পরমাণুকে' সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করছে। তা না হলে আজকের এই মহাবিশ্বই অস্তিত্ব ধারণ করতে পারতো না।

"সতর্ক হও, তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" (৪১ ঃ ৫৪)

'পরমাণুর' ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ ৩টি হচ্ছে ঃ ১- 'প্রোটন' কণিকা পজেটিভ চার্জযুক্ত এবং নিউট্রন কণিকা চার্জমুক্ত হওয়ার পরও ওদের মধ্যে 'আকর্ষণ বল' সৃষ্টি হওয়া, যা পদার্থ বিজ্ঞানের স্বাভাবিক আচরণ বহির্ভূত।

২- 'প্রোটন' কণিকাসমূহ একই জাতীয় পজেটিভ চার্জযুক্ত হওয়ার পরও ওদের পরস্পর পরস্পরের

সাথে গায়ে গায়ে লেগে নিউক্লিয়াসে অবস্থান করতে থাকে। যা পদার্থ বিজ্ঞানের সরাসরি লংঘন। কেননা সমজাতীয় চার্জ বিকর্ষণ বল সৃষ্টি করার এবং বিস্ফোরণ ঘটানোর কথা।

৩- 'প্রোটন' কণিকাদ্বয়ের মাঝে 'বিকর্ষণ বলে'র বিপরীতে নতুন যে 'আকর্ষণ বল' সৃষ্টি হয়ে ওদেরকে গায়ে গায়ে লেগে অবস্থান করতে বাধ্য করে, তা কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম পরিমিতি বজায় রাখে। নতুবা ঐ আকর্ষণ বল বেশী হলে প্রোটন কণিকাদেরকে পরস্পরের সাথে এত গভীরভাবে মিশিয়ে ফেলতো যে গোটা মহাবিশ্বটি নিরেট একটা পিণ্ডে পরিণত হয়ে যেত। জগতকে আজকের চেহারায় দেখতে পেতাম না। সত্যি বড় বিস্ময়ের বিস্ময় নয় কী?

৭. "তাঁর হস্তেই সকল বস্তুর কর্তৃত্ব। (৩৬ ঃ ৮৩)
"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।" (৩ ঃ ৮৩)

৭. মহাবিশ্বে কোন বস্তুর কর্তৃত্ব-ই বিজ্ঞানের কৃতিত্বের নামে চলছে না। কারণ বিজ্ঞান মৌলিকভাবে কোন বস্তুই সৃষ্টি করেনি, যা করতে পেরেছে তা হলো- আবিষ্কার বা উদ্ঘাটন মাত্র। আর এই উদঘাটন বা আবিষ্কার কখনই সৃষ্টি কার্যের মর্যাদা বহন করে না।

মহাবিশ্বের কোন কিছুই বিজ্ঞানের গোলামীতে বাধ্য নয় এবং বিজ্ঞানও সে ধরনের অপ্রত্যাশিত কিছু দাবী করে না।

৮. "মহা বিজ্ঞানময় এই কুরআন।" (৩৬ ঃ ২)
"এগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ ঃ ১)

৮. কুরআনের "বৈজ্ঞানিক" তথ্যসমূহ দীর্ঘ ১৪০০ বৎসর পুরনো হলেও বিজ্ঞান তার সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত আবিষ্কারের উৎকর্ষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা ছাড়া ঐ তথ্যসমূহের নিকটেও ঘেঁষতে পারেনি।

সাদা-মাটা বিজ্ঞান দিয়ে 'কুরআন' বুঝা সত্যিই এক দুরূহ্ ব্যাপার।

"কুরআন তোমাদের জ্ঞান-চক্ষু হিসেবে তোমাদের পালনকর্তার নিকট হতে অবতীর্ণ। সুতরাং যে দেখতে পেল সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করল।" (৬ ঃ ১০৪)

নিরপেক্ষ মঞ্চে দাড়িয়ে বিজ্ঞান নির্ভীকভাবেই স্বীকার করে 'কুরআনের' পেশকৃত বৈজ্ঞানিক ভাষ্যসমূহ 'কুরআনকে' জ্ঞান গর্ভ গ্রন্থের মর্যাদায় আসীন করেছে।

বিজ্ঞান তার বর্তমান আবিষ্কারসমূহ দিয়ে একথা স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করেছে এবং জানিয়ে দিচ্ছে যে, মহাগ্রন্থ 'কুরআনের' পবিত্র বাণীসমূহ গোটা মহাবিশ্ব জুড়ে মানবমণ্ডলীর জন্য জ্ঞান-চক্ষু হিসেবেই ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পৃথিবীতে যার দ্বিতীয় নজির নেই।

৯. "আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই। এটা এক মহা সাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

"তোমাদের প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায় সংগত, তাঁর বাণী কেউই মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয়েই অবগত রয়েছেন। (৬ ঃ ১১৫)

৯. মহাবিশ্বের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিটি ক্ষেত্রেই যতক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞান তার সার্বিক রহস্য আবিষ্কার করতে পারেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত বার বার পরিবর্তনমুখী বক্তব্য পেশ করে যেতেই থাকে।

কোন কোন বিষয়ে দেখা গেছে শত বৎসরেও সঠিক রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি এবং এরই মাঝে প্রায় শতবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়েছে। এ দুর্বলতা বিজ্ঞানের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

১০. সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্' তাঁর সৃষ্টির ক্ষুদ্র-সূক্ষ্ম কণিকা পর্যন্ত তাঁর অসীম জ্ঞানের পরিবেষ্টনে ঘিরে আছেন বলে মানব সমাজকে অবহিত করেছেন প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে। বর্তমান উৎকর্ষিত 'বিজ্ঞান'

১০. বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দিতেই কেবল বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ 'পরমাণুর' রহস্য উন্মোচন করার পরই প্রমাণ করে যে, 'পরমাণুর' সূক্ষ্ম-কণিকাসমূহ 'নিউক্লিয়াস' গঠনের মাধ্যমে মহাবিশ্বময় বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করেছে, আর তা করতে গিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রচলিত আইনকে ভঙ্গ করে যে ৩টি ব্যতিক্রমী আচরণ প্রকাশ করেছে

চলেছে। "অতএব এগুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১ ঃ ৩০

তাতে প্রতীয়মান হয় অদৃশ্য থেকে কোন মহাজ্ঞান ও মহাশক্তি সম্পন্ন এক পরাক্রমশালী 'সত্তা' এর পেছনে সক্রিয় রয়েছেন।"

সুতরাং "ওপরে আলোচিত অধ্যায়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, আল্লাহ্ তাঁর উপস্থিতির চির সত্যতাকে জ্ঞানের মোড়কে প্রকাশ করার জন্য সমগ্র মহাবিশ্বের গঠন প্রক্রিয়ায় মৌলিক বস্তু কণার একক (unit) 'পরমাণু' (Atom)-র মূল অংশ 'নিউক্লিয়াসে' বস্তু জগতের চিরাচরিত নিয়ম-নীতিকে (Phisical Law) গুড়িয়ে দিয়ে এক বিপরীতধর্মী মহাবিস্ময়কর অবস্থার ভেতর দিয়েই জগতের গোড়া পত্তন ঘটিয়েছেন। তাঁর মত সর্বশক্তিমান স্রষ্টার একান্ত উপস্থিতি ছাড়া কি সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী বস্তুভর (Mass) উল্লেখিত ব্যতিক্রমী আচরণ মেনে নিয়ে দৃশ্যমান রূপ লাভ করতে পারে?

মানব সমাজের জ্ঞানীজন আল্লাহ্র উপস্থিতির সপক্ষে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি চান? 'পরমাণুর' ভেতর 'নিউক্লিয়াসে' প্রোটন কণিকাদের সমজাতীয় পজেটিভ চার্জের প্রচণ্ড বিস্ফোরণকে গলা চিপে ধরে যিনি মহাবিশ্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন, তিনি কি সেই মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্' নন? তাহলে তাঁর সম্মুখে এখনি মাথা অবনত করে ধন্য হতে বাধা কোথায় হে জ্ঞানী সমাজ?
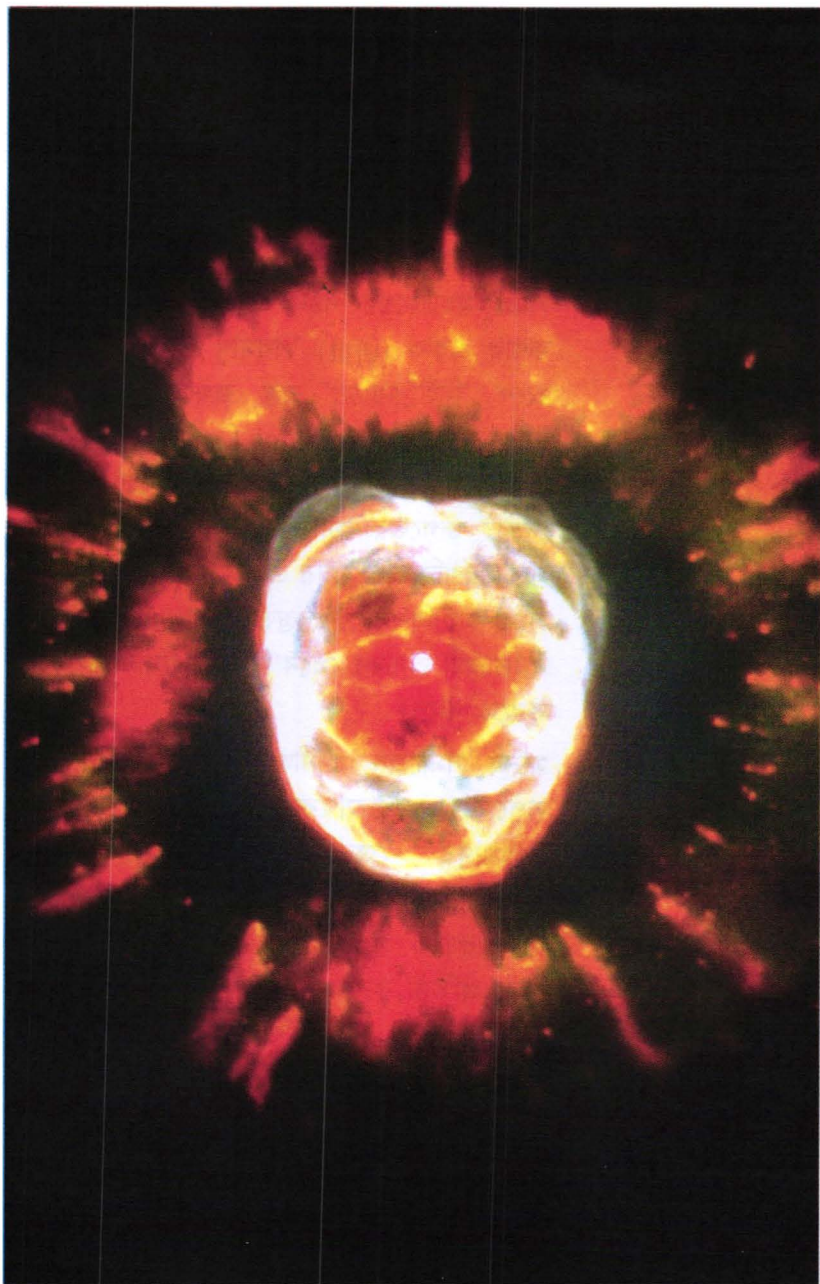
মহাবিস্ময়কর স্রষ্টা
(২)

আল্-কুরআন

"আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী।" (৮ ঃ ৪৯)

"তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথাযথ করেছেন নির্দিষ্ট অনুপাতে।" (২৫ ঃ ২)

"যিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর এদের পথ (ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম, সীমা ও ধর্মরীতি ইত্যাদি) নির্দেশ করেছেন।" (২০ ঃ ২৫)

"পালনকর্তা নিজ জ্ঞানের বিস্তৃতিতে প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছেন, তা কি তোমরা (বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর উদ্ঘাটনের মাধ্যমে) দেখতে পাচ্ছনা?" (৬ ঃ ৮০)

"তোমার প্রতিপালক সকল বস্তুর রক্ষণা বেক্ষণ করেন।" (১১ ঃ ৫৭)

উল্লেখিত 'কুরআনের' ওহীকৃত বাণীসমূহের মর্মকথা আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনায় পেয়েছি। যেহেতু বক্ষমান অধ্যায়ের বিষয়ে আয়াতগুলো সরাসরি জড়িত, তাই পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় না গিয়ে মূল পয়েন্টগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যেমন ঃ

১। আমাদের এই মহাবিশ্বে প্রচণ্ড শক্তি ক্ষমতা এবং মহাজ্ঞানের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্।

২। এ মহাবিশ্বের মাঝে তিনি যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রত্যেককেই তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী সুগঠিত করেছেন, ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন ও বিভিন্ন উপাদানের যথাযথ অনুপাতে সমন্বয় ঘটিয়ে বর্তমান আকৃতি এবং কাঠোমোতে রূপদান করেছেন।

৩। এ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর দিকে জ্ঞানে চক্ষু করলে তাদের সৃষ্টি ও

ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের পিছনে রহস্যঘেরা কলা কৌশলের উপস্থিতির নিদর্শন দেখে একথা উপলব্ধি করতে মোটেই বেগ পেতে হয় না যে, সকল ব্যাপারের মূলে অদৃশ্য একজন মহান 'সত্তা' সক্রিয় রয়েছেন। সকল ব্যাপারে সে কথাই বার বার প্রমাণিত হচ্ছে।

৪। আর সে মহান 'সত্তা' হচ্ছেন মহাবিশ্বের প্রভু 'আল্লাহ্ তা'আলা', যিনি অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং যাঁর তত্ত্বাবধানে সকল কিছুই সুনিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে।

মানবীয় জ্ঞান যেখানে গিয়ে থেমে পড়ে, তাঁর জ্ঞান সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করে, তাই দেখা যায় মানবীয় জ্ঞানে যখন কোন সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে এবং সমস্যা সমাধানের সকল প্রকার সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়, তখন একেবারে নিকট থেকে, মানব জ্ঞানে যা তুচ্ছ ঠিক এমনি এক স্থান থেকে বিস্ময়করভাবে বিরাট বিরাট পাহাড়তুল্য সমস্যার সমাধান খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে নীরবে বেরিয়ে আসে। যা মানুষের কল্পনার রাজ্যকেও কিংকর্তব্য বিমূঢ় করে দেয়। মানুষ তার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে খুব বেশি একটা বুঝতে না পারলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মহান আল্লাহ্র অদৃশ্য হস্তক্ষেপকে জ্ঞানচোখ দিয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আরও বুঝতে পারে যে, মহাবিশ্বের সকল প্রকার বস্তুর সার্বিক তত্ত্বাবধান তাঁর মহাজ্ঞানের আধারে ধারণকৃত এবং নিয়ন্ত্রিত। সেজন্য সৃষ্টির কোথাও কোন প্রকার বিশৃংখলা বা ব্যতিক্রম দেখা যায় না বরং নিয়ম ও ক্রমের সুষ্ঠু ধারাই কেবল দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রতিটি ব্যাপারেই তাঁর অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা কার্যকর না থাকলে এ মহাবিশ্বকে আমরা বর্তমানে যে মনোরম পরিবেশে পরিপাটি ও সাজানো অবস্থায় এবং সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনের উপযোগী দেখতে পাই, তা কোনদিন-ই সম্ভব হত না। ব্যাপক বিশৃংখলা, অনিয়ম ও উদ্দেশ্যহীনতা সমগ্র মহাবিশ্বকে একটি প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ছাড়তো।

আল্-কুরআনের উদ্ধৃত চিরসত্য, রূঢ়-বাস্তব ও জ্ঞানপূর্ণ বক্তব্যের আলোকে বিজ্ঞান তার কতটুকু উদ্‌ঘাটন করে মানব সমাজের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে, এবার আমরা তার যৎসামান্য হলেও দু'একটি উদাহরণের মাধ্যমে পরখ করার চেষ্টা করবো।

বিজ্ঞান

বর্তমান চরম উৎকর্ষিত বিজ্ঞান আমাদের এ মহাবিশ্বের প্রায় প্রতিটি বিষয়ের সৃষ্টি, কার্যক্রম, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের পিছনে অদৃশ্য অথচ এক মহাজ্ঞানের উৎসের উপস্থিতি যে প্রতিনিয়ত কার্যকর তা বিভিন্নভাবে প্রমাণ দাঁড় করিয়ে অকপটে স্বীকার করছে (যদিও দৃশ্যমান না হওয়ার কারণে একজন স্রষ্টাকে অস্বীকার করেই চলেছে)।

বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে, এ পর্যন্ত ১০৯টি মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার এবং মৌলিক পদার্থের 'পরমাণু' জগত পরস্পর এক কঠিন ও নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতিতে মিলিত হয়ে অগণিত যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে করুণার ডানা বিস্তার করছে, তার প্রতিটি ব্যাপারে কিন্তু পরমাণুর 'নিউক্লিয়াস-ই' বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। পদার্থের মহাসূক্ষ্ম কণিকা' 'প্রোটন ও নিউট্রন' পরস্পর মিলিত হয়ে জড়াজড়ি করে অবস্থানের মাধ্যমে উক্ত 'নিউক্লিয়াস' গঠন করে থাকে (যা আমরা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনায় পেয়েছি)। প্রধানতঃ পরমাণুর 'নিউক্লিয়াসে' 'প্রোটন' কণিকাদের সক্রিয় উপস্থিতির সংখ্যার ওপরই পদার্থের গঠন, ধর্ম, রীতি ও গুণাগুণ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যেমন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে একটি মাত্র প্রোটন কণিকা থাকলে ঐ পদার্থ 'হাইড্রোজেন' নামে, দু'টি প্রোটন কণিকা থাকলে 'হিলিয়াম' নামে চিহ্নিত হয় এবং তাদের পরস্পরের গঠন, আচরণ, গুণাগুণ ও ব্যবহারও সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

পরমাণুর 'নিউক্লিয়াসে' প্রোটন ও নিউট্রন কণিকাদ্বয়কে পরস্পরের সাথে জড়াজড়ি অবস্থান করার জন্য 'মেসন' কণিকা-ও Strong Nuclear Force-এর 'Gluon' নামক মহাসূক্ষ্ম দূত কণিকা মূল ভূমিকা পালন করে থাকে।

বর্তমান সময় পর্যন্ত আবিস্কৃত মৌলিক পদার্থের মধ্যে যে কয়টি বস্তু অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থরূপে চিহ্নিত হয়েছে, ওদের মধ্যে 'ইউরেনিয়াম' মৌল অন্যতম। যে কারণে পৃথিবীর সর্বত্র 'ইউরেনিয়াম' দীর্ঘদিন পর্যন্ত

ব্যবহার অযোগ্য পদার্থরূপে অবহেলিত ছিল। বিশ শতকের শুরুতে ১৯০৩ সালে ফ্রান্সের 'Marie Pierie Curie' বিজ্ঞানী দম্পতির মাধ্যমে 'ইউরেনিয়ামের' রেডিও এ্যাক্টিভিটি (তেজস্ক্রিয়তা) বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে রাতারাতি 'ইউরেনিয়ামের' মূল্য অন্য সকল প্রকারের পদার্থের মূল্য-মানকে ছাড়িয়ে যায়। সাথে সাথে 'ইউরেনিয়াম' থেকে নির্গত প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) কিভাবে মানুষের করায়ত্তে এনে বিশ্বসভ্যতায় ব্যবহার করা যায় সে প্রচেষ্টাও ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। ফলে চল্লিশের দশকে সর্বপ্রথম আমেরিকা এ ব্যাপারে সফলতা লাভ করে এবং 'পরমাণু বোমার' বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পর পর দু'টি পারমাণবিক বোমার আঘাত হেনে শহর দু'টিকে সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বিভৎস ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। লক্ষ লক্ষ বনি-আদমের প্রাণ মুহূর্তেই প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা এবং তাপ শক্তির তাণ্ডবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সৎ উদ্দেশ্যে ইউরেনিয়ামকে ব্যবহারের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা করতে গিয়েও প্রথমদিকে মানব সম্প্রদায়, 'ইউরেনিয়াম' থেকে প্রতিনিয়ত নির্গত তেজস্ক্রিয়তাকে (Radiation) যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের কৌশলটি অবহিত হতে না পারার কারণে ব্যর্থ হয়ে নিয়ন্ত্রণহীন 'ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসে যখন Fission পদ্ধতিতে Chain Reaction ঘটতে থাকে তখন বিরতিহীনভাবে প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা এবং শক্তি উৎপন্ন হওয়ার এই আবিষ্কারকে মানব কল্যাণের পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী মানব সমাজকে ধ্বংসের কাজে 'পারমাণবিক বোমা' তৈরীতে ব্যবহার করতে বিজ্ঞানীগণ এগিয়ে যান। কারণ Fission পদ্ধতিতে প্রতিটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভাঙ্গার সাথে সাথে তখন নুতন এক প্রকার 'নিউট্রন' কণিকা জন্ম নিয়ে থাকে ঐ বিস্ফোরণের $১০^{-১৪}$ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে, যা 'Prompt Neutron' নামে পরিচিত। এই 'Prompt Neutron' কণিকাগুলোর কাজই হচ্ছে সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত অপর পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে ভেঙ্গে দেয়া এবং প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা ও শক্তি উৎপন্ন হতে সহায়তা করা।

"তিনিই মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন ইতোপূর্বে (সে নির্বোধ ও অবুঝ শিশুরূপেই এ পৃথিবীতে আগমন করেছিল এবং সেই কারণে) সে যা জানত না।" (৯৬ : ৫)

চিত্র-৬০

– বিজ্ঞানের হিসেবে এ পৃথিবী প্রায় সাড়ে চার শত কোটি বৎসর পূর্বে অস্তিত্ব ধারণ করেছিল ওর ভেতরের সকল প্রকার বস্তু নিয়ে। আর সভ্য মানুষের আগমন ঘটেছে এতে প্রায় কয়েক হাজার বছর পূর্বে মাত্র। তাই মানুষ তার পারিপার্শ্বিক অনেক বিষয়ই অবগত নয়। আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান সরবরাহ করে এ বিব্রতকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এটা একমাত্র তাঁরই করুণা। তাই জ্ঞানের অহংকার করা মানুষের জন্য শোভনীয় হতে পারে না। আল্লাহ্‌র কৃতিত্ব যেখানে যতটুকু, তা মানুষের নির্দ্বিধায় মেনে

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) লুকায়িত বস্তুকে (বস্তুর ধর্ম, মান, গুণাগুণ ও কার্যকারিতাকে) বা অদৃশ্যবস্তুকে (দূরত্বের কারণে কিংবা মহাসূক্ষ্মতার কারণে অদৃশ্য বস্তুকে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে) প্রকাশ করে থাকেন।" (২৭ ঃ ২৫)
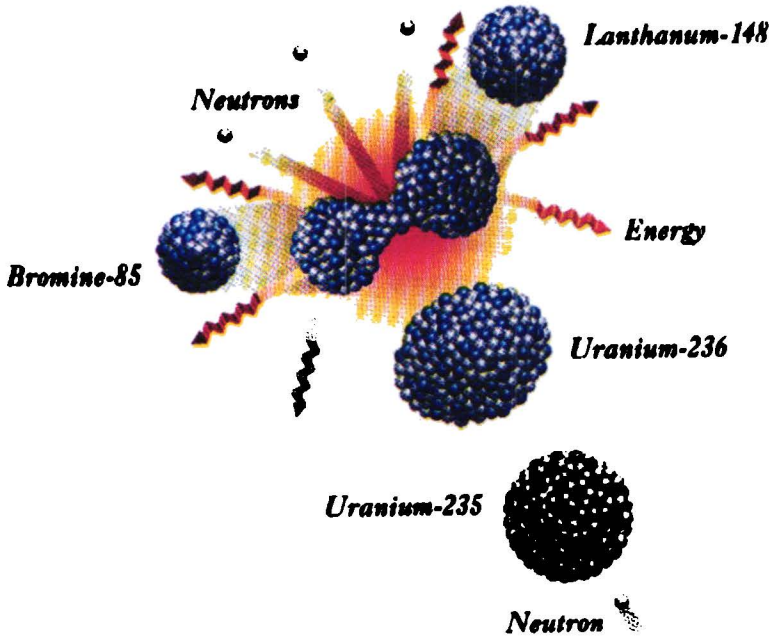
চিত্র-৬১

– 'ইউরেনিয়াম' দীর্ঘদিন ব্যবহার অযোগ্য হিসেবে পাথর খণ্ডরূপে মাটিতে পড়ে থাকলেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হওয়ায় মানুষ এর পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে লুকায়িত ভয়ংকর তেজস্ক্রিয়তার কথা মোটেও জানতে পারেনি। ১৯০৩ সালে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলেন ফ্রান্সের পিরি-কুরি দম্পতির মাধ্যমে এর তেজস্ক্রিয়তার রহস্য উদঘাটন করায়ে বিশ্বব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি করে দিলেন। আল্লাহ্‌র কৃতিত্ব ও কৌশলকে অস্বীকার করার যুক্তিসংগত কোন পথ আছে কী? তাহলে কেন তাকে মানা হবে না?

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে (কোন কিছুকে অবজ্ঞা না করে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আল্লাহর কৃতিত্ব দর্শনের আশায়) তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর (দেখবে এক ও একক মহান স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল তুলনাবিহীন শত বিস্ময়ের বিস্ময়ে পরিপূর্ণ) ।" (১০ ঃ ১০১)

চিত্র-৬২

– সতি-সত্যি ফ্রান্সের 'পিরি-কুরি' দম্পতি অবহেলিত ভারী পাথর খণ্ডকে অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে আবিষ্কারের করে ফেললেন রেডিও এ্যাকটিভিটি (তেজস্ক্রিয়তা), যা ইউরেনিয়াম নামক পদার্থ থেকে প্রতিনিয়ত ব্যাপক আকারে নির্গত হচ্ছে ওর পরমাণুর অবক্ষয়ের কারণে । এখানে আল্লাহর বাণী সত্য হিসেবে আবারও প্রতিষ্ঠা লাভ করলো । এখানে ইউরেনিয়াম এর তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারক মাত্র মানব সমাজ কিন্তু এর স্রষ্টা হচ্ছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ।

"এই লোকদের সম্মুখে সে অবস্থা এসে গেছে, যার মাঝে আল্লাহদ্রোহিতা থেকে বিরত রাখার বহু শিক্ষাপ্রদ উপকরণ নিহিত রয়েছে এবং এমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিও (বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর উদঘাটনসমূহ) রয়েছে। যা উপদেশ দানের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ মাত্রায় সমাপ্ত করতে সক্ষম।" (৫৪ ঃ ৪ ও ৫)
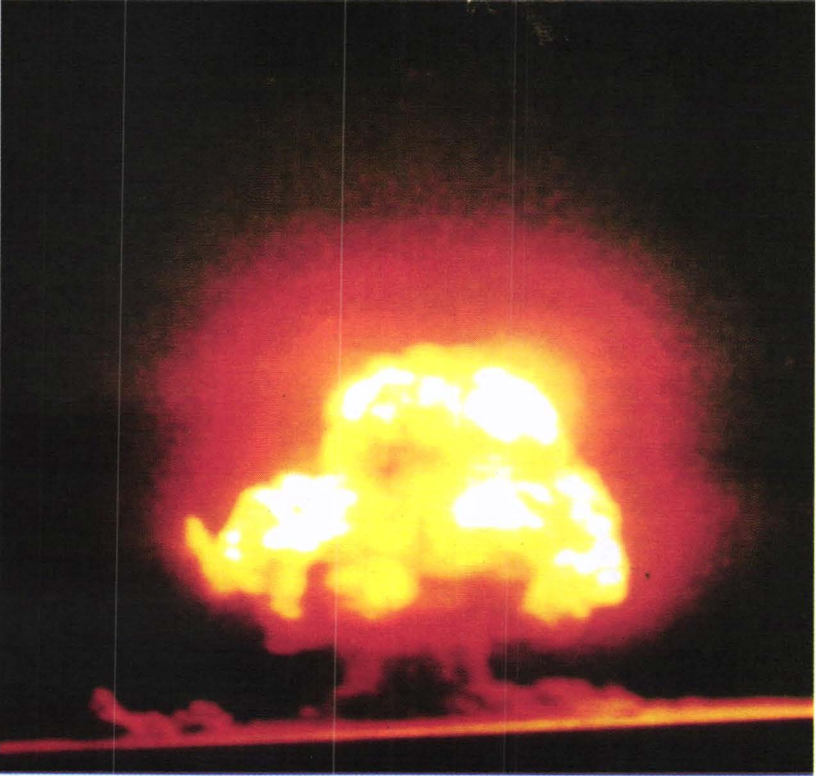
চিত্র-৬৩

– ছবিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ দেখা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম$^{-২৩৫}$ – এর পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে Fission পদ্ধতিতে 'নিউট্রন' দিয়ে আঘাত করার কারণে নিউক্লিয়াসটি বাড়তি নিউট্রন ধারণ করে অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়ে মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙ্গে গিয়ে ব্যাপক তেজস্ক্রিয়তা নির্গত করে।

বস্তুতঃ পদার্থের এই বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্যও প্রমাণ করে আল্লাহ্ সত্য এবং তিনি মহাজ্ঞানী। কারণ সকল প্রকার মৌলিক পদার্থের স্রষ্টা একমাত্র তিনিই।

"ফিরিশতারা বললো, 'আপনি কি পৃথিবীতে এমন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন, যারা অহরহ অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? (২ ঃ ৩০)
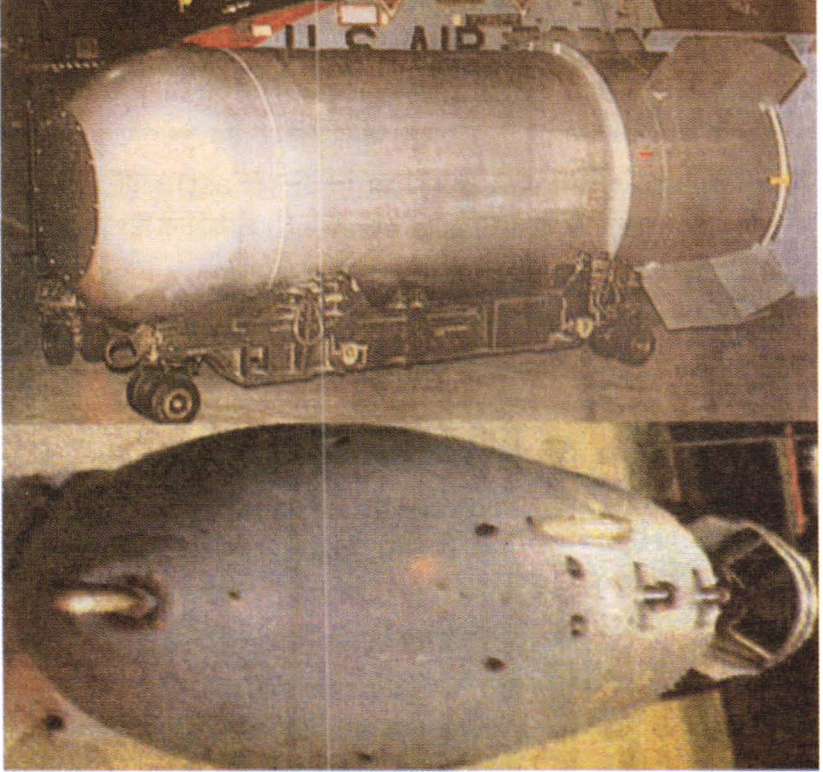
চিত্র-৬৪

– ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকীতে আমেরিকা পারমাণবিক বোমার আঘাত হানে। 'লিটল বয়' নামক ঐ বোমার আঘাতে শহর দুটো প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তায় জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। শুধু হিরোশিমাতেই প্রায় দুই লক্ষ লোক প্রাণ হারায়।

আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ভয়াবহ তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন পদার্থ ইউরেনিয়ামকে অপব্যবহার করেই এ মহাবিপর্যয় ঘটিয়েছিল মানব সমাজের একাংশ। সুষ্ঠু বিচারে এরা মানবতার শত্রু। ইউরেনিয়াম-এর এ বৈশিষ্ট্য মানুষ ইচ্ছা করলেও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র। সত্য নয় কী?

প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর মধ্যে ইউরেনিয়ামই সর্বশেষ মৌল বলে এর Fission-ই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কারণ এ পরামাণুই সর্বাপেক্ষা ভারী এবং এর Fission প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তির পরিমাণও খুব বেশী। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে ০.৭% U^{235} এবং ৯৯.৩% U^{238} থাকে। অর্থাৎ ১৪০টি প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে একটি U^{235} পরমাণু এবং বাকী ১৩৯টি হলো U^{238} পরমাণু। যে সকল ভারী পরমাণুকে শ্লথগতির (তাপীয় বা Thermal) নিউট্রন এবং দ্রুতগতির নিউট্রন (Fast) দ্বারা Fission ঘটানো যায় তাদেরকে বলে Fissile element। প্রাকৃতিক উপাদানগুলো মধ্যে শুধু U^{235} Fissile element । U^{233} এবং PU^{239} ও Fissile element; কিন্তু প্রকৃতিতে এদের পাওয়া যায় না। কৃত্রিম পদ্ধতিতে থোরিয়াম (Th^{232}) থেকে U^{233} এবং U^{233} থেকে প্লোটোনিয়াম (PU^{239}) উৎপাদন করা যায়। এই জন্য Th^{232} এবং U^{238} কে বলা হয় উর্বর বস্তু (Fertile element)।

Fission বিক্রিয়ায় একটি ভারী পরমাণু ভেঙ্গে দুই টুকরো হয়ে যায় এবং সাথে সাথে গড়ে প্রায় ২.৫ নতুন নিউট্রন, গামা রশ্মি এবং প্রায় ২০০ MeV শক্তি উৎপন্ন হয়। Fission বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন নিউট্রন ২ প্রকার। বিক্রিয়া ঘটার 10^{-14} সেকেণ্ডের মধ্যে যেসব নিউট্রন নির্গত হয় তাদেরকে Prompt (তাৎক্ষণিক) নিউট্রন বলে এবং এদের পরিমাণই মুখ্য (>99% বেশী), 'ফিশান' প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে যাওয়ার বেশ কিছু সময় পরে যে সকল নিউট্রন উৎপন্ন হয় তাদেরকে বলে 'বিলম্বিত' (Delayed) নিউট্রন। এদের সংখ্যা ১% এর কম।

এখন এই ভয়াবহ তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন ইউরোনিয়াম পদার্থ একমাত্র ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানো ছাড়া অন্য কোন প্রকার কল্যাণকর কাজে ব্যবহারের কথা বা চিন্তা মানব সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা লাগতো যদি না ইউরেনিয়াম থেকে মুহূর্তের মধ্যে উৎপন্ন ব্যাপক ও বিশাল পরিমাণ তাপ শক্তিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাপনা জানা না হতো অথবা মানব সম্প্রদায় অবিশ্বাস্য ও জটিল রহস্যঘেরা ইউরেনিয়ামের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাটি অনবহিত থাকতো। কেননা 'Fission' (ফিশান)

পদ্ধতিতে ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসে বিস্ফোরণ ঘটাতে গেলে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের অভাবে ব্যাপক পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) এবং শক্তি উৎপন্ন হয়ে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে বিশ্বব্যাপী মারাত্মক ধ্বংসীয় পরিবেশ ডেকে আনতো এবং মানুষ তার প্রয়োজন মত ইউরেনিয়ামকে কখনই ব্যবহার করার সুযোগ পেত না। যেহেতু মানব জ্ঞানে ইউরেনিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত প্রাকৃতিকভাবে ওর নিয়ন্ত্রণের মহাবিস্ময়কর কৌশলটি জানা হয়ে গেছে, তাই ঐ মহাবিপদ থেকে মানব জাতি আত্মরক্ষার সুযোগ লাভ করেছে এবং প্রয়োজন মত ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসে 'চেইন রিয়েকশান' (Chain Reaction)কে নিয়ন্ত্রণ করে বর্তমান সভ্যতার হাজারো কল্যাণে ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে।

'ইউরেনিয়ামের' নিউক্লিয়াসে সম্পৃক্ত সেই রহস্যঘেরা বিস্ময়কর কৌশলটি হচ্ছে– বিস্ফোরণে ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস ভাঙ্গার সময় ওপরে বর্ণিত 'বিলম্বিত নিউট্রন' (Delayed Neutron), সৃষ্টি হয়। তাই 'ইউরেনিয়াম-235' কে 'ফিশান' (Fission) পদ্ধতিতে যখন 'নিউট্রন' কণিকা দিয়ে আঘাত করা হয়, তখন ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস উক্ত 'নিউট্রন' কণিকাকে ধারণ করে অস্থিতিশীল (Unstable) ইউরেনিয়াম-236'-এ রূপান্তরিত হয়। ফলে সাথে সাথেই প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ায় গোলযোগপূর্ণ অবস্থায় (Violently) ঐ নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হয়ে (Splits) দু'টি ছোট নিউক্লিয়াসে রূপ নেয় এবং ব্যাপক-বিশাল পরিমাণে 'তেজস্ক্রিয়তা ও শক্তি' (Radiation and Energy) নির্গত করে। এই অবস্থায় দু'প্রকার সূক্ষ্ম 'নিউট্রন' (Neutron) কণিকাও আত্মপ্রকাশ করে। এক প্রকার নিউট্রনকে বলা হয় Prompt Neutron (প্রম্পট নিউট্রন) যেগুলি বিস্ফোরণের $১০^{-১৪}$ সেকেণ্ডের (প্রায়) মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু অপর যে নিউট্রন কণিকাগুলো বিস্ফোরণের প্রায় ০.২ হতে ৫৬ সেকেণ্ড (প্রায়) পরে আত্মপ্রকাশ করে, ঐ কণিকাগুলোকে বলা হয় 'ডিলেইড নিউট্রন' (Delayed Neutron)। এই 'ডিলেইড নিউট্রন'-কে প্রায় সেকেণ্ড খানিকের চেয়ে একটু বেশি সময়ের ভেতর মানবীয় তৎপরতা ও প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রেখে পরবর্তী

"অবশ্যই এতে (আল্লাহর সৃষ্ট প্রত্যেকটি বস্তুর এবং এক এক বস্তুর এক এক ধরনের আকৃতি, গঠন, ক্ষমতা ও কার্যকারিতার মধ্যে) নিদর্শন রয়েছে (এক ও একক স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়ার এবং নতশীরে তাঁকে মেনে নেয়ার জন্য) পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের তরে।" (১৬ ঃ ৬৭)
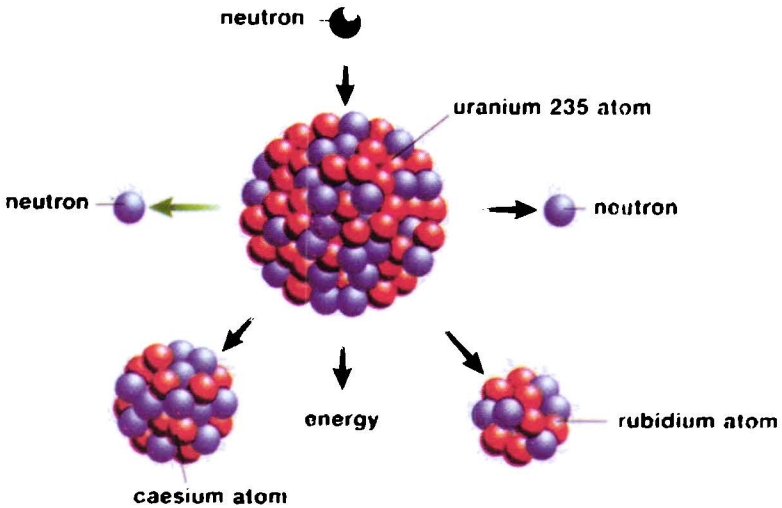
চিত্র-৬৫

– ছবিতে দৃশ্যমান ইউরেনিয়াম U^{-235} –এর পরমাণুর 'নিউক্লিয়াস' এর স্রষ্টা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্। এর গঠন, ক্ষমতা এবং ভয়ংকর তেজস্ক্রিয়তা নির্গমনের ভয়াবহতা প্রমাণ করছে একমাত্র আল্লাহ্ই তার স্রষ্টা এবং প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা সরবরাহকারী। মানুষ কখনই মৌলিক কোন পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে না। তাই মানব সমাজের উচিত একক স্রষ্টা মহান আল্লাহ্কে মেনে নেয়া।

"দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি (এলোমেলো, কিংবা বিশৃংখলাপূর্ণ কোন কিছুই) দেখতে পাবে না। তুমি আবার তাকিয়ে দেখ (সমগ্র বিশ্বব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটরিতে নানাভাবে পরীক্ষা করে পর্যবেক্ষণ কর, একত্রে মিলিয়ে দেখ) কোন ত্রুটি খুঁজে পাও কি?" (৬৭ ঃ ৩)

চিত্র-৬৬

– ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের সময় থেকে নিয়ে আজকের সময় পর্যন্ত পূর্ণ ১০০ বৎসরের মাথায় আমরা এর অপব্যবহারের ক্ষতিকর বড় দিকটি ইতিমধ্যেই জাপানের ২টি শহরে বাস্তবভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। এর ধ্বংস সাধন ক্ষমতা তুলনা করার মত মানব জ্ঞানে দ্বিতীয় আরেকটি নজির এখনো সৃষ্টি হয়নি। এর তেজস্ক্রিয় 'গামা-রে' সর্বোচ্চ ধ্বংস সাধন ক্ষমতা বহন করে থাকে। বিশ্বের সর্বত্র এর একই অবস্থা। ইউরেনিয়ামের পরমাণু সর্বক্ষণ ভেঙ্গে গিয়ে তেজস্ক্রিয়তা নির্গত করতে থাকে।

"তুমি বার বার তোমার দৃষ্টি ফিরাও (যে কোন গবেষণাগারে, যে কোন ল্যাবরেটরিতে যেভাবে ইচ্ছা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাওনা কেন) সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে (সকল ক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন ফলাফল লাভ করবে, কেননা এর পেছনে 'আল্লাহ্' সক্রিয় আছেন যে!) ।" (৬৭ ঃ ৪)
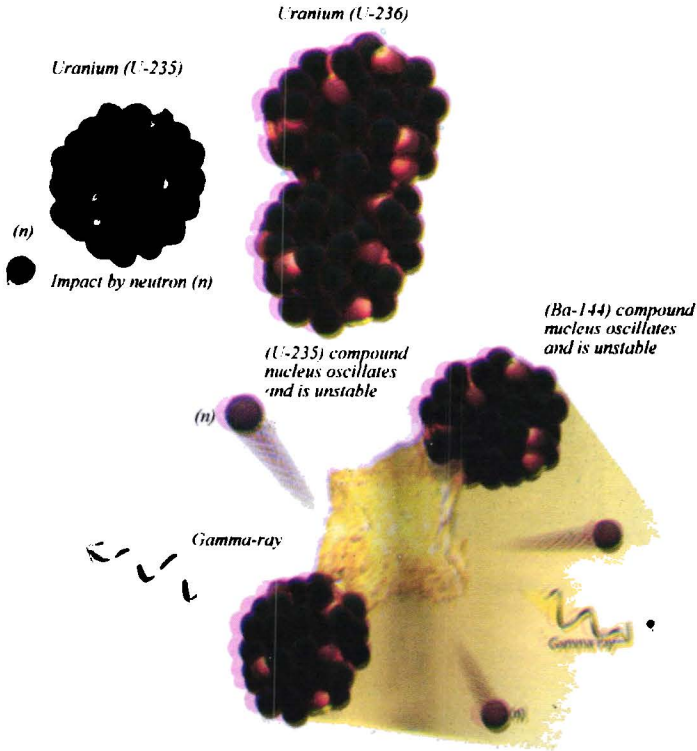
চিত্র-৬৭

– ইউরেনিয়ামের পরমাণুর ভাঙ্গন, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে লক্ষ কোটি সংঘটিত হয়ে মুহূর্তের মধ্যেই সব ধ্বংস করে থাকে । শুরুতে একটি পৃথক নিউট্রন কণিকা দিয়ে একটি পরমাণুকে 'Fission' পদ্ধতিতে ভাংতে পারলেই তৎক্ষণাৎ Chain reaction আরম্ভ হয়ে যায় এবং এমনভাবে তা চলতে থাকে যে, যদি স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত এর ভেতর লুকায়িত কৌশল উদঘাটন করে মানুষের জানা না হতো তাহলে প্রয়োজন মত মানুষের পক্ষে ব্যবহার করা যেত না । আল্লাহ্ মানুষকে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ভয়াবহ অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন । সুতরাং এ কৃতিত্ব আল্লাহ্‌র নয় কী?

"মহা মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত (স্রষ্টা হিসেবে সকল প্রকার বস্তু ও শক্তিকে একমাত্র তিনিই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন), তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (যে কারণে মানব জাতি তাদের শক্তি ও জ্ঞানের সর্বোচ্চ উৎকর্ষতা দিয়েও যা অনুধাবন করতে কিংবা সমাধান করতে ব্যর্থ, তা তাঁর জন্য একেবারে নগণ্য ও মামুলী ব্যাপার মাত্র) ।" (৬৭ ঃ ১)
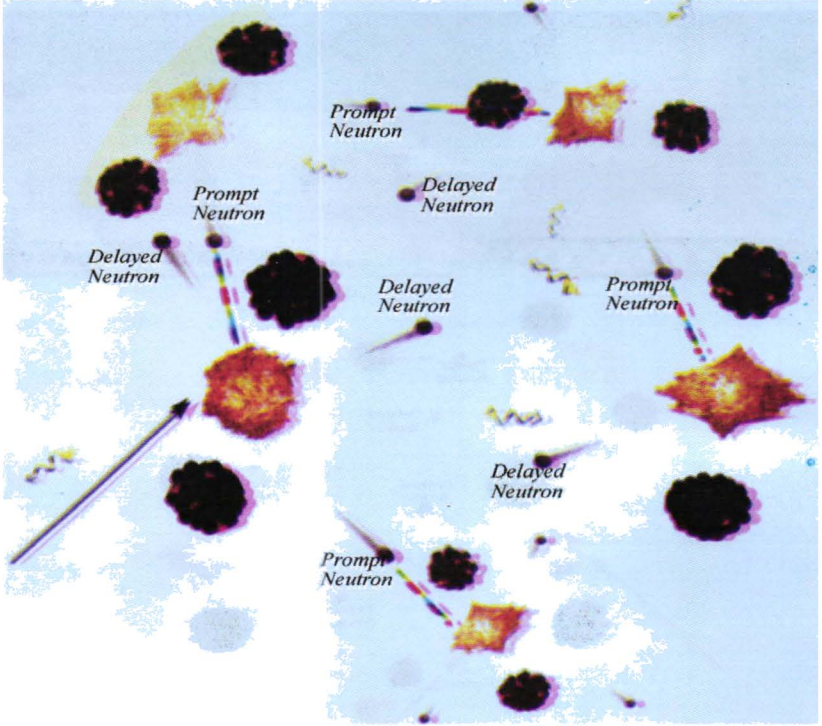
চিত্র-৬৮

– মানুষ ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেছে ঠিকই, কিন্তু প্রথম দিকে এর ভয়াবহ Chain reaction কে কিভাবে প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাপক তাপশক্তিকে মানব সভ্যতার কাজে লাগানো যায় সে ব্যবস্থা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয় । Delayed Neutron আবিষ্কার হওয়ার ফলে ওর মাধ্যমেই Chain reaction-এর গলা চিপে ধরা মানুষের পক্ষে সম্ভব হলো এবং সভ্যতার কাজে ব্যবহারের সুযোগ এলো । এ Delayed Neutron ব্যবস্থাটা কিন্তু আল্লাহ্‌র সৃষ্টি । মানুষের সৃষ্টি নয় । সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এ কৃতিত্বের দাবীদার একমাত্র 'আল্লাহ্‌ ।'

"যিনি সৃষ্টি করেছেন (ইউরেনিয়াম-২৩৫, এর গঠন, শক্তি-ক্ষমতা, ভালো-মন্দ কার্যকারিতা) তিনিই কি জানেন না? (আসলে তো একমাত্র তাঁরই জানার কথা। তিনি জানেন বলেইতো নিজ থেকে Delayed Neutron এর ব্যবস্থা এঁটে দিলেন তেজস্ক্রিয় মৌলের ভেতর যাতে এবার মানুষ প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ করে মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে পারে! বস্তুতঃ) তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।" (৬৭ ঃ ১৪)
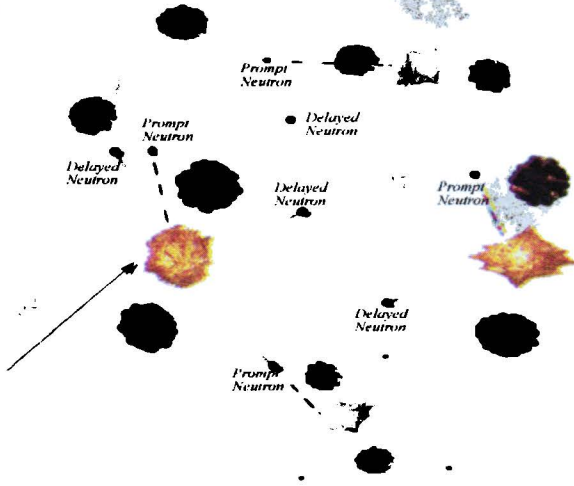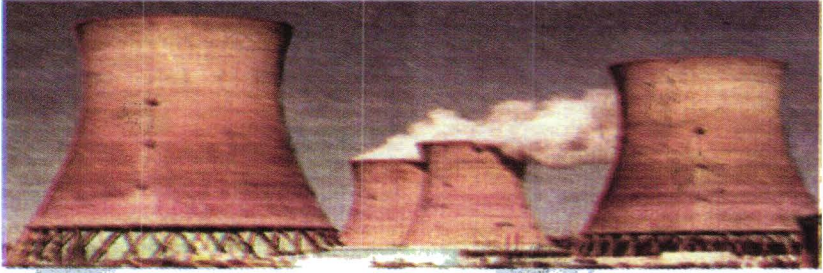
চিত্র-৬৯

– বিশ্ববাসীর জন্য আতংকে ভরা ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইউরেনিয়ামের মধ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যবস্থা Delayed Neutron উদ্‌ঘাটন এবং এর মাধ্যমে Chain reaction নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বব্যাপী বর্তমানে শত-শত Atomic Power Plant মানব সভ্যতার প্রভূত কল্যাণে অবদান রেখে চলেছে। সুতরাং প্রমাণ হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্ই মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান এবং অদ্বিতীয়। তাই তাঁকে মেনে নিয়ে জীবন নির্বাহ করতে জ্ঞানী সমাজের আপত্তি কোথায়? তাঁকে অস্বীকার করে জ্ঞানী সমাজ শুধু কি ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যাবে?

'চেইন রিয়েকশানে' অংশগ্রহণ করার পথে প্রয়োজন মত বাধা প্রদান করা হয়। ফলে 'নিউক্লিয়ার রি-এ্যাক্টার' (Nuclear Reactor) নিয়ন্ত্রিত হয়ে মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধনে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত মহাবিপর্যয়ও ঘটতে পারছে না।

বক্ষমান অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যায়ে যাওযার পূর্বে আলোচিত বিষয়ের যে মূল পয়েন্টটি আমাদের জ্ঞানের রাজ্যকে দোলা দিয়ে যায় তা হলো বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের নিকট সবচেয়ে বেশী তেজস্ক্রিয়তার ভয়াবহতাকে প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণে রেখে মানব কল্যাণে ব্যবহারের পিছনে লুকায়িত রহস্য ঘেরা মহাবিস্ময়কর 'ডিলেইড নিউট্রন' (Delayed Neutron)-এর সৃষ্টিকর্তাও মানুষ নয় বরং আল্লাহ্। মানুষ সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উদ্‌ঘাটনকারী বা আবিষ্কারকর্তা, এর বেশি মোটেই নয়।

অতএব বলা যায়, মূলতঃ সমগ্র মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা যেমনিভাবে একমাত্র 'আল্লাহ্', ঠিক তেমনিভাবে সকল বস্তুর গঠন, আকার, আকৃতি, ধর্ম, ব্যবহার, রীতিসহ সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণও তাঁর অদৃশ্য মহাজ্ঞানময় মুষ্টিতে আবদ্ধ। আর সে মহাসত্যটি কি Fissionable element ও তার 'ডিলেইড নিউট্রন' (Delayed Neutron) ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে প্রমাণিত হয়নি? মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র দৃশ্যমান এ মহাকীর্তি কি অস্বীকার করা চলে? আল্লাহ যদি নিজ থেকেই প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) সম্পন্ন Fissionable element-এর নিউক্লিয়াস ভাঙ্গার সময় শুধু 'Prompt Neutron' সৃষ্টির কৌশলটি জুড়ে দিয়ে 'Delayed Neutron' সৃষ্টির কৌশলটির সুযোগ না রাখতেন, তাহলে বর্তমান উৎকর্ষতায় উদ্ভাসিত বিজ্ঞান বিশ্ব কোন প্রকারেই পারমাণবিক শক্তিকে কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হতো, ফলে শুধু ক্ষতিকর ও ধ্বংসীয় কাজেই কেবল তা ব্যবহার করতো। সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য যা হতো মহাবিপর্যয়ের কারণ। তাই স্বীকার করতে আপত্তি কোথায় যে, "আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, মহাকৌশলী।" (৮ ঃ ৪৯)

"এগুলোই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১ ঃ ৩০)

এবার আমরা আলোচিত পুরো বিষয়টি এক নজরে সাজিয়ে দিচ্ছি–

এক নজরে

আল্-কুরআন

১. "আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।" (৮ ঃ ৪৯)

২. "তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথার্থ করেছেন নির্দিষ্ট অনুপাতে।" (২৫ ঃ ২)

৩. "যিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর এদের পথ (ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম, সীমা ও ধর্মরীতি ইত্যাদি) নির্দেশ করেছেন।" (২০ ঃ ২৫)

৪. পালনকর্তা নিজ জ্ঞানের বিস্তৃতিতে প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছেন তা কি তোমরা (জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্‌ঘাটন আর আবিষ্কারের মাধ্যমে) দেখতে পাচ্ছ না?" (৬ ঃ ৮০)

বর্তমান বিজ্ঞান

১. আমাদের জানা মতে 'বিজ্ঞান' তার অগ্রযাত্রার মাধ্যমে প্রতিনিয়তই একের পর এক 'তথ্য ও তত্ত্ব' আবিষ্কার সম্পন্ন করার পরও কখনই নিজকে মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী বলে দাবী করেনি। দাবী করলেও তা কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. এ মহাবিশ্বের কোন একটি মৌলিক বস্তুও বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পারেনি এবং সে দাবীও উত্থাপন করেনি। বিজ্ঞান যা করেছে তা হলো মহাবিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা বস্তুকে আবিষ্কার করে মানব সমাজে পরিচিত করেছে। আর একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে বহু যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করেছে।

৩. বিজ্ঞান এ মহাবিশ্বের কোন মৌলিক বস্তুরই আকৃতি নিজ থেকে সৃষ্টি করার যোগ্যতা রাখে না এবং এদের মৌলিক ধর্মরীতি ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমকেও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না।

৪. 'বিজ্ঞান' বর্তমান প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করেই আবিষ্কারের কৃতিত্ব লাভ করছে। ভবিষ্যতের ব্যাপারে একেবারে অন্ধ। কেননা সম্পূর্ণ মহাবিশ্বকে এক সঙ্গে কখনই জ্ঞানের বেল্টে ধারণ করার যোগ্যতা 'বিজ্ঞান' রাখে না। ইদানিং পরিপক্কতার কারণে বিভিন্ন আবিষ্কারের

ভেতর দিয়ে বিজ্ঞানবিশ্ব অনুভব করছে– জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায়-ই সর্বময় ক্ষমতার একটি উৎস যেন লুকায়িত আছে, যার প্রচ্ছন্ন হস্তক্ষেপটি অস্বীকার করা যায় না।

৫. মহাবিশ্বের মাঝে বিরাজমান মৌলিক বস্তুসমূহ 'বিজ্ঞান' সৃষ্টি করেনি এবং সৃষ্টি করতে সক্ষমও নয়। তাই বিজ্ঞানের পক্ষে মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নই আসে না। বরং বিজ্ঞান তার আবিষ্কারের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করছে যে, প্রতিটি বস্তুর ভেতরকার গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ডের পেছনে এক মহাজ্ঞানময় ও অপ্রতিরোধ্য রহস্যপূর্ণ শক্তি সর্বক্ষণ কার্যরত রয়েছে, যে শক্তি নিজ থেকেই সকল প্রকার বস্তুকে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। যদিও সেই বিস্ময়কর মহাশক্তিকে সরাসরি প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে না। যেমন– প্রতিটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে পজেটিব চার্জযুক্ত সমজাতীয় অসংখ্য 'প্রোটন' কণিকার পদার্থ বিজ্ঞানের আইনকে অমান্য করে একত্রে অবস্থান গ্রহণ করা, যখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে পরমাণুই ধ্বংস হওয়ার বিষয় ছিল, কিন্তু অদৃশ্য সেই মহাশক্তি নিজ থেকেই এমন এক রহস্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কোন প্রকার বিপর্যয় ঘটতে পারছে না।

আবার Fissionable element পরমাণুর ফিশান ঘটার সময় যে ব্যাপক শক্তি নির্গত হয় তা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য অদৃশ্য সেই মহাশক্তি নিজ থেকেই Delayed Neutron সৃষ্টির ব্যবস্থাটি এঁটে দিয়েছেন। ফলে মহাধ্বংসের শক্তিকে চাহিদা মত নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী

৫. "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সকল বস্তুর রক্ষণা-বেক্ষণ করেন।" (১১ ঃ ৫৭)

বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী পবিত্র সত্তা হিসেবে সকল বস্তুর রক্ষণা-বেক্ষণ করেন বলেই তো ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক অপ্রতিরোধ্য ধ্বংসীয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য গোপনীয় কৌশল হিসেবে 'ডিলেইড নিউটন' (Delayed Neutron)-কে সৃষ্টি করেছেন, যা মানবীয় জ্ঞানে কল্পনা করাও ছিল এক দুরূহ ব্যাপার।

এখানেই দৃষ্টির অলক্ষ্যে আল্লাহ্র একক রক্ষণা-বেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের দাবী 'স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। জ্ঞানের নিরপেক্ষ অবস্থান যা স্বীকার না করে পারে না।

বর্তমান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়-ই গভীরভাবে নজর দিলে এ জাতীয় অসংখ্য রহস্যপূর্ণ বিষয় দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট

আলোতে ফুটে উঠে। মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা নিজ থেকেই জ্ঞানপূর্ণ এ সকল নিদর্শন স্থাপন করেছেন যেন, সমাজের জ্ঞানীজন এ সকল বিষয়ের ভেতর দিয়ে এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টাকে অবলোকন করতে পারেন, স্রষ্টার উপস্থিতি বুঝতে পারেন এবং স্রষ্টার তুলনাহীন কৃতিত্বের সম্মুখে মিনতির সাথে নিজ মস্তক অবনত করে দিয়ে ধন্য হতে পারেন।

বিপর্যয় ঘটতে পারছে না। মানব সমাজ এ সকল মৌলিক বিষয়ে কখনই কৃতিত্বের দাবী করতে পারে না।

সুতরাং মহাবিশ্বের মাঝে বিরাজমান প্রতিটি পরমাণুর অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াসের মধ্যে 'পজেটিভ চার্জ' নামক সমজাতীয় চার্জসম্পন্ন 'প্রোটন' কণিকাদের একত্রে অবস্থান গ্রহণ এবং Fissionable element-এর বিভাজন (ফিশান) সময় নির্গত 'Delayed Neutron' প্রমাণ করছে মানব সম্প্রদায় কখনও এ সকল কাজের কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারে না বরং এক ও একক স্রষ্টা হিসেবে পরিচিত 'আল্লাহ্'-ই উল্লেখিত জ্ঞানময় ও বিস্ময়পূর্ণ কাজের পেছনে প্রতিনিয়তই সক্রিয় রয়েছেন, যা বর্তমান বিজ্ঞানের উজ্জ্বল পরিবেশে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

"অতএব, হে জ্ঞানী সমাজ! আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল, যাতে তোমরা পরিত্রাণ পেতে পার।" (৫ ঃ ১০০)

"মূলতঃ গোলামদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে।" (৩৫ ঃ ২৮)

'বস্তু জগতের লাইফ সাইকেল'

আল্‌-কুরআন

"বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) এমন কোন কিছুর সংবাদ দিতে চাও যা তিনি অবগত নন্? নিশ্চয়ই তিনি (অজ্ঞানতা হতে) অতি পবিত্র।" (১০ ঃ ১৮)

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) লুকায়িত (অদৃশ্য) বস্তুকে প্রকাশ করেন।" (২৭ ঃ ২৫)

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে।" (৬ ঃ ৬৭)

"বল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য কর, নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।" (১০ ঃ ১০১)

"বল, প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই, তিনি তোমাদের অতিসত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন।" (২৭ ঃ ৯৩)

"আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে ওটাই সত্য, এ ঘটনা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত?" (২১ ঃ ৩৭)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।" (২৭ ঃ ৭৫)

"পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর কিভাবে আল্লাহ্ প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করেন।" (২৯ ঃ ২০)

"সেই সত্তাই আকাশমণ্ডলীও পৃথিবীকে (মহাবিশ্বকে) সৃষ্টি করেছেন সঠিক সমতায়, তিনি যখন ইচ্ছা করেন এবং আদেশ করেন 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।" (৬ ঃ ৭৩)

"তারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন? অতঃপর ওর পুনরাবৃত্তি ঘটান? এটাতো আল্লাহ্র জন্য সহজ।" (২৯ ঃ ১৯)

"বল, আল্লাহ্-ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন এবং ওর পুনরাবৃত্তি ঘটান।" (১০ ঃ ৩৪)

"যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি ওর পুনরাবৃত্তি করবেন।" (২৭ ঃ ৬৪)

"তিনি ছয়টি সময়কালে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন।" (৫৭ ঃ ৪)

"তারা কি তাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কিভাবে ওটাকে নির্মাণ করেছি ও সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোন ফাটলও নেই।" (৫০ ঃ ৬)

"কত মহান তিনি যিনি আকাশে সৃষ্টি করেছেন গ্যালাক্সি (দুর্গ) এবং ওতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।" (২৫ ঃ ৬১)

"শপথ দুর্গ (গ্যালাক্সি) বিশিষ্ট আকাশের এবং প্রতিশ্রুত দিবসের।" (৮৫ ঃ ১,২)

"(মহাশূন্যে) প্রত্যেকেই ভাসমান অবস্থায় নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণে রত।" (৩৬ ঃ ৪০)

"শপথ নক্ষত্র পুঞ্জের (গ্যালাক্সির) যখন ওরা ভেসে বেড়ায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৫৩ ঃ ১)

"আমি শপথ করছি হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্র পুঞ্জের (গ্যালাক্সির) যখন ওরা ভেসে বেড়ায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৮১ ঃ ১৫, ১৬)

"সেই দিন আকাশমণ্ডলীকে গুটায়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর, যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করব-ই ।" (২১ ঃ ১০৪)

"সেই দিন জমিনকে পরিবর্তন করে ভিন্নরূপ জমিনে পরিণত করা হবে এবং তদ্রূপ করা হবে আকাশমণ্ডলীকেও এবং সবাই এক প্রচণ্ড শক্তিশালী আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে ।" (৩৯ ঃ ৫৯)

"আর নিশ্চয় আমি পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে একটি পরিষ্কার ময়দানে পরিণত করব ।" (১৮ ঃ ৮)

"সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর ওর পুনরাবর্তন ঘটান, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে ন্যায় বিচারের সাথে কর্মফল প্রদানের জন্য এবং যারা অবিশ্বাসী তারা কুফরী করত বলে তাদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি ।" (১০ ঃ ৪)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বের সর্বত্র) গৌরব-গরীমা একমাত্র তাঁর-ই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।" (৪৫ ঃ ৩৭)

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দর্শন লাভ করেও তা হতে মুখ ফিরায়, তার অপেক্ষা আর অধিক যালিম কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি ।" (৩২ ঃ ২২)

"বল, তোমরা যাদেরকে (আল্লাহ্‌র সাথে) শরীক কর, তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে ওর পুনরাবর্তন ঘটায়? বল, 'আল্লাহ্‌-ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে ওর পুনরাবর্তন ঘটান, সুতরাং তোমরা কেমন করে সত্য বিচ্যুত হচ্ছো?" (১০ ঃ ৩৪)

"এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন ।" (১০ ঃ ১)

"সুতরাং তারা কুরআনের পর আর কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে?" (৭৭ ঃ ৫০)

"সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতেই অবতীর্ণ। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।" (১৮ ঃ ২৯)

উক্ত বইয়ের সকল অধ্যায়ের মধ্য চলতি 'অধ্যায়টি'ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অধ্যায়টিতে আমাদের এ মহাবিশ্বের সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে ওর ভগ্নাংশ 'গ্যালাক্সি' আবার ধ্বংস হয়ে পুনর্বার সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একনাগাড়ে বস্তুগজতের 'পূর্ণ সাইকেলটি' (Complete cycle) খুবই আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। যা পাঠক সমাজকে মহাবিশ্ব এবং ওর কাঠামো ও কর্ম তৎপরতা বাস্তবভাবে জ্ঞানের আলোকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করবে। অধ্যায়ের আলোচনার গভীরে যতই প্রবেশ করা যাবে ততই মনে হবে যেন ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআন 'মনীষা' সব এক এক করে দেখে দেখে যেন বর্ণনা করেছেন, বাস্তবেও কিন্তু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল কালই আল্লাহ্‌র নিকট বর্তমান, নতুবা 'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞানের' বর্তমান আবিষ্কার ও রিপোর্টের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার বছরের ব্যবধান থাকলেও এত অভিন্নতা ও মিল কিভাবে থাকতে পারে? কিভাবে অদৃশ্য বিষয়গুলোর 'কুরআনিক' বক্তব্যের অনুকুলে 'বিজ্ঞান' তার সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রযুক্তি ব্যবহার করার পর হুবহু একই পর্যায়ের রিপোর্ট পেশ করতে ও মেনে নিতে পারে? আসলে যিনি মহাবিশ্বের মহান 'স্রষ্টা', আবার তিনিই হচ্ছেন 'কুরআন' অবতীর্ণকারী একমাত্র 'সত্তা'। আর তাই সকল বর্ণনার ধারা একই স্রোতে পতিত হয়ে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

পৃথিবী পৃষ্ঠে মানব ইতিহাসের প্রথম থেকেই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি বিষয়ক চিন্তা, মানুষের মন মস্তিষ্ককে সবসময়ই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মানুষ সময়, সুযোগ ও অবস্থার আলোকে উক্ত বিষয়ে সঠিক তথ্য লাভের জন্য চেষ্টার কমতি কখনো প্রদর্শন করেনি। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি মহাবিশ্বের স্রষ্টার সাথেও সম্পৃক্ত, তাই তাঁর পক্ষ থেকে মানব সমাজকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত ঐ সময় সম্ভবতঃ না থাকায় তারা প্রথম দিকে মোটেই অগ্রসর হতে পারেনি। কেননা কোন বিষয়ে উপযুক্ততা অর্জন করা ছাড়া তা ধারণ করার বা গ্রহণ করার প্রশ্নই অবান্তর। চলতি অধ্যায়ের শুরুতেই উদ্ধৃত

প্রথমদিকের কয়েকটি আয়াতে সে দিকে ইংগিত করেই বলা হয়েছে যে, মহাবিশ্বর স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ই মানুষকে এমন এমন বিষয় (প্রথমে কুরআনের মাধ্যমে এবং পরে বিজ্ঞানের মাধ্যমে) অবহিত করেছেন, যে সম্পর্কে পূর্বে তাদের কোনই জ্ঞান বা ধারণা ছিল না। উক্ত বিষয়ে যে তারা এক সময় সঠিক তথ্য জানতে পারবে, তেমন ধারণাও অতীতে পোষণ করতে পারেনি। আল্লাহ মানুষকে অবহিত করার পূর্বে মানুষের দৃষ্টির সামনে সকল কিছুই ছিল অন্ধকার এক গভীর সাগরে নিমজ্জিত। মহান স্রষ্টা তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইচ্ছা করলেন, প্রথমে 'কুরআন' ও পরে 'বিজ্ঞানের' নামে মানবমণ্ডলীর সামনে মেলে ধরলেন। তাই বলা হয়েছে যে, মানব সমাজে কেউ কেউ নিত্য নতুন কিছু আবিষ্কার করে ভাবে যে, বিষয়টি হয়তোবা মহাবিশ্বের স্রষ্টার গোচরীভূত নয় অথবা তিনি জানেন না। আল্লাহ্ এর কড়া প্রতিবাদ করে সাথে সাথেই শুনিয়ে দিলেন- কক্ষনই না, তিনি এ জাতীয় ভ্রান্ত চিন্তা-ধারার অনেক উর্ধ্বে এবং এ জাতীয় অজ্ঞানতা হতেও পবিত্র। 'আল্লাহ্' সকল বিষয় শুধু জানেন-ই না বরং মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিতেও যা অদৃশ্য, তাও তিনি তাদের সামনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ করে থাকেন, তবে মহাবিশ্বের দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ের প্রকাশকাল তাঁর পক্ষ থেকে পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে থাকার কারণে ঐ সময়টি আগমন না করা পর্যন্ত বিজ্ঞান বিশ্ব শত চেষ্টা করেও তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাসমত মহাবিশ্বের কোন ব্যাপারেই সুরাহা করতে পারে না। বিষয়টির অসংখ্য প্রমান ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। তাই মানুষের ভালোভাবে জানা দরকার, মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে 'নির্ধারিত সময়টি' ক্রমান্বয়ে আগমন করেই মহাবিশ্বের প্রতিটি বিষয়ে সঠিক 'তথ্য ও তত্ত্ব' প্রকাশিত হয়ে মণি-মুক্তার মত মানব সমাজের সম্মুখে উদ্ভাসিত হচ্ছে এবং হবে, এর বাইরে কোন বিষয়ে মানুষের সামান্যতমও অবহিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

এরপর কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে সৃষ্ট বিস্ময়কর এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্যসহ সকল বিষয়ের-ই অকাট্য নিদর্শন পর্যায়ক্রমে মানবমণ্ডলীর দৃষ্টির সামনে উপস্থাপন করবেন। মানুষ তার জ্ঞান দিয়ে মহাকাশের দিকে, পৃথিবীর দিকে এমনকি তাদের নিজ

দেহের দিকে তাকালেও স্পষ্টভাবে এক ও একক, প্রচণ্ড ক্ষমতা ও মহাজ্ঞানী সত্তা 'আল্লাহ্‌র' বাস্তব নিদর্শন দেখতে পাবে। আর তখন কি সে বুঝতে কষ্ট হবে যে, তার 'প্রভু' এক 'মহাসত্য' বিষয় এবং তাঁর জ্ঞান সকল কিছুর ওপর ছেয়ে আছে এবং প্রতিটি নিদর্শনই অকাট্য সত্যতা বহন করে চলেছে? তার সঠিক জ্ঞান এবং নিরপেক্ষ অবস্থান তাকে এ ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করবে। মানুষের আরও জানা থাকা দরকার যে 'বিশ্বপ্রভু' তাঁর সৃষ্ট এ মহাবিস্ময়কর মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র থেকে বিরাট-বিশাল সকল কিছুই মূল 'মাষ্টার প্লানের' আওতায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং তারই আলোকে তিনি প্রতি মুহূর্তে তাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা নিজেই করছেন, ফলে মহাবিশ্বের মাঝে সকল ব্যাপারেই তাঁর জ্ঞান বিস্তার লাভ করে আছে এবং পরিকল্পনা মাফিক সবকিছু যথাযথভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। কোথাও চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম ঘটবার বা ঘটাবার কোন প্রকার প্রশ্নই আসে না। তাই মানুষের সামনে অকাট্য নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পর তা জ্ঞানের বোধগম্য সীমায় পৌঁছায়ে তা থেকে কল্যাণ লাভ করার জন্য তার সচেষ্ট হওয়াই উচিত হবে।

তারপর 'আল্লাহ্ তা'আলার' পক্ষ থেকে তাঁর সৃষ্টি 'মানুষকে' বলা হয়েছে যে, তারা যেন পৃথিবীতে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ নামক সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে ভালভাবে সর্বত্র খুঁজে খুঁজে দেখে যে কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে, কি জিনিষ থেকে মহাবিশ্বের তিনি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেন। মহাবিশ্বটি সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কোন হাত নেই এবং থাকার কথাও নয়। এর পেছনে শক্তি-ক্ষমতা ও জ্ঞানের যে সমারোহ প্রয়োজন তা তো একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই আছে অন্য কারোই নেই। আর এ ব্যাপারে কেউ কোন দক্ষতা বা কৃতিত্ব দেখাবে কিভাবে, যেখানে সে নিজেই এক নগণ্য সৃষ্টি! যেহেতু 'আল্লাহ্-ই' হচ্ছেন মূল এক ও একক 'সত্তা' এবং তাঁর সমকক্ষ, অংশীদার, প্রতিদ্বন্দ্বী কোথাও কেউ নেই, তাই মহাবিশ্বটি পরিপূর্ণরূপে সৃষ্টি এবং ওর যাবতীয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কেবল এক ও অদ্বিতীয় 'আল্লাহ্'তেই শোভনীয় এবং সর্বত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রহণীয়ও বটে। সমগ্র আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এক বিরাট-বিশাল ব্যাপার ও

সত্ত্বেও 'আল্লাহ্'র পক্ষে এটা মোটেই কঠিন কোন কাজ ছিল না, তিনি তো শুধু ইচ্ছা করে 'হও' বলতেই সব তাঁর ইচ্ছামত সৃষ্টি হয়ে ক্রমান্বয়ে অস্তিত্ব ধারণ করে বর্তমান মহাবিশ্বরূপে আবির্ভূত হয়েছে। মহাবিশ্বটি সৃষ্টি করার পর ওর সংগঠনের বিভিন্ন অংশ 'সময় এবং দূরত্ব' স্কেলের বিভিন্ন পর্যায়ে ধ্বংস সাধন ঘটায়ে আবার পূর্বের ন্যায় একই পদ্ধতিতে ওকে পুনর্বার সৃষ্টি করেন এবং করবেন, এ ক্ষমতাও তাঁর আছে এবং তাঁর জন্য এটাও কোন কঠিন কাজ নয় বরং সহজ। আর মহাবিশ্বের আদিতে যে সৃষ্টি এবং পরবর্তীতে ওর পর্যায়ক্রমে ধ্বংস ও সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির 'সাইকেলের' (Cycle) যে ব্যবস্থা করেছেন তা তাঁর পূর্বেই নির্দিষ্ট করা সিদ্ধান্ত এবং প্রতিশ্রুতি বিধায় তিনি তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি পালন করে চলেছেন।

পরের আরেকটি আয়াতে মহাবিশ্বের গঠন বা সংগঠন পদ্ধতির উল্লেখ করতে গিয়ে মহান 'আল্লাহ্' তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবমণ্ডলীকে অবহিত করছেন যে, আদিতে সমগ্র সৃষ্টিকে শূন্য থেকে অস্তিত্বে আনার সময় 'সৃষ্টি মুহূর্ত' থেকে 'অটল পদার্থ' (Stable atom) সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন স্কেলে মোট ছয়টি পর্যায় বা সময়কালে তা সম্পন্ন করেছেন। 'অটল পদার্থ' দিয়ে পরবর্তীতে সমগ্র আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করে তিনি সার্বিক কাজের সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে পরিচালনা কেন্দ্র' বা 'আরশে'র অধীন করে দেন। এ পর্যায়ে মানুষেরা যদি তাদের ঊর্ধ্বে অবস্থিত আকাশ রাজ্যের দিকে সত্যিকার দৃষ্টি দিয়ে তাকায় তাহলে তারা তাদের প্রভুর সৃজিত আকাশ সংগঠনের প্রকৃত গঠনাকৃতি এবং ওর আভ্যন্তরীণ কাঠামো দেখতে পারবে, বুঝতে পারবে এবং উপলব্ধি করতে পারবে তার সৌন্দর্য।

তারপরের দু'টি আয়াতে আকাশ রাজ্যের সংগঠনের খোলামেলা চিত্র বর্ণনা করে বললেন যে, মূলতঃ মহাবিশ্বের আভ্যন্তরীণ কাঠামো হচ্ছে দুর্গ (বুরূজ) বা গ্যালাক্সি সমৃদ্ধ। আর ঐ গ্যালাক্সিতেই অবস্থান করছে নক্ষত্র (সূর্য), চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহসহ সকল কিছুই। উক্ত গ্যালাক্সিসমূহ বা নক্ষত্রপুঞ্জের সমষ্টি-ই হচ্ছে এ 'মহাবিশ্ব'। গ্যালাক্সিগুলো আবার স্থির নেই, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহসহ সকল কিছুকে গুচ্ছাকৃতভাবে বুকে ধারণ করে নিজ নিজ

কক্ষপথে প্রবল বেগে ছুটে যাচ্ছে গন্তব্যের পানে, যেখানে তাদের শেষ পরিণতি অপেক্ষা করছে। আল্লাহ্ তা'আলা শপথের আকারে পরের দু'টি আয়াতে মানব সমাজকে জানিয়ে দিলেন যে, 'গ্যালাক্সিসমূহ' বা 'নক্ষত্রপুঞ্জের' মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় গুচ্ছাকৃতিভাবে সকল কিছুকে সাথে নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে উড়ে যাওয়ার অর্থ হলো- ঐ অবস্থায় এক পর্যায়ে মহাবিশ্বে হারিয়ে যাওয়া। এটা মহাবিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত এক বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থাটি এবং ওর কারণ পরের আয়াতে উল্লেখ করে জানিয়ে দিলেন এই বলে যে- তিনি মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টির অনুকরণে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গ্যালাক্সিগুলোকে প্রচণ্ড গতিশীল অবস্থায় চালিত করায় ওরা প্রবল চাপে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হতে হতে এক পর্যায়ে অফিস আদালতে গুটানো লিখিত দফতরের মত সঙ্কুচিত হয়ে আকৃতিগতভাবে একেবারে শূন্য পর্যায়ে অদৃশ্য হয়ে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টিকার্যও তিনি এরূপ প্রায় শূন্য থেকেই বর্তমান অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। এখন গ্যালাক্সিসমূহকে আবার ঐ জাতীয় শূন্যাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে তিনি তা থেকে নতুনভাবে জগত সৃষ্টি করবেন- এটা তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর সেরা সৃষ্টি মানবমণ্ডলীর নিকট প্রদত্ত বিশেষ এক ওয়াদা যা করার কারণ হলো- যারা পৃথিবীর এই জীবনে আল্লাহ্ তা'আলাকে না দেখেও তাঁর পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন দেখেই তাঁকে বিশ্বাস করবে, তাঁর বাণী বাহকদেরকে, ফিরিশতাদেরকে, পরকালকে, জান্নাত-জাহান্নামকে বিশ্বাস করবে এবং তারই আলোকে জীবন পরিচালনা করবে, তাদেরকে তিনি বিচারের মাধ্যমে সম্মানিত করে আরেকটি অনন্ত জীবন সমৃদ্ধ বর্ণনাতীত কল্পনাতীত এক সুখময় জগৎ প্রদান করবেন, এটা স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি পুরস্কারস্বরূপ, যা পূর্বেই তিনি ঘোষণা করেছেন বিধায় অবশ্যই তা তাঁর জন্য পালনীয়।'

অতঃপর বিচার অনুষ্ঠানের জন্য বর্তমান গ্যালাক্সিগুলোকে প্রচণ্ড ঘনায়নে সঙ্কুচিত করে প্রায় শূন্য পর্যায়ে নিয়ে আবার যখন নতুনভাবে জগত সৃষ্টি করা হবে তখন ঐ জগতের গঠন, আকৃতি সবই বর্তমান থেকে ভিন্ন হবে। পাহাড়, পর্বত, উঁচু-নীচু, খাল-বিল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, গাছ-

পালা, তরু-লতা কিছুই থাকবে না, পুরো জগতটাই একক সমতল ময়দানে পরিণত হবে। পৃথিবীর জীবনের পর মানুষ আবার উক্ত নুতন জগতে নতুনভাবে সৃষ্টি হয়ে বিচারের সম্মুখীন হবে। মানুষের একমাত্র 'প্রভু' সেদিন উক্ত বিচার অনুষ্ঠানে আবির্ভূত হয়ে সকলের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বিচার কার্য পরিচালনা করবেন। অতঃপর বিচারের রায় অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করার জন্য সফলতা লাভকারীগণ 'জান্নাতে' এবং বিফলতা লাভকারীগণ অগ্নিময় 'জাহান্নামে' প্রবেশ করবে। এক পর্যায়ে বিচারের মাঠ হয়ে যাবে শূন্য। মহাবিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী 'একবার সৃষ্টি আবার ধ্বংসের' মাধ্যমে উল্লেখিত অবস্থাটির পুনরাবৃত্তি ঘটান বিধায় শূন্য হয়ে যাওয়া বিচারের মাঠটি পুনরায় মহাকাশের মহাশূন্যতায় নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে করে পূর্বের ন্যায় এক সময় প্রচণ্ড গতি লাভ করে 'মহাসঙ্কোচনের' মাধ্যমে আবার শূন্যের কোঠায় প্রবেশ করে মহা এক 'বিস্ফোরণ' ঘটিয়ে নুতন জগত সৃষ্টি করবে এবং তাতে নতুনভাবে নতুন প্রাণের আবির্ভাব ঘটবে। এভাবে বার বার একই ধারায় পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে 'মহাবিশ্ব' ওর সাইকেল (পরিক্রমণ) পূর্ণ করতে থাকবে, যতদিন মহাবিশ্বটি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক চূড়ান্তরূপে ধ্বংস না হবে।

শেষের দিকের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ পাক জানাচ্ছেন এ বলে যে, মানব সমাজে যারা জ্ঞানী, চিন্তাশীল এবং স্মরণকারী কেবল তাদের জন্যই তিনি বিজ্ঞানময় ঐ জাতীয় নিদর্শন প্রকাশ করে থাকেন। সাধারণ মানুষ এ সকল জ্ঞানময় বক্তব্যের কিছুই বুঝতে পারে না। জ্ঞানবানরা সমসাময়িক উৎকর্ষিত জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে যদি আসমানী বাণীগুলোর বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহকে যাচাই-বাছাই করে, তাহলে তারা পরিবেশিত 'কুরআনিক' তথ্যসমূহকে প্রমাণিত 'সত্য' হিসেবেই দেখতে পাবে, আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন তারা দেখতে পাবে না। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই এ এক বিরাট সাফল্য। কেননা, তারা যে 'সত্তার' ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে তা প্রমাণিত। অতএব তারা সঠিক কাজটি করেছে, যেহেতু 'আল্লাহ্' বস্তুজগত ও পরজগত সৃষ্টি করে সর্বত্র সকলের

দিয়েছেন তাঁর প্রচণ্ড-পরাক্রমশালী ক্ষমতা ও মহাজ্ঞান দিয়ে, তাই একমাত্র তাঁরই গুণ-কীর্তন, গৌরব-গরীমা ও শ্রেষ্ঠত্ব মহাবিশ্বের সর্বত্র উচ্চারিত হবার দাবী রাখে। আর নীতিগতভাবে সে সম্মান ও গৌরবের একমাত্র অধিকারী হচ্ছেন মহাবিশ্বের প্রতিপালক মহান 'আল্লাহ্-ই।

এ অবস্থায় মানব সমাজের যে বা যারা তাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান দিয়ে বুঝার পরও নেহায়েত সংকীর্ণ স্বার্থের কারণে সত্যকে না দেখার ভান করে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদেরকে বড় যালিম ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? 'আল্লাহ্' পাক ওয়াদা করেছেন তিনি অবশ্যই ঐ জাতীয় লোকদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ-আস্বাদন করাবেন পরকালে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এই বলে যে, তারা 'আল্লাহ্‌কে' ছাড়া যাদেরকে প্রভু হিসাবে মনে করে, তারা কি মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং পরবর্তীতে ওর বিভিন্ন পর্যায়ের যে পুনরাবৃত্তি তা কি তারা ঘটাতে সক্ষম? আল্লাহ্ ছাড়া যদি কেউ সক্ষম না হয়ে থাকে, তাহলে তারা কোন যুক্তিতে 'সত্য'-বিমুখ হচ্ছে? বিষয়টি অবশ্যই এক গুরুতর ব্যাপার বৈ কি!

অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ের বাণীতে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, উল্লেখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত মাপকাঠিতে প্রমাণিত 'তথ্য' সম্বলিত জ্ঞান 'আল্-কুরআন' জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থেরই নিদর্শন বহন করে চলেছে। যার সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ হতে পারে না, এটা বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। উক্ত গ্রন্থের পরে মানুষ বিশ্বাস করতে পারে তেমন কোন গ্রন্থ বা উৎস আর একটিও নেই। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, আর যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করুক। সবাই নিজ নিজ সিদ্ধান্তের আলোকেই 'পরিণতি' ভোগ করবে। এবার আমরা বিষয়টিকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরখ করতে চাই। চলুন তাহলে!

বিজ্ঞান

পৃথিবী নামক এ জীবনময় 'গ্রহে' মানব সমাজে 'বিজ্ঞান' যখন হাঁটি-হাঁটি, পা-পা করে একটু একটু অগ্রসর হচ্ছিল, তখন তার প্রয়োজনীয় সহায়-সম্বল, যন্ত্রপাতি, আয়োজন, উপায়-উপাত্ত, প্রযুক্তি তেমন কিছুই ছিলনা।

ফলে বিজ্ঞান ঐ সময় যৎসামান্য মানুষের জ্ঞানের আওতায় পরিচালিত হলেও আন্দাজ এবং অনুমানের ওপরই নির্ভরশীল ছিল বেশী। আর সে কারণেই তৎকালীন প্রকাশিত 'তথ্য' বা 'রিপোর্ট' একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠা পায়নি অপরদিকে তেমনি তথ্যগুলো অপরিবর্তনীয়ও থাকেনি। পরবর্তীতে সময়ের বিবর্তনে উপায়-উপাত্ত, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও আয়োজনে ব্যাপক-বিশাল পরিবর্তন ও অগ্রগতি সূচিত হওয়ায় বিজ্ঞান বিশ্বও পূর্বের তুলনায় দৃঢ় ভিত্তির ওপর আসন লাভ করছে এবং বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্যজনকভাবে মহাবিশ্বের অগণিত বিষয়ে প্রকৃত ও সঠিক 'তথ্য ও তত্ত্ব' মানব সমাজের সামনে উপস্থাপনে সক্ষম হচ্ছে।

আমাদের মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে তথ্য উদ্ঘাটনের নিমিত্তে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বিজ্ঞান বিশ্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী হাবু-ডুবু খেয়েছে ঠিকই তবে কখনো হাল ছাড়েনি। বিংশ শতাব্দিতে এসে তা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সর্বত্র একই ভাবনা 'আমাদের মহাবিশ্ব কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে?' প্রথম দিকে 'স্যার জেমস্ এইচ জেইন' মত ব্যক্ত করেন যে, মহাবিশ্বটি দৈবক্রমে বিশৃংখলার ভেতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। এর জন্য কোন স্রষ্টার প্রয়োজন পড়েনি, নিজ থেকেই নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবের বিপরীতে বিজ্ঞানীদের হাতে তখন কোন বিকল্প তথ্য না থাকায় তা গোটা বিশ্বকে নিজ বলয়ে ধরে রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সত্য আগমনের পূর্বাভাসস্বরূপ আলোর ঝলক প্রকাশিত হওয়ায় তা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি, মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। ১৯৩৩ সালে বেলজিয়াম বিজ্ঞানী 'জর্জ লি' মেইটর' (Jorge Le. Maitre) অফিসিয়ালী উল্লেখিত থিউরিকে চ্যালেঞ্জ করে 'Big-Bang' নামক নুতন প্রস্তাব পেশ করেন। তখন সর্বত্র এর প্রতি অধিকাংশ বিজ্ঞানীর আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়। পরে ১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মিঃ থমাস্ গোল্ড, হারম্যান বন্ডি, ও ফ্রেড হোয়েলসহ অনেকেই আবার নুতন আর এক থিউরি' যা 'Steady state' মতবাদ নামে পরিচিত তা প্রস্তাব করেন। উক্ত 'ষ্টেডী ষ্টেট' মতবাদের মূল কথা হলো এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিও নেই এবং ধ্বংসও নেই। অনন্তকাল থেকেই বিরাজমান আছে আবার অনাদিকাল পর্যন্তই তা

"পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর, দেখ আল্লাহ্ কিভাবে (কোন পদ্ধতিতে, কোন জিনিষ অবলম্বনে) কেমন করে প্রথম (এ মহাবিশ্বের) সৃষ্টির সূচনা করেছেন। (স্মরণ রেখ,) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (২৯ : ২০)

চিত্র-৭০

– বেলজিয়াম পদার্থ বিজ্ঞানবিদ 'জর্জ লি-মেইটর' উক্ত বিষয় অনুসন্ধান করতে গিয়েই বিগত বিংশ শতাব্দির গোড়াতেই 'মহাবিস্ফোরণ' তথা 'Big Bang' তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। তখন বিষয়টি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রাধান্য না পেলেও পরবর্তীতে বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রযাত্রার কারণে মহাবিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ক এ প্রস্তাবটি প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্যান্য প্রস্তাবগুলো সঠিক প্রমাণ উপস্থাপনে অক্ষম হয়ে ক্রমান্বয়ে বিলীন হয়ে যায়।

থেকেও যাবে। 'বিগ-ব্যাংগ-এর' হিসাবে তখন কিছু ভুল প্রকাশিত হওয়ায় ওর স্থলে 'ষ্টেডী ষ্টেট' প্রস্তাবটি জনপ্রিয় হয়ে উঠে। কিন্তু খুব বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯৫০ সালে 'রেডিও এ্যাষ্ট্রোনোমি' (Radio Astronomy) প্রস্তাব এসে 'ষ্টেডী ষ্টেট' প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। এভাবে এক পর্যায়ে ১৯৬০ সালে 'দুর্বল বেতার ধ্বনি' (feeble radio hiss) 'Big-Bang' থিউরিকে আবার জোরালোভাবে তুলে ধরে। এরই মধ্যে ১৯৪০ সালের দিকে বিজ্ঞানী 'মিঃ গামো' 'বিগ-ব্যাংগ' থিউরীকে সমর্থন করেন এবং ম্যাথমেটিক্যালী প্রমাণ করে দেখান যে উক্ত থিউরি 'সত্য' এবং ঐ বিস্ফোরণ পরবর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা (Back ground radiation) প্রায় 3k. (কেলভীন) এখনো মহাবিশ্বে বিরাজ করছে। যথাযথভাবে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হলে তা উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ১৯৬৪ সালে দু'জন মার্কিন বিজ্ঞানী 'মিঃ আরনো পেনজিয়াস' এবং 'রবার্ট উইলসন' তাদের 'রেডিও টেলিস্কোপ' পরীক্ষা করার সময় হঠাৎ করেই উক্ত 'Back ground radiation' বা উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা প্রায় 3k. (কেলভীন) প্রদর্শিত হয়ে প্রমাণ করে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ 'বিগ-ব্যাংগ' (Big-Bang) থিউরী সত্য ঘটনা। বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্ব 'বিগ-ব্যাংগকে' মেনে নিয়েছে বাস্তবতার নিরিখে।

'বিগ-ব্যাংগ' থিউরি মতে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে কোন এক অজানা উৎস থেকে ব্যাপক-বিশাল পরিমাণ শক্তির একটি মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে ($১০^{-৩৩}$ সেঃ মিঃ) ঘনায়নের এক পর্যায়ে প্রচণ্ড চাপের কারণে তাপমাত্রা উন্নীত হয় $১০^{৩২}$k.-এ। এ অবস্থায় মহাসূক্ষ্ম সময়ে $১০^{-৪৩}$ সেকেণ্ড প্রায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বর্তমান মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা করে (বিস্তারিত কুরআন, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিগ-ব্যাংগ, পর্ব-১-এ দেখুন)। বিস্ফোরণের পূর্বে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুটিতে (Singularity-তে) মহাবিশ্বের তাবৎ শক্তি, বস্তুভর সকল কিছুই ছিল আটকানো। বিস্ফোরণের পর পরই মহাসূক্ষ্ম বিন্দুটি ব্যাপক থেকে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়ে এবং পরিশেষে মহাসম্প্রসারণে রূপ নিয়ে এখনো পর্যন্ত

"তারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে (সম্পূর্ণ অদৃশ্য দশা থেকে দৃশ্যমান এ বিশাল জগতকে) আল্লাহ আদিতে অস্তিত্ব দান করেছেন?" (২৯ ঃ ১৯)
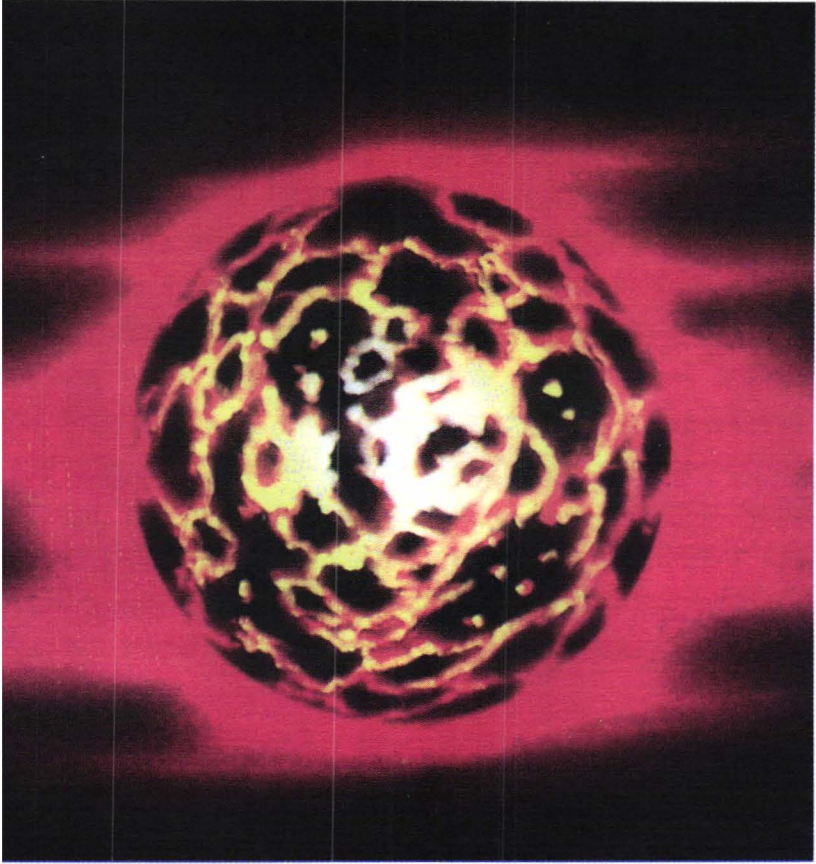
চিত্র-৭১

– 'Big Bang' ঘটার পরক্ষণেই অদৃশ্য মহাশক্তি সম্পন্ন বিন্দুটিতে পদার্থ কণিকা 'কোয়ার্ক' এবং 'এ্যান্টিকোয়ার্ক' সৃষ্টি হয়ে এবং বিন্দুটি মহাসম্প্রসারণে নিয়োজিত হয়ে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হতে হতে এ বিরাট বিশাল মহাবিশ্বে রূপ নিয়ে বর্তমান পর্যায়ে আগমন করেছে। বিজ্ঞান এ বিন্দুটির নামকরণ করেছে আদি 'অগ্নিগোলক' (Primordial Fire Ball).

আদি অগ্নিগোলক (Primordial fire ball)-র ভেতর 'মেটার' এবং 'এন্টিমেটার' হিসাবে 'কোয়ার্কের' আবির্ভাব হয়। উভয়ের পারস্পরিক সংঘর্ষের পর উদ্বৃত্ত বেঁচে থাকা 'মেটার' (Quark) থেকে পর্যায়ক্রমে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন নামক ক্ষুদ্র কণিকা সৃষ্টি হয় এবং পরে প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা মিলিত হয়ে বস্তুর প্রাথমিক ভিত্তি 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) গঠন করে। এরপর এক পর্যায়ে 'নিউক্লিয়াস' অতিক্ষুদ্র কণিকা 'ইলেকট্রনকে' ধারণ করে 'অটল পদার্থ' (Stable atoms) সৃষ্টি করতে সক্ষম হলে তারপর ঐ পদার্থ থেকেই সৃষ্টি হয় দৃশ্যমান গ্যালাক্সি, কোয়াসার, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহসহ আমি, আপনি সবাই, সবকিছু। 'অটল পদার্থ' সৃষ্টি হওয়ায় পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) পৃথক হয়ে পড়ায় পদার্থের ঘন ধোঁয়ায় গোটা মহাবিশ্ব পরিপূর্ণ হয়ে যায়। উক্ত ধোঁয়ার মেঘপুঞ্জের ভেতর আবির্ভূত হয় এক পর্যায়ে 'মহাজাগতিক তার' ('Cosmic string') নামক এক প্রকার 'সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম' তার। ঐ মহাজাগতিক তারগুলো প্রচণ্ড 'মধ্যাকর্ষণ বল' সম্পন্ন হওয়ায় প্রতিটি তারই ওদের চতুর্দিকের পদার্থের মেঘপুঞ্জকে আকর্ষণ করে করে নিজেদের সাথে জমিয়ে নিতে থাকে। ফলে এক সময় নবীন মহাবিশ্বটি গুচ্ছ-গুচ্ছ মেঘপুঞ্জের আকারে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক একটি 'গুচ্ছ মেঘ' খণ্ডের ব্যাস প্রায় গড়ে এক লক্ষ আলোকবর্ষ পর্যন্ত ছাড়িয়ে যায়। পরবর্তীতে উক্ত গুচ্ছ-গুচ্ছ পদার্থের মেঘমালা মহাসম্প্রসারণের নেশায় ক্রমান্বয়ে গতি বাড়িয়ে মহাকাশের মহাশূন্যতায় পরিভ্রমণেরত থাকে এবং সময়ের বিবর্তনে ওদের অভ্যন্তরে মহাজাগতিক নিয়মে 'মাধ্যাকর্ষণ বল' কর্মতৎপরতা সৃষ্টি করে 'পদার্থের মেঘ' (নেবুলা) থেকে জন্ম দিতে থাকে পর্যায়ক্রমে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি। উল্লেখিত গুচ্ছাকৃতি পদার্থের ধোঁয়া বা মেঘপুঞ্জকে বর্তমানে 'গ্যালাক্সি' বা 'star city' নামে অভিহিত করা হয়। গ্যালাক্সিগুলোই মূলতঃ মহাবিশ্বের প্রধান অংশ বা সংগঠন। বর্তমান সময় পর্যন্ত গ্যালাক্সিগুলোতে গড়ে প্রায় ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্র জন্ম নিতে সক্ষম হয়েছে। যেমন আমাদের 'মিলকি ওয়ে' গ্যালাক্সিতে প্রায় ৩০,০০০ কোটি এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী 'এ্যান্ড্রোমিডা' গ্যালাক্সিতে প্রায় ৪০,০০০ কোটি

"(আল্লাহ্) তিনিই ছয়টি সময়কালে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) সৃষ্টি করেছেন।" (৫৭ ঃ ৪)
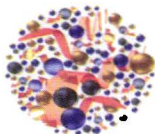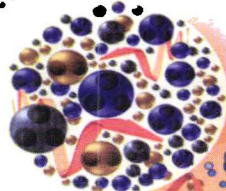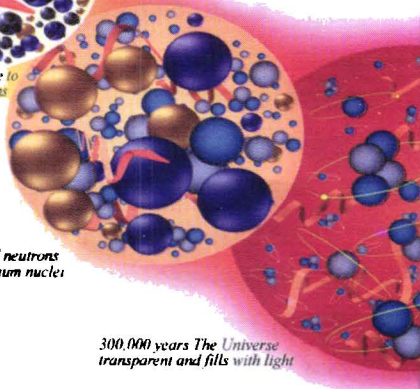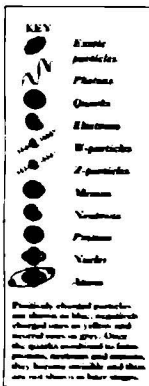
চিত্র–৭২

– বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে উৎকর্ষিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে 'Big Bang Model' গবেষণাকারী বিজ্ঞানীগণ এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কীয় সর্বমোট ছয়টি সময়কালকেই নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। যথা ঃ Plank Time, Inflation Period, Annihilation Period, Proton and Neutron Period, Atomic Nuclei Period and Stable Atom period.

মূলতঃ যা হচ্ছে 'কুরআন', পরবর্তীতে তা-ই রূপ নিচ্ছে সত্য-সঠিক বিজ্ঞানে। সত্য নয় কী? কুরআন এবং বিজ্ঞানের বক্তব্য এক ও অভিন্ন প্রমাণিত হওয়ার পরও মানুষ কিভাবে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতে পারে?

"এক পর্যায়ে তিনি আকাশের (মহাবিশ্বের) দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্র-পুঞ্জ (বস্তু কণিকার ধোঁয়া) দিয়ে পরিপূর্ণ।" (৪১ ঃ ১১)

চিত্র-৭৩

– সর্বমোট ৬টি সময়কালের মধ্যে অটল পদার্থরূপে 'পরমাণু' (Atom) সৃষ্টির পর পরবর্তীতে ঐ পরমাণু দিয়ে মহাবিশ্ব ভরে গেলে ধোঁয়ার পরিবেশ ধারণ করে। ঐ পরমাণুসমূহ মূলতঃ তখন এককভাবে হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুরূপেই বিরাজমান ছিল। পরবর্তীতে হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়ামসহ অন্যান্য পরমাণুতে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং এ পর্যন্ত ১০৯টি মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। বিজ্ঞানও বলছে ধোঁয়া থেকেই গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং কুরআন যে সত্য গ্রন্থ তা আবারও প্রমাণিত হল।

"অনন্তর তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে (মহাবিশ্বকে) অস্তিত্ব ধারণের নির্দেশ দিলেন এ বলে যে, তোমরা তৈরী হও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ফলে ওরা অনুগত হয়ে অস্তিত্ব ধারণ করলো।" (৪১ ঃ ১১)

চিত্র–৭৪

– ধুঁয়ার পরিবেশে অসংখ্য Cosmic String' আগমন করে প্রচণ্ড 'মহাকর্ষ বলের' মাধ্যমে ধুঁয়াকে নিজ নিজ দেহের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে, খণ্ড-খণ্ড মেঘপুঞ্জরূপে মহাবিশ্বকে বিভক্ত করে ফেলে। পরবর্তীতে ঐ ধুঁয়ার মেঘ খণ্ডগুলোই প্রথমে গ্যালাক্সিতে পরিণত হয় এবং শেষে তা থেকেই নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি সৃষ্টি হতে থাকে। এ হচ্ছে বিজ্ঞানের বক্তব্য। সুতরাং 'কুরআন' সত্য গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

"আমি আকাশমণ্ডলী (মহাবিশ্বটি) সৃষ্টি করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমিই এটিকে মহাসম্প্রসারণে নিয়োজিত রেখেছি।" (৫১ : ৪৭)
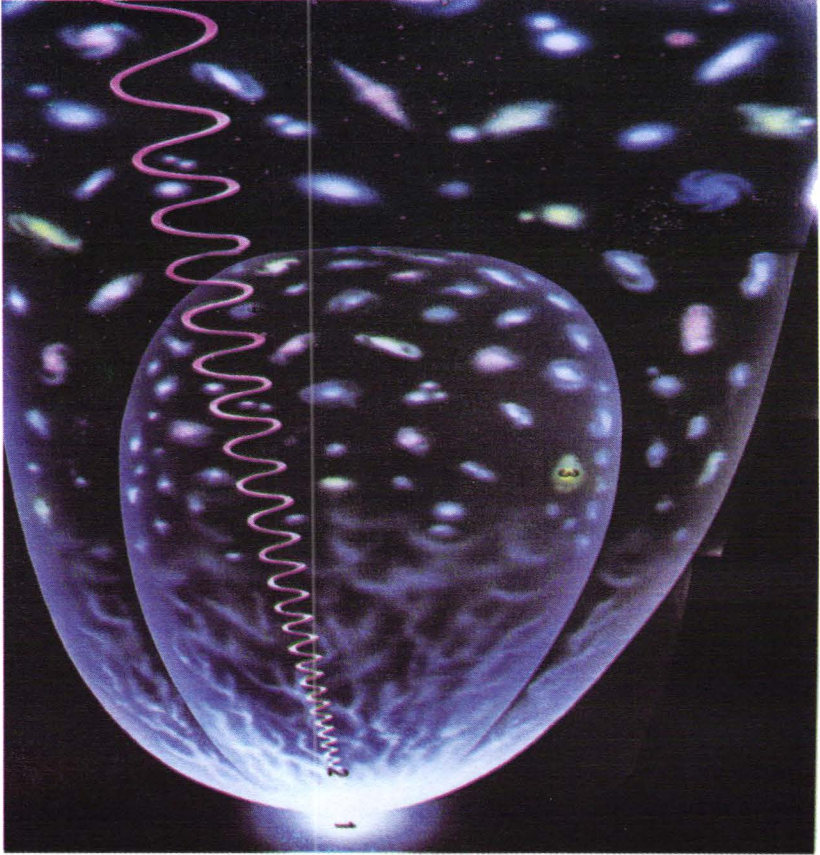
চিত্র-৭৫

- প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে Big Bang-এর মাধ্যমে এ মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলা বিস্ময়কর প্রভাব খাটিয়ে এখন পর্যন্ত এক মহাসম্প্রসারণে একে কেবলই বর্ধিত করে চলেছেন। এতে আল্লাহ্ যে মহাজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান এক মহান সত্তা, এটাও একটি বড় প্রমাণ বহন করছে সমাজের জ্ঞানীদের জন্য।

সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্বকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের জ্ঞানীজনেরই দায়িত্ব রয়েছে বেশি।

"আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন (তিনি যে সত্যি-সত্যি আছেন এবং তিনিই যে একমাত্র স্রষ্টা তার প্রমাণস্বরূপ) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মধ্যে (সমগ্র মহাবিশ্বে) তিনি যে সকল জীব-জন্তু (প্রাণ) ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলো ।" (৪২ ঃ ২৯)
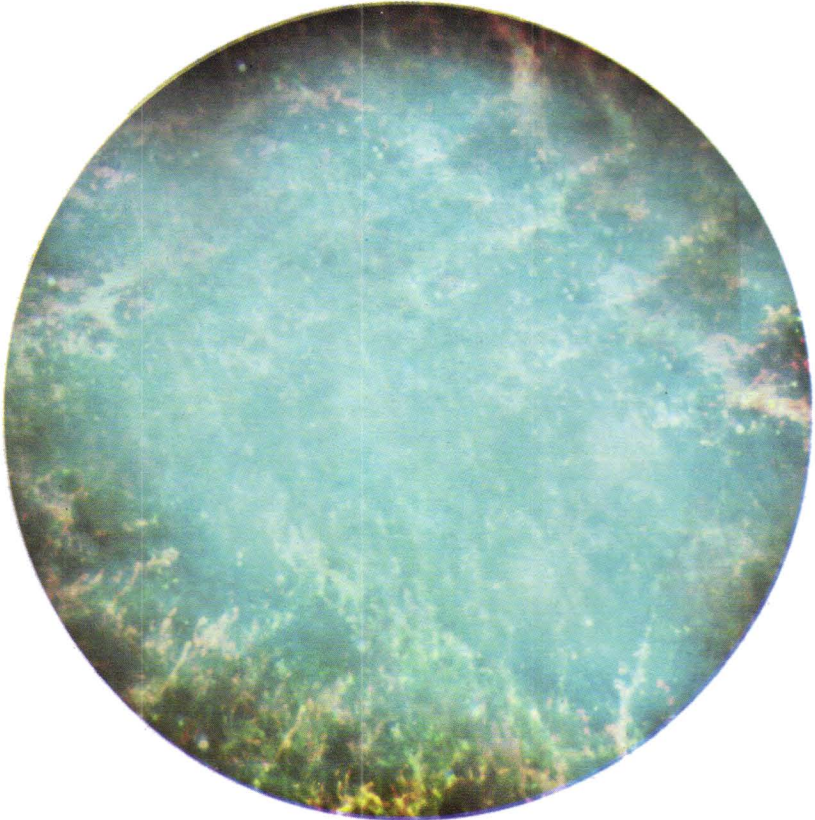
চিত্র–৭৬

– কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞানচক্ষু দিয়ে মহাবিশ্বের দিকে তাকালে সত্যি একজন মহান স্রষ্টাকে মেনে না নিয়ে পারা যায় না, যিনি Big Bang এর মাধ্যমে একে সৃষ্টি করে পরবর্তীতে ধুঁয়ার পরিবেশ থেকে পর্যায়ক্রমে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি করে এ মহাবিশ্ব সাজিয়েছেন । সমগ্র মানবমণ্ডলী একযোগে চেষ্টা করলেও যা করা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হবে না । তাই এক আল্লাহ্‌কে মেনে নেয়াই যুক্তিযুক্ত ।

"তারা কি নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব) এবং এদের মাঝে বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন যথাযথ পরিমাপে ও সঠিক অনুপাতে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য?" (৩০ ঃ ৮)
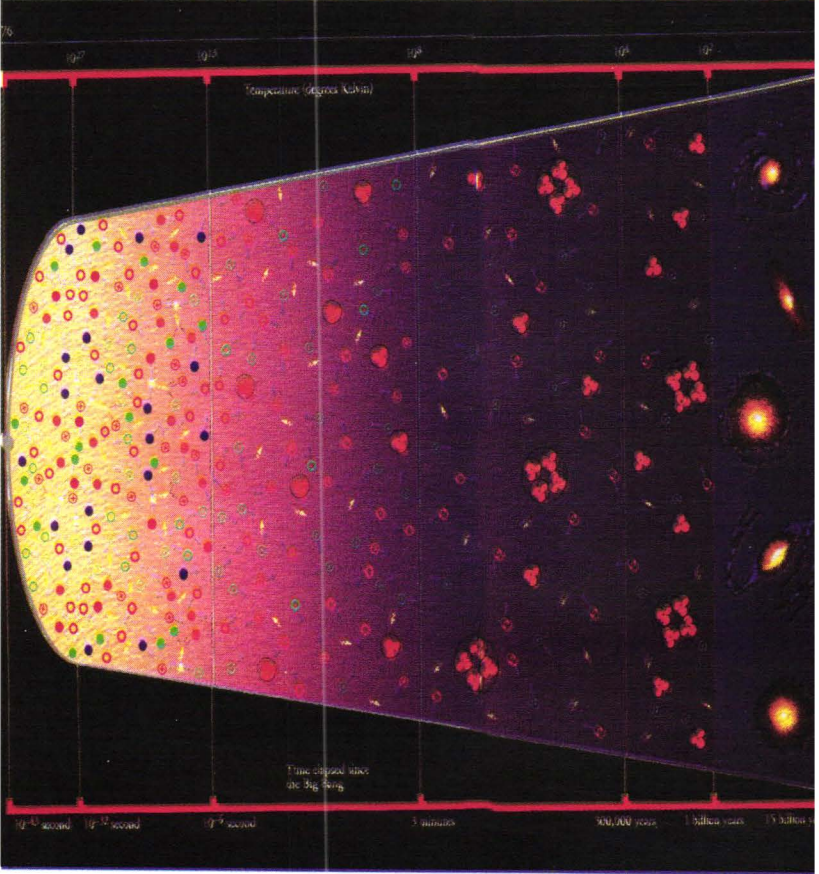
চিত্র–৭৭

– Big Bang Model-এর মহাবিস্ফোরণ বিন্দু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত মহাবিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ক ধারাবাহিক ছবিটি ওপরে দু'টি পৃষ্ঠাব্যাপী প্রদর্শন করা হল। ছবিটির দিকে তাকিয়ে আজকে প্রায় সকল বিজ্ঞানী এ বিষয়ে একমত যে, নিঃসন্দেহে এর পেছনে এক মহাজ্ঞান কাজ করেছে। সত্য ও নিরপেক্ষ জ্ঞান সঠিক তথ্য-ই পরিবেশন করে থাকে। প্রকৃত সত্য গ্রহণে আমরা উদ্যোগী হব কী?

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের (এ মহাবিশ্বে যাবতীয় বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার ব্যাপারে মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ'র পক্ষ থেকে) নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং খুব সহসাই তোমরা (বিজ্ঞানের মাধ্যমে) অবহিত হবে।" (৬ : ৬৭)
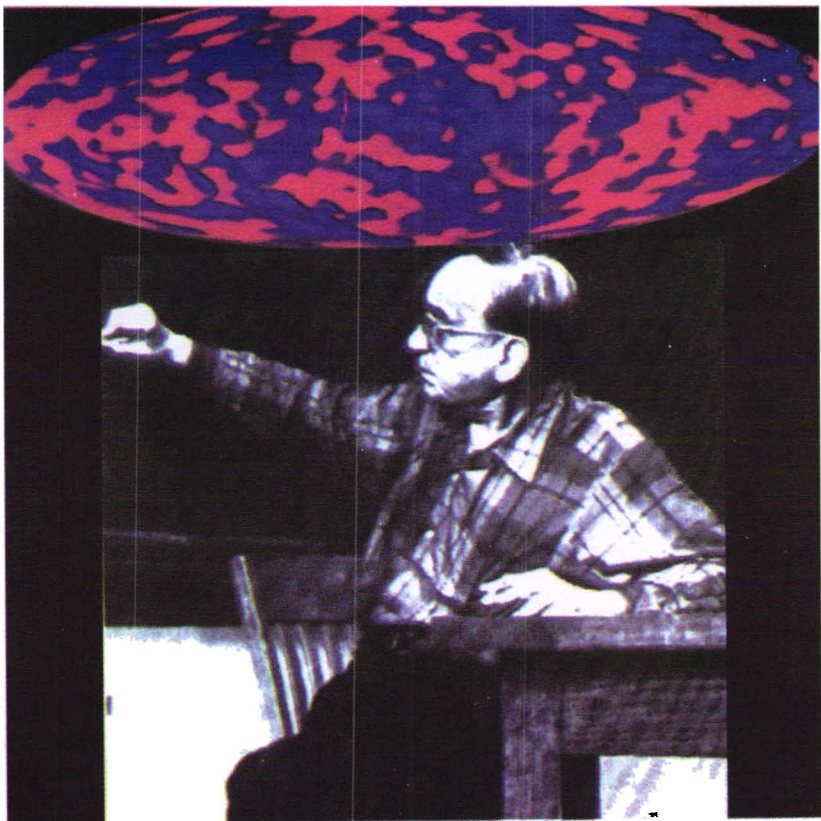
চিত্র—৭৮

– বিজ্ঞানী 'জর্জ লি' মেইটর' 'কর্তৃক ১৯৩৩ সালে প্রস্তাবকৃত Big Bang থিউরী ১৯৪৬ সালে বিজ্ঞানী 'মিঃ গামো' সমর্থন করেন এবং ম্যাথমেটিক্যালী হিসেব করে দেখান যে, সেই মহাবিস্ফোরণের উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা এখনও মহাবিশ্বে প্রায় 3K. (কেলভীন) বিরাজমান আছে। এক সময় তা প্রমাণিত হতে পারে। ১৯৬৫ সালে তাঁর এ দাবী প্রমাণিত হয় আমেরিকার দুই বিজ্ঞানীর মাধ্যমে।

সুতরাং Big Bang সত্য ঘটনা।

"তোমার প্রভুর বাণী সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায় সংগত (জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ যে কোন দিক থেকেই)। তাঁর পবিত্র বাণী সম্ভার কেউ (কোন অবস্থাতেই) মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবে না (বরং চেষ্টা করতে গেলে উল্টো আল্লাহ্‌র কথাকেই প্রমাণিত করবে) তিনি সমস্ত বিষয়ই পূর্ণরূপে অবগত আছেন।" (৬ ঃ ১১৫)
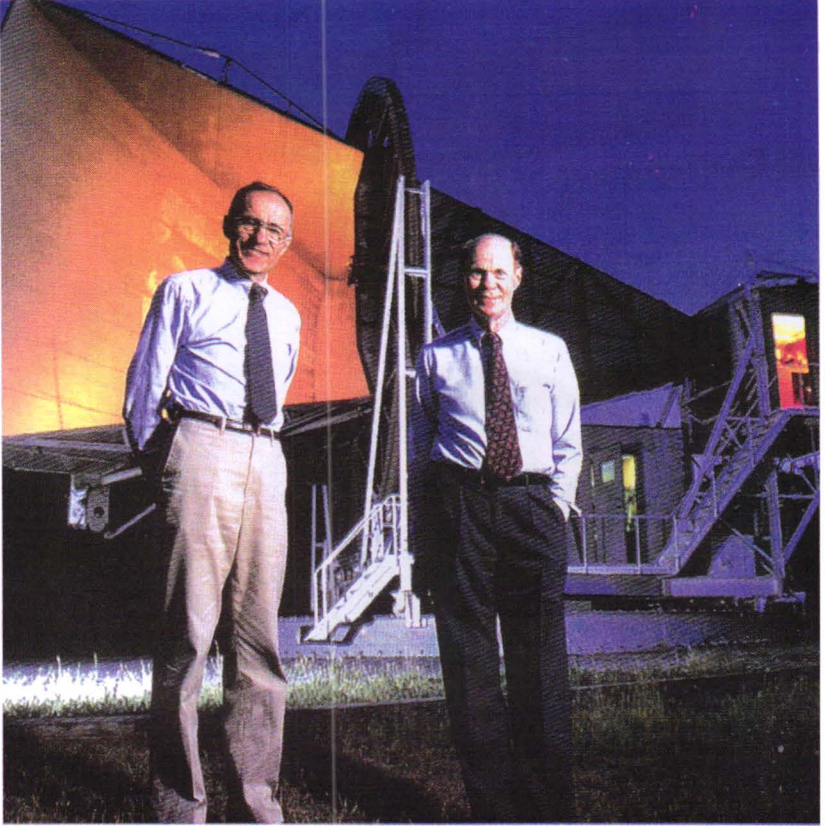
চিত্র–৭৯

– বিজ্ঞানী 'মিঃ গামো'র দাবীর প্রায় বিশ বছর পর ১৯৬৫ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী 'মিঃ আরনো পেনজিয়াস' ও 'মিঃ রবার্ট উইলসন' তাদের তৈরী এ্যান্টেনার মাধ্যমে 3K. 'ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশান' আবিষ্কার করে Big Bang প্রস্তাবকে সত্যে পরিণত করেন। এর ভেতর দিয়ে সাথে সাথে এক আল্লাহ্‌র উপস্থিতিও প্রমাণিত হয়ে মানব সমাজের নিকট ধরা দেয়। তাই এক আল্লাহ্‌কে মেনে নেয়াই হবে যুক্তিযুক্ত কাজ।

"তিনিই (আল্লাহ্) মানুষকে অবহিত করেছেন (বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে এ মহাবিশ্বে জ্ঞানময় সকল বিষয়গুলো) যা ইতিপূর্বে মানব সম্প্রদায় জানতো না।" (৯৬ ঃ ৫)

চিত্র–৮০

– Big Bang মহাবিস্ফোরণ-এর উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা 'Background radiation 3k. বর্তমান উন্নত প্রযুক্তি 'Cobe Satellite'-এর মাধ্যমেও বিজ্ঞান বিশ্ব হাতে-কলমে প্রমাণ করে এ মহাবিশ্বটি যে সত্য-সত্যই এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে সৃষ্টি হয়েছে এবং তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং পরিকল্পক ও স্রষ্টা যে আল্লাহ্ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা মানুষতো এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান এবং ক্ষমতা রাখে না।

নক্ষত্র বর্তমান আছে। তাছাড়া আরো সমসংখ্যক নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার মত যথেষ্ট পরিমাণে পদার্থের 'মেঘপুঞ্জ' বা 'নেবুলা' এখনো প্রতিটি গ্যালাক্সিতে মওজুদ রয়েছে।

১৯২০ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী 'ইডুইন হাবেল পাওয়েল' সর্বপ্রথম গ্যালাক্সি জগতের সঠিক রহস্য উন্মোচন করেন। তিনি ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত অসংখ্য গ্যালাক্সির ওপর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালিয়ে তাদের অনেক তথ্যই উদঘাটন করতে সমর্থ হন। তিনি প্রমাণ করে দেখান যে, গ্যালাক্সিগুলো প্রতিনিয়ত 'বিগ-ব্যাংগ' নামক বিন্দু থেকে পরিভ্রমণেরত থেকে কেবলই দূরে সরে যাচ্ছে, আবার প্রতিটি গ্যালাক্সিই পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকেও ক্রমান্বয়ে দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছে। অবস্থাটা অনেকটা বাতাসে ফুলানো বেলুনের মত। 'ইডুইন হাবেল' আরও দেখান যে, গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে দূর সরে যাওয়ার এবং বস্তু জগতের প্রান্ত সীমানার দিকে এগুবার পথে প্রতি পারসেক অর্থাৎ ৩.২৬ আলোকবর্ষ দূরত্ব অতিক্রম করার সাথে সাথে মহাজাগতিক নিয়মে ওদের উড়ন্ত গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৫০ মাইল (৭৫ কিলোমিটার) হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। উক্ত হিসেবে আমাদের 'মিল্কি ওয়ে' গ্যালাক্সির অবস্থান থেকে প্রায় ১১,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ (১১ শত কোটি আলোকবর্ষ) দূরত্বের পরে উড়ন্ত গ্যালাক্সিগুলো প্রায় আলোর গতি লাভ করে উড়ে যেতে থাকে। (আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল)। আবার গ্যালাক্সিগুলো যতই ওদের ধাবমান গতি বাড়াতে থাকে; ততই প্রচণ্ড বাধার কারণে তাদের মূল আকৃতি কমতে থাকে, অপরদিকে ভর বাড়তে থাকে গতির সমানুপাতিক হারে। 'জিরাল্ড ফিট্জ কন্ট্রাক্শান' এবং 'আইন ষ্টাইনের' ভরবেগ তুল্যতার সমীকরণ '$E=mc^2$ হতে প্রমাণিত হয়েছে আলোর গতিপ্রাপ্ত গ্যালাক্সিগুলো ঐ সময় তাদের মূল আদি আকৃতি হারিয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় (Singularity-তে) প্রবেশ করে, কিন্তু ভর (Mass) বেড়ে দ্বিগুন হয়ে যায়। এ অবস্থায় দৃষ্টির আড়ালে যে ঘটনা ঘটে, তা হলো– গ্যালাক্সিদের গতি বৃদ্ধির কারণে যে মুহূর্ত থেকে ওদের আকৃতি ছোট হতে থাকে সে মুহূর্ত থেকেই ওদের চাকতির প্রান্ত সীমানার সৌরব্যবস্থা ধ্বংসের করাল

"আমি আকাশে গ্যালাক্সিসমূহ সৃষ্টি করেছি এবং ওদের সুশোভিত করেছি প্রকৃত দর্শকদের জন্য।" (১৫ ঃ ১৬)

চিত্র–৮১

– আমেরিকান আকাশ বিজ্ঞানী 'মিঃ ইডুইন হাবেল পাওয়েল' উদ্ভাবিত টেলিস্কোপ দিয়ে সর্বপ্রথম ১৯২০ সালে মহাকাশের আবরণ সরিয়ে দিয়ে কোটি কোটি গ্যালাক্সি জগতের সৃষ্টি এবং এদের প্রত্যেকেই যে প্রচণ্ড গতিতে একে অপরের নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, সেই সংবাদ মানব জাতিকে অবহিত করেন। সত্যি এ দৃশ্য বিশ্বে বিশেষ দর্শকদের জন্যই সংরক্ষিত। অধিকাংশ মানুষই এ বিষয়ে কিছুই জানে না।

"তিনিই সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন (যা মানব জাতি দেখতে পাচ্ছে আর যা দেখতে পাচ্ছে না) এবং তিনি সকল বস্তুর সকল অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত।" (৬ ঃ ১১০)

চিত্র–৮২

– বিজ্ঞানী 'মিঃ ইডুইন হাবেল পাওয়েল' ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত একটানা গ্যালাক্সিদের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে দেখান যে মহাবিশ্বের মহাসম্প্রসারণের কারণে গ্যালাক্সিগুলো চতুর্দিকেই সমভাবে একে অপরের নিকট থেকে কেবলই দূরে সরে যাচ্ছে। প্রতি ৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর প্রতি সেকেণ্ডে এ সরে যাওয়ার গতি প্রায় ৭৫ কিলোমিটার হারে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মানুষ শুধু এদের অবস্থা জানতে পেরেছে। মানুষ স্রষ্টা নয়। মূলতঃ আল্লাহ্-ই হচ্ছেন স্রষ্টা ও মালিক। সত্য নয় কী?

"শপথ গ্যালাক্সিসমূহের (Star City) যারা পশ্চাদগমনে রত এবং যারা ভেসে ভেসে (মহাশূন্যে) উড়ে যায় ও অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৮১ ঃ ১৫ ও ১৬)
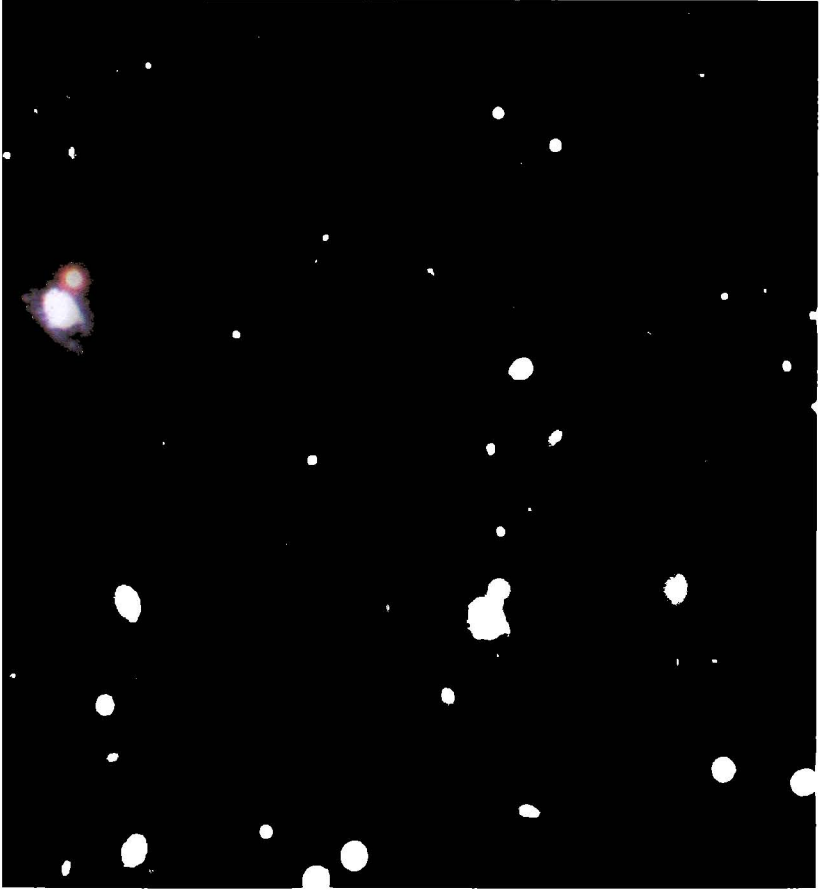
চিত্র-৮৩

– বর্তমান উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞান বিশ্ব মানব জাতিকে অবহিত করেছে যে, মহাবিশ্বে প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি ভেসে বেড়াচ্ছে। যতই দূরে যাচ্ছে, ততই প্রস্থান গতিবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এক পর্যায়ে আলোর গতি লাভ করে অদৃশ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি স্বাভাবিক দৃষ্টিতে অদৃশ্য হলেও বাস্তবে কিন্তু কুরআন ও বিজ্ঞানের বক্তব্য এক ও অভিন্ন এবং এটা মহাবিশ্বের প্রান্তসীমায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে।

"শপথ ঐ গ্যালাক্সিসমূহের, যখন ওরা মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে (আলোর সমান গতিবেগ প্রাপ্ত হয়ে মহাসঙ্কোচনে পড়ে এক পর্যায়ে) অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৫৩ ঃ ১)
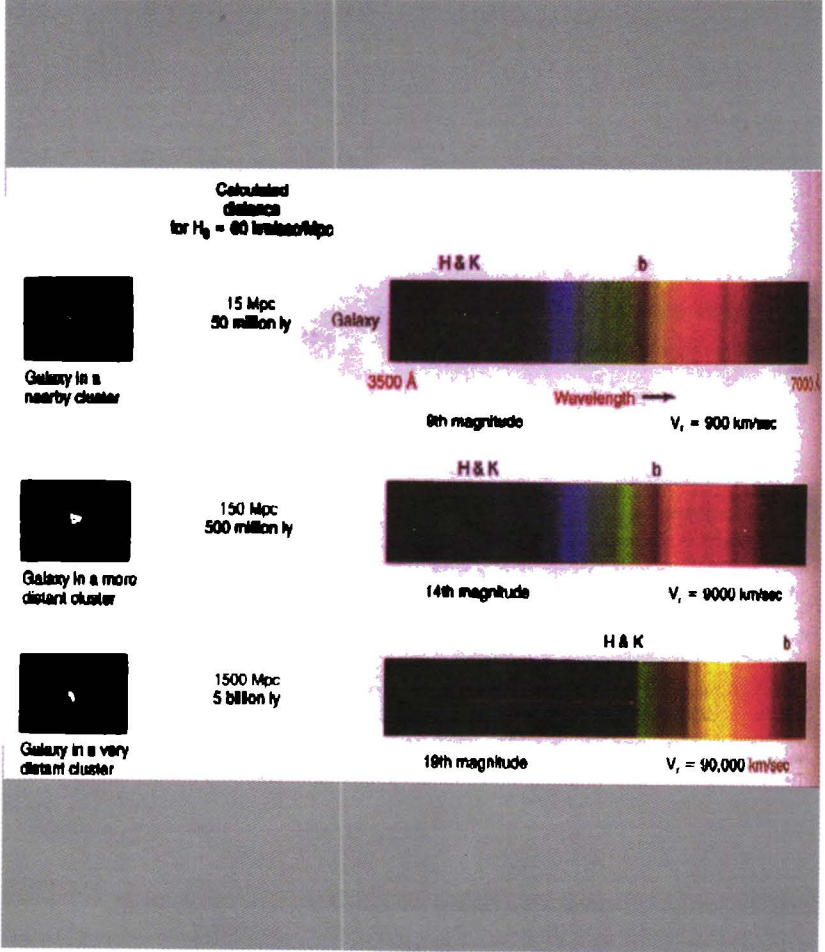
চিত্র-৮৪

– ওপরের ছবিতে বর্ণালী–বীক্ষণ যন্ত্রে (Spectroscopy –তে) গ্যালাক্সি হতে আগত আলোর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিফলন (Red and Blue Shift) ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে তাদের অবস্থান এবং সাথে সাথে তাদের গতিও নির্দেশ করছে।

"শপথ আকাশ জগতের (সপ্তাকাশের), যা গ্যালাক্সিসমূহ (প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি) দিয়ে ব্যবস্থিত।" (৮৫ ঃ ১)
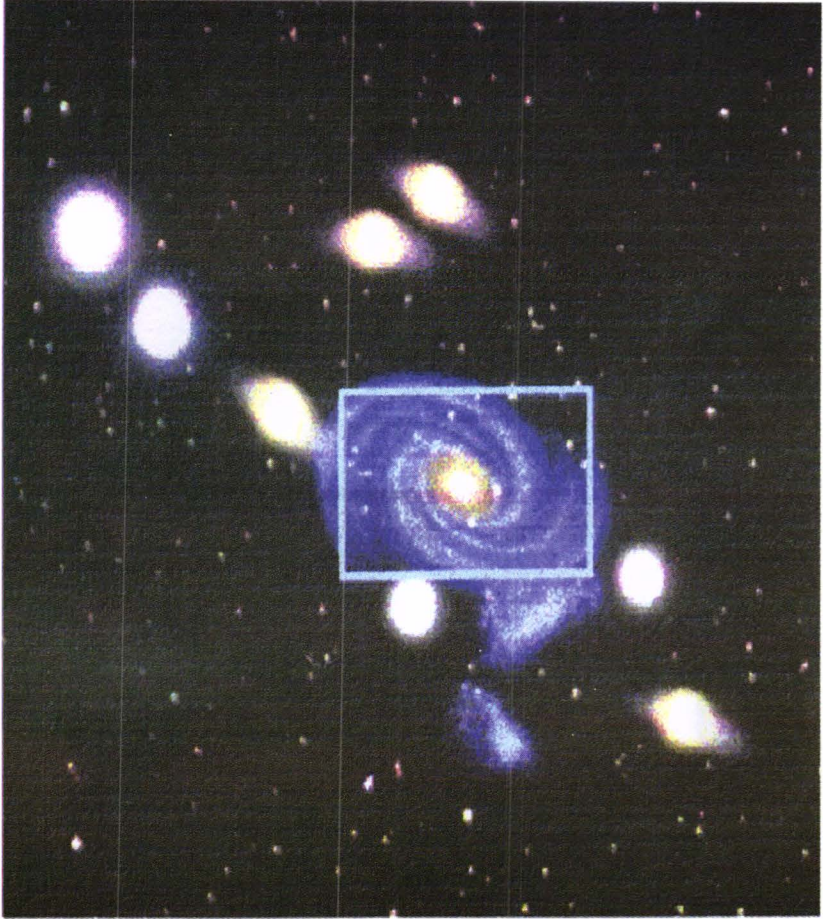
চিত্র–৮৫

– ওপরের ছবিতে আমাদের লোকাল গ্রুপের এক গুচ্ছ গ্যালাক্সি দেখা যাচ্ছে। এ গ্রুপে মোট ৩২টি গ্যালাক্সি রয়েছে। তার মধ্যে বক্স আকারে চিহ্নিত গ্যালাক্সিটি আমাদের 'মিলকি-ওয়ে' (Milky-Way) গ্যালাক্সি। প্রতিটি গ্যালাক্সি প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃত এবং প্রতিটিতে গড়ে প্রায় ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্র বিদ্যমান।

"আমি তোমাদের ওপরে (মহাবিশ্বের মাঝে অসংখ্য স্তর বিশিষ্ট) সপ্তাকাশ নির্মাণ করেছি।" (৭৮ ঃ ১২)
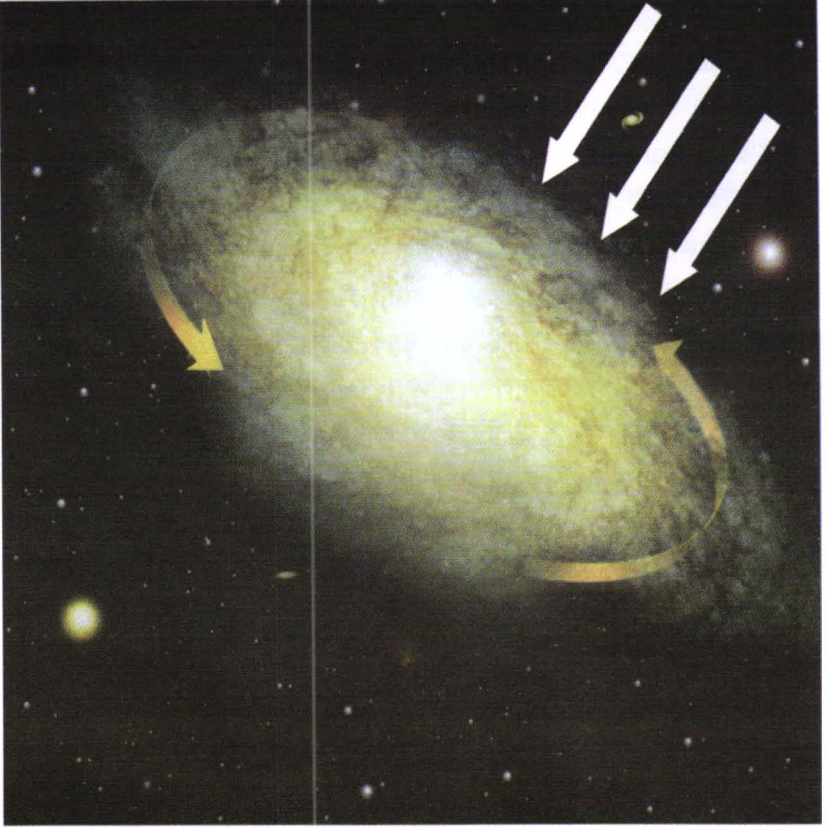
চিত্র–৮৬

– ওপরের ছবিতে অসংখ্য গ্যালাক্সিকে উড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েকটি গ্যালাক্সিকে আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে ক্ষুদ্রত্ব ধারণ করে মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমার দিকে চলে যেতে দেখা যাচ্ছে (হালকা হলুদ রং বিশিষ্ট ক্ষুদ্র গ্যালাক্সিগুলো)। আর স্বল্প সময়ে এরা অদৃশ্য প্রায় বিন্দুতে (Singularity -তে) সঙ্কুচিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ধ্বংস হবে গ্যালাক্সি, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্র। প্রমাণিত হবে আল্লাহর বাণী মহাসত্যতায় উদ্ভাসিত। আল্লাহ্‌কে জ্ঞান দিয়ে দেখার জন্য কেউ আছে কী? মূলতঃ তারাই প্রকৃত সৌভাগ্যবান।

গ্রাসে পতিত হতে শুরু করে। গতি যতই বৃদ্ধির পেতে থাকে ততই আকৃতি আরও সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে গ্যালাক্সির ভেতরের দিকের সৌরজগতসমূহ প্রচণ্ড চাপে আরও ব্যাপকভাবে ধ্বংসের মধ্যে পড়তে থাকে। যে মুহূর্তে গ্যালাক্সি প্রায় আলোর গতিপ্রাপ্ত হয়ে উড়তে থাকে তখন গ্যালাক্সির অভ্যন্ত রীণ ব্যবস্থা প্রথমে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও পরে ঘনীভূত হয়ে এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) প্রবেশ করে। বিজ্ঞান এ মহাসূক্ষ্ম বিন্দুকে 'অনন্য' নামে অভিহিত করে থাকে।

প্রতিটি গ্যালাক্সিকে উল্লেখিত পদ্ধতিতে বাধ্যতামূলকভাবে একটি বিন্দুতে উপনীত করার পথে ব্যাপকভাবে সাহায্য করার জন্য মহাজাগতিক নিয়মেই ওদের কেন্দ্রে সৃষ্টি হয়ে রয়েছে বৃহৎ বৃহৎ 'ব্ল্যাক হোল' (Massive black hole)। বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণে প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে কেন্দ্রের দিকে অসংখ্য বড় বড় 'ব্ল্যাক হোলের' অস্তিত্ব আবিষ্কৃত করতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞানীগণের ধারণা হচ্ছে যে, যদি গ্যালাক্সিদের কেন্দ্রে বৃহৎ ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে মহাকাশের মহাশূন্যতায় প্রায় ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্র ভর, সমপরিমাণ নেবুলাসহ সকল কিছুর বস্তুভর একত্রিত হয়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে প্রবেশ করতে পারবে না। ফলে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং অনেক অনেক সময় পূর্বেই মধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে প্রচণ্ড চাপ ও তাপের কারণে কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রের জন্ম দিতে থাকবে। ফলে গ্যালাক্সির বর্তমান 'লাইফ সাইকেল' (Life Cycle) বিপর্যস্ত হবে। তাই মহাজাগতিক নিয়মেই প্রতিটি গ্যালাক্সিতে বৃহৎ-বৃহৎ 'ব্ল্যাক হোল' বর্তমান থাকায় উল্লেখিত বিপর্যয় দেখা দিতে পারে না। 'ব্ল্যাক হোল'গুলো প্রচণ্ড রুদ্র-রোষে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অন্যান্য সকল প্রকার বস্তুভরকে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া মাত্র গলধঃকরণ করে করে তার চৌঙের ভেতর মহাঘূর্ণির ভয়ংকর স্রোতে নিক্ষেপ করে অস্তিত্বের বাইরে 'মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে' প্রবেশ করতে বাধ্য করে। প্রশ্ন হতে পারে- শেষ মুহূর্তে 'ব্ল্যাক হোল' কিভাবে ধ্বংস হবে? হ্যাঁ, উক্ত বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞান 'কম্পিউটার সিমুলেশান' (Computer Simulation)–এ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে-

গ্যালাক্সির ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন ওর 'বস্তুভর' (Mass) পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে সর্বোচ্চ পরিমাণে 'ব্ল্যাক হোলের' মুখে প্রবেশ করবে তখন 'ব্ল্যাক হোল' ওর সাধ্যের (Capacity) বাইরে অতিরিক্ত বস্তুভর (Mass) গিলে ফেলার কারণে এক পর্যায়ে চৌঙটি আটকিয়ে (Chocked) গিয়ে ওর তর্জন-গর্জন-হুঙ্কার সব হারিয়ে নিজ অস্তিত্বও মুছে ফেলবে। ঐ অবস্থায় অবশিষ্ট 'বস্তুভর' পরিমাণে আর বেশী বাকী না থাকায় আলোর গতির বিপরীতে প্রচণ্ড চাপের কারণেই মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity-তে) প্রবেশ করতে বাধ্য হবে। এ অবস্থা পর্যন্ত 'Mission Possible' বলা যায়, যা 'গ্যালাক্সির লাইফ সাইকেলের' প্রায় অর্ধাংশ কভার করেছে।

আপনি আশ্চর্য হওয়ার মত বিজ্ঞানের রিপোর্ট এখনও শেষ হয়নি। এ পর্যায়ে এসে বিজ্ঞান জানাচ্ছে প্রায় ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্রসহ প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাস ব্যাপী বিস্তৃত এক একটি গ্যালাক্সি, ওর সমস্ত বস্তুভরকে (Mass) যে মুহূর্তে মহাসূক্ষ্ম এক অদৃশ্য বিন্দুতে ঘনিয়ে আটকিয়ে দিচ্ছে, সে মুহূর্তে 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang)-এর অনুকরণে ভাষায় প্রকাশে অক্ষম (এমন) এক প্রচণ্ড ভয়ানক মাত্রায় (স্কেলে) চাপ এবং তাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় শর্ত পূরণ হয়ে ঐ বিন্দুটিতে অবশ্যই এক 'মহাবিস্ফোরণ' ঘটছে। ঐ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পরিণতিতে আবার পূর্বের ন্যায় সৃষ্টি হচ্ছে একই পদ্ধতিতে নুতন জগত। এভাবে বর্তমান গ্যালাক্সিগুলো একবার সৃষ্টি আবার ধ্বংসের মাধ্যমে তাদের চলার পথে পুনঃ পুনঃ একই জাতীয় কার্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে 'লাইফ সাইকেল' (Life Cycle) পূর্ণ করে চলেছে।

আমেরিকান স্পেস সেন্টার 'NASA' একবিংশ শতাব্দীর শুভলগ্নে পৃথিবীর কক্ষপথে পরিভ্রমণরত 'The Compton Gamma-ray Observatory' কর্তৃক ১১,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের প্রান্তঃসীমায় আবিষ্কৃত 'কোয়াসার 4c 71.07 সম্পর্কে এক আশ্চর্য ধরনের সংবাদ গোটা বিশ্বব্যাপী প্রচার করেছে। বিগত কয়েক বছর থেকেই বিজ্ঞানীগণ দৃষ্টির প্রায় প্রান্তঃসীমানায় আবিষ্কৃত ঐ কোয়াসারের (Quasar) ওপর নজর রাখছিলেন উক্ত 'স্যাটেলাইট' দিয়ে। ১৯৯৫ সালের ২০শে নভেম্বর

"আমি শপথ করছি নক্ষত্রসমূহের 'ধ্বংস পতন' (Black Hole) স্থানের। অবশ্যই এটা এক গুরুতর মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে (জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদঘাটনের মাধ্যমে এদের দর্শন ও এদের গঠন এবং কর্ম তৎপরতা যদি সত্যিকারভাবে অবহিত হতে পারতে, তাহলে কতইনা ভালো হত!)।" (৫৬ ঃ ৭৫ ও ৭৬)

চিত্র-৮৭

– প্রতিটি গ্যালাক্সিতে রয়েছে অসংখ্য Black Hole. এদের কাজই হচ্ছে প্রতিনিয়ত মহাজাগতিক বস্তু-নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ও গ্রহানুসহ সকল কিছুকে মহাকর্ষ বলের ঘূর্ণীর চক্রের মাধ্যমে টেনে এনে প্রবল প্রতাপে গলধঃকরণ করে বস্তুটিকে দৃশ্যমান অস্তিত্ব থেকে মুছে ফেলা। আল-কুরআন সত্য-সঠিক গ্রন্থ। তাই প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই সে এ বৈজ্ঞানিক ভয়াবহ বিষয়টি মানব জাতিকে অবহিত করতে পেরেছে। আল্লাহ্ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ আছে কী? এবার তাহলে তাঁর কথামত জীবন নির্বাহ করার পালা!

"অদৃশ্যের পূর্ণ জ্ঞান শুধু তাঁরই (যেহেতু তিনিই এগুলোর স্রষ্টা এবং রক্ষণা-বেক্ষণকারী, মানুষ শুধুমাত্র তার কিছুটা উদ্‌ঘাটনকারী) তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান পূর্ণরূপে কারও নিকট প্রকাশ করেন না।" (৭২ ঃ ২৬)
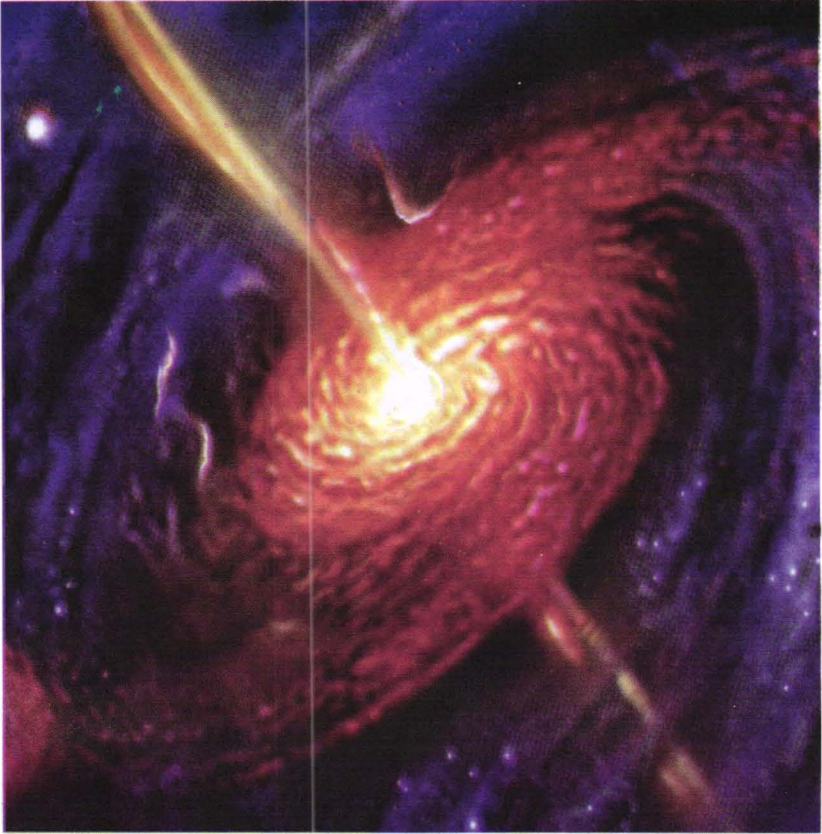
চিত্র–৮৮

– মহাবিশ্বের মহাশূন্যে মহাবিস্ময়ের মধ্যে অন্যতম বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে– Black Hole. প্রতিটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রেই এদের বিশাল দেহের অস্তিত্ব ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীগণ শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে এরা প্রতিনিয়ত ভয়ংকর ঐশ্বরিক টানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র ব্যবস্থাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে গিলে গিলে সাবাড় করে দিচ্ছে। এদের গ্রাস থেকে এক পর্যায়ে গ্যালাক্সিও রক্ষা পাচ্ছে না। কি ভয়ংকর ব্যবস্থা এই Black Hole! এগুলোই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য এবং কুরআনও সত্য।

"তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের মাঝে সংঘটিত) এমন কোন বিষয়ে সংবাদ দিতে চাও, যা তিনি অবগত নন? (বরং তিনি এগুলোর স্রষ্টা হিসেবে সবচেয়ে বেশি জানেন) নিশ্চয় তিনি অজ্ঞানতা হতে অতি পবিত্র।" (১০ ঃ ১৮)
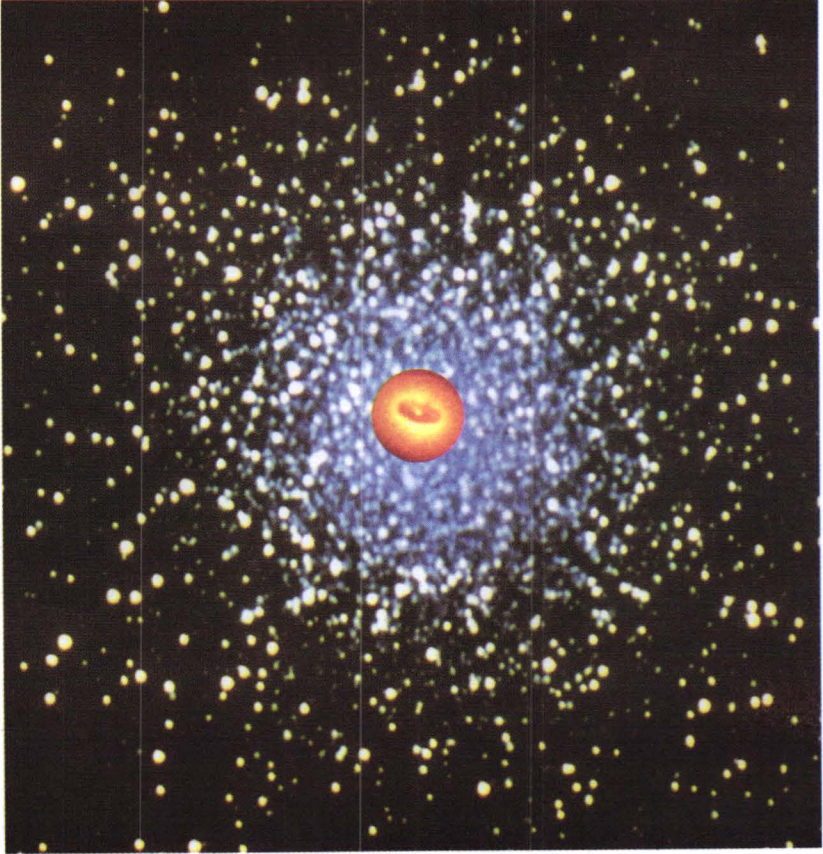
চিত্র–৮৯

– ওপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে গ্যালাক্সি তীব্র গতিতে উড়তে গিয়ে যখন চতুর্দিক হতে সঙ্কুচিত হয়ে ছোট হতে থাকে তখন চাপে চতুর্দিক হতে নক্ষত্রসমূহ ছুটে এসে কেন্দ্রে জড় হতে থাকে। আর তখন Black Hole ব্যাপকভাবে ওদের গলাধঃকরণ করে করে নিঃশেষ করে দেয়। কুরআনের 'নক্ষত্রপতন' স্থানের ভয়াবহতার বর্ণনা এখানে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাই প্রমাণ হচ্ছে 'কুরআন' মহাসত্য গ্রন্থ।

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) অসংখ্য (বিজ্ঞানসম্মত এবং বাস্তব) নিদর্শন রয়েছে (তাদের একমাত্র প্রভুর উপস্থিতি এবং কর্ম তৎপরতা উপলব্ধির জন্য), তারা এ সমস্তই প্রত্যক্ষ করে (ঠিকই, তবে সংকীর্ণ মানসিকতা এবং সত্য গ্রহণে অনিচ্ছার কারণে) কিন্তু ঐসব বিষয়ের প্রতি তারা উদাসীন।" (১২ ঃ ১০৫)

চিত্র-৯০

– ওপরের ছবিতে Black Hole কিভাবে অসংখ্য নক্ষত্রকে একত্রে মহাকর্ষ বলের প্রচণ্ড প্রভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করে তার চোঙের ভেতরে টেনে নিচ্ছে তা দেখা যাচ্ছে। তীব্র গতিতে গ্যালাক্সি উড়তে গিয়ে ধ্বংসের পূর্ব মুহূর্তে এ জাতীয় বিপর্যয়কর অবস্থায় নিপতিত হচ্ছে। সত্যিই মহান স্রষ্টার এ এক মহান কীর্তিই বটে। একমাত্র তাঁর পক্ষেই এটা সম্ভব। মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও এক দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং আল্লাহ্‌র বাস্তব প্রমাণ দেখেও নীরব থাকা বড় মূর্খতা নয় কী?

"আমি ঐ সব মানুষের জন্য (যারা সত্যি সত্যি সমাজে জ্ঞানী এবং নিরপেক্ষ মন-মানসিকতা সম্পন্ন এবং প্রকৃত সত্যকে আলিঙ্গন করতে আগ্রহী, তাদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে মোড়ানো) নিদর্শন প্রকাশ করে থাকি, যারা স্মরণকারী ও চিন্তাশীল।" (৬ ঃ ১২৬)
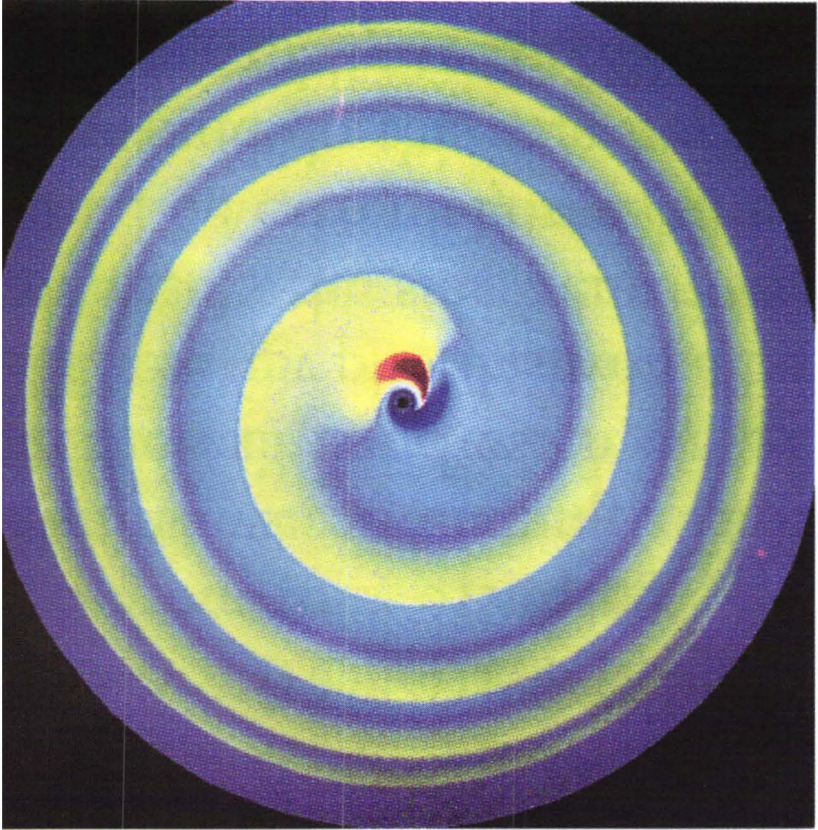
চিত্র-৯১

– এতদিন বিজ্ঞানী মহল ভাবতে ছিলেন গ্যালাক্সির কেন্দ্রের বিশাল Black Hole-এর যবনিকাপাত কিভাবে ঘটে থাকে। ইদানিং এর সমাধানকল্পে তারা উদঘাটন করেছেন যে, ব্যাপক থেকে ব্যাপক আকারে নক্ষত্র ভক্ষণ করতে গিয়ে এক পর্যায়ে ওর খাদ্যনালী জাম্ (Chocked) হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে Black Hole তার অস্তিত্ব তখন আর ধরে রাখতে পারে না। বিস্ময়কর নয় কি? যে আল্লাহ্ তাদের সৃষ্টিকারী, সেই আল্লাহ্ই আবার কৌশলে তাদের যবনিকাপাতকারী। এ কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহ্র।
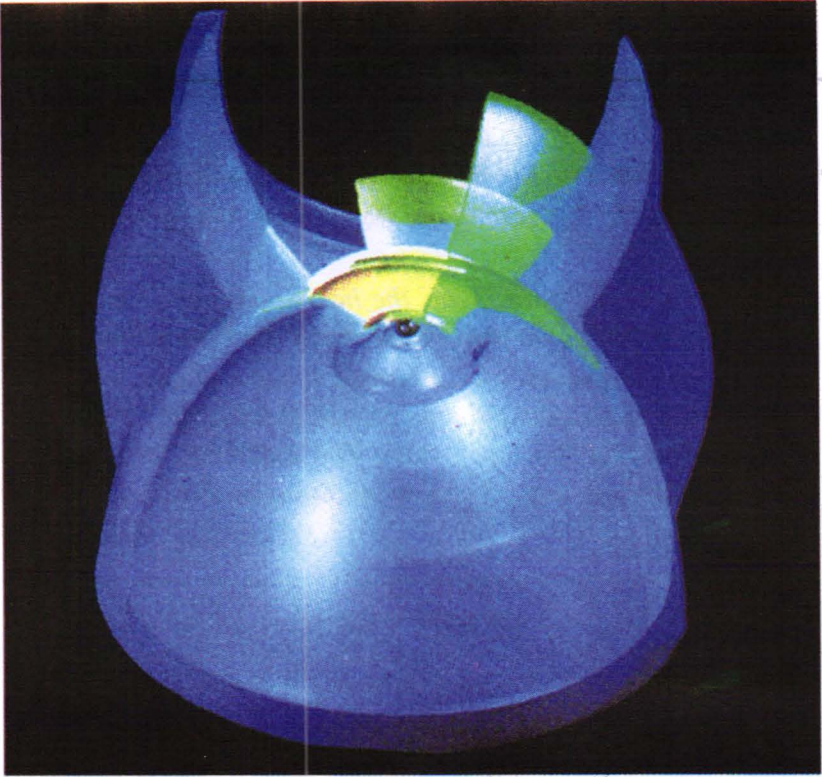
চিত্র-৯২

Scientists from the Institute of Astronomy in Cambridge have discovered that even black holes have limits to the amount of matter they can digest. According to a paper in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society written by Professors Jim Stone, Jim Pringle and Mitch Begelman, black holes can only swallow limited amount of material at any one time. If you try to feed a black hole with mater too quickly, it will 'choke' and only manage to swallow a small amount.

Computer simulations by the Cambridge group investigated what happens as black holes grow by swallowing material. A particular area of interest was to find out why black holes are

not radiating huge amounts of energy from the glowing matter which circles them as it is sucked inwards.

As expected, their studies show that matter approaching a black hole will start to slow down, releasing energy and becoming hotter as it begins to fall inwards. However, only a small part of this infalling matter is actually ingested by the hungry hole in space.

"According to previous ideas, the hole should have swallowed the material without any problems," said Professor Stone, "But instead, as the material fell inwards, more and more of it was turned back out again and only a small fraction of the material actually reached the black hole. The conclusion we have to draw from this is that, if you try to force-feed a black hole, it will choke."

বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেন কোয়াসারটি তার উজ্জ্বলতা ব্যাপক হারে ছড়াচ্ছে। এ ঘটনার ৫৫ দিন পর এ অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। অতঃপর ৩ মাসের মধ্যে এর পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে এবং পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বলতা কমে যেতে থাকে। বর্তমানে ওর নির্গত উজ্জ্বলতা (Gamma-ray emission) পূর্বের সর্বোচ্চ রেকর্ডতো দূরের কথা পূর্বের স্বাভাবিক স্কেল থেকেও অনেক অনেক নীচে নেমে গেছে এবং যে কোন মুহূর্তেই চিরতরে নিভে গিয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। আমাদের সৌরজগতের প্রায় দেড়গুন সমান আয়তন বিশিষ্ট কোয়াসারটি কোটি কোটি নক্ষত্র প্যাক্ট (Packed) অবস্থায় বুকে ধারণ করে সম্ভবতঃ আলোর গতির সমান গতিপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আদি আকৃতির ব্যাপক সঙ্কোচন ঘটিয়ে (কোটি কোটি নক্ষত্রের ব্যাপক ধ্বংস ঘটিয়ে) মহাজাগতিক কঠিন নিয়মের ভেতর দিয়ে 'মহাসূক্ষ্ম' বিন্দুর (Singularity) দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আর তাই হয়তো ওর অভ্যন্তরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কারণে এক পর্যায়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিকীরণ (Radiation) নির্গত করে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করেছিল। এখন শেষ পরিণতির করুণ অবস্থায় যৎসামান্য গামা-রে নির্গত (Gamma-ray emission) করছে। আর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে হয়তোবা 'মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে' (Singularity) প্রবেশ করে দৃশ্যমান অস্তিত্বের সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধন করবে এবং গামা-রে নির্গতকরণ নিজ থেকেই নিঃশেষ করে দেবে। বিজ্ঞানের উক্ত আবিষ্কারটি মহাবিশ্বের সৃষ্টির শুভক্ষণটি-'বিগ-ব্যাংগ'কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যেখানে এ জাতীয় মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (10^{-33} cm) সমস্ত বস্তুভর এক সময় প্রচণ্ড চাপে জমানো ছিল। তাই বর্তমান বিজ্ঞানীগণ, বস্তুজগতের প্রায় প্রান্তঃসীমানায় গ্যালাক্সি বা কোয়াসারের উল্লেখিত পদ্ধতিতে পর পর 'মহাসূক্ষ্ম' বিন্দুতে জমে গিয়ে অদৃশ্য হওয়াকে, শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নতুন নতুন জগত আবার সৃষ্টির সম্ভাবনার কথাই বলে চলেছেন। কেননা সমগ্র গ্যালাক্সি প্রায় ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্র সমেত মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে ঘনায়নের পর পরবর্তী অবস্থা-ই হচ্ছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে পূর্বের সঙ্কোচনের বিপরীতে মহাসম্প্রসারণে নিয়োজিত থেকে পর্যায়ক্রমে নতুনভাবে জগত সৃষ্টি করা,

যা আমরা ‘Big Bang Model’-এ প্রত্যক্ষ করেছি। বিজ্ঞান বিশ্ব উল্লেখিত তথ্যের সমর্থনে বেশ চাঞ্চল্যকর একটি বিষয় ইতিমধ্যেই উদঘাটন করেছে। আর তা হলো মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানায় অর্থাৎ বহু দূরে ‘গামা-রে বিচ্ছুরণ’ (Gamma-ray burst) দর্শন ও শনাক্ত করে ছবি ধারণ। উক্ত ‘গামা-রে বিচ্ছুরণ’ এত প্রচণ্ডভাবে সংঘটিত হচ্ছে যে, তা সমগ্র মহাকাশকে তার ঝল্ক (Flash) দিয়ে আলোকময় করে দিচ্ছে। ব্যাপারটি জাতি সংঘের তত্ত্বাবধানে পারমাণবিক বিস্ফোরণরোধক (Nuclear Ban Treaty) কমিটি বিমান ও ‘Vela Satellite’-র মাধ্যমে মহাশূন্যে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ওপর কড়া নজর রাখতে গিয়ে সর্বপ্রথম এ তথ্য আবিষ্কার করেন। প্রথম প্রথম তারা ভেবেছিলেন ভূ-পৃষ্ঠে গোপনে কোন দেশ হয়তোবা নিষিদ্ধ ঘোষিত একাধিক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীতে ঐ ‘গামা-রে বিচ্ছুরণের’ ব্যাপকতা ও বিশালতা পরিমাপের পর তাদের সে ভুল ভেঙ্গে যায়। বিজ্ঞানী মহলে তুমুল হৈ-চৈ পড়ে যায়। পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি উৎকর্ষিত স্যাটেলাইট (Beppo-Satelite, Compton Observatory, BATSE. Instrument ইত্যাদি) কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীগণ উল্লেখিত ‘গামা-রে’ বিচ্ছুরণের’ (GRBs) উৎসস্থান প্রাথমিকভাবে হলেও শনাক্ত করতে সমর্থ হন। যদিও এর প্রকৃত কারণ সন্ধানে এখনও তারা নিয়োজিত রয়েছেন। তবে কেউ কেউ এর কারণ সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে, হয়তোবা কল্পনাতীত উক্ত ‘গামা-রে বিচ্ছুরণের’ জন্য একাধিক ‘নিউট্রন ষ্টার’ বা ‘ব্ল্যাক হোলের’ সংঘর্ষই মূলতঃ কারণ হতে পারে। কিন্তু উক্ত প্রস্তাব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই গ্রহণযোগ্যতা পায় না। কেননা সদ্য শনাক্ত ‘গামা-রে বিচ্ছুরণ’ থেকে মুহূর্তের মধ্যে যে পরিমাণ বিকিরণ নির্গত হচ্ছে, বিজ্ঞানীগণের ভাষ্য মতে তার তুলনা হতে পারে কেবল মাত্র ‘Big Bang’ বিস্ফোরণ হতে নির্গত বিকিরণের কাছাকাছি পর্যায়ের বিকিরণের সাথে, অন্য কোন বিকিরণের সাথে এর তুলনা হতে পারে না, কেননা মানব সভ্যতা এখনও পর্যন্ত এ জাতীয় প্রচণ্ড শক্তিশালী- বিস্ফোরণের সাথে পরিচিত নয় (Gamma-ray Burst (GRBS) are the most powerful explo

"তিনি তোমাদেরকে (তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ বিজ্ঞানভিত্তিক) বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?" (৪০ : ৮১)

চিত্র-৯৩

– জাতি সংঘের উদ্যোগে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে আকাশ থেকে পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত বিমান সর্বপ্রথম, 'গামা-রে বার্স্ট' (Gamma-Ray Burst বা (GRB) সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল হয়তোবা গোপনে কোন দেশ পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। ফলে কল্পনাতীত তেজস্ক্রিয়তায় মহাকাশ ভরে যাচ্ছে। পরে দেখা গেল সে ধারণা ভুল, বরং মহাবিশ্বের প্রান্তে 'গামা-রে' বার্স্ট সংঘটিত হচ্ছে। যার আলোরছটা সমগ্র মহাকাশকে আলোকময় করে তোলে।

"আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের কল্যাণে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) সমস্ত কিছুকে নিয়োজিত করেছেন, চিন্তাশীল সমাজের জন্য এতে অবশ্যই স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে।" (৪৫ ঃ ১৩)

চিত্র–৯৪

– ওপরের ছবিতে Compton Gamma - Ray Observatory, দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর কক্ষপথে অবস্থান করে এ কৃত্রিম উপগ্রহটি 'গামা-রে বার্স্ট' কে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে এবং তা থেকে বিচ্ছুরিত গাঢ় নীলাভো 'গামা-রে' দিয়ে সমগ্র আকাশ যে ভরে যায়, সে তথ্যও প্রদান করেছে। খুবই শক্তিশালী বলে সে আলোকে আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়ে দর্শন লাভ করতে সক্ষম হইনা। 'গামা-রে' জীব ও উদ্ভিদের জন্য খুবই বিপদজনক।

"অবশ্যই এতে (স্রষ্টার উপস্থিতির স্পষ্ট) নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।" (১৫ ঃ ৭৫)
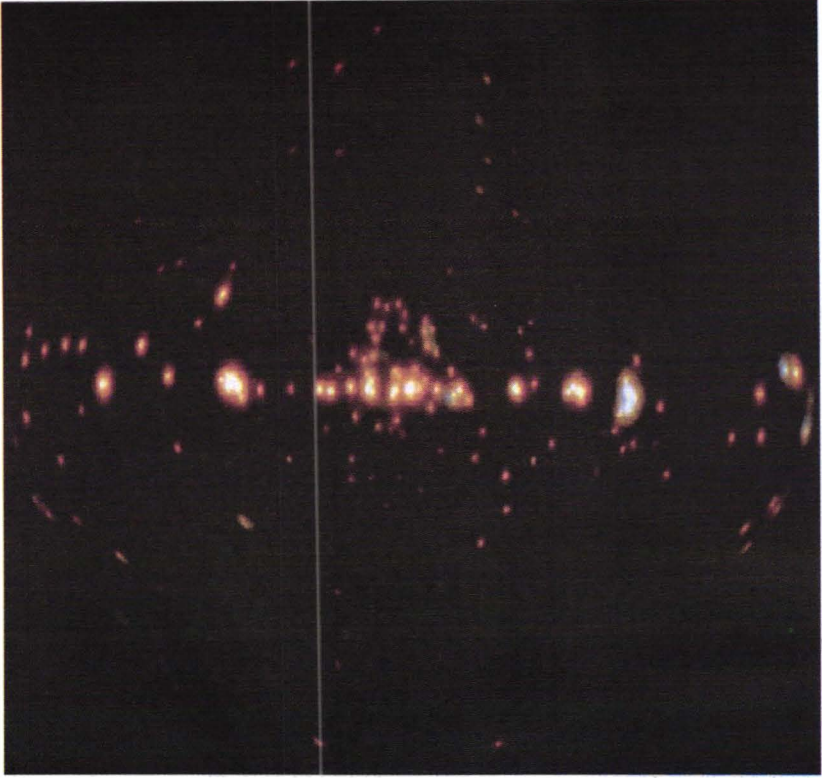
চিত্র-৯৫

– পৃথিবীর কক্ষ পথে প্রদক্ষিণরত Compton Gamma-Ray Observatory কর্তৃক তৈরী আকাশ চিত্রে গাঢ় নীলাভো 'গামা-রে' দিয়ে যে পরিপূর্ণ তা দেখা যাচ্ছে। 'গামা-রে বার্স্ট' –এর মুহূর্তে সৃষ্ট 'গামা-রে' দিয়ে এভাবে সমগ্র আকাশ রূপ ধারণ করে প্রমাণ করছে– Big Bang-এরপর এত বড় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আর দ্বিতীয়টি ঘটছে না। ফলে মহাবিশ্বের প্রান্তে গ্যালাক্সিগুলো যে এক এক করে সঙ্কুচিত হয়ে শেষে আবার প্রচণ্ড চাপ ও তাপে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুনভাবে জগত তৈরী হচ্ছে তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে।

সুতরাং মহান আল্লাহ্ যেমন সত্য, তেমনি তাঁর বাণীও সত্য। অস্বীকার করার কোন পথ আছে কী?

"সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, আর মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।" (১৭ ঃ ৮১)
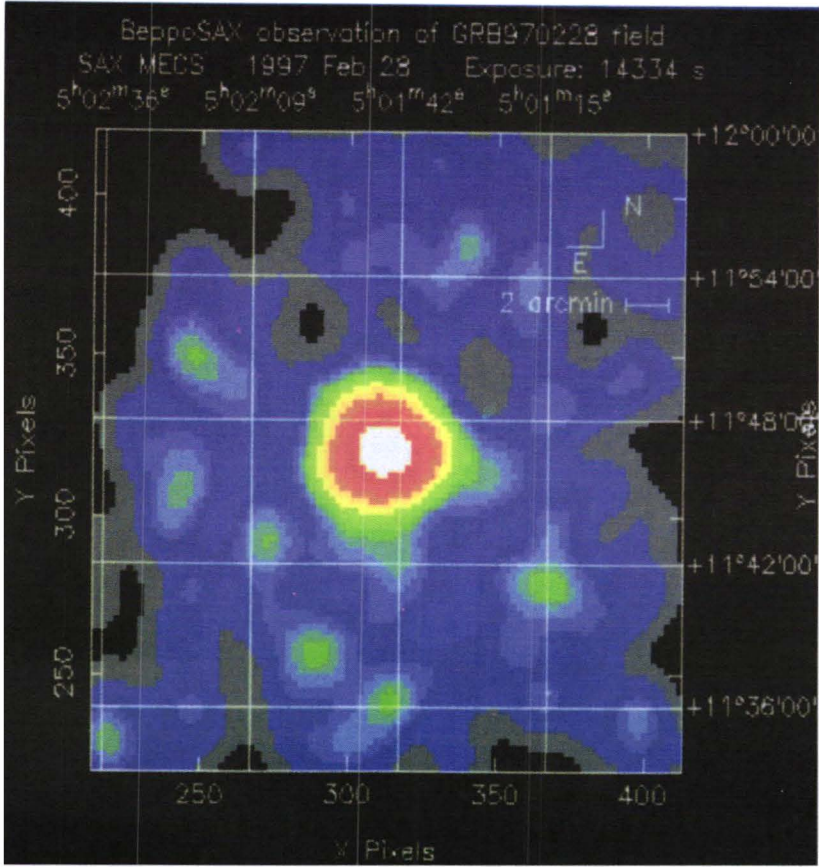
চিত্র-৯৬

– বস্তু জগতের প্রান্তসীমায় গ্যালাক্সি আলোর গতি লাভ করে মহাসঙ্কোচনে পতিত হয়ে প্রচণ্ড চাপ ও তাপে যে 'Big Bang'-এর অনুকরণে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে, সেই GRB-এর সঠিক অবস্থান, পৃথিবীর আকাশে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে স্থাপিত 'হাবল টেলিস্কোপ'ও চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে 'গামা-রে বার্স্ট' (GRB) অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। ঘটনা সত্য। এতুটুকুন পর্যন্ত বস্তুজগতের পরিক্রমণ (Cycle)-কে অর্ধেক বলা যায়। বাকী অর্ধেক হচ্ছে পুনরায় প্রান্ত থেকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসা।

"তারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর ওর পুনরাবর্তন ঘটান? এটাতো আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ।" (২৯ ঃ ১৯)
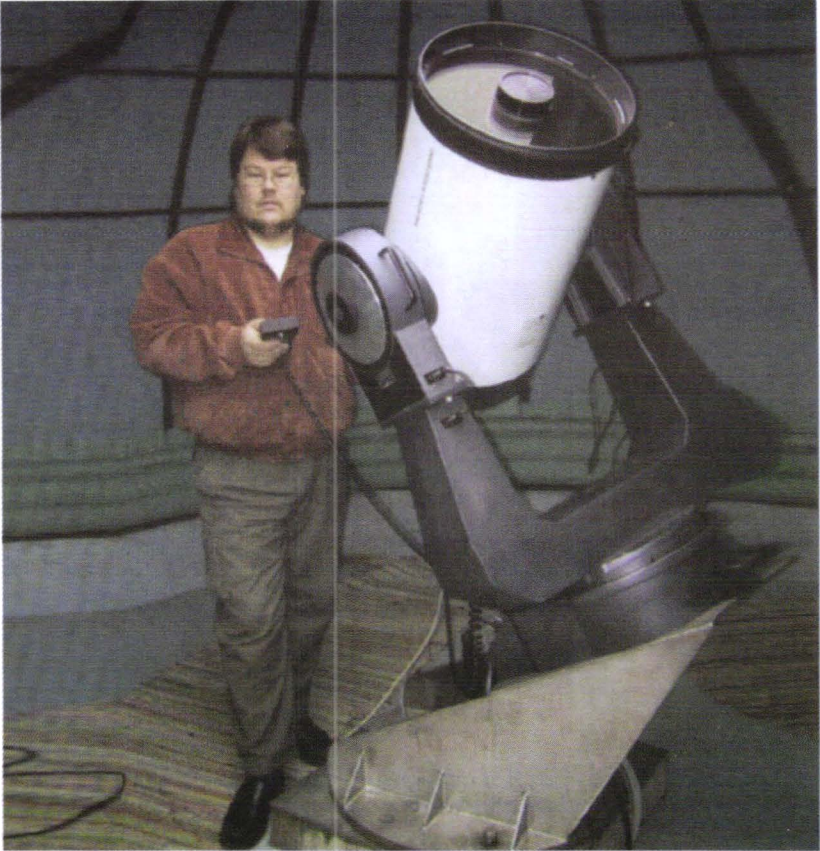
চিত্র-৯৭

– ওপরে আকাশ পর্যবেক্ষণকারী বিজ্ঞানী 'Mr. Arto Oksanen' তার টেলিস্কোপ দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ থেকেই 'গামা-রে বার্স্ট' কে শনাক্তকরণ ও পর্যবেক্ষণ করে এর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

'Big Bang' থেকে সমগ্র মহাবিশ্ব জন্ম নিয়েছিল আর এ 'গামা-রে বার্স্ট' থেকে একটি গ্যালাক্সির ভেতরকার পদার্থ দিয়ে সীমিত পর্যায়ে নুতন জগত তৈরী হচ্ছে। যে জগত সম্ভবতঃ পরকালের বিচারের মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

"তিনি (আল্লাহ্) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) সমুদয় গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন (কেননা প্রকৃতপক্ষে তিনিইতো এগুলো ঘটাচ্ছেন)।" (২৫ ঃ ২৬)
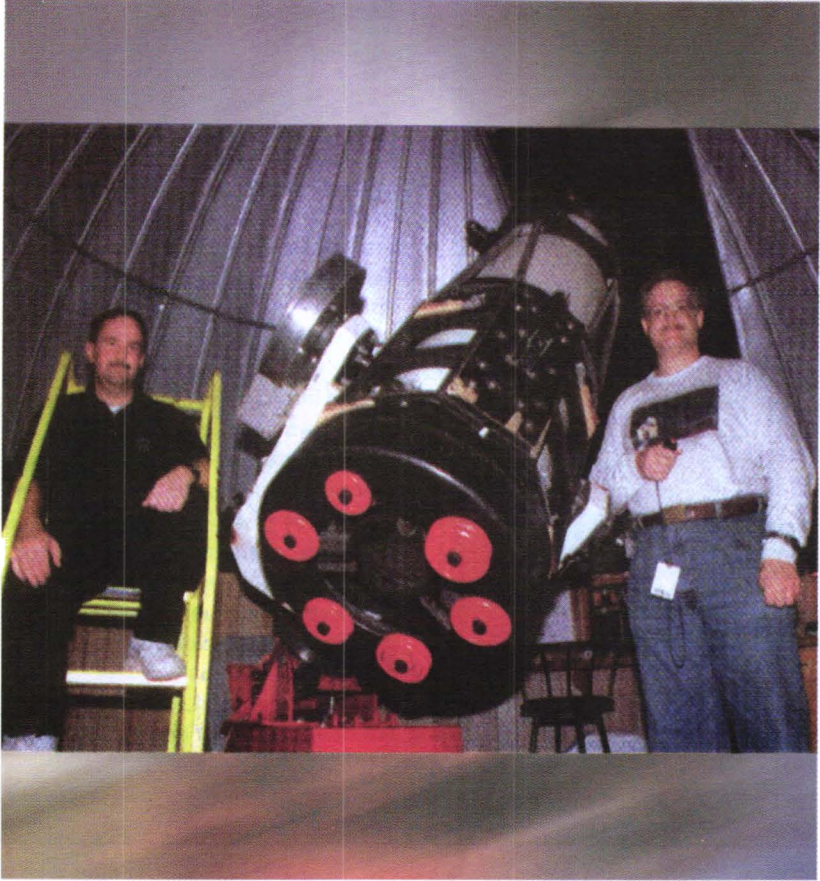
চিত্র–৯৮

– আকাশ বিজ্ঞানী 'Mr. Joe Dellinger (ডানে বসা) Gamma-Ray Burst' কে গ্রাউণ্ড বেইছ টেলিস্কোপের সাহায্যে শনাক্ত করে প্রমাণ করেন বস্তুজগতের প্রান্ত সীমানায় আলোর গতিতে উড়ে চলা গ্যালাক্সি সঙ্কুচিত হয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে, যে বিস্ফোরণের ফলশ্রুতি হচ্ছে সীমিত পর্যায়ে নতুনভাবে জগত তৈরী করা। এতে কুরআনের বাণীর প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে, সত্য এভাবেই ধীর গতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে।

"বলো, আল্লাহ্-ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন (Big Bang মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে) এবং ওর পুনরাবৃত্তি (গ্যালাক্সিকে সঙ্কুচিত ও পরবর্তীতে তা বিস্ফারিত করে GRB নামে) ঘটিয়ে থাকেন।" (১০ ঃ ৩৪)
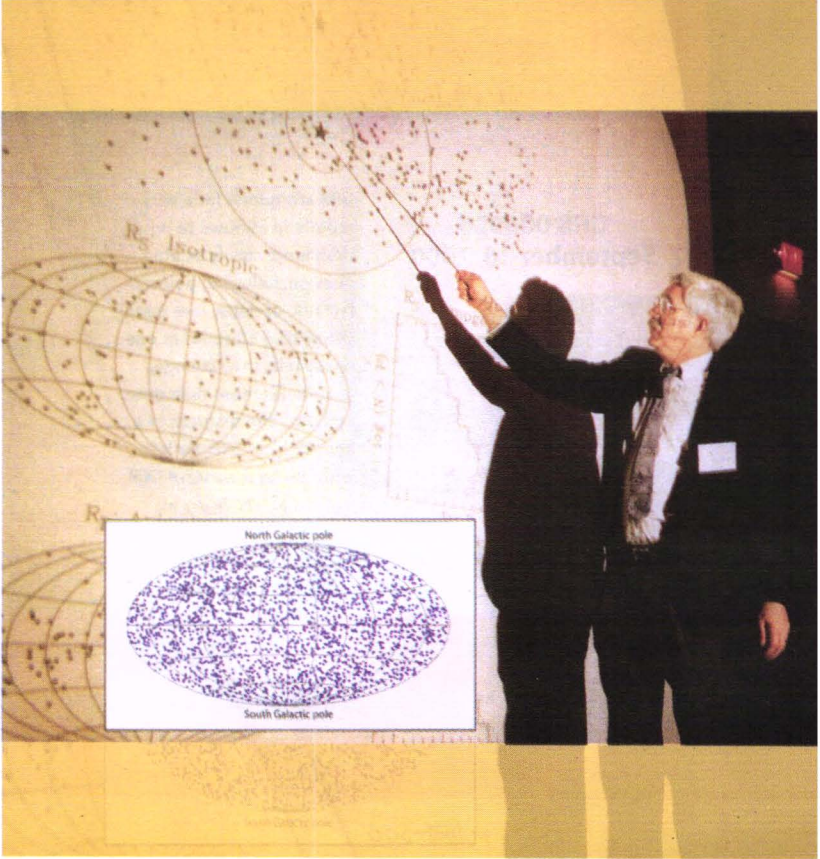
চিত্র–৯৯

– ছবিতে NASA'র Mershall Space Flight Centre –এর 'Mr. Charles Meegan' মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানার দিকে সংঘটিত 'গামা-রে বার্স্ট'-এর বর্ণনা দিচ্ছেন। গড়ে প্রায় প্রতিদিনই একটি করে 'গামা-রে বার্স্ট' সংঘটিত হচ্ছে কোন না কোন দিকে বিলিয়ন বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে।

"আল্লাহ্ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ আছে কি যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের একমাত্র) স্রষ্টা?" (১৪ ঃ ১০)

চিত্র-১০০

– ছবিতে New York শহরে অনুষ্ঠিত 'Special Panel Session on GRB' তে বিজ্ঞানীগণ 'গামা-রে বার্স্ট'-এর ওপর আলোচনা পেশ করছেন। এতে GRB-এর সত্যতা এবং এর মাধ্যমে ব্যাপক Gamma-Ray নির্গত হয়ে মহাকাশ যে পূর্ণ করে দেয় সেই বিষয়ই প্রাধান্য পায়।

'গামা-রে বার্স্ট' আজ পরকাল সৃষ্টির বাস্তব দলীল নিয়ে মানব সমাজের দ্বারে উপস্থিত হয়েছে। সত্য নয় কী?

"আল্লাহ্ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ আছে কি যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) একমাত্র স্রষ্টা?" (১৪ : ১০)

চিত্র-১০১

– সমগ্র বিশ্ব থেকে আমেরিকার 'Huntsville' শহরে একত্রিত হয়েছেন 'গামা-রে বার্স্ট' পর্যবেক্ষণকারী ও শনাক্তকারী ৮০ জন বিজ্ঞানী। ওপরের ছবিতে তাদের দেখা যাচ্ছে। তারা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানায় সংঘটিত Gamma-Ray Burstsগুলোর সাথে তুলনা হতে পারে এমন তথ্য বিজ্ঞানী মহলের হাতে বর্তমান নেই। Big Bang-এর পরেই এর স্থান। 'Gamma – Ray Burst' বিজ্ঞান বিশ্বের জন্য এক নতুন দিগন্ত নিয়ে হাজির হয়েছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে বস্তুজগতের সাইকেলের (Cycle) একটি অংশ হচ্ছে 'গামা-রে বার্স্ট'।

"শপথ গ্যালাক্সিসমূহের (নক্ষত্রপুঞ্জের) যারা পশ্চাতগমনে রত এবং যারা ভেসে ভেসে (মহাশূন্যে) উড়ে বেড়ায় (এক পর্যায়ে ক্ষুদ্রত্ব বরণ করে) অদৃশ্য হয়ে যায়।"

(৮১ ঃ ১৫ ও ১৬)

চিত্র-১০২

– ওপরের ছবিটি Hubble Space Telescope দিয়ে ধারণ করা হয়েছে। এতে তীর চিহ্নিত গ্যালাক্সিটি প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে উড়ে যাওয়ার কারণে মহাজাগতিক নিয়মে প্রচণ্ড চাপে সঙ্কুচিত হয়ে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রত্ব বরণ করতে দেখা যাচ্ছে। এ সময় ওর ভেতরকার প্রাণময় সৌরব্যবস্থাগুলোও ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রচণ্ডভাবে সঙ্কুচিত হয়ে মহাসূক্ষ্ম একটি বিন্দুতে (Singularity–তে) উপনীত হবে এবং টেলিস্কোপের দৃষ্টি থেকেও হারিয়ে যাবে। দেখুনতো 'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞানে' কোন পার্থক্য আছে কি?

"শপথ ঐ সকল তারকাপুঞ্জের (গ্যালাক্সির) যারা (মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় প্রচণ্ড গতিতে উড়তে গিয়ে এক পর্যায়ে মহাসঙ্কোচনে পড়ে ক্ষুদ্রত্ব বরণ করার মধ্য দিয়ে) অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৫৩ ঃ ১)

চিত্র–১০৩

– ওপরের ছবিটি একটি 'কোয়াসার' (Quasar)-এর, যার সন্ধান লাভ করেছেন বিজ্ঞানীমহল, যার Redshift হচ্ছে 5.4 –অর্থাৎ এ যাবত কালের মধ্যে সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে এ কোয়াসারটিকে উড়ে যেতে এবং ক্রমান্বয়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে উপনীত হতে দেখা যাচ্ছে। যে মুহূর্তে অদৃশ্য প্রায় বিন্দুতে চলে যাবে তখন স্বাভাবিক নিয়মেই এর মধ্যে ঘটবে মহাবিস্ফোরণ। বিজ্ঞান বিশ্ব এরই নাম দিয়েছেন 'Gamma-ray Burst'. আল্লাহ্ সত্য, তাই তিনি সত্য কথাই বলেন। নতুবা প্রায় ১৪০০ বছর আগে কুরআন এ সত্য জানতে পারলো কিভাবে?

"বলো, আল্লাহ্-ই সৃষ্টিকে (মহাবিশ্বকে প্রথম) অস্তিত্বে আনেন এবং (একই সঙ্কোচন পদ্ধতিতেই তিনি আবার গ্যালাক্সিগুলোর মাধ্যমে) ওর পুনরাবৃত্তি ঘটান।" (১০ ঃ ৩৪)
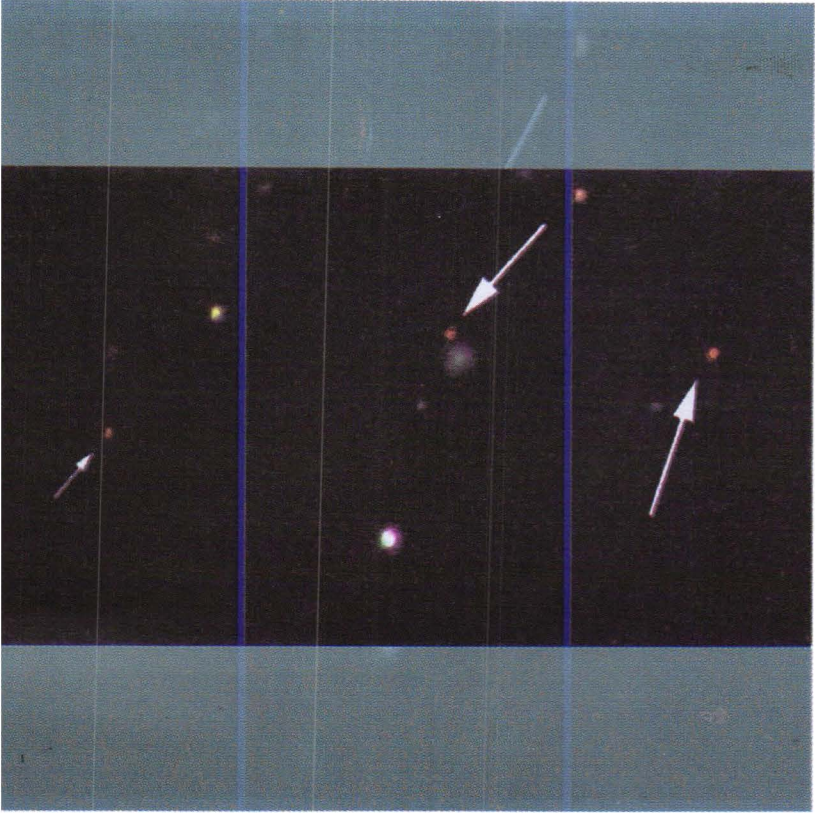
চিত্র-১০৪

- ছবিতে একটি 'Powerful High Redshift Quasar' -কে দেখা যাচ্ছে। এর উজ্জ্বলতা প্রায় ১০০টি গড় গ্যালাক্সির সমান। অথচ মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানায় আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে উড়ে যাওয়ার সময় গতিমুখের বিপরীতে বাধার কারণে সঙ্কুচিত হয়ে প্রায় অদৃশ্য ক্ষুদ্র বিন্দুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পরে এক পর্যায়ে চাপ ও তাপে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার নতুনভাবে তৈরী করবে নতুন সৃষ্টি। কুরআনের বক্তব্যে কোন ভিন্নতা আছে কী? সকল অস্পষ্টতা দূর হয়ে গিয়ে এবার আল্লাহ্কে জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে কী?
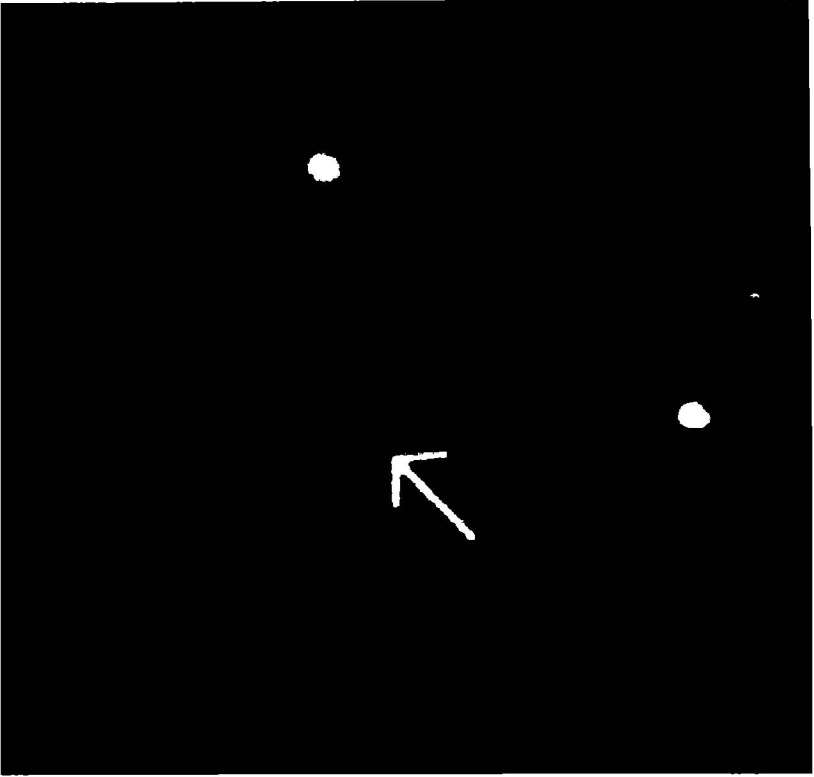
চিত্র-১০৫

Scientists using the Burst and Transient Source Experiment (BATSE) aboard the Compton Gamma Ray Observatory have discovered that a distant quasar continuously emits low energy ('soft') gamma rays interspersed by an occasional burst.

This is quite an achievement because BATSE observes the entire sky and does not have the accuracy of identify individual stars or galaxies. One way to overcome this handicap is to use the Earth as a giant occulting disk so that the signal of a particular source can be identified as it appears and disappears behind the planet.

The quasar concerned, known as 4C 71,07, lies about 11 billion light years away and is extremely bright at radio wavelengths. After painstaking research using three years of BATSE data, Angela Malizia from the University of Southampton also recognised its faint, low energy gamma-ray emissions.

This makes it the faintest and most distant object to be obseved in soft gamma rays. 4C 71.07, has already been observed in gamma rays by the Energetic Gamma Ray Telescope (EGRET), another instrument aboard the Compton Gamma Ray Observatory.

The quasar is probably powered by a supermassive black hole at the centre of a newly forming galaxy. Its average flux (the amount of radiation reaching our telescopes) is about 1.3% that of the Crab Nebula, but it also bursts, although not simultaneously across the entire spectrum.

On November 20, 1995, it reached its record optical brightness. Then, 55 days later, the gamma ray emissions peaked, before fading back to the average output three month later. According to Malizia, this implies that the source is only 100 billion km (about 60 billion miles or a third of a light year) across.

The cause of the bursts remains unknown. However, the quasar population peaks at about the same distance as 4C 71.07, so the ability to observe these objects in soft gamma rays may provide astromomers with inportant information about their formation and internal processes.

"যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই (সঙ্কোচন পদ্ধতিতে) পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য। আমি তা পালন করবই।" (২১ ঃ ১০৪)
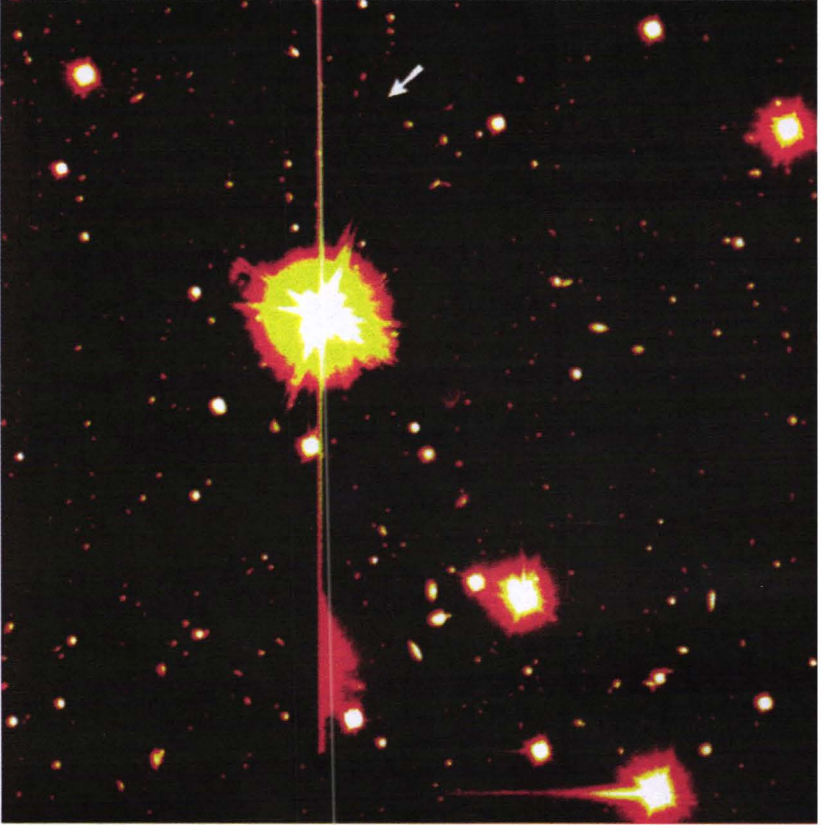
চিত্র–১০৬

– 'Gamma-ray Burst' মূলতঃই যে কত প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং এর থেকে নির্গত 'গামা-রে' যে কত ব্যাপক পরিমাণে মহাকাশে ছড়িয়ে থাকে, তা অনুধাবন করার জন্য বিস্ফোরণ মুহূর্তের ছবি ধারণ করতে বিজ্ঞানীগণ সক্ষম হয়েছেন। এতে দেখা যাচ্ছে ঐ মুহূর্তে সমগ্র মহাকাশ এবং তাতে লক্ষ কোটি গ্যালাক্সিও আলো ঝলমল করে ওঠে। ছবির দিকে তাকাতেই তা বুঝা যায়। তাহলে কুরআনের দাবীকে কিভাবে অস্বীকার করা যাবে? সমাজের জ্ঞানীজন বিষয়টি কি একবারও ভেবে দেখবেন না? Big Bang –এর পর 'গামা-রে বার্স্ট' -এর মাধ্যমে সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি চলছে। সত্য নয় কী?

"এতে অবশ্যই (মহাবিশ্বের স্রষ্টার উপস্থিতি এবং তাঁর মহাজ্ঞান ও মহাশক্তির কার্যকারিতার) নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য।" (১৬ ঃ ৬৭)
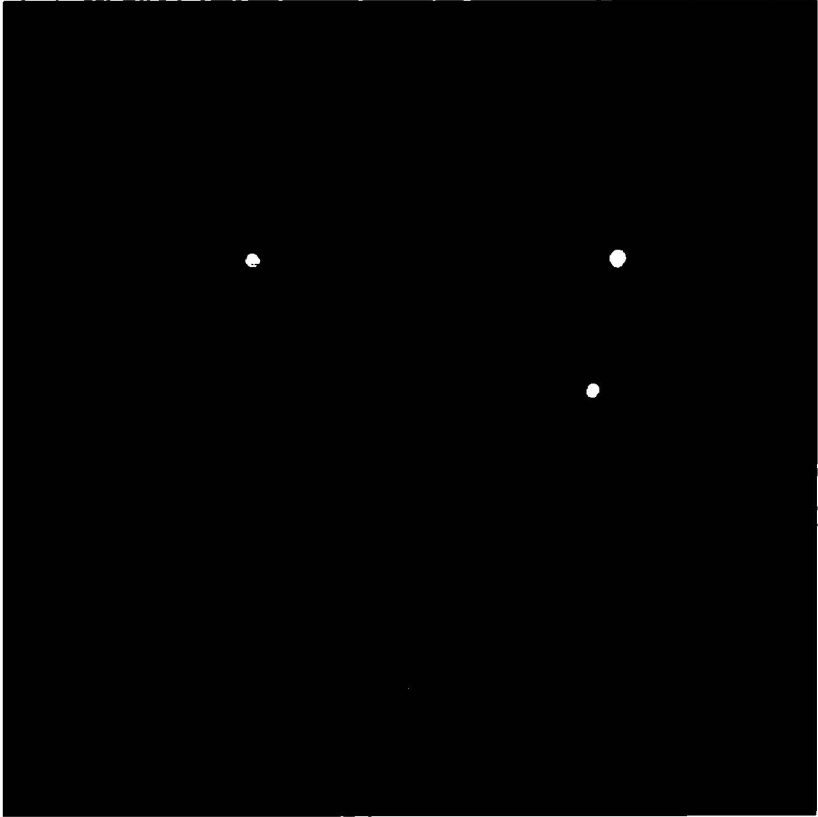
চিত্র–১০৭

– ওপরের ছবিতে একটি Gamma-ray Burst-এর প্রথম দিনের সৃষ্ট অগ্নিগোলক এবং পরের দিনের বর্ধিত অগ্নিগোলক দেখা যাচ্ছে। ছবিতে উক্ত 'Afterglow' জীবনময় জগতসমূহের জ্ঞানবান এবং জবাবদিহিতার বন্ধনে আবদ্ধ মানব সমাজকে যেন মুহূর্তের মধ্যেই পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কেননা উক্ত অগ্নিগোলকই পরে বিশাল গ্রহে রূপ নেবে।

মানব সমাজের প্রকৃত জ্ঞানীজন বিষয়টি অবশ্যই অনুধাবন করতে সক্ষম। সেই জন্যইতো কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন– Where are we going?

"প্রথমে যিনি (এ মহাবিশ্বকে প্রথমে মহাসঙ্কোচন ও পরে মহাবিস্ফোরণ পদ্ধতিতে) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি (ঐ একই পদ্ধতিতে) সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করবেন।" (২৭ ঃ ৬৪)
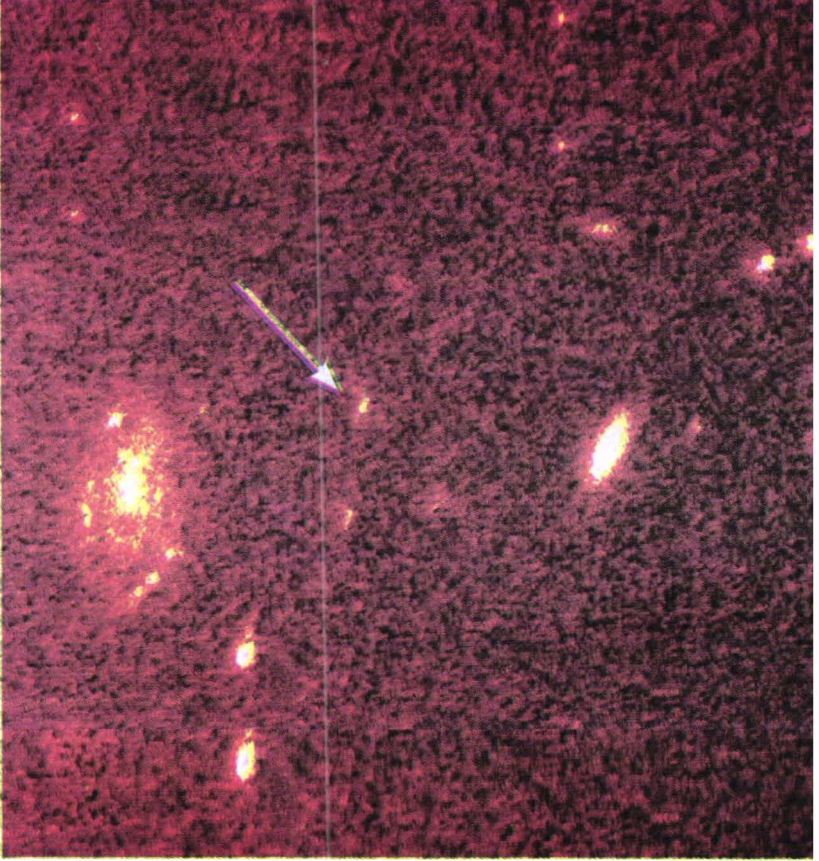
চিত্র–১০৮

– ওপরের 'গামা-রে বার্স্ট'-এর ছবি একই সাথে 'Space based Gamma-ray burst' detectors, Hubble Space Telescope এবং Keek Telescope দিয়ে ধারণ করা সম্ভবপর হয়। সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেছেন– উক্ত বিস্ফোরণ এবং এর থেকে নির্গত 'গামা-রে' –এর সাথে Big Bang ছাড়া আর কোন প্রকার বিস্ফোরণের তুলনাই হয় না। এ যেন মহাবিশ্বে এক মহাবিস্ময়কর ঘটনা।

সুতরাং বিজ্ঞান বিনাদ্বিধায় কুরআনকে সত্য বাণীরূপে স্বীকার করছে।

"আকাশ জগত ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) মধ্যস্থিত বস্তুপুঞ্জের (সকল প্রকার ঘটনা প্রবাহের) মধ্যে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে (যে সকল নিদর্শনের ভেতর দিয়ে মানুষ তার স্রষ্টার উপস্থিতি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে)।" (২ ঃ ১৬৪)

চিত্র–১০৯

– 'গামা-রে বার্স্ট' –এর মধ্যে বিজ্ঞানীগণ বিশেষ একটি দিক লক্ষ্য করেছেন। তা হলো বিস্ফোরণের পরপরই খুব স্বল্প সময়ের ভেতরই ওর উজ্জ্বলতা কমে যেতে থাকে। কিন্তু এর কি কারণ হতে পারে বিজ্ঞান তা জানেনা।

'কুরআন' বলছে- এটা এ জন্যই হচ্ছে যে, আল্লাহ্- পরকাল শুরু করবেন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে এবং খুবই স্বল্প সময়ে সৃষ্ট নতুন জগতে মানব জাতিকে উত্থিত করা হবে। তাই দ্রুত ওর তাপ ও আলো আল্লাহ্ কমিয়ে দিচ্ছেন।

সুতরাং 'কুরআনকে অস্বীকার করার পথ আছে কী?

"এটাতো (পরকালের ব্যবস্থাপনার শুরু) কেবলমাত্র একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এরপর পরই সৃষ্ট নতুন ময়দানময় জগতে তাদের আবির্ভাব ঘটবে।" (৭৯ ঃ ১৩)

"অতঃপর আবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে, তৎক্ষণাত ওরা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।" (৩৯ ঃ ৬৮)
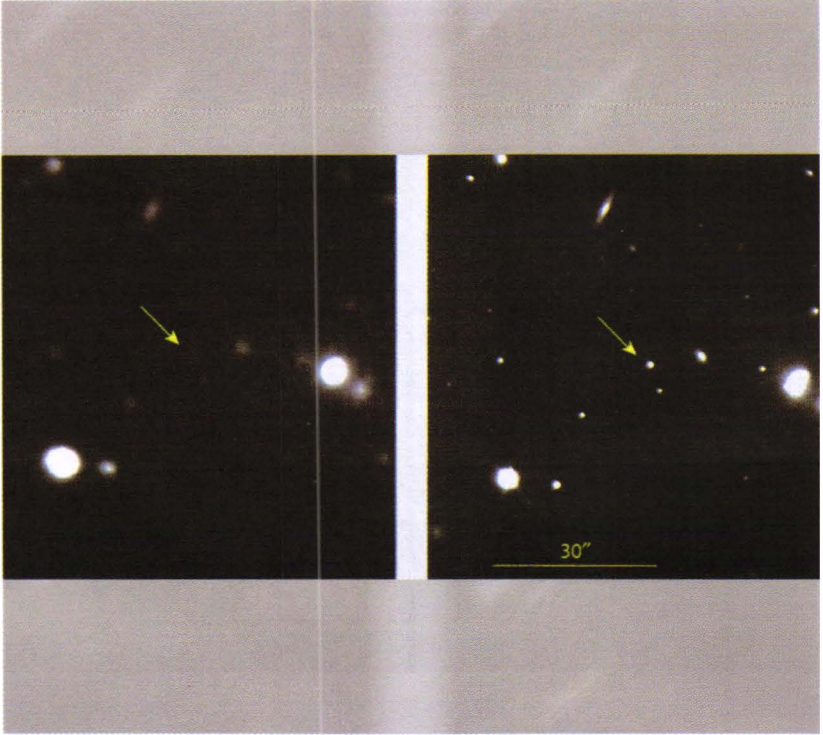
চিত্র-১১০

– ওপরে প্রদর্শিত ছবিতে 'গামা-রে বার্স্ট'-এর একদিকে উজ্জ্বলতা এবং অপরদিকে ঐ উজ্জ্বলতা দ্রুত স্তিমিত হয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। দ্রুত উজ্জ্বলতা হারিয়ে দ্রুত নতুন জগত তৈরী এর অন্যতম কারণ, যা পরকালে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করার বিষয়টি আল্লাহ্ কুরআনে ওয়াদা করেছেন।

সুতরাং মহাবিশ্ব তার কার্যক্রমের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিক্রমণ (Cycle) পূর্ণ করছে। তেমনি অপরদিকে কুরআনের বক্তব্যকে প্রমাণিত করে চলেছে। এত বড় প্রমাণ লাভ করার পরও কি মানুষ পরকালকে ভয় করবে না?

"সেইদিন আমি আকাশমণ্ডলীকে (একটি গ্যালাক্সিতে একাধিক আকাশ বিদ্যমান) গুটিয়ে ফেলবো যেভাবে লিখিত দফতর গুটানো হয়। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির (Big Bang-এর মাধ্যমে) সূচনা করেছিলাম, সেইভাবে (একই সঙ্কোচন পদ্ধতিতে গ্যালাক্সিকে সঙ্কুচিত করে) পুনরায় (বিস্ফোরণের মাধ্যমে নতুনভাবে) সৃষ্টি করবো। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এটা পালন করবো-ই।" (২১ ঃ ১০৪)
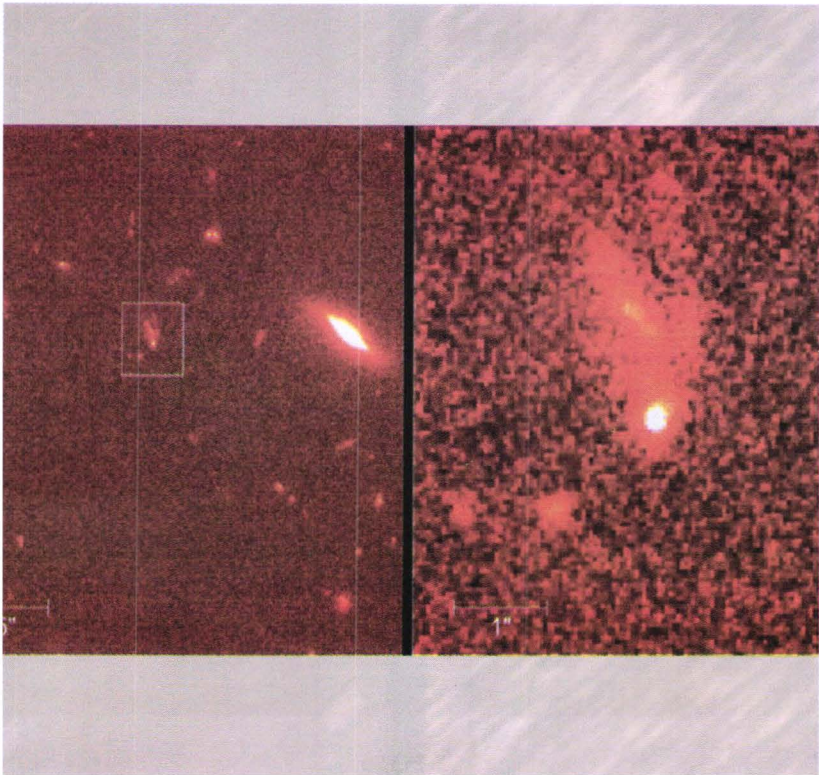
চিত্র–১১১

– ওপরের ছবিতে তাকালে এবং বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণকৃত রিপোর্ট পাঠ করলে 'কুরআন' যে সত্যি সত্যি মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র বাণী এবং 'আল্লাহ্‌' যে সত্যই বাস্তবে (অদৃশ্য হলেও) আছেন তা আর স্বীকার না করে পারা যায় না। তা না হলে এত গভীর জ্ঞানময় বিষয়ে কুরআন এবং বিজ্ঞানে এত মিল হয় কিভাবে? যেখানে উভয়ের মাঝে ব্যবধান প্রায় ১৪০০ বৎসর! বস্তুতঃ কুরআনের বক্তব্য যে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র-ই বক্তব্য তা আবারও বিজ্ঞান প্রমাণ করছে।

"তিনি তোমাদেরকে বহু নিদর্শন (বিজ্ঞানময় হাজারো বাস্তব ঘটনা) দেখায়ে থাকেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?" (৪০ ঃ ৮১)
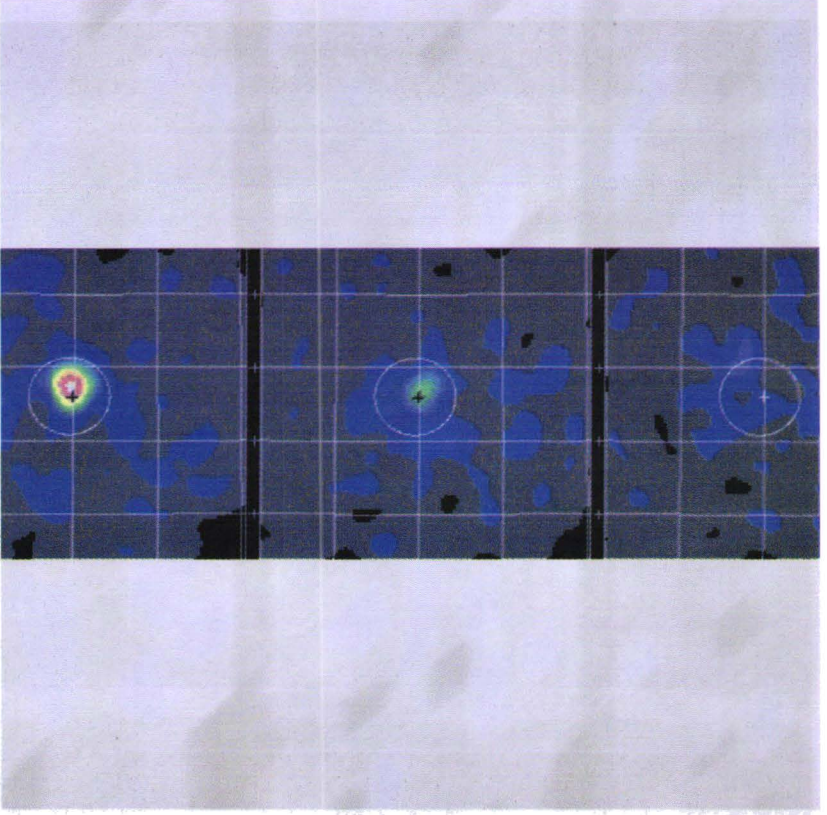
চিত্র–১১২

– বস্তুজগত তার পরিক্রমণ (Cycle) পূর্ণ করার পথে গ্যালাক্সি সঙ্কুচিত হয়ে একবার ধ্বংস, পরে ঐ সঙ্কুচিত ধ্বংসস্তূপে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আবার নতুন করে জগত সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। বর্তমান বিজ্ঞান এক এক করে সে সকল তথ্য উদঘাটিত ও প্রমাণিত করছে। সাথে সাথে বিজ্ঞান যে পরকালের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে সমাজের জ্ঞানীরা তা কি অস্বীকার করার কোন পথ খোলা আছে? নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর একটি কৌশল! সুতরাং সঠিক পথ গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

"তিনি মানুষকে জ্ঞান (আল্লাহর সৃষ্ট এ মহাবিশ্বে তাঁর পূর্ব ঘোষিত সকল ব্যাপারের পক্ষে চরম বাস্তবতার বোধগম্যতা) দান করেছেন (বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্যদিয়ে) ইতিপূর্বে মানব জাতি যা জানতো না।" (৯৬ ঃ ৬)
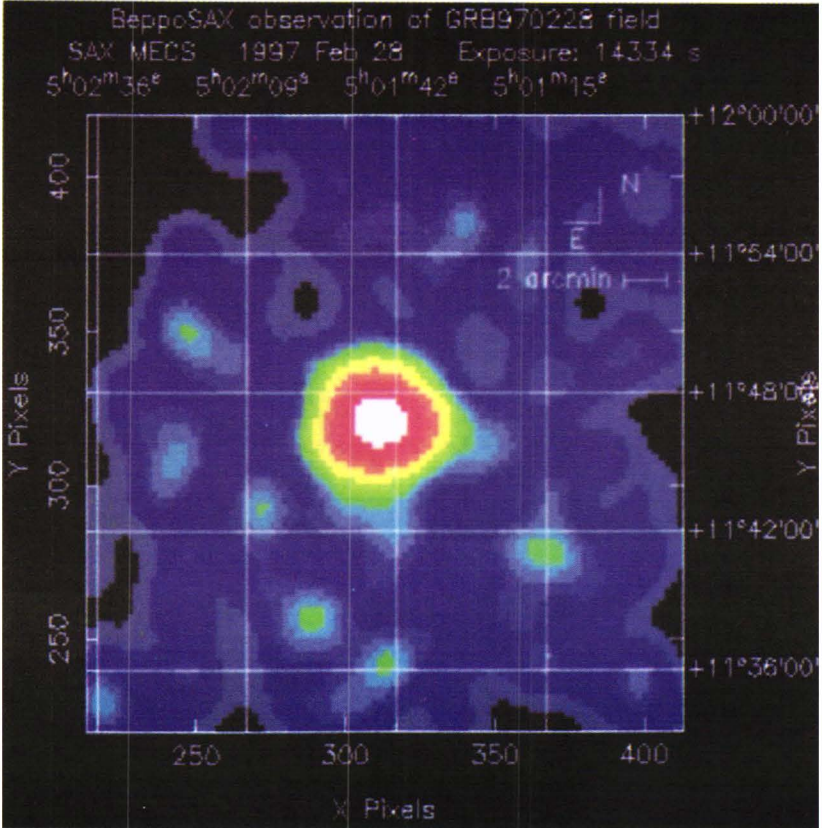
চিত্র-১১৩

– পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে যেখানে গ্যালাক্সিসমূহ প্রচণ্ড গতিমুখের বিপরীত চাপে সঙ্কুচিত হয়ে এক পর্যায়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে উপনীত হচ্ছে এবং বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে, সেখানে সৃষ্ট ঐ বিস্ফোরণ পরবর্তী 'Afterglow'-কে ছবিতে বড় করে দেখানো হয়েছে। এখানেই এখন আলোর ঝলক শেষ হয়ে গিয়ে পদ্ধতিগতভাবে নতুন নতুন জগত তৈরী হবে। ধন্যবাদ জানাতে হয় বিজ্ঞানকে, কুরআনের পক্ষে আবিষ্কার সম্পন্ন করার জন্য। সুতরাং মহাসত্যকে গ্রহণ করার কেউ আছে কী?

"অবিশ্বাসীরাই (যারা আল্লাহ্ ও পরকালে অবিশ্বাসী) আল্লাহর নিদর্শন (যা বিজ্ঞানের মাধ্যমে তিনি আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটন করাচ্ছেন, সে সম্পর্কে অজ্ঞদের ন্যায় বিতর্ক করে। সুতরাং দেশে দেশে (আন্তর্জাতিকভাবে) এদের অবাধ বিচরণে (বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞানের নামে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদি) যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে (কেননা প্রকৃত সত্যকে এরা কখনও কখনও আড়াল করতে চায়)।" (৪০ ঃ
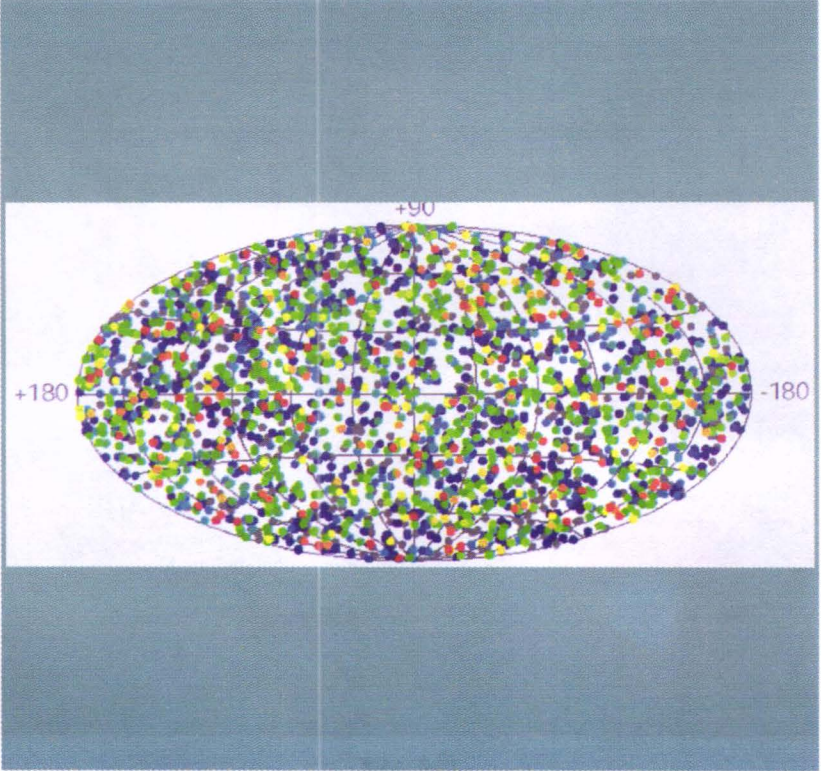
চিত্র–১১৪

– বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মহাবিশ্বের চতুর্দিকেই যেমনি গ্যালাক্সি উড়ে যাচ্ছে তেমনি আবার সবদিকেই Gamma-ray Burst সংঘটিত হচ্ছে গড়ে প্রায় প্রতিদিন একটি করে। অর্থাৎ বহুজগতময় এ মহাবিশ্বে প্রতিদিনই কোন না কোন জগত ধ্বংস হচ্ছে, তার পরিক্রমণ (Cycle) পূর্ণ করার কারণে। এভাবে মহাবিশ্বে প্রতিদিন যেমন নতুন নতুন জীবনময় জগত সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি আবার একাধিক জগত ধ্বংসও হচ্ছে।

"প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে, আমার নিদর্শন (পরকালের বিষয়াদিসহ অন্যান্য বিষয়াবলীও বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর উদঘাটনের নামে) তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোকে (বিজ্ঞানের দিক থেকে সত্য এবং ধর্মীয় দিক থেকে) মিথ্যা বলেছিলে এবং (নিজ জ্ঞানের) অহমিকা প্রকাশ করেছিলে। আর তুমিওতো ছিলে অবিশ্বাসীদেরই একজন।" (৩৯ ঃ ৫৯)
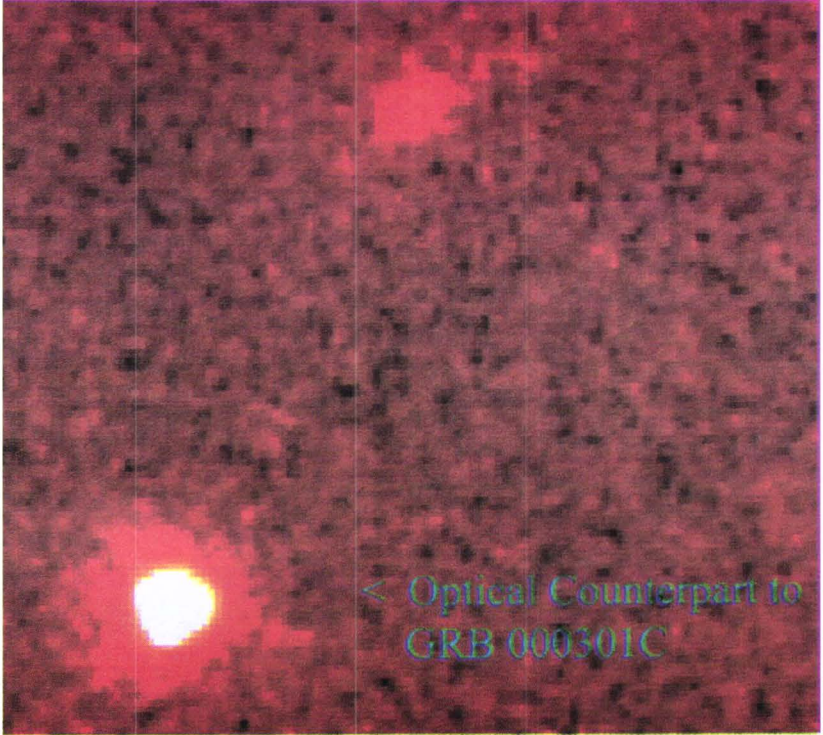
চিত্র-১১৫

– ওপরের ছবিটি 'ধুলিস্যাৎ' করে দিয়েছে তাদের অসাড় যুক্তিকে যারা পরকালকে আড়াল করার জন্য বলেছিল 'গামা-রে বার্স্ট'-এর কারণ হচ্ছে– দু'টি ব্ল্যাক হোলের সংঘর্ষ, কিংবা দু'টি নিউট্রন ষ্টার-এর মধ্যে সংঘর্ষ অর্থবা 'হাইপারনোভা' ঘটে থাকতে পারে। অথচ বিজ্ঞান এর আশেপাশে কখণই কোন প্রকার গ্যালাক্সির অস্তিত্বই খুঁজে পায়নি। যেখানে সম্পূর্ণ গ্যালাক্সি Singularity-তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সেখানে Black Hole কিংবা Neutron Star কিভাবে থাকতে পারে? সত্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে অবাঞ্ছিত তথ্য সরবরাহ করা বিজ্ঞানীদের জন্য শোভনীয় নয়।

sions everfound by humanity).

'নিউট্রন ষ্টার' বা 'ব্ল্যাক হোলের' নিজেদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের কারণে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকলে ঃ

১. তা অবশ্যই দৃশ্যমান প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সির অভ্যন্তরেই সংঘটিত হয়ে থাকতো।

২. কিন্তু তা না হয়ে মহাকাশের প্রান্তঃসীমানার মহাশূন্যতায় এককভাবে আলাদা স্থানে সংঘটিত হচ্ছে, যেখানে কোন গ্যালাক্সি কিংবা কোয়াসার পাওয়া যাচ্ছে না।

৩. প্রতিটি গ্যালাক্সিতে শত সহস্র 'নিউট্রন ষ্টার' ও 'ব্ল্যাক হোলের' আবাস সত্ত্বেও এ যাবত ঐ জাতীয় একটি ঘটনাও দৃশ্যমান প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সিতে বিজ্ঞানীগণ শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন।

৪. প্রায় ১৪/১৫ শত কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে যেখানে গ্যালাক্সিগুলো আলোর গতিপ্রাপ্ত হয়ে পৌঁছার কারণে মহাজাগতিক কঠিন নিয়মে সঙ্কুচিত হয়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) উপনীত হচ্ছে সেখানে নিউট্রন ষ্টার, ব্ল্যাক হোল কিংবা দু'টো গ্যালাক্সির সংঘর্ষ বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক থেকে ন্যায্যতা পায়না।

ইদানিং আবার একদল বিজ্ঞানী নতুন করে বলছেন যে 'গামা-রে বার্স্ট'-এর জন্য দায়ী হচ্ছে- 'হাইপারনোভা'। এ 'হাইপারনোভা' হচ্ছে স্বাভাবিক নক্ষত্রের 'চেয়ে কয়েক গুন বড় ও ভারী নক্ষত্রের বিস্ফোরণ।

উল্লেখিত প্রস্তাবটিও গ্রহণযোগ্যতা পেতে ব্যর্থ। কেননা, প্রায় ১৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে যেখানে 'গামা-রে বার্স্ট' অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে প্রায় ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্র বুকে ধারণকারী পূর্ণাঙ্গ গ্যালাক্সিরই-তো কোন আকৃতি থাকে না আলোর গতিতে উড়ে যাওয়ার কারণে। এমতাবস্থায় ঐ সকল গ্যালাক্সির আওতাভুক্ত বড় বড় নক্ষত্র টিকে থাকে কিভাবে? বরং এরাতো বহু পূর্বেই গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা মহাসঙ্কোচনের ভেতর চাপা পড়ে। বস্তুতঃ মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমায় প্রায় আলোর গতিতে উড়ে যাওয়া গ্যালাক্সির যেখানে সম্পূর্ণ কাঠামোই অদৃশ্য

প্রায় বিন্দুতে (Singularity) উপনীত হচ্ছে, সেখানে ওর-ই দু'একটি নক্ষত্র তখনো বহাল তবীয়তে বিরাজমান থেকে 'হাইপারনোভা' বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তুলনাবিহীন 'গামা-রে' বিচ্ছুরণ করবে, বিষয়টি একেবারে যেন ছেলে-খেলায় পরিণত হয়েছে। এটা কল্পনায় স্থান দেয়াও কঠিন মনে হচ্ছে। বরং এখন উক্ত 'গামা-রে বার্স্ট' (GRBs)সমূহ যে প্রকৃতপক্ষে নতুন জগত সৃষ্টির সূচনামূলক বিস্ফোরণ এবং তা থেকেই বিচ্ছুরিত হচ্ছে বিকিরণ সে কথা প্রায় অনেকটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। কারণ ঃ

বিজ্ঞানীগণ বলছেন ঃ

১. 'Gamma-ray Burst still believed to be the most powerful explosions in the Universe'.
এখনও বিশ্বাস করা হয় 'গামা-রে বার্স্ট' সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্ফোরণ আমাদের এই মহাবিশ্বে।

২. 'Gamma-ray Burst thought to be the most powerful explosions in the Universe'.
অর্থাৎ, মহাবিশ্বে 'গামা-রে বার্স্ট' কে খুবই শক্তিশালী বিস্ফোরণ হিসেবে চিন্তা করা হচ্ছে।

৩. The source of the incredible energay of Gamma-ray Burst remains a mystery'.
অর্থাৎ, অকল্পনীয় শক্তির উৎস 'গামা-রে' বার্স্ট এখনও রহস্যপূর্ণই রয়ে গেছে।

৪. 'Some estimate suggest that in a few seconds the burster released the equivalant energy of several hundred Supernova (Exsploding Stars.)'
অর্থাৎ অনেকের মতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে 'গামা-রে বার্স্ট' হতে যে শক্তি নির্গত হয়, তা প্রায় হাজার হাজার 'সুপারনোভা' বিস্ফোরণ হতে নির্গত শক্তির সমষ্টির সমান।

৫. 'GRBs shiness with' the brightness of hundred billion Suns. (One billion = ১০০ কোটি)'

অর্থাৎ 'গামা-রে বার্স্ট' হতে নির্গত বিকিরণের উজ্জ্বলতা সহস্র কোটি নক্ষত্রের সম্মিলিত উজ্জ্বলতার সমান।

৬. একটি গ্যালাক্সিতে গড়ে নক্ষত্রের সংখ্যাও হচ্ছে প্রায় ৩০,০০০ কোটি থেকে ৪০,০০০ কোটি এবং বস্তুজগতের প্রান্তঃসীমানায় গিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যদি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে (চাপ এবং তাপে) গ্যালাক্সিটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুনভাবে জগতের গোড়াপত্তন করে, তাহলে ঐ বিস্ফোরণ হতে নির্গত বিকিরণের উজ্জ্বলতা অবশ্যই সহস্র কোটি নক্ষত্রের (Hundred billion Stars) উজ্জ্বলতার সমানই দেখাবে।

৭. বিজ্ঞানীগণ পূর্বেই দেখিয়েছেন, গ্যালাক্সিসমূহ মহাশূন্যে উড়তে গিয়ে ক্রমান্বয়ে গতি বাড়িয়ে যে মুহূর্তে বস্তুজগতের প্রান্তঃসীমানার দিকে প্রায় আলোর গতির সমান গতিপ্রাপ্ত হবে, তখন গতিমুখের অনুকুলে মহাসঙ্কোচনের কারণে বাধ্য হয়ে এক সময়ে মহাসূক্ষ্ম এক বিন্দুতে (Singularity) উপনীত হবে। ফলে 'Big Bang Model'-এর ন্যায় প্রচণ্ড চাপে ও তাপে বিন্দুটি আর স্থির থাকতে না পেরে মুহূর্তেই মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুনভাবে জগত সৃষ্টি করবে।

৮. 'Big Bang' বিস্ফোরণ মুহূর্তের ঝলকটি (Flash) ছিল যেমন সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ, তদ্রূপ উক্ত GBRs-র বিকিরণ ঝল্‌কটিও মুহূর্তের জন্য হয়ে থাকে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি প্রমাণিতও হয়েছে।

৯. 'Big Bang Flash'-র পরে মহাবিশ্বে বড় সংগঠন একমাত্র গ্যালাক্সি বৃহৎ বস্তু হিসেবে সঙ্কুচিত হয়ে যদি চাপ এবং তাপের চূড়ান্ত মাত্রার কারণে শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে থাকে তাহলে ঐ বিস্ফোরণের 'Flash'-ই 'Big Bang Flash'-এর পরে স্থান পাওয়ার যোগ্য হতে পারে। অন্য কোন প্রকার বিস্ফোরণ ঐ বিস্ফোরণের ('Big Bang Flash') পরে স্থান পেতে পারে না।

১০. প্রতিটি GRBs সংঘটিত ও শনাক্ত হচ্ছে আমাদের বর্তমান অবস্থান থেকে প্রায় ১৪/১৫ শত কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে। যে দূরত্বে পৌঁছার পরই

গ্যালাক্সিসমূহ গতিমুখের বিপরীত চাপে সঙ্কুচিত হতে বাধ্য হয়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে উপনীত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে চাপ ও তাপের প্রচণ্ডতায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার নতুন জগত সৃষ্টি করছে।

১১. পৃথিবী থেকে দশ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে আবিষ্কৃত 'গ্যালাক্সিগুচ্ছ 3C-295' বিস্ফোরণ পরবর্তী বর্ধিত রক্তিম আভার (Glowing) অগ্নিগোলক হতে নতুন নতুন গ্যালাক্সির জন্ম দিচ্ছে, তাতে প্রমাণিত হচ্ছে 'গামা-রে বার্স্ট' সংঘটিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সময়ের বিবর্তনে ওর ভেতরে থেকেই নতুন নতুন জগত সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

১২. এতটুকু আসার পর আমরা আমাদের মহাবিশ্বের মাঝে গ্যালাক্সিদের পূর্ণ একটি জীবন পরিক্রমার (Life Cycle) চিত্র দেখতে পাচ্ছি। 'Big Bang' বিন্দুতে মহাবিস্ফোরণ ঘটার পর বিবর্তন ধারায় গ্যালাক্সিগুলো সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় গতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে উড়তে গিয়ে প্রচণ্ড চাপে সঙ্কুচিত হয়ে এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) উপনীত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে ঐ অবস্থায় আবার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পূর্বের ন্যায় নতুন গ্যালাক্সি সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় নতুনভাবে জগত সৃষ্টি করছে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার তা হলো আলোর গতিপ্রাপ্ত গ্যালাক্সিগুলোর অবস্থান থেকে বিজ্ঞান আর সামনের দিকে কিছুই দেখতে পায় না। আলোর গতিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গ্যালাক্সিগুলোকে পৃথিবী থেকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিন্দুসম চিহ্নস্বরূপ শনাক্ত করা যায়, তারপর থেকেই টেলিস্কোপের দৃষ্টি থেকেও গ্যালাক্সিসমূহ অদৃশ্য হয়ে হারিয়ে যায়। তাই পরবর্তী বর্ণনাগুলো, বর্তমান বিজ্ঞান তার উন্নত প্রযুক্তি ও টেকনিক ব্যবহার করে এ পর্যন্ত যা আবিষ্কার এবং উদঘাটন করতে সমর্থ হয়েছে, তারই আলোকে কার্যকারণ নীতিকে সামনে রেখেই অদৃশ্য অবস্থাগুলোর পরিণতির তথ্য মানব সমাজে তুলে ধরা হয়েছে।

একথাতো সত্য যে, যে অবস্থার চিত্র শেষ পর্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে, সে অবস্থায় পৃথিবীর বিজ্ঞান বাস্তবভাবে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ ঐ অবস্থা আগমন করার বহু পূর্বেই আমাদের পৃথিবী ওর পৃষ্ঠদেশের

সকল কিছুকে সাথে নিয়েই ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাবে, যা আমরা পূর্বের সিরিজ-২ তে ব্যাখ্যা করেছি। অর্থাৎ ব্যাপারটি আরও একটু সহজভাবে গুছিয়ে নিয়ে বলা যায়, মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের 'মিলকি ওয়ে' গ্যালাক্সির পূর্ণ এক সাইকেলের (Cycle) মাত্র অর্ধেকই বর্তমান বিজ্ঞান দিয়ে সরাসরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারি, এর বাইরে যেখানে আমাদের অস্তিত্বই থাকবে না সেখানে কিভাবে আমরা দেখে দেখে বর্ণনা করবো? সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অব্যশ্যই আমাদের পূর্বে অর্জিত জ্ঞান ও মহাবিশ্বে কার্যকারণ নীতির আশ্রয়গ্রহণ করতে হবে। এতে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলতা লাভ করা যায়, যেহেতু মহাবিশ্বটি মূলতঃই কার্যকারণ নীতির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে।

অতি সম্প্রতি ৩০শে আগষ্ট, ১৯৯৯ ইং পৃথিবীর কক্ষপথে মহাশূন্যে কার্যরত NASA–র 'Chandra X-ray observatory' কর্তৃক 'ডিপ স্পেস' (Deep Space) থেকে ধারণকৃত '3C 295 গ্যালাক্সির' ছবিতে প্রমাণ হয়েছে এক সাথে গুচ্ছাকৃতি হয়ে জমানো বিরাট 'পদার্থ মেঘপুঞ্জ' থেকে ক্রমান্বয়ে একটি দু'টি করে হাজার হাজার গ্যালাক্সি সৃষ্টি হচ্ছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে– বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে আরও ধরা পড়েছে যে, মিলিয়ন বছর পূর্বে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের (Gigantic Explosion) মাধ্যমেই উক্ত গ্যালাক্সি সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

তাহলে প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কারণে বর্তমান বিজ্ঞান একদিকে প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন দূরত্বের পরে দেখতে পাচ্ছে গ্যালাক্সিসমূহ ক্রমান্বয়ে গতি বাড়িয়ে আদি আকৃতি হারাতে হারাতে এক পর্যায়ে আলোর গতি লাভ করা মাত্র 'শূন্যের' কোঠায় গমন করে দৃশ্য অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার অপরদিকে প্রায় ৫,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে 'প্রচণ্ড বিস্ফোরণ' (Gigantic Explosion) ঘটিয়ে 'পদার্থের মেঘপুঞ্জ' থেকে গ্যালাক্সিসমূহ এক এক করে ক্রমান্বয়ে জন্ম নিচ্ছে।

তাহলে জ্ঞানবান মানুষের স্বচোখে, স্বজ্ঞানে নিরেট বাস্তবতার আলোকে উক্ত দৃশ্য দেখেও কি এ কথা প্রমাণ হয় না যে, গ্যালাক্সিগুলো মহাজাগতিক

নিয়মে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করে করে একবার 'সৃষ্টি' আবার 'ধ্বংসের' এ পুনঃ পুনঃ একই কাজের ভেতর দিয়ে ওদের 'লাইফ সাইকেল' পূর্ণ করছে? বর্তমান অগ্রসরমান আশীর্বাদপুষ্ট বিজ্ঞান ওপরে উল্লেখিত মহাবিশ্বের মাঝে সবচেয়ে বড় সংগঠন গ্যালাক্সিদের 'সৃষ্টি' এবং 'ধ্বংস' সম্পর্কীয় ওদের 'লাইফ সাইকেলের' পূর্ণাঙ্গ বিবরণের প্রকৃত 'তথ্য' ও 'ছবি' বাস্তবভাবে মানব সমাজের সামনে তুলে ধরায় বিষয়টি মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে সমাজের জ্ঞানীদের জন্য ভাবনার নুতন দিক উন্মোচিত করেছে।

একটি বিষয় আলোচনা না করলেই নয়– আল-কুরআনের দাবি এবং বর্তমান বিজ্ঞানের উদ্ঘাটন ও আবিষ্কার অনুযায়ী এ মহাবিশ্বে প্রায় প্রতিটি বিষয়ে পরিক্রমণ (Cycle) অনুসৃত হচ্ছে। যেমন ঃ Watr cycle, Co_2 cycle, O_2 cycle, নক্ষত্র জীবন পরিক্রমা (Star life cycle) ইত্যাদি।

এভাবে সকল বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সর্বত্র-ই পুনঃ পৌণিকভাবে একবার সৃষ্টি, আবার বিপর্যয়, অতঃপর ঐ বিপর্যয় থেকে পুনরায় সৃষ্টি হয়ে আবার পূর্বের ন্যায় একই নিয়মে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আবার আদি অবস্থায় ফিরে যাওয়া পরিক্রমণের (Cycle) যেন শেষ নেই। বস্তুতঃ সমগ্র মহাবিশ্ব ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সকল কিছুই এভাবে নিজ নিজ পরিক্রমণ (Cycle) অনুসরণ করেই চলতে থাকবে এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেয়া এক মহাসত্য ঘটনা (Universal truth), তাই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় সংগঠন গ্যালাক্সির বেলায় এ পরিক্রমণ (Life Cycle) দর্শনে অবাক হওয়ার মত কিছুই নেই বরং এ মহাবিশ্বে এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা।

বর্তমান সমাজে যারা জ্ঞানী তারা বিজ্ঞানের বেলায় যে কোন আবিষ্কারকে বিজ্ঞানের কৃতিত্ব ও সাফল্য হিসেবে খুবই দ্রুত তা লুফে নেয়, কিন্তু একই বিষয়ে যখন জানতে পারে কুরআনও সেকথা প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই ঘোষণা করেছে, তখন তা গ্রহণ করতে বা মানতে অগ্রসর হয় না। এটা বড়ই দুঃখজনক ঘটনা। প্রকৃত জ্ঞানী সমাজের এ জাতীয় আচরণ করা অনুচিত।

"যারা নিজেদের নিকট কোন প্রকার (বাস্তবভাবে প্রত্যক্ষ দর্শনের ও ভ্রমণের) দলীল না থাকলেও আল্লাহর (পক্ষ থেকে দেখানো) নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, আসলে ওদের অন্তরে আছে কেবল (মিথ্যা) অহংকার (আল্লাহ্‌, রাসূল ও পরকালের বিপরীতে) যা সফল হবার নয় (এটা আল্লাহর ওয়াদা)।" (৪০ ঃ ৫৬)
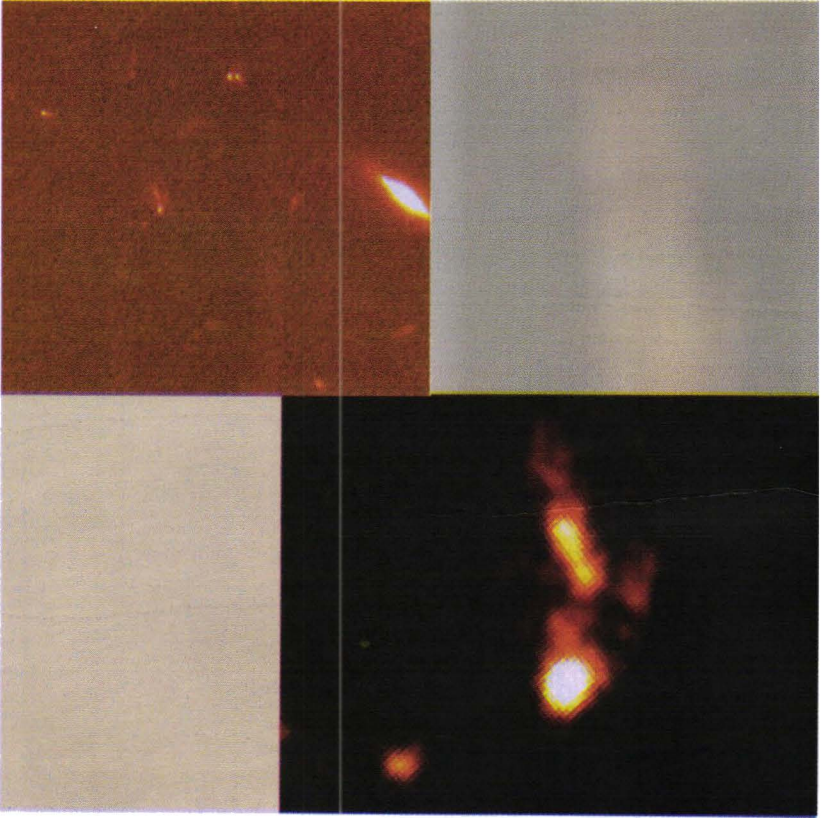
চিত্র–১১৬

– ওপরের ছবিতে বাঁয়ের ছবিটি 'গামা-রে বার্স্ট'-এর যা ছবির মাঝখানে দেখা যাচ্ছে। ডানদিকের ছবিটি হচ্ছে বিস্ফোরণ পরবর্তীতে উজ্জ্বলতা হারিয়ে এবার ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়ে বর্ধিত হওয়া এবং নতুন নতুন জগত তৈরীর কাজ সম্পন্ন করা।

মনে রাখতে হবে বস্তুজগতের দু'প্রান্তেই কিন্তু একই পদ্ধতিতে একইভাবে নতুন জগত সৃষ্টি হচ্ছে।

"এটাতো কেবলমাত্র একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ (যা গ্যালাক্সিকে সঙ্কুচিত করে ঘটানো হয়ে থাকে)। অতঃপর (ঐ বিন্দুতে পদ্ধতিগতভাবে দ্রুত সৃষ্ট নতুন জগতে) ওদের আবির্ভাব হবে।" (৭৯ ঃ ১৩, ১৪)

X-ray gas filament from an oscillating galaxy in cluster Abell 1795. Image: NASA/IoA.

চিত্র–১১৭

– আবিষ্কৃত 'Able 1975 Cluster' 'গামা-রে বার্স্ট' –হতে পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন জগতের গুচ্ছ সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে, যা প্রমাণ করছে গ্যালাক্সিগুলো বস্তু জগতের মধ্যে পরিক্রমণ (Cycle) অনুযায়ী একবার সৃষ্টি আবার ধ্বংস, আবার সৃষ্টি – আবার ধ্বংস এ জাতীয় পথ অনুসরণ করে চলেছে। কুরআন এই পুনরাবৃত্তির তথ্য প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে প্রদান করেছে। তাহলে কুরআনকে বিশ্বব্যাপী গ্রহণ করতে আপত্তি কোথায়?

"আর যখনই ওদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর (জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যপূর্ণ) কোন নিদর্শন (আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে) ওদের নিকট আসে, তখনই ওরা (ঐ সত্য বিষয়গুলো থেকে) ওদের মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (৩৬ ঃ ৪৬)

চিত্র–১১৮

– আবিষ্কৃত 'Abell 1795 Cluster' বড় করে দেখানো হয়েছে যাতে করে মূল কেন্দ্রিয় অগ্নিগোলকের চতুর্দিকে যে সুপ্ত গ্যালাক্সির বীজ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে বাইরের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তা উপলব্ধি করা যায়। এ তথ্য ও ছবি বর্তমান সাফল্যে ভরা বিজ্ঞানের। উক্ত সুপ্ত বীজ থেকেই পরবর্তীতে পূর্ণ গ্যালাক্সি রূপধারণ করে থাকে।

সঠিক 'বিজ্ঞান' এবং 'কুরআনে' যে বিভেদ নেই তা বস্তুজগতের লাইফ সাইকেলে আবারও ফুঠে উঠেছে। আল্লাহ্ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ আছে কী?

"ওরা (জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ) কোন নিদর্শন দেখলে (প্রথমে) উপহাস করে এবং পরে এক পর্যায়ে (যখন অস্বীকার করার কোন পথ খোলা থাকে না তখন) বলে, এটাতো এক প্রকার সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছু নয়।" (৩৭ ঃ ১৫)
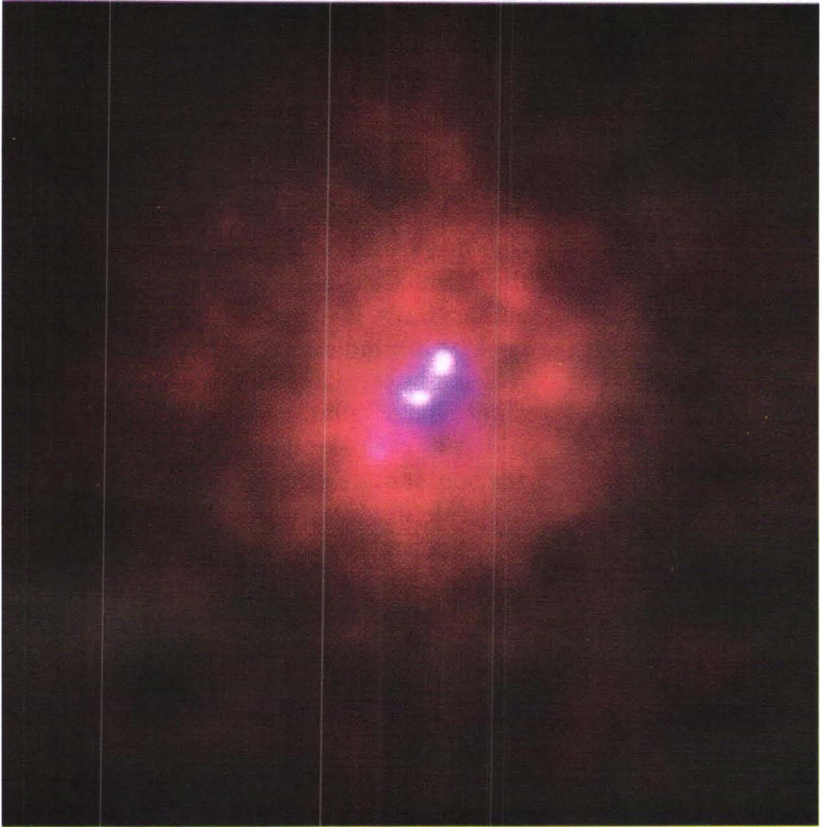
চিত্র-১১৯

– সদ্য আবিষ্কৃত 'Radio Galaxy 3C-295' এক বড় ধরনের দলীল নিয়ে উপস্থিত হয়েছে মানব জাতির দ্বারপ্রান্তে। বিজ্ঞানীগণ বলছেন– 'গামা-রে বার্স্ট'-এর পর 'Afterglow' সৃষ্টি এবং তা থেকে পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন অসংখ্য গ্যালাক্সি জগত, ওপরের ছবিতে তা দেখা যাচ্ছে। এক একটি আবিষ্কারের সাথে আরেকটির কত মিল, তাই না? সত্য ও সঠিক বিষয়ে এরূপ মিল থাকাটা-ই স্বাভাবিক।

"আদিতে যিনি (Big Bang-এর মাধ্যমে এ মহাবিশ্বের) সৃষ্টির সূচনা করেছেন, অতঃপর তিনি (একই সঙ্কোচন ও বিস্ফোরণ পদ্ধতিতে) ঐভাবে সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করেন।" (২৭ ঃ ৬৪)
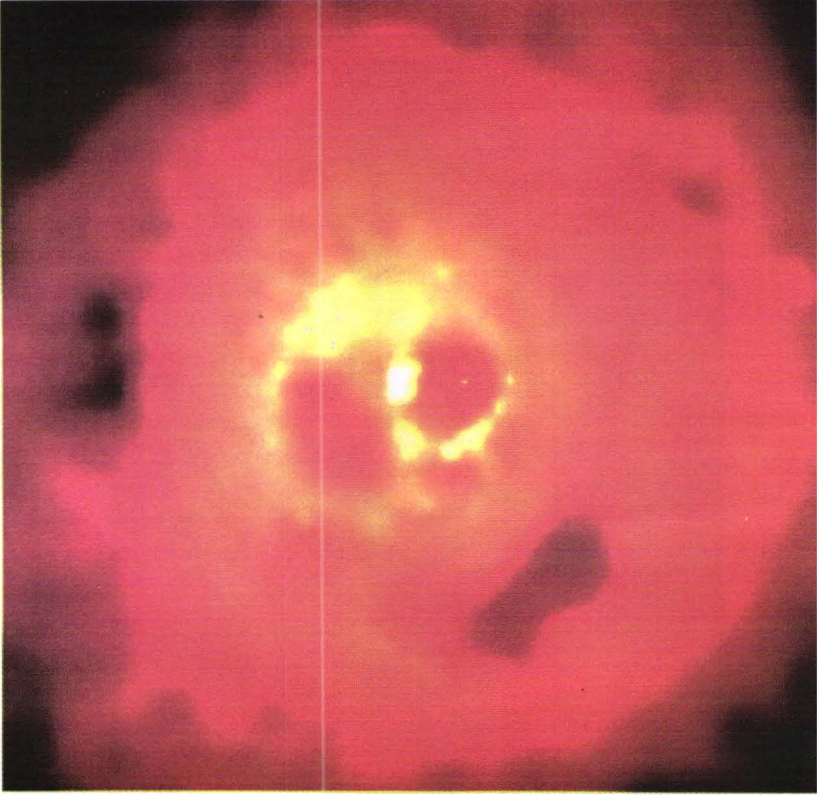
চিত্র-১২০

– বিজ্ঞান বিশ্ব ইতিমধ্যে 'Perseus cluster' নামে গ্যালাক্সিগুচ্ছ আবিষ্কার করেছে, যেখানে একই সাথে অসংখ্য গ্যালাক্সি ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস এ অবস্থায় আসার পূর্বে অবশ্যই গ্যালাক্সি সঙ্কুচিত হয়ে ছিল এবং বিস্ফোরণ ঘটেছিল। আর ঐ বিস্ফোরণের পর যে অগ্নিগোলক (Fire ball) তৈরী হয়েছিল, সেটি থেকেই পরবর্তীতে এ গ্যালাক্সিগুলো জন্ম নিচ্ছে। এটা Big Bang-এর Product অবশ্যই নয়। কেননা এর দূরত্ব পৃথিবী থেকে মাত্র ৩২০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ।

সুতরাং 'গামা-রে বার্স্ট যে পরকালের সূচনা, তা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে।

"তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং (তোমাদের আবিষ্কৃত সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও স্যাটেলাইটসহ সকল কিছু ব্যবহার করে) পর্যবেক্ষণ কর, দেখ (উদ্‌ঘাটন কর) কিভাবে (কোন পদ্ধতিতে) তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ (অনুরূপ পদ্ধতিতেই) সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি।" (২৯ ঃ ২০)
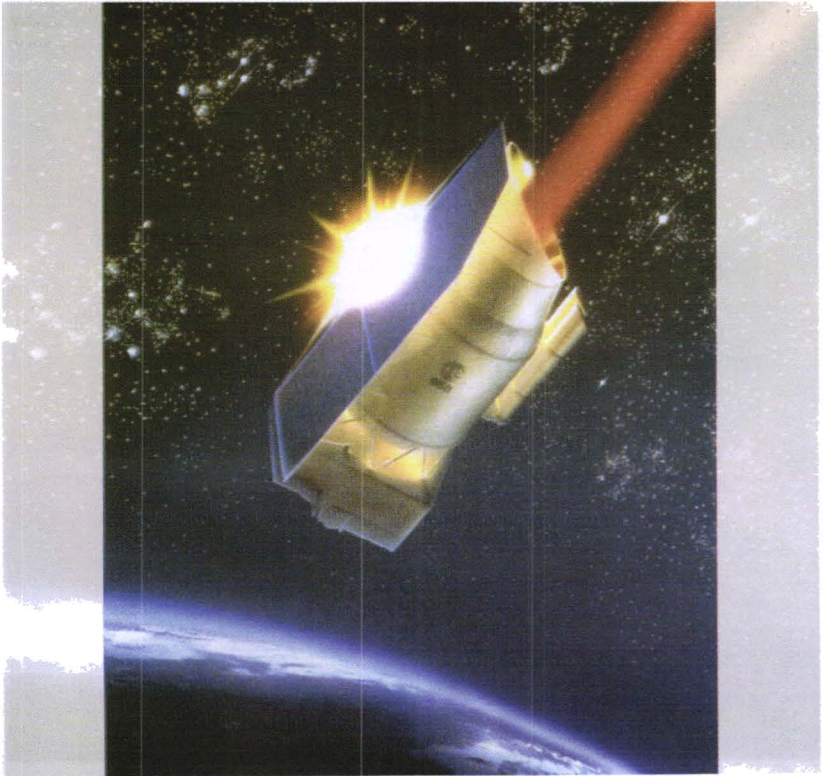
চিত্র–১২১

– ছবিতে Infrared Space Observatory (ISO) কে মহাশূন্যে পৃথিবীর কক্ষপথে দেখা যাচ্ছে। এর কাজ হচ্ছে প্রায় ১০০০ কোটি বছর পূর্বে Big Bang –পরবর্তী সময়ে কিভাবে গ্যালাক্সি সৃষ্টি হয়েছিল তা উদঘাটন করা। বস্তুত সে তথ্য ইতিমধ্যেই উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাই নতুন যে গ্যালাক্সি সৃষ্টির প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হচ্ছে– তার উদ্‌ঘাটিত সময়ই প্রমাণ করছে এগুলি নতুন সৃষ্টি, Big Bang-এর Product নয়। অতএব পরকাল এখন বাস্তব সত্যতা নিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে।

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) অনেক (জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ) নিদর্শন রয়েছে। ওরা এগুলো (আবিষ্কারের নামে ঠিকই) প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু তারা এগুলোর প্রতি (না দেখার মতই) উদাসীন।" (১২ ঃ ১০৫)
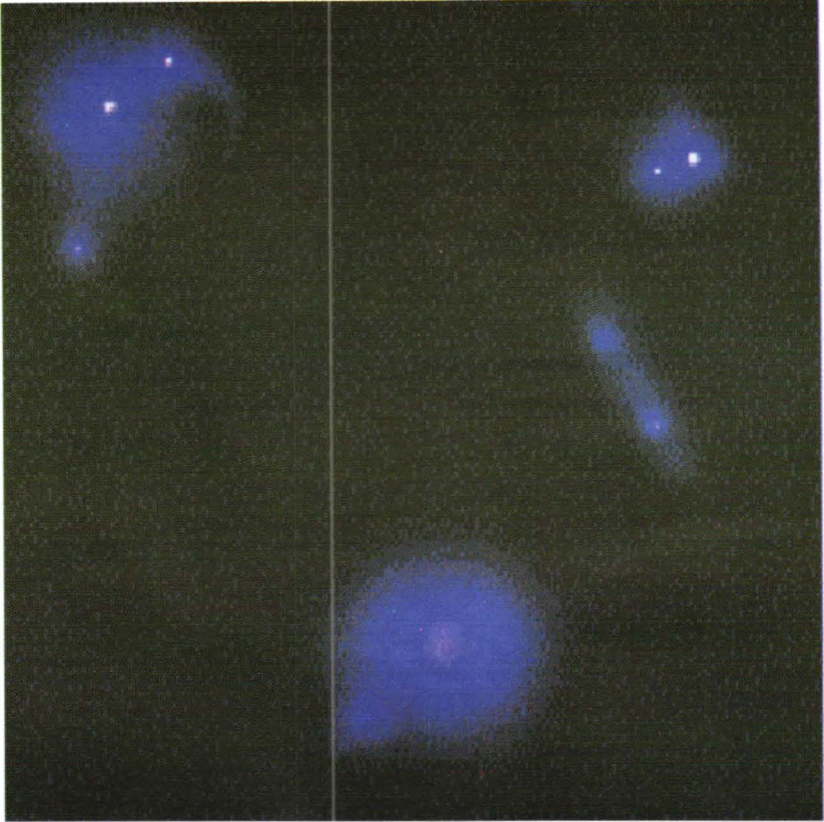
চিত্র–১২২

– ওপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে– এখনও অপূর্ণাঙ্গ নতুন সৃষ্টজগতগুলো পরপর পৃথক হয়ে পরস্পর পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে নিজ নিজ পরিক্রমণ (Cycle) অনুযায়ী নিজস্ব গতিবেগে। নবীন এ জগতগুলো আবার একসময় প্রচণ্ড গতি লাভ করে সঙ্কুচিত হয়ে ধ্বংস হবে এবং চাপ ও তাপে আবার এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুনভাবে জন্ম নেবে। এটাই মহান স্রষ্টার পুনরাবৃত্তি (Cycle)। সন্দেহ আছে কি? না থাকলে কেন এক আল্লাহ্‌কে মানা হবে না?

"আর বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। তিনি অতিসত্বর দেখাবেন তোমাদেরকে তাঁর (বাস্তব উপস্থিতির এবং তিনিই যে সব কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছেন, তার প্রমাণস্বরূপ বৈজ্ঞানিক তথ্য সমৃদ্ধ) নিদর্শন। তখন তোমরা (জ্ঞান খাটালে) বুঝতে পারবে (কেননা মানুষতো এগুলো করার ক্ষমতা রাখে না)।" (২৭ ঃ ৯৩)

চিত্র–১২৩

– ছবিতে পূর্ণাঙ্গ গ্যালাক্সি মহাশূন্যে উড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। সৃষ্ট নবীন – গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর পৃথক হয়ে নিজ নিজ চলার পথে সময়ের আবর্তনে এক পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়ে পরে আবার চলার গতি মুখের চাপে ধ্বংস ও সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে। স্রষ্টার বেঁধে দেয়া নিয়মের বাইরে যে এরা চলতে পারে না তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে এখানেও স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা যায়। জ্ঞানী পাঠক একবার সেভাবে তাকাবেন কী?

"ওরা কি লক্ষ্য করে দেখে না, কিভাবে আল্লাহ (এক বিশেষ সঙ্কোচন পদ্ধতিতে) সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন, অতঃপর (ঐ একই পদ্ধতির অনুকরণে) পুনরাবৃত্তি ঘটান? এটাতো আল্লাহর জন্য সহজ (যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী স্রষ্টা)।" (২৯ ঃ ১৯)

চিত্র—১২৪

– ওপরের ছবিতে Big Bang-এর Product হিসেবে হলদে রংয়ের পুরাতন গ্যালাক্সিগুলোকে এবং পরিক্রমণ (Cycle) পূর্ণ করতে গিয়ে একবার ধ্বংস আবার সৃষ্টির পুনরাবৃত্তিতে ব্যাপৃত হয়ে সৃষ্ট সবুজ ও নীলাভো রংয়ের নতুন সৃষ্ট গ্যালাক্সিগুলোকে একত্রে উড়তে দেখা যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে Big Bang-এর মাধ্যমে সৃষ্ট গ্যালাক্সিদের মধ্যে নতুন ও পুরাতনগুলো কখনোই একত্রিত হয়ে এক সাথে উড়তে পারে না। এটা অসম্ভব। কেননা ওদের মাঝে ব্যবধান হবে কম করে হলেও ১০,০০০ মিলিয়ন বছর। তাই Big Bang-এর Product হলো হলদে রংয়ের পুরাতন গ্যালাক্সি এবং নতুনও পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির Product হলো সবুজ গ্যালাক্সিগুলো।

"মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার (উপস্থিতির প্রমাণস্বরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ণ) নিদর্শনাবলী দেখাবো। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া কর না (ধৈর্যধারণ কর, এক এক করে আমি সবই দেখাবো)।" (২১ ঃ ৩৭)

চিত্র–১২৫

– Hubble Space Telescope দিয়ে ধারণকৃত ছবিতেও Big Bang হতে সৃষ্ট পুরাতন গ্যালাক্সিসমূহ এবং যেগুলো পূর্বেই গমন করে পরিক্রমণ (Cycle) পূর্ণ করে পুনরায় নতুন হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে, হালকা নীলাভো ঐ গ্যালাক্সিগুলোকেও এক সাথে উড়তে দেখা যাচ্ছে। গ্যালাক্সিসমূহ Cycle অনুসরণ না করলে এ অবস্থা কখনোই হত না। আর তা মানুষ সৃষ্টি করেনি। করেছেন একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্। সত্য নয় কী?

অতএব আল্লাহ্ যেমন সত্য, পরকালও তেমনি সত্য ঘটনা।

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে (দৃশ্য-অদৃশ্য) সমস্ত কিছুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং সকল প্রকার প্রশংসাও তাঁর। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (৬৪ ঃ ১)
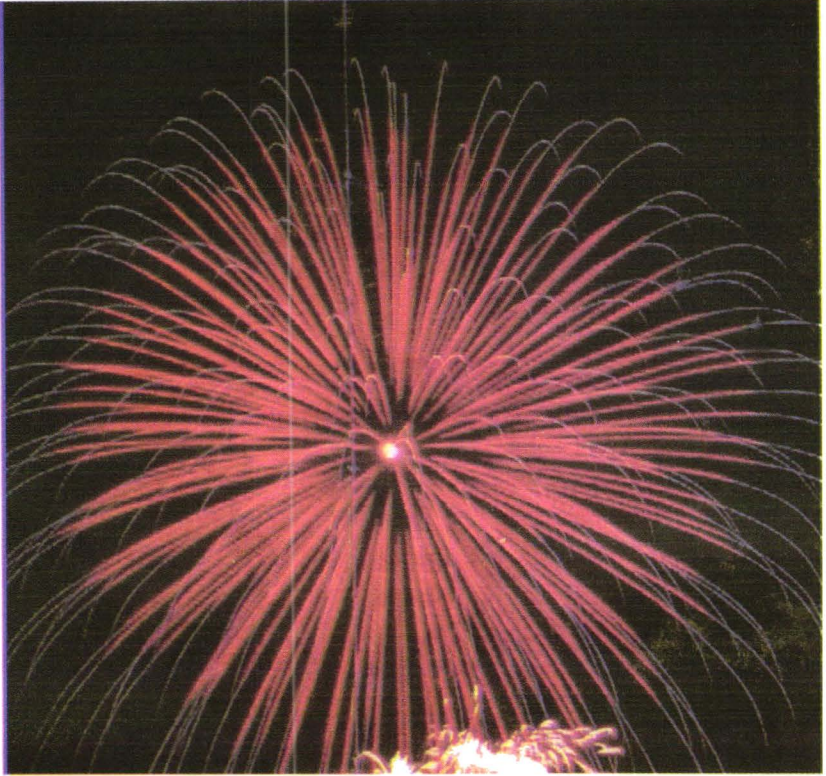
চিত্র-১২৬

– 'আল্লাহ' মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান এক মহান 'সত্তা'। তিনি আমাদের পারিপার্শ্বিক বিষয়ের সাথে মিল রেখেই এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে আমরা তা অনুধাবন করতে কষ্ট না হয়।

আকাশে প্রজ্জ্বলিত 'আতশ বাজী'র মতই Big-Bang মহাবিস্ফোরণ তিনি ঘটিয়েছেন। ফলে আতশবাজির ফুলঝুরি একটা দূরত্বে গিয়ে আবার কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসতে চায় 'Cycle' পূর্ণ করতে, ঠিক তেমনি Big Bang বিন্দু থেকে গ্যালাক্সিগুলো ছিটকে দূরে গিয়ে আবার এক পর্যায়ে ফিরে এসে Cycle পূর্ণ করছে। আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন ততদিন মহাবিশ্ব এভাবেই চলতে থাকবে।

"ওরা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে (সঙ্কোচন ও পরে বিস্ফোরণ পদ্ধতিতে) আল্লাহ্ সৃষ্টিকে (মহাবিশ্বকে) অস্তিত্ব দান করেছেন, অতঃপর (এর মাঝে খণ্ড খণ্ড অংশ গ্যালাক্সির) পুনরাবৃত্তি (একই সঙ্কোচন পদ্ধতিতে) ঘটাচ্ছেন? এটাতো (যদিও মানবীয় জ্ঞানে বিশাল এক ব্যাপার কিন্তু) আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।" (২৯ ঃ ১৯)

চিত্র-১২৭

– সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি সম্পর্কীয় 'কুরআনের' দাবী, বর্তমান বিজ্ঞান আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে। বিজ্ঞান দেখিয়েছে Big Bang বিস্ফোরণের পর গ্যালাক্সি সৃষ্টি হয়ে আবার ধ্বংস হচ্ছে এবং ঐ ধ্বংসের ভেতর দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি হয়ে পুনঃ পুনঃ Cycle পূর্ণ করছে।

'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞানের' বর্ণনা অনুযায়ী এ অভিন্নতা কিভাবে অস্বীকার করা যায়?

"সেদিন আকাশমণ্ডলীকে (মহাবিশ্বকে সঙ্কোচন পদ্ধতিতে) গুটিয়ে ফেলবো, যেভাবে লিখিত দফতর গুটিয়ে (ছোট করে) ফেলা হয়। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম (সঙ্কোচন পদ্ধতিতে), সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য। আমি তা পালন করবোই।" (২১ : ১০৪)

চিত্র–১২৮

– ওপরের ছবিটি ফ্রান্সের বিজ্ঞানীদের সরবরাহকৃত। এতে তারা দেখিয়েছেন এ মহাবিশ্বটি Oscillating তথা পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই পরিচালিত হচ্ছে, অর্থাৎ সর্বত্রই পরিক্রমণ (Cycle) অনুসৃত হচ্ছে। সুতরাং কুরআনের বক্তব্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও পূর্ণরূপে সত্য এবং সঠিক। অতি বিজ্ঞান প্রিয় মানুষগুলোর এখনো কি হুঁশ ফিরবে না?

"প্রথম সৃষ্টির সূচনা যিনি (সঙ্কোচন পদ্ধতিতে) ঘটিয়েছেন, তিনিই পরবর্তীতে (একই সঙ্কোচন পদ্ধতিতে) তার পুনরাবৃত্তি করছেন।" (২৭ ঃ ৬৪)
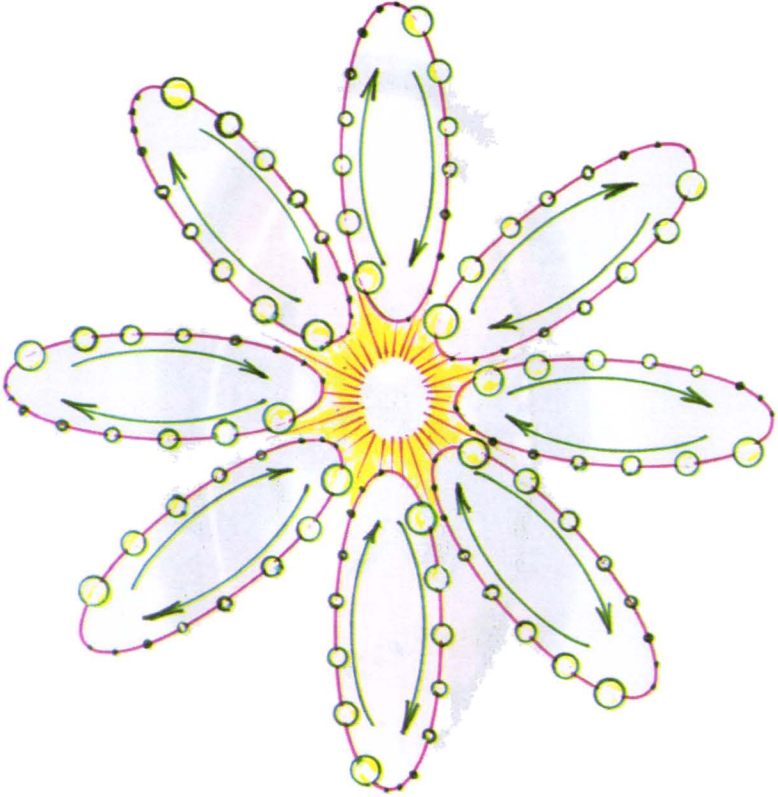
চিত্র–১২৯

– ওপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে– মধ্যস্থানে Big Bang বিন্দুতে সূচনায় মহাবিস্ফোরণ ঘটে, পরবর্তীতে তা থেকে গ্যালাক্সি সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্বের চতুর্দিকে উড়ে যাচ্ছে। পরে ক্রমান্বয়ে গতির বৃদ্ধি ঘটায় বস্তুজগতের প্রান্তে সঙ্কুচিত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংসের ভেতর দিয়ে আবার নতুনভাবে জন্ম লাভ করে কেন্দ্রের দিকে ফিরে এসে পরিক্রমণ (Cycle) পূর্ণ করছে। বর্তমানে গ্যালাক্সিগুলো এভাবে একবার সৃষ্টি – একবার ধ্বংসের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে টিকিয়ে রেখেছে। 'আল্লাহ্' যে সত্য তাতে আর কোন সন্দেহ আছে কী? কেননা কুরআন যা বলেছে বিজ্ঞান তাই দেখাচ্ছে!

"ওদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে মৃত ভূমি, যাকে আমি (বৃষ্টির পানি দিয়ে তথা Water Cycle দিয়ে) সঞ্জীবিত করি এবং তা হতে উৎপন্ন করি শস্য যা ওরা ভক্ষণ করে।" (৩৬ ঃ ৩৩)
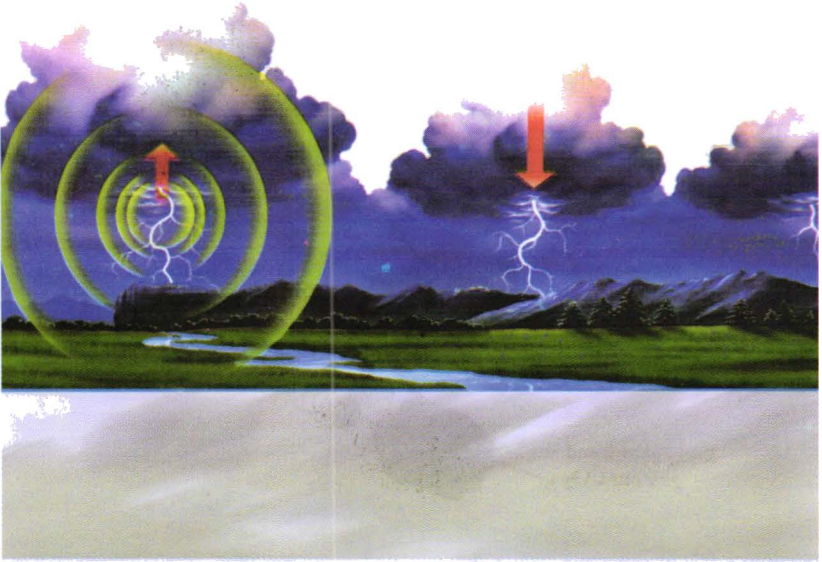
চিত্র-১৩০

– আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট এ মহাবিশ্বে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে আকাশ পর্যন্ত পানি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে মূলতঃ পরিক্রমণ (Cycle) পূর্ণ করছে। এর ফলে এ পৃথিবীর জীব-উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত তাদের জীবন প্রবাহ সজীব রাখার সুযোগ লাভ করছে।

সুতরাং বলা যায় যে কোন ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত একইভাবে কার্যকর রাখতে হলে Cycle অক্ষুণ্ণ রাখা জরুরী। যেমনিভাবে মহাবিশ্বকে কার্যকর ও যথাযথভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য গ্যালাক্সিগুলো Cycle পূর্ণ করছে। এ সৃষ্টিতে Cycle সর্বত্র কার্যকর।

"আর যখন ওদের প্রতিপালকের (উপস্থিতির প্রমাণস্বরূপ) নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন ওদের নিকট আসে। তখনই ওরা তা হতে মুখ ফিরায়ে নেয়।" (৩৬ ঃ ৪৬)
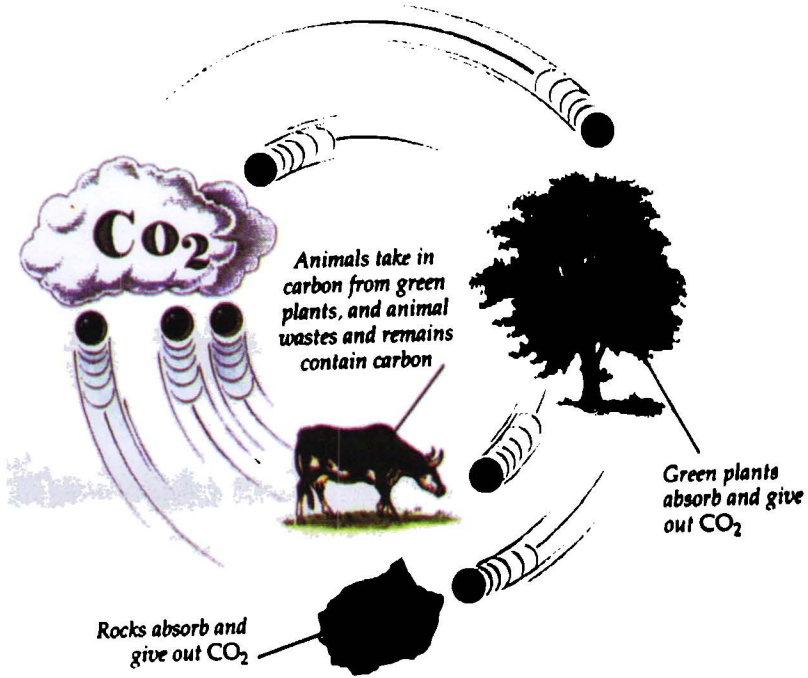
চিত্র—১৩১

– প্রাণীদেহ অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। উদ্ভিদ আবার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে। ফলে প্রাণ এবং উদ্ভিদের মাঝে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর একটি অদৃশ্য পরিক্রমণ (Cycle) গড়ে উঠে। এ Cycle পালিত না হলে সব বরবাদ হয়ে যেত। মহাবিশ্বের সব বিলীন হয়ে যেত। সুতরাং মহাবিশ্বের সর্বত্র চলছে Cycle. যে Cycle থেকে কেউ বিরত নেই।

"যারা আল্লাহ্‌র (পরিচয় ও উপস্থিতি প্রকাশকল্পে উপস্থাপিত) নিদর্শনকে প্রত্যাখান করে, তাদের (এ সত্য বিমুখতার) জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডদাতা।" (৩ ঃ ৪)

চিত্র–১৩২

– একটি নক্ষত্রের বেলায়ও দেখা যায় যে ধূলাবালি ও পদার্থ কণার মেঘপুঞ্জ থেকে 'নক্ষত্র' এক সময় জন্ম নিয়ে থাকে, কালের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মাঝে বিবর্তন ঘটিয়ে ঐ নক্ষত্রটি বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে এক সময় আবার ধ্বংস হয়ে ঐ ধূলাবালি ও পদার্থ কণার মেঘপুঞ্জে ফিরে যায়, অর্থাৎ তার Life Cycle পূর্ণ করে থাকে।

সুতরাং এ মহাবিশ্বে গ্যালাক্সিরও তেমনি আছে Life Cycle যা তারা প্রতিনিয়ত পূর্ণ করছে সৃষ্টি ও ধ্বংসের পুনঃ পুনঃ পদ্ধতির (Oscillating) মাধ্যমে।

"কেউ আল্লাহর (উপস্থিতির এবং তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত) নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করলে, আল্লাহ্ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।" (৩ঃ ১৯)
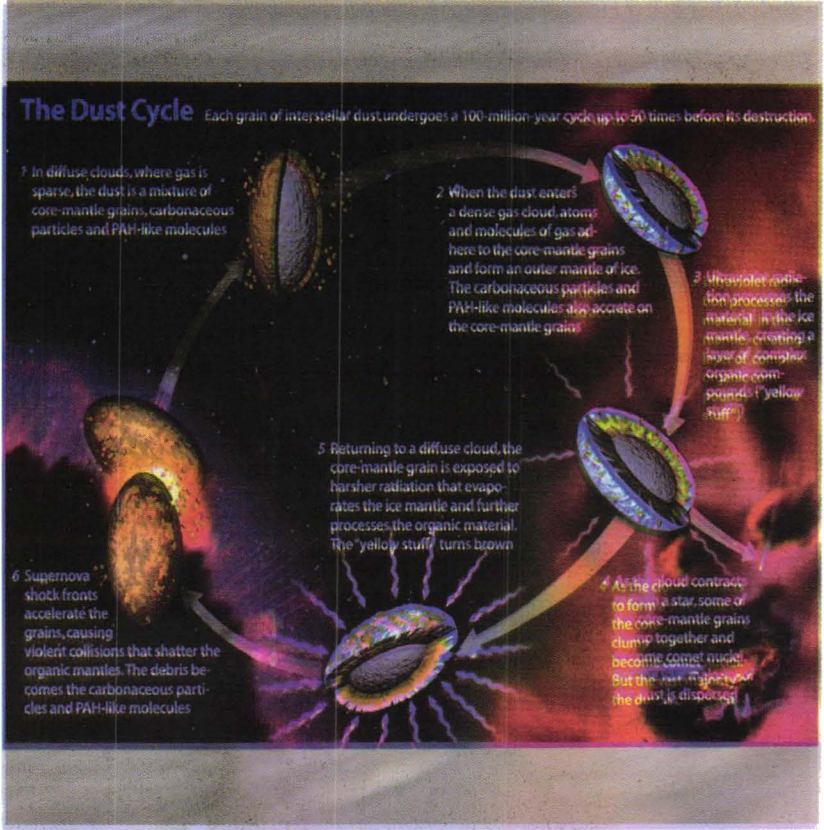
চিত্র-১৩৩

– যে ধূলাবালি ও পদার্থ কণিকা দিয়ে এ মহাবিশ্বে মহাজাগতিক বস্তুসমূহ গঠিত হয়েছে, সেই মহাসূক্ষ্ম Dust Particleগুলোও মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের পরিক্রমণের (Cycle) বেল্টে আবদ্ধ। বিজ্ঞানের এ সকল আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণ হচ্ছে যে, ক্ষুদ্র পদার্থ কণিকাসমূহ যেমন প্রতিনিয়ত তাদের Life Cycle পূর্ণ করছে তেমনি বৃহৎ গ্যালাক্সিগুলোও তাদের Life Cycle পুনঃ পুনঃ সম্পাদন করছে। অর্থাৎ সকল ব্যাপারেই চলছে পরিক্রমণ (Cycle)।

এবার আমরা অধ্যায়টির 'কুরআনিক' আলোচনার 'Key Point'গুলো এবং 'বৈজ্ঞানিক' আলোচনার 'Key Point'গুলো যদি পৃথক পৃথকভাবে সাজিয়ে নেই তাহলে দাঁড়ায় ঃ

'কুরআনিক' তথ্যের মূল (Key) পয়েন্টসমূহ

১. 'কুরআন' অবতীর্ণের পূর্বে মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে সঠিক কোন জ্ঞান পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থানরত মানব সমাজের ছিল না।

২. সর্বপ্রথম মহাবিশ্বের প্রতিপালক একমাত্র 'আল্লাহ্'ই আল্-কুরআনের মাধ্যমে মানব সমাজকে মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে সঠিক তথ্য প্রদান করেন।

৩. তাছাড়া মহাবিশ্বের অদৃশ্য বস্তুসম্ভার সম্পর্কেও তিনিই মানুষকে সর্বপ্রথম অভিহিত করেন। যে সম্পর্কে মানুষ পুরোপুরি অজ্ঞতার মাঝে নিমজ্জিত ছিল, ওদের কিছুই জানতো না।

৪. মহাবিশ্বের প্রতিটি বিষয় কখন, কিভাবে, কোন পরিবেশে মানুষের সামনে প্রকাশিত হবে, তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বিশ্বপ্রতিপালকের ইচ্ছার ওপর। তিনি ইচ্ছা করে যে বিষয়ের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছেন, তার কোন প্রকার আগে-পরে হওয়ার সম্ভাবনা মোটেও নেই। শত-কোটি বার চেষ্টা করেও মানুষ নির্ধারিত সময়ক্ষণকে এগিয়ে এনে আবিষ্কার বা উদ্‌ঘাটন করার সামর্থ্য রাখে না। ইতিমধ্যে তা বহু ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে।

৫. মহাবিশ্বের সর্বত্র এবং মানুষের নিজেদের মধ্যেও মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত-অসংখ্য বাস্তব নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। প্রকৃত দর্শক-ই কেবল তার সন্ধান এবং দর্শন লাভ করতে পারে।

৬. মহাবিশ্বের প্রভু তাঁর পক্ষ থেকে পরিকল্পনা করেই মহাবিশ্বটিকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং এর অভ্যন্তরের ছোট-বড় যাবতীয় বিষয়ের মহাধ্বংস পর্যন্ত যা যা ঘটবে তার সকল কিছুই অগ্রিম একাই তিনি পরিকল্পনা করে লিপিবদ্ধ করেছেন।

৭. বিশ্ব প্রতিপালক কোন কিছু সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে 'হও' বলতেই সব যথাযথভাবে সৃষ্টি হয়ে অস্তিত্ব ধারণ করে।

৮. মহান স্রষ্টা আল্লাহ্-ই দৃশ্যমান এ মহাবিশ্বকে 'শূন্যাবস্থা' থেকে প্রথমে অস্তিত্বে আনয়ন করেন।

৯. মহাবিশ্বটিকে সৃষ্টি করার পর সময়ের বিবর্তনে ভিন্ন-ভিন্ন সময় স্কেলে প্রথমবারের ন্যায় পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি তিনিই ঘটিয়ে থাকেন।

১০. পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির (Oscillating) পদ্ধতি ব্যবহার করে একবার সৃষ্টি, একবার ধ্বংসের প্রতিনিয়ত পুনরাবৃত্তি ঘটানো তাঁর জন্য কঠিন কোন বিষয় নয় বরং স্রষ্টা হিসেবে খুবই সহজ।

১১. তিনি ছয়টি সময়কালের মধ্যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তথা মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন।

১২. মহাবিশ্বের মূল সংগঠন হচ্ছে গ্যালাক্সিসমূহ (বুরূজ)।

১৩. মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহসহ সকল কিছুই নিজ নিজ পরিবেশে ভিন্ন-ভিন্ন গতিতে প্রতিনিয়ত-ই সন্তরণশীল বা গতিশীল অবস্থায় আছে।

১৪. 'নক্ষত্র পুঞ্জ' বা 'গ্যালাক্সিসমূহ' মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় পরিভ্রমণে রত থেকে ক্রমান্বয়ে গতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে ভাস্‌তে-ভাস্‌তে হারিয়ে যায় বা অদৃশ্য হয়ে যায়।

১৫. আল্লাহ্ তা'আলা এক সময় গ্যালাক্সিগুলোকে লিখিত দফতরের মতই পরিপূর্ণরূপে গুটিয়ে ক্ষুদ্র করে নেন। যাতে করে আবার নতুনভাবে ওদের সৃষ্টি করতে পারেন ঠিক পূর্বোক্ত পদ্ধতিতেই। এটা তাঁর প্রতিশ্রুতি যা তিনি অবশ্যই পালন করছেন।

১৬. গ্যালাক্সি ধ্বংসের পর ওটাকে একই সৃষ্টি পদ্ধতিতে পুনরাবৃত্তি করে যে জগত তৈরী করা হচ্ছে, তা পূর্বের জগত থেকে ভিন্ন চেহারার হচ্ছে এবং সমতল ময়দানে পরিণত হচ্ছে।

১৭. নুতন জগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে- পৃথিবীতে এবং সম্ভাব্য অন্যান্য জগতেও যারা বিশ্বাসী সম্প্রদায় তাদেরকে তাদের সৎকাজের

বিনিময়স্বরূপ পুরস্কার প্রদান এবং যারা অবিশ্বাসী সম্প্রদায় তাদেরকে প্রতিফলস্বরূপ শাস্তি প্রদান করার জন্য সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করা।

১৮. মানব সমাজে যারা চিন্তাশীল, জ্ঞানী ও স্মরণকারী, শুধু তারাই তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত অকাট্য নিদর্শনসমূহ অবলোকন করে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ধন্য হয়ে থাকে।

১৯. মানুষ তার মানবীয় জ্ঞানে যত প্রকারেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধান করুক না কেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আসমানী বাণীর মাঝে কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা কোন প্রকার পরিবর্তন খুঁজে পাবে না।

২০. বস্তুতঃ মহাবিশ্বের সর্বত্র একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই প্রশংসা, গুণগান ও গৌরব-গরীমা প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী একক প্রচণ্ড শক্তি-ক্ষমতা ও মহাজ্ঞানের কারণে।

২১. যে বা যারা মহান স্রষ্টার বাস্তব নিদর্শন চোখে দেখেও না দেখার ভান করে, তারা অবশ্যই মহাঅপরাধ করার কারণে 'যালিমদের' মধ্যেই গণ্য হবে।

২২. এক ও একক 'আল্লাহ্' ছাড়া মানুষেরা অপর যা কিছুকেই প্রভু হিসেবে মানে, মূলতঃ তাদের কেউ-ই 'মহাবিশ্বের সৃষ্টি' এবং ওর গ্যালাক্সিদের ধ্বংস ও পুনর্বার সৃষ্টির যে পুনরাবৃত্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে চালু করা হয়েছে তার কিছুই তারা করতে সক্ষম নয়।

২৩. 'আল্-কুরআন' উক্ত জটিল ও 'মেধা সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ' স্বচ্ছ আলোতে উপস্থাপন করে স্রষ্টার পক্ষ থেকে আগত 'জ্ঞানগর্ভ ও সত্য গ্রন্থরূপে' নিজের পরিচয় তুলে ধরেছে।

২৪. আর সে কারণেই অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যও একমাত্র 'কুরআনই' ভরসাস্থল হতে পারে।

২৫. এ পর্যায়ে সবকিছু দেখে-শুনে যার ইচ্ছা এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, আবার যার ইচ্ছা বিশ্বাস না করে সত্যকে প্রত্যাখ্যানও করতে পারে। তবে প্রত্যাখ্যানের জন্য শাস্তির ব্যবস্থাকে এড়াতে পারবে না। অবশ্যই কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

'বৈজ্ঞানিক' তথ্যের 'মূল' (key) পয়েন্টসমূহ

১. মহাবিশ্বের প্রকৃত সত্য 'তথ্য ও তত্ত্ব' আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে বিজ্ঞান বিশ্ব ছিল অন্ধকারে।

২. আন্দাজ-অনুমান নির্ভর 'থিউরিসমূহ' বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত গোটা বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রাখতে সমর্থ হয়।

৩. 'বেলজিয়াম বিজ্ঞানী 'লি' মেইটর' ১৯৩৩ সালে সরকারীভাবে 'বিগ-ব্যাংগ' থিউরি প্রকাশ করার পর ১৯৬৪ সালে তা সত্যরূপে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৪. আমেরিকান দু'জন বিজ্ঞানী 'মিঃ আরনো পেনজিয়াস' এবং 'রবার্ট উইলসন' তাদের টেলিস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করার সময় হঠাৎ করেই 2.73k. বেক গ্রাউণ্ড রেডিয়েশন (Back Ground Radiation) আবিষ্কারের মাধ্যমে 'Big-Bang' থিউরিকে ১৯৬৪ সালে বাস্তবভাবে প্রমাণ করেন।

৫. 'বিগ-ব্যাংগ' (Big-Bang) তথ্য অনুযায়ী প্রায় $১০^{-৩৩}$ সেঃ মিটার মহাসূক্ষ্ম একটি বিন্দুতে বিপুল-বিশাল পরিমাণে শক্তি ঘনীভূত হয়ে আবদ্ধ হওয়ায় বর্ণনাতীত চাপে তাপমাত্রা যখন প্রায় $১০^{৩২}$k.-এ উন্নীত হয়, তখন সময়ের এক মহাসূক্ষ্ম পরিসরে ($১০^{-৪৩}$ সেঃ প্রায়) ঘটে যায় 'মহাবিস্ফোরণ', ঐ মহাবিস্ফোরণের পরিণতিতে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুটি বাতাসে ফুলে উঠা বেলুনের মত চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমান 'মহাবিশ্বের' রূপ পরিগ্রহ করেছে।

৬. বিস্ফোরণের পর আলোর কণা 'ফোটন' থেকে পর্যায়ক্রমে কোয়ার্ক, ইলেকট্রন, প্রোটন-ও নিউট্রন নামক ক্ষুদ্র কণিকাসমূহ সৃষ্টি হয়। প্রোটন ও নিউট্রন কণিকাদ্বয় মিলিত হয়ে পদার্থের মূল ভিত্তি 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) তৈরী করে, অতঃপর 'নিউক্লিয়াস' এক পর্যায়ে 'ইলেকট্রন' কণিকা ধারণ করে 'অটল পদার্থ' সৃষ্টি করে। উক্ত 'অটল পদার্থ' (Stable Atoms) মূলতঃ ছয়টি পর্যায় অতিক্রম করার পরই সৃষ্টি হয়।

৭. 'অটল পদার্থ' (Stable Atoms) সৃষ্টি হয়ে বিকিরণ (Radiation) থেকে পৃথক হয়ে পড়ায় 'পদার্থ কনার' ধোঁয়ায় মহাবিশ্ব পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

৮. এক পর্যায়ে উক্ত ধোঁয়ার মেঘপুঞ্জের ভেতর এক প্রকার সূক্ষ্ম 'মহাজাগতিক তার' (Cosmic String) আবির্ভূত হয়ে প্রবল মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ধোঁয়ার মেঘকে আকর্ষণ করে করে গুচ্ছাকৃতিতে সাজিয়ে তোলে নবীন মহাবিশ্বকে।

৯. উক্ত গুচ্ছাকৃতি ধোঁয়ার মেঘপুঞ্জগুলোই পরবর্তীতে 'গ্যালাক্সি' (Galaxy) নামে অভিহিত হয়।

১০. মহাবিশ্বের সৃষ্টির শুরুর মুহূর্ত থেকে সর্বত্র মহাসম্প্রসারণ চলতে থাকায় গ্যালাক্সিগুলোও ক্রমান্বয়ে গতি বাড়িয়ে বিস্ফোরণ বিন্দু থেকে চতুর্দিকে কেবলই ছুটে যাচ্ছে।

১১. মহাকাশের মহাশূন্যতায় পরিভ্রমণে নিরত থাকাবস্থায় 'গ্যালাক্সিদের' অভ্যন্তরে পদার্থের মেঘপুঞ্জে 'মধ্যাকর্ষণ বল' (Gravitation) সক্রিয় হয়ে পরবর্তীতে সৃষ্টি করতে থাকে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুসমূহ।

১২. ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকান বিজ্ঞানী 'মিঃ ইডুইন হাবেল' গ্যালাক্সিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের দ্বার উন্মোচন করেন।

১৩. 'মিঃ হাবেল' ১৯২৯ সালে প্রমাণ করে দেখান যে প্রতিটি গ্যালাক্সি পরস্পর পরস্পর থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে এবং প্রতি 'পারসেক' (৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ) পথ অতিক্রম করার পর ওদের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৫০ মাইল হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা 'হাবল কনস্টেন্ট' (H_O) নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৪. তিনি আরও প্রমাণ করেন যে উক্ত 'হাবল কনসটেন্ট' অনুযায়ী গ্যালাক্সিসমূহ উড়ন্ত অবস্থায় প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের পর প্রায় আলোর গতির সমান গতিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

১৫. 'জিরাল্ড ফিট্জ কনট্রাকশান' এবং 'আইন ষ্টাইনের ভরবেগ তুল্যতার সমীকরণ $E=mc^2$' প্রমাণ করে যে, আলোর গতিতে উড়ে যাওয়া

বস্তুর আকৃতি চলে যাবে শূন্যের কোঠায় কিন্তু 'ভর' (Mass) বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুন হয়ে যাবে।

১৬. আলোর গতিতে ধাবমান অবস্থায় গ্যালাক্সিদের সঙ্কোচনের মাধ্যমে আদি আকৃতির বিনাশ ঘটার পর্যায়ে গড়ে প্রায় ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্রসহ গ্যালাক্সির সমস্ত বস্তুভরকে (Mass) প্রচণ্ড ঘনায়নের মাধ্যমে ঘনীভূত করে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity তে) জমিয়ে নেয়ার জন্য প্রাকৃতিকভাবেই প্রতিটি গ্যালাক্সিতে বিরাট বিরাট 'ব্ল্যাক হোল' তৈরী হয়ে আছে।

১৭. পুরো গ্যালাক্সিটি মহাসংকোচনের শেষলগ্নে উপনীত হলে তখন সর্বোচ্চ পরিমাণে বস্তুভর গলাধঃকরণ করার কারণে এক সময় 'ব্ল্যাক-হোল' চৌঙ (Black Hole Tunnel) জাম হয়ে (Choched) 'এক পর্যায়ে ব্ল্যাক-হোলের' অস্তিত্বও মুছে যাবে।

১৮. সমগ্র গ্যালাক্সিটি এ পর্যায়ে প্রচণ্ড গতির কারণে যে মাত্র 'মহাসূক্ষ্ম এক বিন্দুতে' (Singularity) প্রবেশ করবে, ঠিক তখনই ভাষায় প্রকাশহীন এক প্রচণ্ড পরিমাণে চাপ এবং তাপ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে মহা এক 'বিস্ফোরণ' ঘটিয়ে 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) মডেলের ন্যায় আবার নুতন জগত সৃষ্টি করবে।

১৯. নতুনভাবে সৃষ্ট জগত পূর্বের ন্যায় মহাকাশের মহাশূন্যতায় নির্দিষ্ট করা কক্ষপথে পরিভ্রমণে নিরত থেকে আবার তার ধ্বংসের ঠিকানায় এগিয়ে যাচ্ছে।

২০. উল্লেখিতভাবেই আমাদের বর্তমান মহাবিশ্বটি সৃষ্টি হওয়ার পর ওর লক্ষ-কোটি গ্যালাক্সিসমূহ চতুর্দিকে একবার সৃষ্টি, আবার ধ্বংসের পুনঃ পুনঃ ব্যবস্থার কঠিন এক নিয়মে তাদের 'লাইফ সাইকেল' তথা জীবন পরিক্রমা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং ওর মূল সংগঠন গ্যালাক্সিসমূহের পুনঃ পুনঃ ধ্বংস এবং সৃষ্টি বিষয়ক প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে মহা গ্রন্থ 'কুরআনের' পেশকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ এবং বর্তমান শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষতায় উত্তীর্ণ 'বিজ্ঞানের' প্রকাশকৃত রিপোর্ট এবং বাস্তব ছবির মাঝে মূল বিষয়গত কোন

গরমিল আছে কি? প্রায় দেড় হাজার বছরের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান কি মহাজাগতিক এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আল্-কুরআনের পদতলে আত্মসমর্পণ করেনি? বিজ্ঞান প্রকাশ্যে মহাবিশ্বের প্রতিপালককে এখনো স্বীকার না করলেও ইচ্ছায় আর অনিচ্ছায় হোক, পরকালে বিচারের জন্য সৃষ্ট নুতন জগত 'হাশরের মাঠ' পর্যন্ত কি গিয়ে উপস্থিত হয়নি? বস্তুজগতের প্রান্তঃসীমার বর্ণিত দৃশ্য দেখে আমেরিকান NASA-র বিজ্ঞানীগণ যে ভয়ে ভয়ে কম্পিত স্বরে উচ্চারণ করেছেন 'Where are we going?' তা-কি ভেবে দেখার বিষয় নয়? এতদিন যে বা যারা পার্থিব জীবনের সমাপণান্তে পরকালে বিচারের মাঠে আবার জীবন্ত হয়ে প্রভুর সামনে হিসেব দেয়ার জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে অসম্ভব-অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিত, আজকে বাস্তবতার কঠিন এক বিধানে তাদের সেই হাসি-তামাসা তাদের জন্য কি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়নি?

মহাবিশ্বে মহাজাগতিক কঠিন নিয়মের সামনে মানুষের সকল প্রকার তর্জন-গর্জন, হুঙ্কার আর প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং টেকনিককে ধূলিস্মাৎ করে দিয়ে আমাদের গ্যালাক্সি 'মিলকি ওয়ে' স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রায় আলোর গতির সমান 'প্রস্থান গতি' লাভ করে আভ্যন্তরীণ সকল সৌরব্যবস্থাকে 'কিয়ামাত' বা 'ধ্বংসে' নিক্ষেপ করে প্রথমে 'শূন্যের কোঠায়' (প্রায়) গমন করবে এবং পরক্ষণেই আবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে নতুনভাবে জগত সৃষ্টি করে হাশরের মাঠে রূপ নিবে। আমরা চাই বা না চাই, 'কুরআন' শপথ করে ঘোষণা দিয়েছে এবং বিজ্ঞান প্রমাণ করে প্রকাশ করেছে যে, উক্ত অবস্থা ঘটবেই, ঘটতে বাধ্য। মহাজাগতিক নিয়মে দ্বিতীয় কোন পথ আর খোলা নেই, তাই আমাদের নিজেদের কল্যাণেই বিষয়টিকে আমাদের ভাবনার সীমানায় আনা দরকার এবং আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন করা দরকার।

"চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হল বক্ষস্থিত হৃদয়।" (২২ ঃ ৪৬)

"এটা জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন"। (১০ ঃ ১)

"তিনি তোমাদেরকে বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (৪০ ঃ ৮১)

"তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায় সংগত। তাঁর বাণী কেউ-ই

মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন।” (৬ ঃ ১১৫)

“এগুলোই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য”। (৩০ ঃ ৩০)

বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইন ষ্টাইন ও বিগ-ব্যাংগ মডেল গবেষণাকারী বিজ্ঞানী দল এবং বিজ্ঞান বিশ্বের প্রায় সকল বিজ্ঞানী একমত যে, আলোর গতিপ্রাপ্ত গ্যালাক্সিগুলো যে মুহূর্তে পরিপূর্ণরূপে প্রচণ্ড সঙ্কোচের কারণে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে জমে যাবে অর্থাৎ Singularity-তে পৌঁছে যাবে, তখন চাপ এবং তাপ সর্বোচ্চ পর্যায়ে লাভ করার কারণে সঙ্কুচিত বিন্দুটি আর স্থির থাকতে না পেরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পূর্বের সঙ্কোচনের বিপরীতে মহাসম্প্রসারণে নিয়োজিত হয়ে পড়বে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে Big Bang Model-এর অনুসরণে নতুন নতুন জগত তৈরী করতে থাকবে।

বিজ্ঞানী সমাজ যখন তাদের পূর্বের আবিষ্কারের আলোকে উল্লেখিত সত্য তথ্য অবহিত আছেন, আবার টেলিস্কোপ দিয়ে স্বচোখে গ্যালাক্সিগুলোকে মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানার দিকে আলোর গতিতে প্রস্থান করতে গিয়ে যে সঙ্কুচিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে দর্শন করছেন এবং তার-ই নিকটবর্তী ঐ প্রান্তঃসীমায় ‘গামা-রে বার্স্ট’ (GRBs), (যে বিস্ফোরণ থেকে নির্গত ‘গামা-রে’-এর বিচ্ছুরণের কোন তুলনা বিজ্ঞানীদের হাতে নেই এবং Big Bang-এর পর যার স্থান তারা নির্ধারণ করেছেন) প্রত্যক্ষ ও শনাক্ত করছেন, এখন ঐ ‘গামা-রে বার্স্ট’ (GRBs) যে সঙ্কুচিত গ্যালাক্সি-ই ঘটাচ্ছে এবং এর ফলে সেখানে Bing Bang Moded-এর অনুকরণে নুতন জগত সৃষ্টি হচ্ছে একথা তারা নির্দ্বিধায় বলতে পারছেন না কেন? হতে পারে তাঁরা Telescope দিয়ে আগে দেখতে চান এবং পরে তা প্রকাশ করতে চান। কিন্তু ততটুকু সময় তাঁরা পাবেন কি-না সন্দেহ আছে। কেননা এখানে দু’টি বিষয় আছে।

এক : হতে পারে আল্লাহ্ তা’আলা এ পৃথিবী থেকে মানুষকে সরাসরি পরকাল দর্শন করতে দেবেন না এটা তাঁর ইচ্ছা। সে অবস্থা আসার পূর্বেই তিনি এ পৃথিবীর কিয়ামাত ঘটিয়ে ফেলবেন।

দুই ঃ ঐ সকল জগতের মানুষ তাদের পার্থিব হিসাব-নিকাশ প্রদানের জন্য আবার যে সৃষ্টি হতে থাকবে হাশরের মাঠে, তা হয়তো দর্শনের সময় দেবেন না। এরই ফাঁকে কিয়ামাত এসে যাবে এ পৃথিবীতে। কেননা পরকালের বিষয় যদি বিজ্ঞান প্রমাণ করে মানুষের হাতে পুরো প্যাকেজটি তুলে দিতে পারে, তাহলে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বসবাসকারী তখনকার মানব সমাজের ইহ্কালীন পরীক্ষা যথাযথ হবে না, তারা ঐ সংবাদের ওপর বিশ্বাস করে নিজেদের জীবন ১০০ ভাগ শুধরায়ে নেয়ার সুযোগ পাবে। যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দাহদের প্রতি ইনসাফ করা হবে না। কিন্তু কুরআনের ভাষ্যের অনুকুলে আমরা এখনই বিজ্ঞান থেকে যতটুকু তথ্য ও ছবি লাভ করেছি, তাতে বুঝতে পারছি যে মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানায় আলোর গতি লাভকারী গ্যালাক্সিগুলো সঙ্কুচিত হয়ে সকল প্রাণময় জগতগুলোর কিয়ামাত সংঘটিত করছে এবং তার পরে গিয়ে Bing Bang Model-এর অনুকরণে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে (যে বিস্ফোরণ থেকে ব্যাপক আকারে গামা-রে নির্গত হচ্ছে) আবার নতুন নতুন জগত তৈরী করছে, যে জগতগুলো পরকালে হাশরের মাঠের ভূমিকা পালন করছে। হাশরের মাঠের কর্মকাণ্ড শেষে (এ বিষয়ে আরও তথ্য জানতে হলে সিরিজি-২, কিয়ামাত ও হাশর অধ্যায় দেখুন) নতুন জগত নিজস্ব পরিক্রমণ (Cycle) রুটে আবার Big Bing বিন্দুর দিকে চলে আসছে। এতে আবার ক্রমান্বয়ে গতির বৃদ্ধি ঘটতে ঘটতে এক পর্যায়ে আলোর গতির সমান গতি লাভ করা মাত্র মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) উপনীত হয়ে পুনরায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার নতুন জগত তৈরী হচ্ছে। এ পর্যায়ে কিন্তু বিস্ফোরণটি একেবারে Big Bang বিন্দুতে ঘটবে না, ওর নিকট পৌঁছার আগেই ঘটবে, কেননা দোলনের কারণে (Frequency কমে যাওয়ার কারণে) ক্রমে ক্রমে Big Bing বিন্দু থেকে বিস্ফোরণ দূরত্ব বাড়তে থাকবে, ইতিমধ্যে বিজ্ঞান এ ধরনের বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট গ্যালাক্সিগুলো আবিষ্কার করে তার ছবি আমাদের হাতে পৌঁছিয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে– একটি গ্যালাক্সি ধ্বংস হয়ে তার থেকে অসংখ্য গ্যালাক্সি কিভাবে জন্ম নিতে পারে? এর উত্তর বিজ্ঞানীগণ-ই ইতিমধ্যে প্রদান করেছেন। তারা হাতে-নাতে প্রমাণ পেয়েছেন যে আমরা যে সকল পূর্ণাঙ্গ গ্যালাক্সি উড়ে যেতে দেখছি, এরা

"তাঁর আসন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত আছে, ওদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।" (২ ঃ ২২৫)
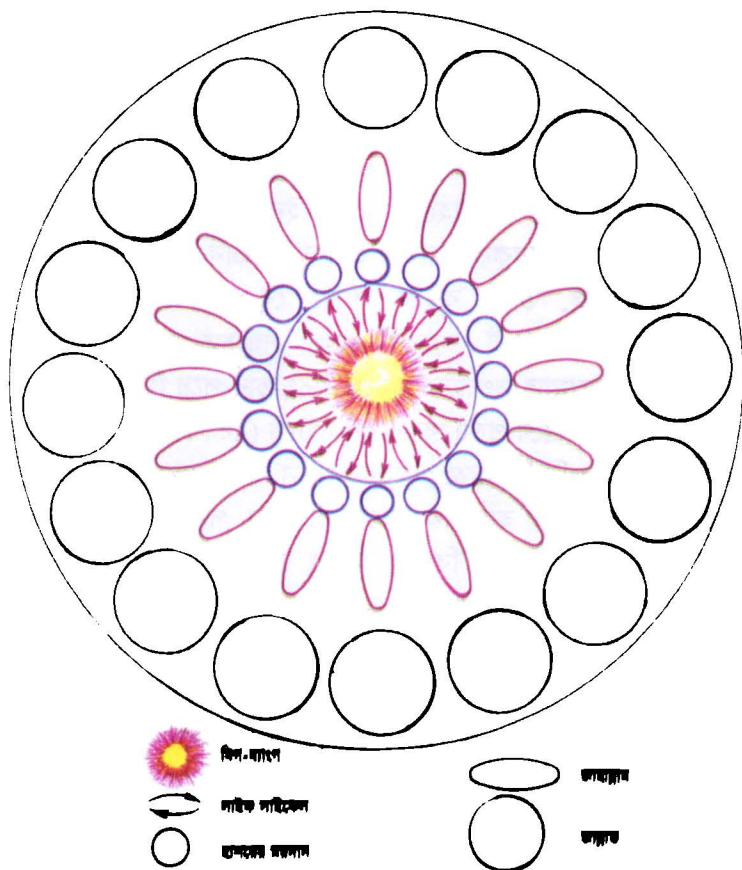
চিত্র–১৩৪

– আল্লাহ্ তা'আলার 'আরশ' দ্বারা সমগ্র মহাবিশ্বটি পরিবেষ্টিত বিধায় এর অভ্যন্তরস্থ বস্তুজগত ও আধ্যাত্মিক জগত ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবস্থায় অথচ স্ব-স্ব জীবন পরিক্রমা (Life Cycle) অনুসরণ করে চলছে। বস্তুজগতের অবস্থান হচ্ছে মধ্যস্থলে আর আধ্যাত্মিক জগতের অবস্থান হচ্ছে বস্তুজগতের চতুর্দিকে। এতে প্রমাণ হচ্ছে মহাবিশ্বটি একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অধীন থেকে যথাযথভাবে এগিয়ে চলেছে।

"মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।" (৪০ ঃ ৫৭)
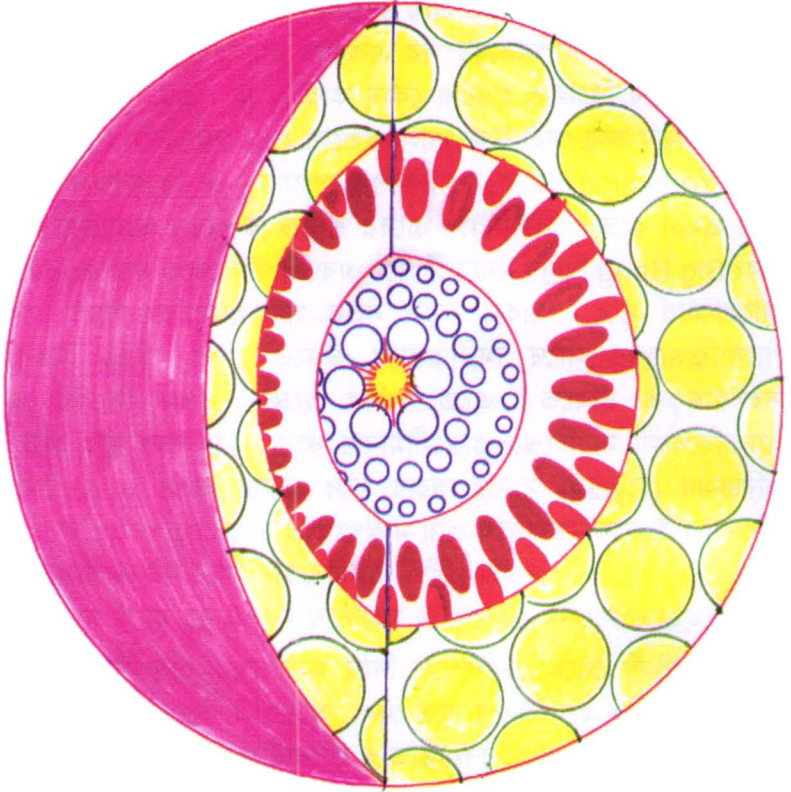
চিত্র-১৩৫

- মহান স্রষ্টার মহাজ্ঞানের ও মহাক্ষমতার মহাকীর্তি হচ্ছে এ মহাবিশ্বটি সৃষ্টি। এর ভেতরই কেন্দ্রে রয়েছে আমাদের এ বস্তুজগত এবং এরই সমান্তরালে চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে পরজগত বা আধ্যাত্মিক জগত। আর পুরো মহাবিশ্বটি আল্লাহর 'আরশ' দিয়ে ঘেরা। সবই মহাশূন্যে ভাসমান এবং নিজ নিজ স্বতন্ত্র হিসেব মতে গতিশীল এবং পুনঃ পুনঃ পরিক্রমণরত। সুতরাং আল্লাহ্ যে মহাবিশ্বের স্রষ্টা এবং কুরআন যে তাঁর বাণী এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ আছে কী? আল্লাহ্ স্রষ্টা বলেই মহাবিশ্বটি লক্ষ-কোটি জটিলতা নিয়েও যথাযথভাবে মহাশূন্যে পরিচালিত হচ্ছে।

কিন্তু বর্তমান একটি মাত্র গ্যালাক্সিরূপে শুরু থেকে ছিল না। মহাশূন্যে ছুটতে গিয়ে বহু সংখ্যক ছোট ছোট গ্যালাক্সি সংঘর্ষে জড়িয়ে গিয়ে পর্যায়ক্রমে একটি বড় গ্যালাক্সিতে রূপ নিয়েছে। আমাদের মিলকি-ওয়ে মাঝারি ধরনের গ্যালাক্সিটিও প্রায় ৫/৬ টি ছোট ছোট গ্যালাক্সির মিলিত রূপ মাত্র। তাই বিস্ফোরণের পর একাধিক গ্যালাক্সি তা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। নতুন জন্ম নেয়া উক্ত গ্যালাক্সিগুলো (3C 295) যে Big Bang-এর Production নয় বরং গ্যালাক্সির সঙ্কোচনে ও বিস্ফোরণে যে সৃষ্টি তার প্রমাণ হচ্ছে– বিজ্ঞানীগণ এদের শনাক্ত করেছেন আমাদের পৃথিবী এবং Big Bang বিন্দুর মধ্যবর্তী পথে এবং পৃথিবী থেকে মাত্র ৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে। আবার নতুন নতুন সৃষ্ট গ্যালাক্সিগুলোকে পুরনো গ্যালাক্সিগুলোর সাথে মিলিতভাবে উড়তে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের সরবরাহকৃত ছবিতে। এতে প্রমাণ হচ্ছে– প্রথম দিকের আদি গ্যালাক্সিগুলো মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানায় ধ্বংস এবং পুনঃ সৃষ্টি হয়ে পূর্ণ পরিক্রমণ (Cycle) সম্পন্ন করার পথে আবার ধ্বংস ও বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে নতুনভাবে প্রায় মাঝপথে উড়ে চলা পুরনো গ্যালাক্সিদের সাথে যোগ দিয়েছে। নতুবা প্রবীণ গ্যালাক্সিদের সাথে নবীন গ্যালাক্সিদের মিলিত হওয়ার সুযোগ কোথায় এ মহাবিশ্বে মহাশূন্যের মাঝে মহাযাত্রায়?

সুতরাং পৃথিবী থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানার দিকে গ্যালাক্সি সঙ্কুচিত হয়ে অদৃশ্য হতে দেখা, আবার ঐ দূরত্বের পরে 'গামা-রে বার্স্ট' (প্রচণ্ড বিস্ফোরণ যা বর্ণনাতীত ও তুলনাহীন গামা রশ্মির তেজস্ক্রিয়তা ছড়াচ্ছে) সংঘটিত হতে দেখা, আবার ভেতরের দিকে (Big Bang বিন্দুর দিকে) গ্যালাক্সি বিস্ফোরণ পরবর্তী অবস্থা এবং তারও পরের অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে অসংখ্য গ্যালাক্সি সৃষ্টি হতে থাকা দর্শন করা, এ সবই প্রমাণ করছে এ মহাবিশ্বের বড় সংগঠন গ্যালাক্সিসমূহ তথা বস্তুজগত বক্ষমান অধ্যায়ে বর্ণিত ধারায় বারবার সৃষ্টি ও ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তাদের লাইফ সাইকেল (Life cycle) পূর্ণ করে চলেছে।

এবার আলোচিত অধ্যয়টির মূল তথ্যগুলোকে সংক্ষিপ্তাকারে এক নজরে দেখে নিই।

এক নজরে

আল্ কুরআন

১. "বল, তোমরা কি আল্লাহ্কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) এমন কোন কিছুর সংবাদ দিতে চাও, যা তিনি অবগত নন? নিশ্চয়-ই তিনি (অজ্ঞানতা হতে) অতি পবিত্র" । (১০ ঃ ১৮)

-অর্থাৎ আমাদের এ মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র-বৃহৎ এমনকি প্রতিটি মহাসূক্ষ্ম কণিকা পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি ও মহাজ্ঞানের সম্মুখে সমুপস্থিত । একমাত্র তিনিই সর্বজ্ঞানী ।

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) লুকায়িত (অদৃশ্য) বস্তুকে প্রকাশ করেন ।" (২৭ ঃ ২৫)

-অর্থাৎ জ্ঞানবান প্রাণীকুল যা কিছুই নতুনভাবে আবিষ্কার করছে, তা কিন্তু তাদের একমাত্র প্রভু আল্লাহ্র কৌশলগত নির্দেশেই সম্ভব হচ্ছে, এ কৃতিত্ব বস্তুতঃ তাঁরই ।

বর্তমান বিজ্ঞান

১. আমাদের এ পৃথিবী পৃষ্ঠে আগত মানবমণ্ডলী অবিজ্ঞান যুগে যেমনি সমগ্র মহাবিশ্বের সকল প্রকার বস্তু ও শক্তি সম্পর্কে অবহিত হতে সক্ষম হয়নি, তেমনি বর্তমান চরম প্রযুক্তিগত সাফল্য লাভ করার পরও সমগ্র মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার বস্তু, শক্তি ও বিষয়সমূহ এখনও পরিপূর্ণরূপে জ্ঞান রাজ্যের সীমানায় বন্দি করতে পারেনি । অবশ্য সে চেষ্টায় বিজ্ঞান বিশ্ব যে অবিরত কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাতে উৎসাহ উদ্যোগের যে কোন কমতি নেই তা একবাক্যে সবাই স্বীকার করছে ।

বিজ্ঞানের প্রতিদিনের উদ্যোগ-আয়োজনে এবং অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণে অহরহ মহাবিশ্বের মাঝে অদৃশ্য-লুকায়িত অগণিত বিষয় উদঘাটিত হচ্ছে, এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে (১) মহাবিশ্বটি কল্পনাতীত মহাজ্ঞানময় বিষয়সমূহের সমাহারে পরিপূর্ণ এবং (২) মানব সমাজ তাদের জ্ঞানের পরিধির বিস্তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে এগিয়ে নিয়েও কখনই মহাবিশ্বের সকল বিষয়ে পুংখানু-পুংখরূপে অবহিত হওয়া বা জ্ঞান লাভ করার যোগ্যতা রাখে না ।

এ ছাড়াও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ বিজ্ঞানীদের ইচ্ছামত সময় ও পরিবেশে উদঘাটিত

না হওয়া প্রতিটি আবিষ্কারের পেছনে অদৃশ্য কোন হস্তক্ষেপ অবশ্যই ক্রিয়াশীল আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। যে কারণে কোন কোন বিষয় খুবই স্বল্প সময়ে আত্মপ্রকাশ লাভ করছে আবার কোন কোন বিষয় শত শত বৎসরেও মীমাংসা হচ্ছে না। অধিকাংশ জ্ঞানীজন বিষয়টি ইদানিং খুবই গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করছেন।

প্রতীয়মান হচ্ছে মানব সমাজের দৃষ্টির আড়ালে অবশ্যই মহাশক্তিশালী কোন সত্তা বিরাজমান আছেন, সব তার ইচ্ছাতেই ঘটছে।

পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য কর, নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।" (১০ ঃ ১০১)

-অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র কৃতিত্বের নিরংকুশ প্রভাবকে বুঝার বা উপলব্ধি করার জন্য মানব সম্প্রদায় সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা তাঁর বাস্তব নিদর্শনসমূহ দর্শন করে ভেবে দেখতে পারে। এতে সকল প্রকার সন্দেহ অবশ্যই কেটে যাবে।

২. প্রায় প্রতিদিনই এ মহাবিশ্বের ভেতর কোন না কোন বিষয় আবরণ উন্মোচন করে অন্ধকার থেকে স্পষ্ট আলোতে বেরিয়ে আসছে তথা অদৃশ্য থেকে দৃশ্যমান হচ্ছে। ফলে বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশাল এ জগতে মানব সম্প্রদায় অসংখ্য অবিশ্বাস্য নিদর্শন দর্শন লাভে ধন্য হচ্ছে।

আবিষ্কারের বর্তমান গতি ধারায় মনে হচ্ছে কোথাও যেন একটি সর্বশক্তিমান ও অলৌকিক কেন্দ্রে বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে বন্দী করা। সময় এবং অনুকুল পরিবেশে জ্ঞানের গভীরতার উচ্চতর পর্যায়ের ক্রম এবং শৃংখলা রক্ষা করে একের পর এক উদঘাটিত হচ্ছে। ফলে মানব সম্প্রদায়ও উপকৃত হচ্ছে।

২. "বল, প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই, তিনি তোমাদেরকে অতিসত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন।" (২৭ ঃ ৯৩)

-অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌' তাঁর ইচ্ছে মতই সকল প্রকার নিদর্শনকে আবিষ্কার হিসেবে প্রকাশ করবেন।

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে।" (৬ ঃ ৬৭)

-অর্থাৎ 'স্রষ্টা' হিসেবে আল্লাহ তাঁর নিজ ইচ্ছানুযায়ী প্রতিটি আবিষ্কারকে সময় নির্ধারণ করে ব্যবস্থা

বস্তুতঃ মহাকাশের গভীর শূন্যতা আর অন্ধকারের ভেতর থেকে আবিষ্কৃত অসংখ্য জ্ঞানময় বিষয় এবং মানুষের নিজেদের শত বিস্ময়কর দেহ যন্ত্রের আশ্চর্য করার মত কর্মকাণ্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমাজের জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই ভাবনার বিষয় বৈ কি! প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করে কল্যাণ প্রাপ্তির পথে এটি একটি বড়ই সহায়ক পথ যার কোন বিকল্প নেই।

"আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) এবং তাদের (মানুষের) নিজেদের মধ্যেও, ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে আল্লাহ্ সত্য, এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত!" (২১ ঃ ৩৭) -অর্থাৎ মহাবিশ্বের যে কোন দিকে তাকালে এমনকি মানুষ তার নিজ দেহের দিকে তাকালেও মহাবিশ্বের একজন মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বুঝতে পারবে। তাঁর মহাজ্ঞানের ছাপ সর্বত্রই বিরাজমান।

সুতরাং মানব সমাজের যারা প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানী, তারা মহাসত্যকে ধারণ করার জন্য 'আল্-কুরআন' সঠিক পথটি তাদের প্রদর্শন করতে পারে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, পূর্বে বিজ্ঞান বিশ্ব গুরুত্ব না দিলেও বর্তমানে কিন্তু বিবেচনায় আনতে সম্মত হচ্ছে যে, মহাবিশ্বে ঘটে চলা গণনাতীত ঘটনা প্রবাহ বিশৃংখলা থেকে উদ্ভূত নয় বরং এক মহাপরিকল্পনার অংশ মাত্র। বিষয়টি আরও বাস্তবভাবে ব্যাপক আকারে উপলব্ধির জন্য বিজ্ঞানকে সাফল্যের সাথে আরও অনেক পথ অবশ্যই মাড়াতে হবে। তখন দিনের আলোর মত সবই প্রকাশিত হয়ে মানব সমাজকে উপকৃত করবে।

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।' (২৭ ঃ ৭৫) -অর্থাৎ সমগ্র মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যাপারগুলোই 'লৌহ মাহফুজে' আল্লাহ্ পূর্বেই পরিকল্পনানুযায়ী লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, আর সে অনুযায়ী সব ঘটে চলেছে।

৩. "পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর কিভাবে আল্লাহ্ প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করেন?" (২৯ ঃ ২০)

৩. আমাদের দৃশ্যযোগ্য প্রকাণ্ড এ মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার সমস্ত পদার্থ ও শক্তি কিভাবে; কখন সৃষ্টির সূচনা হল তা খুঁজে বের করার জন্য

বিজ্ঞানীগণ শতাব্দির পর শতাব্দি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কাজ চালিয়ে এসেছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের প্রস্তাব উত্থিত হয়ে মানব সমাজকে বার বার আলোড়িত করেছে বিংশ শতাব্দি পর্যন্ত।

অবশেষে ১৯৩৩ সনে বিজ্ঞানী 'জর্জ ল্য মেইটর' কর্তৃক ঘোষিত 'Big Bang' প্রস্তাব ১৯৬৫ সনে আমেরিকান দু'জন বিজ্ঞানী 'আরনো পেনজিয়াস' ও 'বরার্ট উইলসন' কর্তৃক 2.73k বিস্ফোরণে বস্তুর ধ্বংসপ্রাপ্ত উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া তাপমাত্রা (Back Ground Radiation 2.73k) উদ্ঘাটিত হয়ে প্রমাণিত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী তা 'সত্য' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

উল্লেখিত 'Big Bang' সৃষ্টিতত্ত্ব থিউরি অনুযায়ী যে মহাবিস্ফোরণ থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা ঘটে, ঐ মহাবিস্ফোরণটি ঘটার মুহূর্ত কালটি ছিল 10^{-43} Sec. যার মান চোখের পলকের চাইতেও দ্রুততর। আর পুরো সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মোট ৬টি পর্যায়কাল জড়িত ছিল। যেমন ঃ

1. Plank Time orTime zero.
2. Inflation Period.
3. Annihilation Period.
4. Proton & Neutron Period.
5. Atomic Nuclei period.
6. Stable Atoms Period.

সমগ্র বিজ্ঞান বিশ্ব এ ব্যাপারে আজ একমত।

৪. বিজ্ঞান বিশ্ব ১৯২৩ সন থেকে ১৯২৯ সনের

-অর্থাৎ মানবমণ্ডলী সঠিকভাবে তাদের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালিয়ে গেলে এক পর্যায়ে অবশ্যই মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনা অবহিত হতে পারবে।

"সেই সত্তাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে (মহাবিশ্বকে) সৃষ্টি করেছেন সঠিক সমতায়, তিনি যখন ইচ্ছা করেন এবং আদেশ করেন 'হও'; তখনই চোখের পলকের চাইতেও দ্রুততর সময়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।" (৬ ঃ ৭৩)

"তিনি ছয়টি সময়কালে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" (৫৭ ঃ ৪)

-অর্থাৎ মানবমণ্ডলী তাদের পর্যবেক্ষণে অবশ্যই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে মোট ৬টি পর্যায় উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হবে। এটা আল্লাহর নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল।

৪. "তারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন? অতপর ওর

পুনরাবৃত্তি ঘটান? এটাতো আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।" (২৯ ঃ ১৯)

-অর্থাৎ মানব সম্প্রদায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে এগিয়ে গেলে অবশ্যই এ মহাবিশ্বের মাঝে গ্যালাক্সিদের সৃষ্টি, ধ্বংস ও পুনঃ সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নেয়া পদ্ধতি ও ব্যবস্থা তারা জানতে সক্ষম হবে। পরে তাদের নিকট বিষয়টি জটিল মনে হলেও তাদের প্রভুর পক্ষে কিন্তু খুবই সহজ।

"বল, আল্লাহ্‌-ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন এবং ওর পুনরাবৃত্তি ঘটান।" (১০ ঃ ৩৪)

-অর্থাৎ এ মহাবিশ্বের মাঝে গ্যালাক্সিদের সৃষ্টি, আবার ধ্বংস, আবার সৃস্টি এ পুনরাবৃত্তি একমাত্র মহান 'আল্লাহ্‌র' পক্ষেই সম্ভব, অন্য আর কারও পক্ষেই তা মোটেও সম্ভব নয়। এটাও আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে একটি বড় প্রমাণ।

"যিনি আদিতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি ওর পুনরাবৃত্তি করছেন।" (২৭ ঃ ৬৪)

-অর্থাৎ প্রথম থেকেই গ্যালাক্সিদের সৃষ্টি এবং ধ্বংস আল্লাহ্‌ নিজেই

মাধ্যমে আবিষ্কার করে যে, 'Big Bang' মহাবিস্ফোরণের পর সৃষ্ট গ্যালাক্সিগুলো মহাশূন্যে উড়তে গিয়ে ক্রমান্বয়ে গতির বৃদ্ধির কারণে এক পর্যায়ে সঙ্কুচিত হয়ে অভ্যন্তরীণ সকল সৌরব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আবার সঙ্কোচনের চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ 'অনন্য' (Singularity)-তে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাতীত চাপে এবং তাপে আবার ভয়ানক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুন করে জগত সৃষ্টি করছে। সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের তুলনাহীন বিকিরণের ঝলক বর্তমান বিজ্ঞানীগণ 'গামা-রে বার্স্ট' (GRBs) নামে চিহ্নিত করেছেন এবং বিভিন্নভাবে তা পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড করে যাচ্ছেন। বিষয়টি বিজ্ঞানী সমাজকে রীতিমত হিমশিম খাইয়ে দিয়েছে। ভয়ে তারা আঁতকে উঠছেন এবং কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠছেন- 'Were are we going? আমাদের গ্যালাক্সিটিও বর্তমানে প্রতি সেকেণ্ড প্রায় ৬০০ কিলোমিটার গতিতে উড়ে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে তা আলোর গতির সমান গতি লাভ করে নির্ঘাত ধ্বংসের মধ্যে হারিয়ে যাবে, তখন সমগ্র গ্যালাক্সিটি মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity-তে) পৌঁছে গিয়ে প্রচণ্ড চাপে ও তাপে শর্ত পূরণ হয়ে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নুতন জগত সৃষ্টি হবে।

সুতরাং মহাবিশ্বের সৃষ্টির পর একই পদ্ধতি অবলম্বনে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ সংগঠন গ্যালাক্সিসমূহের একবার সৃষ্টি ও একবার ধ্বংসের বার বার পুনরাবৃত্তি বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত

ঘটিয়ে চলেছেন, এখানে অন্য কারও একটু নাক গলাবারও কোন সুযোগ নেই, পারবেও না।

"শপথ নক্ষত্রপুঞ্জের (গ্যালাক্সির) যখন ওরা ভেসে বেড়ায় এবং এক পর্যায়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।" *(৫৩ ঃ ১)*

"তিনি-ই সৃষ্টিকে প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর ওর পুনরাবৃত্তি ঘটান, যারা মুমিন ও সৎ তাদেরকে ন্যায় বিচারের সাথে কর্মফল প্রদানের জন্য এবং যারা অবিশ্বাসী, তারা কুফরী করত বলে তাদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।" (১০ ঃ ৪)

-অর্থাৎ মহাবিশ্বের মাঝে গ্যালাক্সিদের একবার সৃষ্টি, আবার ধ্বংস এবং আবার সৃষ্টির এ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ পরকালীন জবাবদিহিতার জন্য নতুন করে বিচারের মাঠ সৃষ্টি করছেন, যাতে করে বিশ্বাসীদেরকে পুরস্কৃত করতে পারেন এবং অবিশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান করতে পারেন। গ্যালাক্সিগুলোর পুনরা বর্তনের মাধ্যমে সেটাই বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তথ্যের মাধ্যমেই প্রমাণিত হচ্ছে এবং বস্তুজগতের প্রায় প্রান্তঃসীমানায় সঙ্কুচিত গ্যালাক্সিই যে Singularity-র কারণে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার নুতন জগত তৈরী হবে, বর্তমানে সে ব্যাপারে বিজ্ঞান কোন দ্বিমত করছে না। এ ব্যাপারে এখন বিজ্ঞানের হাতে অসংখ্য তথ্য ও ছবি প্রমাণস্বরূপ মওজুদ রয়েছে।

বর্তমান চরম উৎকর্ষিত বিজ্ঞানবিশ্ব স্বীকার করছে মানবমণ্ডলী জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করলেও কখন-ই গ্যালাক্সিদের সৃষ্টি এবং ধ্বংসের পুনরাবৃত্তিতে কোন ভূমিকা-ই রাখতে সমর্থ নয়। মহাবিশ্বের অজানা কোন শক্তির উৎস থেকেই তা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

সুতরাং আমাদের এ মহাবিশ্বে বড় সংগঠন গ্যালাক্সিসমূহের লাইফ সাইকেলের ব্যাপারে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে 'আল-কুরআন' যে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান করেছিল, আজকের বিজ্ঞানময় বিশ্বের চরম উৎকর্ষতার পরিবেশেই কেবল তা একশত ভাগ সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে আল্লাহ্ যে এক মহাসত্য পবিত্র সত্তা, কুরআন যে এক মহাসত্য আসমানী গ্রন্থ, সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

"অতএব হে জ্ঞানী সমাজ! আল্লাহ্কে ভয় করে চল, যাতে তোমরা পরিত্রাণ পেতে পার।" (৫ ঃ ১০০)

একমাত্র 'আল্লাহ্‌র' সত্তা ব্যতীত সকল কিছুই ধ্বংসের অধীন

আল্‌-কুরআন

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশেরই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে।" (৬ ঃ ৬৭)

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (৫৭ ঃ ৩)

"তিনিই ছয়টি সময়কালে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের অধীন প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" (৫৭ ঃ ৪)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (৪৬ ঃ ৩)

"(মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর (ধ্বংসের অধীন), অবিনশ্বর কেবলমাত্র তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব।" (৫৫ ঃ ২৬, ২৭)

"সেথায় (জাহান্নামে) তারা স্থায়ী হবে ততদিন, যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন।" (১১ ঃ ১০৭)

"পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেথায় তারা স্থায়ী হবে ততদিন, যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে। যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।" (১১ ঃ ১০৮)

"আর এও যে সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট।"
(৫৩ ঃ ৪২)

বর্তমান অধ্যায়টি আমাদের সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহের মধ্যে অন্যতম। আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বেই একটি বিশেষ দিকের ওপর সামান্য আলোকপাত করতে চাচ্ছি। আর তা হল যে, পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ 'আল্ কুরআনের' বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত আয়াতগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত বোধগম্য হয়ে ওঠেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্' বিজ্ঞানের নামে আবিষ্কৃত বা উদ্ঘাটিত করে মানবমণ্ডলীর জ্ঞানের সীমানায় না পৌঁছান। যে মাত্র আমরা এটা 'সত্য' ঘটনা বা বিষয় হিসেবে অবহিত হতে পারি, আর তখনি পবিত্র আয়াতগুলো আমাদের সামনে প্রকৃত আলোতে ঝল্মল্ করে উঠে, আমরা প্রাণ ভরে স্রষ্টার পবিত্র বাণীর মর্মার্থ উপলব্ধি করে স্বর্গীয় তৃপ্তি আকণ্ঠ ভরে পান করার সৌভাগ্য লাভ করি। আর তখন এতটুকুনও অনুভব করি যে, এ কৃতিত্ব কোন বিজ্ঞানীর নয়, কোন আলেমের নয় কিংবা কোন হুজুরেরও নয়। এর সবটুকুন কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টা একমাত্র 'আল্লাহ্'র। এক বিন্দুও অন্য কারো জন্যই নয় এবং হতেও পারে না।

ওপরে উল্লেখিত পবিত্র সত্তার বাণীসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে মহাবিশ্বের প্রতিপালক মহান 'আল্লাহ্' আমাদেরকে অবহিত করেছেন এ বলে যে, 'প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশেরই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে" (৬ ঃ ৬৭)।

আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্টভাবেই মানব জাতিকে এখানে জানিয়ে দিলেন যে এ মহাবিশ্বের দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুর ব্যাপারেই প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়ার বা বিষয়টি সঠিকভাবে জানার ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে সময় নির্দিষ্ট করা আছে। ঐ নির্দিষ্ট সময়টি আগমন করার পূর্ব মুহূর্তটি পর্যন্ত অন্য কেউ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঠিক ও ন্যায় সংগত 'তথ্য ও তত্ত্ব' কোনটিই লাভ করতে পারে না। আর ঐ সময়ে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রস্থানরত যত মানুষই বিষয়টি নিয়ে ভেবে থাকবে, তারা উল্লেখিত কারণে প্রকৃত সত্যের মুখ দেখতে না পেয়ে যে নেহায়েত নিজেদের আন্দাজ এবং অনুমানের ওপর

ভিত্তি করে বিষয়টির ওপর কাল্পনিক ছবি তৈরী করবে, তা তো একেবারেই স্বাভাবিক। অতএব কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য অমুক কি বলেছেন- তমুক কি বলেছেন, সেটা আমাদের জন্য বড় দলীল হতে পারে না। দলীল হতে হবে 'আল্লাহ্' এবং তাঁর 'রাসূল' (সা) ঐ বিষয়ে কি বক্তব্য পেশ করেছেন তার ওপর এবং ঐ বক্তব্যের আলোকে সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কতটুকুন অগ্রগতি ঘটেছে তার ওপর। এর বাইরে যতই সময় ও সম্পদ ব্যয় করে চেষ্টা করা হোক না কেন তা কখনই সঠিকভাবে লক্ষ্যে পৌঁছুতে সক্ষম হবে না, ইতিমধ্যেই এ জাতীয় বহু প্রমাণ সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে- প্রতিটি বিষয়ের নির্দিষ্ট করা সময়টি যথাবিহিত উপস্থিত হলে তখন বিশ্ব প্রতিপালকের নির্দেশে তাঁর পক্ষ থেকে নেয়া ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই তার সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসবে।

এতে আমাদের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, কোন মানুষই তার সংক্ষিপ্ত এই পার্থিব জীবনের পরিক্রমায় সকল বিষয়েরই সঠিক তথ্যটি পূর্ণমাত্রায় অবহিত হওয়ার মত যোগ্যতা বা ক্ষমতা রাখে না। আর সে কারণে কোন যুগে বা কোন কালে কোন জ্ঞানী-গুণী বা পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব একাধিক বিষয়ে যুগ উপযোগী বক্তব্য তুলে ধরলেও দেখা যাবে তার উপস্থাপিত অধিকাংশ বিষয়ই 'সত্য-সঠিক এবং জ্ঞানপূর্ণ' হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু বিষয় হতাশাব্যঞ্জক বা এমন নিম্নমানের ধারণায় পর্যবসিত যে একই ব্যক্তির উভয় বক্তব্য বলে মনেও স্থান দেয়া যায় না। উক্ত অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে মূল কারণ হলো- মহাবিশ্বের প্রতিপালক তখনো যে বিষয়গুলো অস্পষ্ট ঐ বিষয়গুলোর সঠিক 'জ্ঞান ও তথ্য' কোনটি-ই মানব সমাজের জ্ঞানের চতুর্সীমানায় ছাড় দেননি (রিলিজ করেননি)। ফলে বড় বড় জ্ঞানী, আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্বও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন সাধারণ মানুষের মত মতামত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য এ জন্য কাউকে দোষারোপ করা যায় না বা কেউ নিন্দনীয় হতে পারেন না। অন্ধকারে পথ চলতে এরূপ অবস্থার শিকার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। নিন্দনীয় বা দোষারোপ হবে তখন, যখন কোন বিষয়ে মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্‌র' পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার কারণে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তাঁর পক্ষ থেকে যে কোন পদ্ধতির

মাধ্যমে মানব সমাজকে উক্ত বিষয়ে 'সঠিক জ্ঞান' সরবরাহ করে থাকেন, অথচ মানব সমাজ তা গ্রহণ না করে বরং পূর্বের কাল্পনিক ধ্যান-ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে থাকলে, তখন প্রকৃত সত্যকে গোপন করার অপরাধে তাদেরকে মহান আল্লাহ্‌র সামনে অপরাধী হতে হবে। কুরআনের বাণী কি বলছে দেখুন! "ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হবে, যে আল্লাহর পক্ষ হতে সত্যকে জানতে পারল, অথচ মানুষের নিকট প্রকাশ না করে গোপন করে রেখে দিল।" অতএব কোন বিষয়ে 'আল্লাহ্‌র' পক্ষ থেকে সঠিক জ্ঞান লাভ করা মাত্র তা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নৈতিক দায়িত্বের সাথে সাথে দোষারোপ থেকে বাঁচারও একটা পথ বলতে হবে। এক্ষেত্রে আগত 'জ্ঞানটি' সঠিক কিনা যাচাই করার জন্য গ্রন্থ 'কুরআনের' সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। যদি উভয় বক্তব্য এক ও অভিন্ন হয় তাহলে তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। আর যদি আগত বা আবিষ্কৃত জ্ঞানটি 'কুরআনের' সাথে ভিন্নতা পোষণ করে তাহলে, অবশ্যই 'কুরআনের' পক্ষ অবলম্বন করে আবিষ্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বর্জন করতে হবে। যেহেতু "আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটা এক মহাসাফল্য" (১০ ঃ ৬৪)। অপরদিকে সৃষ্টি জনিত অপরিপক্কতার কারণে মানুষের জ্ঞান এবং তার সার্বিক কাজকর্ম প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল এবং অসম্পূর্ণ।

অধ্যায়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমরা ওপরের আলোচনাকে একটু দীর্ঘায়িত করেছি, যাতে করে পাঠকের প্রাথমিক পর্যায়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্বগুলো নির্মূল হয়ে গিয়ে পরবর্তীতে আগত বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞান সমৃদ্ধ বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম হতে সহজ হয়। এবার দ্বিতীয় বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন। সেখানে বলা হয়েছে– "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত" (৫৭ ঃ ৩)। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাহদেরকে একটি মৌলিক বিষয়ে অবহিত করেছেন এ বলে যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার 'সত্তাই' একমাত্র 'সত্তা', যিনি সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার পূর্বেও 'এক ও একক' 'সত্তা'রূপে বিরাজমান ছিলেন। তখন অন্য কোন 'সত্তা' বা কোন কিছুর অস্তিত্ব বলতে কিছুই ছিল না। আবার তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী এক সময় কালের আবর্তনে তিনি পূর্বের সেই

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (৫৭ ঃ ৩)
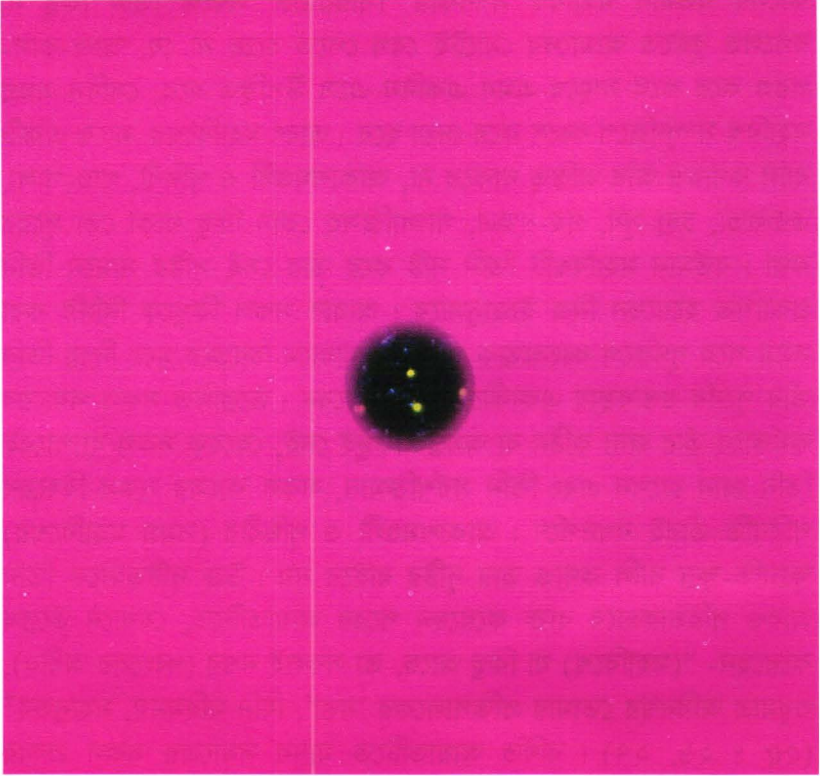
চিত্র-১৩৬

– মূলতঃ চিরন্তন, শাশ্বত ও স্থায়ী 'সত্তা' বলতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তাকেই বুঝায়। মহাবিশ্বটি সৃষ্টির পূর্বে যেমন কেবল মাত্র তাঁর সত্তাই বিরাজমান ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনি একসময় মহাবিশ্বটি ধ্বংস হয়ে গিয়ে কেবল মাত্র তাঁর পবিত্র সত্তাই একক সত্তারূপে বিরাজমান থাকবে। তবে এ কথা একশত ভাগ সত্য যে, মানবীয় এ নগণ্য জ্ঞান দিয়ে আমরা আল্লাহ্র পবিত্র সত্তার আকার, আকৃতি, রং কোন কিছুই কখনই বাস্তবভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব না। দর্শন তো দূরের কথা।

সমগ্র মহাবিশ্বটি আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার মধ্যেই এক জায়গায় সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্র অসীম সত্তার মধ্যে সসীম মহাবিশ্বটি একটি নগণ্য ব্যাপার বৈ কি!

একাকীত্বে ফিরে যাবেন। যখন শুধুমাত্র তাঁর 'এক ও একক' 'সত্তা' ব্যতীত আর কিছুই বিরাজমান থাকবে না। এতে মধ্যবর্তী (Intermediate) সময় কালের বর্তমান মহাবিশ্ব সম্পর্কীয় 'পিরিয়ডটি' সম্বন্ধে তিনি কিছু না বললেও বুঝতে আমাদের মোটেই বেগ পেতে হচ্ছে না যে, আজ-কাল-পরশু করে করে সম্মুখে এমন একদিন এসে উপস্থিত হবে, সেদিন সমগ্র মহাবিশ্ব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হবে। তাবৎ মহাবিশ্বের মাঝে একটি বালি কণারও আর অস্তিত্ব থাকবে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী, গাছ-পালা, তরুলতা, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, গ্যালাক্সিসহ কোন কিছু থাকা তো দূরের কথা। বর্তমান মহাবিশ্বটি তিনি সৃষ্টি করে তাঁর সেই সৃষ্টির সামনে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন নিজ ইচ্ছানুসারে। আবার সকল কিছুকে নির্দিষ্ট করা সময় পরে পূর্ণরূপে ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিরতরে মুছে দিয়ে তিনি তাঁর পূর্বের গুপ্তাবস্থায় একাকীত্বে ফিরে যাবেন। উল্লেখিত সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে তাঁর জন্য কঠিন বা অসম্ভব কিছুই নেই, যেহেতু সকল ব্যাপারেই তিনি জ্ঞান রাখেন এবং তিনি সর্বশক্তিমান, সকল কালের সকল বিষয়ের পরিণতি তাঁরই নখদর্পণে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র বালি কণাও তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি আরও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন পরের আয়াতটিতে, যেখানে উল্লেখ করেছেন- "(মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে, তা সকলই নশ্বর (ধ্বংসের অধীন), শুধুমাত্র অবিনশ্বর তোমার প্রতিপালকের 'সত্তা', যিনি মহিমময়, মহানুভব" (৫৫ ঃ ২৬, ২৭)। বর্ণিত আয়াতটিতে মানব সমাজের সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয় ও অনুমানকে চিরতরে নির্মূল করে দিয়ে মহান স্রষ্টা বিশ্ব প্রতিপালক 'আল্লাহ্' ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, মানব সমাজ যাই ভেবে থাকুক না কেন, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তাঁর এ মহাবিশ্বে, সকল কিছুকেই তিনি একদিন ধ্বংসের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বেন-ই। এটা তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এ পর্যায়ে মানব সমাজে কেউ বা ভাবেন পৃথিবী ধ্বংস হবে, কিন্তু আকাশমণ্ডলী থেকে যাবে, আবার কেউ ভাবেন আকাশ জগত ও পৃথিবী ধ্বংস হবে ঠিকই তবে জান্নাত ও জাহান্নাম ঠিকই থেকে যাবে। যেহেতু কুরআনের অনুবাদে কোথাও কোথাও ঐ জীবনকে স্থায়ী জীবন বলা হয়েছে তাই, আবার কেউ কেউ বলেন-

"তাঁর 'আসন' সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত; রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।" (২ ঃ ২৫৫)
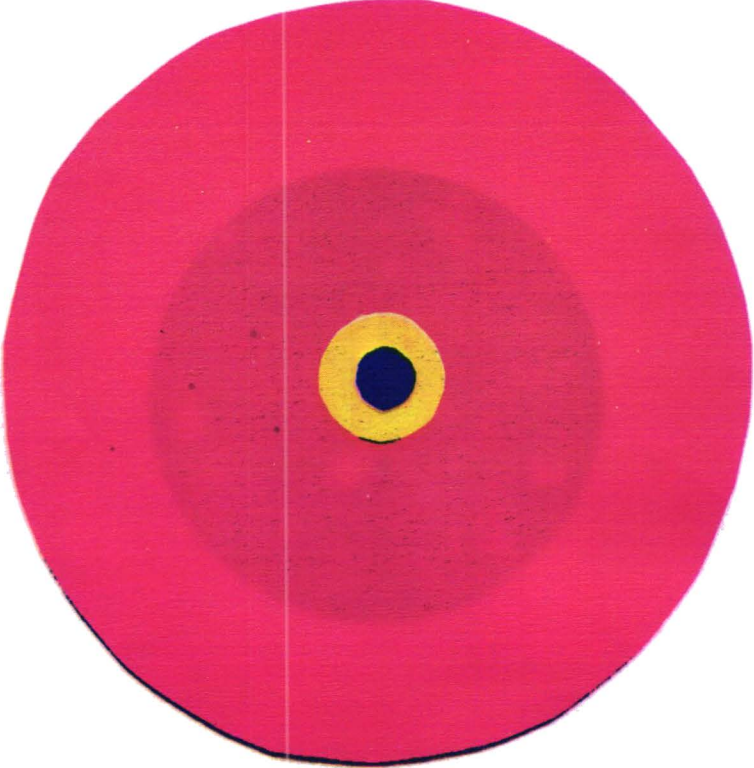
চিত্র–১৩৭

– মহাবিশ্বে যত প্রকার শক্তি-ক্ষমতা আছে, ওদের মূলতঃ উৎস হচ্ছে মৌলিকভাবে আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তাই। যদিও সে সম্পর্কে মানব জাতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবহিত হতে সক্ষম হবে না বিভিন্ন কারণে।

আল্লাহ্‌র সত্তার– 'Basic Energy Field'-এর মধ্যে যে তিনি মহাবিশ্বটি সৃষ্টি করেছেন, তা শুধুমাত্র বুঝাবার জন্যই ওপরের কাল্পনিক ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহ্ সমগ্র মহাবিশ্বটি পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তাঁর আসন সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। বিষয়টি বিশাল সাগরের পানির মধ্যে এক খণ্ড বরফের অবস্থানের মত।

"তিনিই ছয়টি সময়কালে সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন (যার মধ্যে বিরাজমান ইহজগত ও পরজগত), অতঃপর 'আরশের' অধীনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" (৫৭ ঃ ৪)
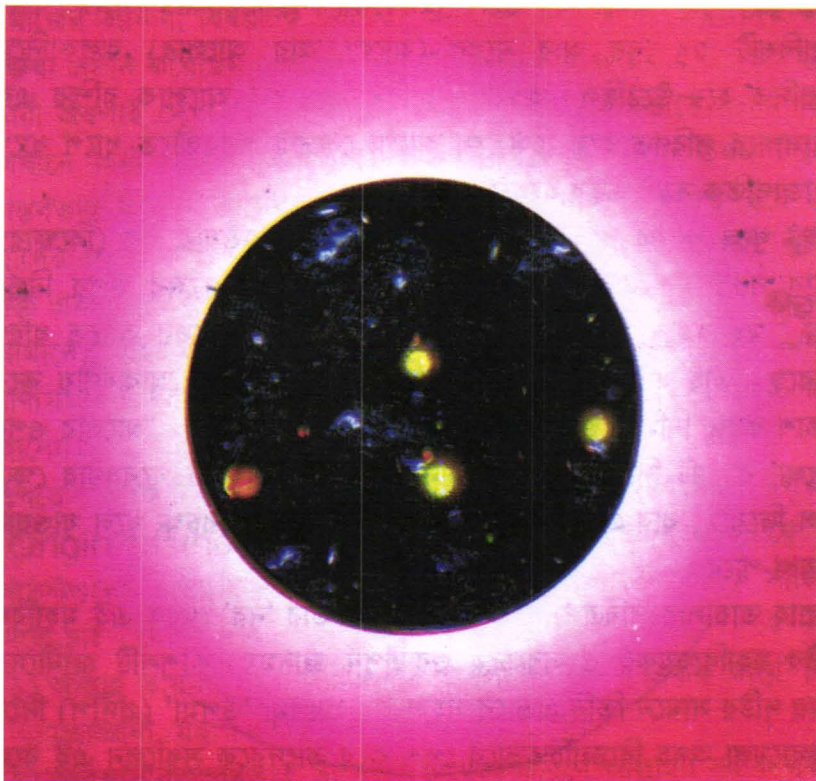
চিত্র-১৩৮

– ওপরের ছবিতে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মহাবিশ্বকে কুরআনের বর্ণনানুযায়ী ইহজগত ও পরজগতকে বিভক্ত করে বিভিন্ন অংশের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

ফলে এক্ষেত্রে বুঝতে সহজ হবে যে, মহান আল্লাহ্‌র নিজ সত্তার মুকাবিলায় তাঁর সৃষ্ট মহাবিশ্বটি এত নগণ্য ব্যাপার যে সমগ্র মহাবিশ্বটি এক সময় ধ্বংস হয়ে গেলেও তাঁর পবিত্র সত্তার তাতে কিছু যায় আসে না। মহাবিশ্ব ধ্বংসের পরেও তাঁর পবিত্র সত্তা অবিকল পূর্বের ন্যায়ই বিরাজমান থাকবে। মানবীয় নগণ্য জ্ঞানে বিষয়টি ব্যাপক বিস্ময়কর মনে হলেও আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান বিধায় তাঁর নিকট এটা কোন ব্যাপারই না। এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তো তাঁর হাতেই। তাই যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা তিনি তা করতে পূর্ণরূপে সক্ষম।

"আর এই যে, সমস্ত কিছুর (সমগ্র মহাবিশ্বও তার সমস্ত বস্তু এবং শক্তির) সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট (থেকেই ঘটবে তাঁরই নির্দেশে) ।" (৫৩ ঃ ৪২)

চিত্র–১৩৯

– সমগ্র মহাবিশ্বের ধ্বংসের ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্থিরিকৃত নির্ধারিত সময়টির আগমন ঘটলে, তাঁর একটি মাত্র আদেশ 'ধ্বংস হও' ঘোষিত হওয়া মাত্র সমগ্র মহাবিশ্বটি চোখের পলকের চাইতেও দ্রুততর সময়ে ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র সত্তার ভিতর মহাবিশ্ব এবং এর ভেতর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এ সময় তার সব কিছুই ধ্বংস সাধন ঘটবে। ইহজগত ও পরজগত কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বিরাজমান থাকবেন এক ও একক মহান 'আল্লাহ্'। সুবহানাল্লাহ্।

"সমগ্র মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংসশীল, অবিনশ্বর কেবল মাত্র তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমান্বিত, মহানুভব।" (৫৫ : ২৬, ২৭)
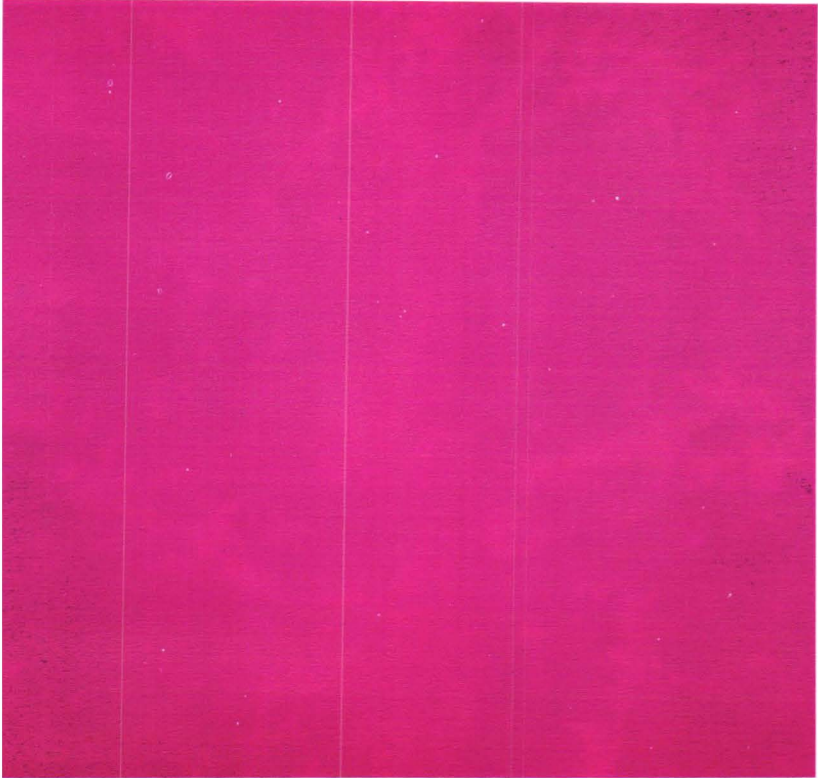
চিত্র-১৪০

– মহান আল্লাহ্ তাঁর মহাজ্ঞান ও মহাশক্তি ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য যে মহাবিশ্ব এবং তার ভেতর যে বস্তু, প্রাণ ও শক্তি সৃষ্টি করে ছিলেন, এক সময় তাঁর ইচ্ছায় আবার এর তিনি ধ্বংস সাধন ঘটিয়ে সকল কিছুর অস্তিত্ব বিলীন করে দেবেন। তখন শুধুমাত্র তাঁর পবিত্র সত্তাই অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান থাকবে। মানুষ বিষয়টি অবগত হতে সক্ষম হোক কিংবা না হোক, তখন আল্লাহ্র অতুলনীয় ও বর্ণনাতীত 'পবিত্র সত্তা' ব্যতীত কোন প্রকার মহাসূক্ষ্ম কণিকা কিংবা আলোর অস্তিত্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আদিতে আল্লাহর পবিত্র সত্তার যে এক ও একক অবস্থা ছিল আবার সে অবস্থা বিরাজমান হবে। সুবহানাল্লাহ্।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং জান্নাত ও জাহান্নামসহ সকল কিছুই ধ্বংস হবে তবে আল্লাহ্‌র 'আর্‌শ' বহনকারী সম্মানিত আট জন ফিরিশতা ধ্বংস হবেন না। আসলে যারা যারা এরূপ ভাবেন- তারা কেন জানি পরের দৃঢ় ও মজবুত আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করেন না। আল্লাহ্‌ পাক ভাল করেই জানেন মানুষ প্রথম আয়াতটির নানা ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে এবং নিজেদের মধ্যে বিশৃংখলার সুযোগ পাবে, তাই তিনি প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করলেন দ্বিতীয় আয়াতে। এখানে মানব সমাজের সকল আন্দাজ-অনুমান এবং ধারণার সকল প্রকার ভিত্তিকে মুছে দিয়ে জানিয়ে দিলেন- "শুধুমাত্র অবিনশ্বর তোমার প্রতিপালকের 'সত্তা' যিনি মহিমময়, মহানুভব।" এখানে স্পষ্ট করে বলে দিলেন ঐ সময় মহান 'আল্লাহ্‌র' সত্তা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, সবই অস্তিত্ব থেকে মিটিয়ে দেয়া হবে, যেরূপ তাদের সৃষ্টি করার পূর্বে তাদের অস্তিত্ব ছিল না। আমাদের সমাজে আমরা প্রায় সবাই একটি ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা ধারায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি। আর তা হচ্ছে- আমাদের জীবনময় গ্রহ সুন্দর এ 'পৃথিবীর কিয়ামাত বা ধ্বংস সাধন' এবং সমগ্র 'মহাবিশ্বের ধ্বংস সাধন'কে আমরা এক করে ফেলেছি। দু'টি আলাদা বৈশিষ্ট্যের 'মহাপ্রলয়কে' এক স্থানে একাকার করে মিশিয়ে ফেললে যা হবার ছিল এখন সম্ভবতঃ তাই হয়েছে! তাই জ্ঞানীজনদেরও প্রশ্ন করে দেখেছি তাঁরা একটি আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হলেও আবার প্রায় একই পর্যায়ের অপর একটি আয়াতের ব্যাখ্যার বেলায় নিজেদের অপরাগতা মিনতির সাথেই পেশ করেছেন। এর কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমাদের স্থানীয় 'কিয়ামাত বা মহাপ্রলয়কে' এক জায়গায় রেখে এবং সমগ্র 'মহাবিশ্বের মহাধ্বংস'কে আর এক জায়গায় রেখে যদি আমরা পবিত্র 'কুরআনের' বাণীসমূহকে অনুধাবন করার চেষ্টা করতাম তাহলে হয়তোবা আমাদের মাঝে এ জাতীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ হতো না। ওপরে উদ্ধৃত বাণীর (৫৫ ঃ ২৬, ২৭) দাবী অনুযায়ী ঐ সময় একমাত্র মহান 'আল্লাহ'র অস্তিত্ব ছাড়া যদি আর কিছুই না থাকে, তাহলে ফিরিশতাকুল এবং জান্নাত-জাহান্নামও যে তখন থাকবে না, সব নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে সে কথা তো দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। এ কথাতো আমরা সবাই জানি বিশ্বাসী সম্প্রদায় হিসেবে যে, এ

মহাবিশ্বের একমাত্র প্রতিপালক হচ্ছেন মহান 'আল্লাহ্' । তাঁর পবিত্র বাণীর ওপরে কথা বলার ইখ্তিয়ার সমগ্র বিশ্ব-জাহানে কারও নেই এবং তাঁর পবিত্র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, যা চিরন্তন-শাশ্বত ও কালজয়ী । এতটুকুন অবহিত হওয়ার পর কয়েকজন মুখলেছ আল্লাহ্র বান্দাহ্ তাঁদের 'তাফসীরে' বিনয়ের সাথেই উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা বিষয়টির প্রকৃত রহস্য এখনও উপলব্ধি করতে পারছেন না । আল্লাহ্-ই এ ব্যাপারে ভালো জানেন । তাঁরা দেখিয়েছেন এভাবে যে একটি আয়াতে বলা হয়েছে "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত ।" (৫৭ ঃ ৩)

আরেক আয়াতে বলা হয়েছে- "তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে ।" (৯৮ ঃ ৮)

আবার অন্যত্র বলা হয়েছে– "(মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর (ধ্বংসের অধীন) অবিনশ্বর কেবলমাত্র তোমার প্রতিপালকের 'সত্তা', যিনি মহিমময়, মহানুভব ।" (৫৫ ঃ ২৬, ২৭)

তাঁদের কথা মত এই যে একদিকে পরকালের ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ জান্নাত-জাহান্নাম স্থায়ী বলা হয়েছে এবং অপর দিকে বলা হয়েছে সমগ্র মহাবিশ্বই সকল কিছুসহ ধ্বংসের অধীন এবং মহান আল্লাহ্র পবিত্র 'সত্তা' ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না, তাতে তো জান্নাত-জাহান্নামও না থাকারই কথা, এ অবস্থার তারা কোন সুরাহা করতে না পেরে তাঁদের লেখায় চুপ থাকার পথ অবলম্বন করেছেন । আমার মনে হয় তাঁদের গৃহীত এই পদ্ধতিটি সঠিক ও যথার্থ হয়েছে যা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে । এর বাইরে যে বক্তব্যগুলো বলিষ্ঠভাবে পেশ করতে গিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে, তা নিঃসন্দেহে আপত্তিকরই বটে । তবে গবেষণায়রত জ্ঞানীদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি 'আল্লাহ্ তা'আলা' ক্ষমা করবেন সে ঘোষণা তিনি দিয়েছেন । তা না হলে ইসলামে গবেষণার দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে যে । ওপরে উল্লেখিত উদাহরণস্বরূপ আয়াত ৩টির মধ্যে যে বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়েছে এখন আমরা তা নিরসনের চেষ্টা করবো ইন্শাআল্লাহ্ ।

চলতি অধ্যায়ে আমরা পূর্বেই আলোচনায় পেয়েছি যে মহাবিশ্বে প্রতিটি বিষয়ে সঠিক 'তথ্য ও তত্ত্ব' অবহিত হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ঐ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে গোটা মানব সমাজ যৌথভাবে চেষ্টা-সাধনা করেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হওয়ার মত অবস্থা লাভ করতে পারে না। যখন তিনি যতটুকুন ছাড় দেন তখনই আমরা ঠিক ততটুকুনই কেবল এগিয়ে যেতে পারি। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক তথ্য উদঘাটিত হওয়ায় চলতি বিষয়েও আমরা আশা করছি বেশ অগ্রসর হয়ে সঠিক তথ্য অবহিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবো ইন্‌শাআল্লাহ্।

ওপরে উল্লেখিত ৩টি আয়াতের বক্তব্যে পরস্পর বিপরীত যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছে, তার একটি হচ্ছে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে সর্বত্র একমাত্র 'আল্লাহ্'র অস্তিত্বই বিরাজমান ছিল এবং অন্য কোন কিছুর বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমান মহাবিশ্বটি তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা ও পরিকল্পনায়। ভবিষ্যতে তিনি একটি নির্দিষ্ট করা সময়ে সমগ্র মহাবিশ্বকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। তখন আবার তিনি 'এক ও একক' সত্তা হিসেবে বিরাজমান থাকবেন। অন্য কোন কিছুরই তখন আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। দ্বিতীয় যে ধারণাটি আমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা হলো– এ পার্থিব জীবনে যারা স্রষ্টার গোলামীর মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করবে তারা পরকালে পুরস্কারস্বরূপ স্থায়ী 'জান্নাত' লাভ করবে (যেখানে অনন্ত জীবন)। অর্থাৎ একদিকে বলা হচ্ছে- আল্লাহ্র 'সত্তা' ব্যতীত সবই ক্ষণস্থায়ী, আবার অপরদিকে বলা হচ্ছে- 'জান্নাত' ও 'জাহান্নাম' স্থায়ী।

আপনি হয়তো জানেন আল্লাহ্র বাণীকে কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে অতীতে যেমনি পারেনি, ঠিক তেমনি বর্তমানেও পারবে না, ভবিষ্যতে তো প্রশ্নই আসে না। এটা আল্লাহ্র কালামের এক বড় মুজেযা। উল্লেখিত প্রথম ধারণায় যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা মানব জ্ঞানে বুঝতে কষ্ট হলেও পূর্ণ মাত্রায় 'সত্য এবং সঠিক'। শুরুতে তিনি একা ছিলেন আবার সমাপনীতে তিনি একাই থাকবেন। প্রথমে যেমন তাঁর কোন সৃষ্টি, সহযোগী, সাথী,

প্রতিদ্বন্দ্বী কিছুই ছিল না, তেমনি আবার এক সময় আসবে, যখন সকল কিছু ধ্বংস করে দেয়ার কারণে তিনি একাই বিরাজমান থাকবেন। তবে 'পৃথিবী ধ্বংসের' সাথেই সব ধ্বংস হয়ে যাবে না, (যদিও বর্তমান সমাজের প্রায় সবাই বিপরীত মনে করেন)। পৃথিবীর 'কিয়ামাত' বা 'মহাধ্বংস' এবং সমগ্র 'মহাবিশ্বকে মহাপ্রলয়ের' মাধ্যমে ধ্বংস করা এক বিষয় নয়। পৃথিবীর ধ্বংসকে আমরা স্থানীয় বা 'আংশিক ধ্বংস' বলতে পারি এবং মহাবিশ্বের 'ধ্বংস'কে পরিপূর্ণ 'ধ্বংস সাধন' বলতে পারি। তাহলে উদ্ভূত সমস্যা আমাদের কেটে যাবে। 'কিয়ামাতে'র অধ্যায়ে (সিরিজ-২-তে) আমরা জানতে পেরেছি যে, পৃথিবীর কিয়ামাতের সময় আমাদের সৌরজগত কিংবা বেশীর থেকে বেশী আমাদের ৩০,০০০ কোটি প্রায় নক্ষত্র নিয়ে গঠিত 'মিলকি ওয়ে গ্যালাক্সিটি' ধ্বংসের তাণ্ডবে পতিত হয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মহাবিশ্বের বাকী প্রায় ১০,০০০ কোটি অনুরূপ গ্যালাক্সি ধ্বংস তো দূরের কথা বরং ওরা কোন খবরই পাবে না মহাবিশ্বের বিশালত্বের কারণে। যেমন আমাদের অবস্থান থেকে আমরা অন্য কোন জগত ধ্বংসের তেমন কোন খবর-ই পাই না। সুতরাং মহাবিশ্বে কোটি কোটি জগতের মধ্যে আমাদের পৃথিবীর ন্যায় মাত্র একটি জগতের সাথে সাথে সমগ্র মহাবিশ্বটিও ধ্বংস হবে না। সমগ্র মহাবিশ্ব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরবর্তী কোন এক নির্দিষ্ট করা সময়ে পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে সকল কিছুর অস্তিত্বকে মুছে দিবে, তখন সবর্ত্র আবার এক ও একক 'সত্তা' হিসেবে মহান 'আল্লাহ্‌'র 'সত্তা'ই বিরাজিত থাকবে। এখানে 'বহু জগত' সম্পর্কে পাঠকের মানসিক প্রশান্তির নিমিত্তে এতটুকুন বলে রাখতে চাই যে, মহান আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা এ বিষয়ে স্পষ্ট করে অনেক কথাই কুরআনে পেশ করেছেন। যার দু' একটি এখানে পাঠকের উৎসুক্য কমাবার জন্য তুলে ধরছি- "তাঁর অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) সৃষ্টি এবং এ দু'য়ের মধ্যে (সমগ্র মহাবিশ্বে) তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়ায়ে দিয়েছেন, সেগুলো, তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।" (৪২ ঃ ৪৯)

এখানে স্পষ্ট করেই আল্লাহ্‌ পাক মানব জাতিকে শুনিয়ে দিলেন যে,

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী অর্থাৎ সমগ্র মহাবিশ্বে তিনি জীব-জন্তু তথা প্রাণ ছড়িয়ে দিয়েছেন। মানুষ তা চোখে দেখে বিশ্বাস করতে হবে, নতুবা তা বিশ্বাস করবে না, আল্লাহ্ এমন বাধ্যবাধকতার বহু ঊর্ধ্বে। তিনি কারও ধার ধারেন না। স্রষ্টা তাঁর এক সৃষ্টিকে বিষয়টি অবহিত করেছেন। এটাই সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। এর চেয়ে বেশী কিছু করে সরাসরি অন্য প্রাণময় জগত দেখিয়ে দিলে পৃথিবী পৃষ্ঠে মানুষের পরীক্ষার জন্য রচিত সকল ব্যবস্থাপনাই ব্যাহত হয়ে যাবে, মানুষের 'পরীক্ষার' উদ্দেশ্যই চরমভাবে বিপর্যস্ত হবে। সম্ভবতঃ দু'টি জীবনময় সৌরজগত যাতে পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারে সে কারণেই একটি তারকা (নক্ষত্র) থেকে অন্য একটি তারকা (নক্ষত্র) বহু দূরে স্থাপন করা হয়েছে (গড়ে প্রায় ৫ আলোকবর্ষ দূরত্বে)। যাতে করে বর্তমান প্রযুক্তির রকেটে চড়ে ভ্রমণ করলেও শত শত বৎসরেও কেউ কারও স্থানে পৌঁছুতে না পারে। আর তাহলেই পরীক্ষাটা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলা যাবে। উল্লেখিত আয়াতের শেষের দিকে আল্লাহ্ তা'আলা আরও জানিয়ে দিলেন যে, এ বিরাট মহাবিশ্বে তিনি সর্বত্র প্রাণ ছড়িয়ে যে দিয়েছেন, ওদের আবার যথাসময়ে ফিরিয়ে আনা তাঁর জন্য মোটেই কোন ব্যাপার না। সবই তাঁর নখদর্পণে। আপনি শুনে আরও অবাক হবেন যে ওদের প্রত্যেকটি জগতের জন্যই নির্ধারিত আছে নির্দিষ্ট সময়, যার সামান্যও নড়-চড় হবে না। মহা বাণীতে দেখুন কিভাবে বলা হয়েছে- "সকলের জন্য নির্ধারিত আছে তাদের বিচার দিবস।" (৪৪ ঃ ৪০)।

বহু জগত সম্পর্কে আরও একটু ধারণা দেই। দেখুন আমাদের এ পৃথিবী একটি মাত্র সূর্যের আওতাধীন। অর্থাৎ একটি সৌরপরিবারের সদস্য। আমরা যে গ্যালাক্সিতে অবস্থান করছি তাতে প্রায় ৩০,০০০ কোটি অনুরূপ সূর্য বা নক্ষত্র আছে। আবার সমগ্র মহাবিশ্বে বর্তমান প্রযুক্তি দিয়ে যতটুকুন দর্শন লাভ করা সম্ভব হচ্ছে তাতে প্রায় ১০,০০০ কোটির ওপরে গ্যালাক্সি উড়তে দেখা যাচ্ছে। এখন আমরাই যদি একমাত্র জীবনময় জগতের দাবী তুলি, তাহলে সৃষ্ট ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি এবং প্রতিটি গ্যালাক্সিতে আবার প্রায় গড়ে ৩০,০০০ কোটির ওপরে নক্ষত্র সৃষ্টি সবই কি বৃথা বা

অযথা সৃষ্টি? আমাদের সুস্থ বিবেক বিষয়টি মেনে নিতে পারছে না। মহাবিশ্বের স্রষ্টা এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে- "আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং তাদের মধ্যে কোন কিছুই খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি, আমি এ দুইটি অযথা সৃষ্টি করিনি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না।" (৪৪ ঃ ৩৮, ৩৯)

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং তাদের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি করিনি।" (১৫ ঃ ৮৫)

সুতরাং একটি জীবনময় পৃথিবী নিয়ে তৃপ্তি পাওয়ার তুলনায় বহু জগতের তৃপ্তি পাওয়া অধিকতর শ্রেয়, যেহেতু এটাই 'সত্য' এবং এটাই 'বাস্তব'। আকাশ জগতের ব্যবস্থাপনার দিকে তাকালেই আমাদের পৃথিবী যে অনন্য (Unique) তা তিরোরিত হয়ে যায়, বরং অনুরূপ কোটি কোটি জীবনময় জগত থাকাই যুক্তিযুক্ত বলে সার্বিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় (বহু জগতের এতটুকুন ধারণা দেয়ার পরে আমরা বাকী বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থাপন করবো ইন্‌শাআল্লাহ্)। ওপরের সংক্ষিপ্ত অথচ 'কুরআনে'র দৃষ্টিভঙ্গিতে তথ্যবহুল 'বহুজগত' সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেছি, তাতে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে পৃথিবীর 'কিয়ামাত' সংঘটিত হওয়ার সময় সমগ্র মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে না। অগণিত, অসংখ্য জগতের মধ্যে তখন একটি বা একাধিক জগতের ধ্বংস সাধন ঘটবে মাত্র, সমগ্র 'মহাবিশ্বের' নয়। সমগ্র 'মহাবিশ্বের' মহাপ্রলয় যখন ঘটবে তখন কোন গ্যালাক্সি, কোন সৌরপরিবার কিংবা কোন কিছুরই আর অস্তিত্ব থাকবে না। এমনকি সকল অণু-পরমাণুসহ সকল প্রকার বস্তু ও শক্তি কণিকাও অবশিষ্ট থাকবে না। সবাই মহাধ্বংসের মধ্যে পড়ে গিয়ে চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে। পরিশেষে অবশিষ্ট থেকে যাবেন মহামহিম, মহানুভব, মহান স্রষ্টা, একমাত্র পবিত্র সত্তা 'আল্লাহ্' সুব্‌হানাহু তা'আলা। মহাবিশ্বলোক সৃষ্টির পূর্বে তিনি যে অবস্থায় ছিলেন আবার পুনরায় সেই একাকী অবস্থায় ফিরে যাবেন স্বসম্মানে, সগৌরবে। "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত" (৫৭ ঃ ৩) সেদিন প্রকৃত বাস্তবে রূপ নেবে।

অতএব প্রথম ধারণার সমাপ্তি লাইনে পৌঁছার পূর্বে জ্ঞানরাজ্যে যে মূল কথাটি গেড়ে বসাতে হবে- তা হলো 'মহাধ্বংস' দু'পর্যায়ে ঘটবে, যার এক পর্যায়ের 'ধ্বংস' হচ্ছে- স্রষ্টার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ে 'জীবনময় জগৎগুলোর' পর-পর ধ্বংস সাধন ঘটা এবং অপর 'ধ্বংস'টি হচ্ছে বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও চূড়ান্ত সময়ে এক 'মহাধ্বংসীয়' আয়োজনের মাধ্যমে গোটা 'মহাবিশ্ব'টাকেই (Universe) চিরতরে অস্তিত্ব থেকে মিটিয়ে দেয়া। যে মহাধ্বংসের পরে কেবলমাত্র এক ও একক সত্তা 'আল্লাহ্'র অস্তিত্বই শুধু টিকে থাকবে, সুব্হানাল্লাহ্।

এবার, দ্বিতীয় যে ধারণা দেয়া হয়েছে- তা হচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠে আগত মানব সমাজের জন্য পরকালীন জীবন হবে স্থায়ী। অর্থাৎ যারা মহান স্রষ্টার নির্দেশ মেনে জীবন অতিবাহিত করায় পুরস্কারস্বরূপ 'জান্নাতে' যাবে, তারা সেখানে অনন্ত জীবন লাভ করবে, তাদের জীবন সেখানে স্থায়ী হবে। আবার যারা স্রষ্টার নির্দেশ অমান্য করে পৃথিবীতে বিদ্রোহিতামূলক জীবন যাপন করেছে, তারা তাদের এই বিরুদ্ধাচরণের শাস্তিস্বরূপ অগ্নিময় 'জাহান্নামে' প্রবেশ করবে। সেখানে তারাও অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ স্থায়ী এক জীবনে প্রবেশ করবে। এখানে প্রশ্ন যা সৃষ্টি হয় তা হলো বিশ্ব-প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তা'আলা যদি এক সময় সমগ্র মহাবিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়ার সিদ্ধান্ত করে থাকেন, তাহলে একমাত্র তাঁর অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই না থাকার পরিবেশে জান্নাত-জাহান্নাম স্থায়ী হয় কিভাবে? নিঃসন্দেহে বিষয়টি মানব সমাজের অধিকাংশ সচেতন মানুষকে যে বিব্রতকর অবস্থায় নিক্ষেপ করে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেহেতু পৃথিবীর জীবন পরীক্ষামূলক তাই স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টির জন্য প্রশ্ন পত্রকে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, ওলোট-পালট করে পরীক্ষার্থীর সামনে পেশ করা এবং পরীক্ষার্থীকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে নিয়ে যাওয়া কোন প্রকার দোষের নয় বলে (বরং অধিকতর যুক্তিযুক্ত বিধায়) সর্বত্র স্বীকৃত, তাই এ ক্ষেত্রেও আমরা পরীক্ষার্থী হিসেবে না ঘাবড়িয়ে বরং বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে স্রষ্টার পক্ষ থেকে আগত প্রশ্নের সঠিক উত্তর তালাশ করে এবং সে মতে নিজেদের ধ্যান-ধারণা শুধরিয়ে নিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। ইন্শাআল্লাহ্ আমরা এ ব্যাপারে সফল হবো।

আপনি বহু বার হয়তোবা শুনে থাকবেন যে, দীর্ঘ পথ চলতে গিয়ে সাধারণতঃ মানুষের মাঝে অনেকেই বলে থাকেন- 'এ কোন্ পথে চলতে শুরু করেছি, যে পথের কোন শেষ নেই!' আপনি নিজেও হয়তো কখনও এরূপ বলে থাকবেন অসম্ভব লম্বা দূরত্বের পথ চলতে গিয়ে। আর এটুকুন বলা ঐ অবস্থায় মোটেই অযৌক্তিক নয় বরং যৌক্তিক। এখন যদি আমরা ঐ বাক্যটিকে পর্যালোচনায় নিয়ে আসি, তাহলে কি দেখতে পাবো? আসলেই কি পথের শেষ প্রান্ত অসীম দূরত্বের স্কেলে গিয়ে চিরদিনের জন্যই কি হারিয়ে গেছে? না-কি লম্বা দূরত্বের কারণে পথের প্রান্তের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, অথচ এক পর্যায়ে নিশ্চয় পথের শেষপ্রান্ত দৃষ্টিগোচর হবেই? অবশ্যই প্রতিটি পথের প্রান্তঃসীমানা বলে একটি কথা বা অবস্থা আছেই, যা সুস্থ বিবেকবান বলতেই স্বীকার করবেন। 'পথটি অনন্ত লম্বা বা সীমাহীন, প্রান্তহীন' বলতেই কিন্তু তা বাস্তবে ঐরূপ হয়ে যায় না। বাস্তবে তা যথাস্থানেই থাকে।

আবার দেখুন, আপনার বাড়ী মনে করুন ঢাকার 'সোনার গাঁও' এলাকায়। এখন যদি কেউ আপনাকে প্রশ্ন করে 'ভাই আপনার 'স্থায়ী' ঠিকানা কোথায়?' নিশ্চয় আপনি উত্তরে বলবেন- 'রাজধানী ঢাকার 'সোনার গাঁও'। এখন যদি প্রশ্নকর্তা আবার প্রশ্ন করেন- 'আপনার পূর্ব পুরুষ আনুমানিক কত বৎসর থেকে ঐ এলাকায় বসবাস করছেন?' উত্তরে হয়তো বলবেন- '১০০ বৎসর কিংবা ২০০ বৎসর'। এখন একটু গভীরভাবে বিষয়টি ভেবে দেখুন, মাত্র ১০০ বৎসর কিংবা ২০০ বৎসর একটি স্থানে বসবাস করার কারণে যদি ঐ এলাকাটি আপনার স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে গ্রাম-গঞ্জে, শহরে, সমগ্র দেশে এমনকি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে, কোথাও কেউ আপত্তি না তোলে বরং মাথা পেতে মেনে নেয়, তাহলে সেই মানব সমাজই কোটি, কোটি, কোটি, কোটি বৎসর ধরে 'জান্নাতে' অথবা 'জাহান্নামে' থাকার পরও কেন ঐ সময়কে 'স্থায়ী' বলা যাবে না? এর কি কোন যুক্তি আছে? পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বৎসর, পরকালের মাত্র একটি দিনের সমান, তাহলে পরকালের সময়ের স্কেলের দৈর্ঘ্য এমনিতেই কোটি-কোটি গুন বৃদ্ধি পাওয়ার পর আবার সেখানে মানুষ অবস্থান করবে অনন্তকাল, যার মনে

"তিনি তোমাদিগকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখায়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?" (৪ : ৮১)
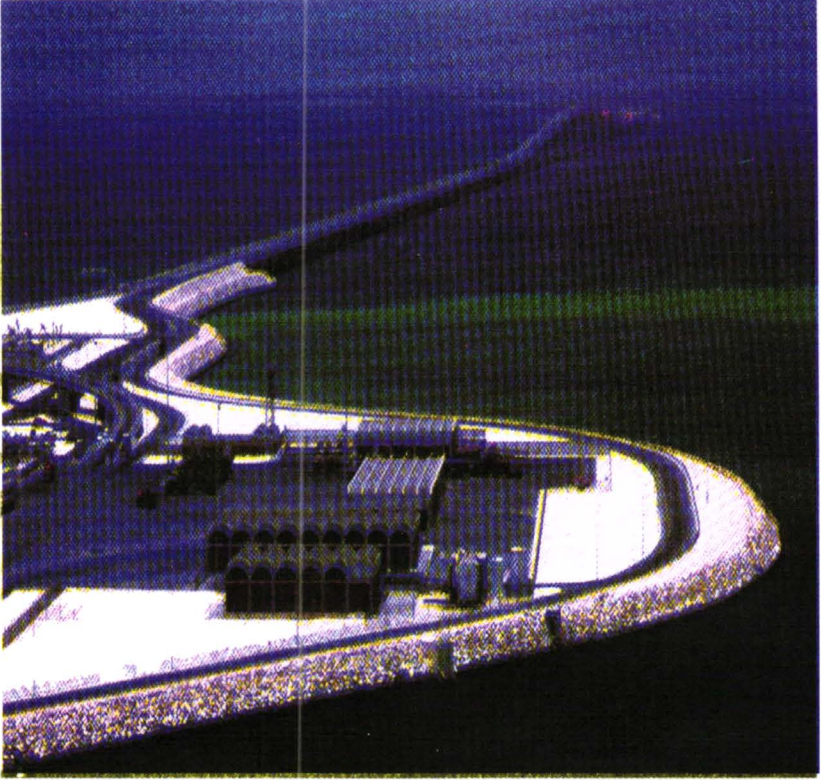
চিত্র-১৪১

– মানুষ তার দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে কখনো কখনো অস্বাভাবিক লম্বা দূরত্ব পথ হেঁটে হেঁটে অতিক্রম করে থাকে। আর তখন অনুমান বহির্ভূত ঐ পথ চলতে গিয়ে বলে থাকে এ কোন পথে চলেছি, যে পথের কোন শেষ নেই।

বস্তুতঃ লম্বা দূরত্বের কারণে পথিকের এ ধরনের উক্তিতে কিন্তু বাস্তবে ঐ পথটি কখনই প্রান্তহীন হয়ে যায় না। যতই লম্বা হোক পথটি, এক সময় কিন্তু তার শেষ অবশ্যই আছে। এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য কথা।

অনুরূপভাবে কুরআনের দাবী অনুযায়ী পরকালেরও এক পর্যায়ে সমাপ্তি আছে। ভাবতে এবং মানতে মানব সমাজ যতই অস্বীকার করুক না কেন!

হবে কোন শেষ নেই ঐ লম্বা পথ চলা পথিকের ন্যায়, কিন্তু নিরেট বাস্তবতার কারণে 'জান্নাত-জাহান্নামেরও' এক পর্যায়ে শেষ আছে। ঐ শেষ মুহূর্তটি বহু-বহু-বহু দূরে বিধায় সর্বত্র এর ছবি আঁকা হয়েছে 'স্থায়ী' শব্দ দিয়ে। সম্ভবতঃ বিশ্ব প্রতিপালক তাঁর কৃত ওয়াদা পূরণ করতে গিয়েই পরকালের সময়ের স্কেলকে ধারণাতীত দৈর্ঘ্যে লম্বা করে থাকবেন। তিনি তাঁর 'সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' মানুষের নিকট ওয়াদা করেছেন যে, যারা তাঁকে না দেখেও বিশ্বাস করবে এবং তাঁর আদেশ পুরোপুরি মেনে চলবে, তিনি তাদেরকে বিনিময়ে পরকালে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তার বদলা অগণিত-অসংখ্য পরিমাণে দান করবেন। আবার যারা তাঁকে অস্বীকার করে ভ্রান্তির মধ্যে তলিয়ে যাবে তাদেরকেও অনন্ত-অসীম আযাব বা শাস্তি প্রদান করবেন। পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি পর পরকালের জীবনে সেই অনন্ত-অসীম পুরস্কার বা শাস্তির পরিমাণটা যদি মানবীয় এই ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করা যায় মত অবস্থায় থাকে, তাহলে স্রষ্টার কৃতিত্ব তাতে তেমন একটা ফুটে উঠে না বরং পরিমাণটা তাঁর ওয়াদা মত যদি এত ব্যাপক ও সীমা-পরিসীমাহীন হয় যে মানবীয় জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ের উপলব্ধি দিয়েও তার কোন কূল-কিনারার সন্ধান পাওয়া না যায়, তবেই সেখানে মহান স্রষ্টার মহাকীর্তি পরিস্ফূটিত হয়ে প্রকাশ পায়। বিশ্ব প্রতিপালকের অসংখ্য-অগণিত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে 'শ্রেষ্ঠ' যে সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি তার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তার মহান স্রষ্টার সন্ধান করে তারই কথা মত গোলাম হয়ে অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করবে, বিনিময়ে প্রভু গোলামের প্রতি খুশী হয়ে তাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সম্মান প্রদর্শন করে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন যা স্রষ্টার মর্যাদারই পরিপূরক মাত্র। অতএব মহা পুরস্কারের 'সময় দৈর্ঘ্য' এক দীর্ঘ স্কেলে পরিচালিত হবে বলে ওটাকে স্থায়ী বলা যাবে ঠিকই কিন্তু তাই বলে ওটা চিরস্থায়ী নয়। এ পর্যায়ে এবার মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্'র আসমানী বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন- "সেথায় (জাহান্নামে) তারা স্থায়ী হবে ততদিন, যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন।" (১১ ঃ ১০৭)

আবার পরের আয়াতে বলা হয়েছে “পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেথায় তারা স্থায়ী হবে ততদিন, যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) বিদ্যমান থাকবে। যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।” (১১ঃ ১০৮)

উক্ত দু'টি আয়াতে একেবারে স্পষ্ট করেই বলে দেয়া হয়েছে 'জাহান্নামে' এবং 'জান্নাতে' মানুষ কত দিন থাকবে। অর্থাৎ যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থাকবে তথা আমাদের এই মহাবিশ্বটি থাকবে ততদিন-ই পরকালের স্থায়িত্ব। বিষয়টি আরো খুলে আনলে দাঁড়ায়, আল্লাহ্ পাক সম্ভবতঃ যে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন 'জান্নাত' এবং 'জাহান্নামের' জন্য তার মেয়াদ হচ্ছে আমাদের এ মহাবিশ্বের স্থায়িত্বের মেয়াদের সময় কাল পর্যন্ত। আয়াতের ভাষায় মনে হয় 'আল্লাহ্ তা'আলা' তাঁর যে 'মাষ্টার প্লানে' তিনি মহাবিশ্বটি সৃষ্টি করেছেন তাতে স্বাভাবিক নিয়ম-নীতিতে উক্ত সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে তিনি যদি উক্ত সময়ের ভেতর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে চান তাহলে তিনি তা করার ক্ষমতা রাখেন এবং নতুন সিদ্ধান্তের আলোকেই তখন সকল কিছু পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হবে। এটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব ইখতিয়ার। তিনি যদি অনুরূপ আর কিছু করতে না চান তাহলে স্বাভাবিক গতিতে চলমান পরিকল্পনার-ই আলোকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মহাবিশ্ব ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে জান্নাত-জাহান্নামেরও ধ্বংস সাধন ঘটবে। আমরা পূর্বেই জেনেছি পৃথিবীর বা অন্যান্য প্রাণময় জগতের 'কিয়ামাত' বা ধ্বংসের সাথে 'মহাবিশ্বের ধ্বংসের' কোন সম্পর্ক নেই। দুটি দু' পরিবেশে ভিন্ন-ভিন্ন ঘটনা যা 'কিয়ামাতের' চলতি অধ্যায়ে আমরা অবগত হতে পেরেছি। তাই জীবনময় জগতসমূহের 'কিয়ামাত' সম্পন্ন হয়ে গিয়ে ওদের পৃষ্ঠে বিচরণশীল জবাবদিহিতার শৃংখলে আবদ্ধ প্রাণীকুল 'জান্নাত' এবং 'জাহান্নামে' পৌঁছে প্রায় কোটি, কোটি, কোটি, কোটি বছর (তাও পঞ্চাশ হাজার বছর মাত্র একদিনের সমান এ হিসেবে) পার হয়ে যাওয়ার পর স্রষ্টার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা 'মহাধ্বংসের' ক্ষণটি ঘনিয়ে আসলে মহাবিশ্বে সার্বিক 'মহাপ্রলয়' শুরু হয়ে যাবে। তখন সপ্তাকাশ ও

পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের মাঝে যা কিছু আছে দৃশ্য-অদৃশ্য তার সকল কিছুই নিশ্চিত ধ্বংসের মাধ্যমে চিরতরে মুছে যাবে। যেহেতু 'আল্লাহ্‌র' অস্তিত্বের পরে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সকল কিছুই এ 'সাত আকাশ' (আকাশমণ্ডলী) ও পৃথিবীর মধ্যেই বিরাজিত, তাই ওদের ধ্বংসের তথা মহাবিশ্বের ধ্বংসের সাথে 'সৃষ্ট' বলতে যা বুঝায় তার কোন কিছুই আর অস্তিত্বের রূপ নিয়ে বজায় থাকবে না। ধ্বংসের মহাতাণ্ডবে চিরদিনের জন্য অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। শুধুমাত্র বুঝার জন্য আমরা এখানে একটি উদাহরণ পেশ করতে পারি। মনে করুন একটি আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল খেলার মাঠ। মাঠে খেলা চলছে। খেলা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছেন একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী 'রেফারী'। খেলাটি সম্পূর্ণরূপে শেষ করার তিনি সময় নির্ধারণ করেছেন মনে করুন ৯০ মিনিট। এখন খেলা চলাবস্থায় আমরা দেখতে পাবো, পুরো খেলা শেষ করার পূর্বেই রেফারী তার চূড়ান্ত ক্ষমতাকে ব্যবহার করে মাঝে মাঝে 'লাল কার্ড' (Red card) দেখিয়ে অনেক খেলোয়াড়ের খেলা শেষ করে দিচ্ছেন। ফলে তারা এক এক করে খেলার মাঠের দৃশ্য থেকে মুছে যাচ্ছেন। দর্শকগণ আর তাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না। এরপর এক সময় দেখা যাবে পুরো খেলার দৃশ্য ভংগ করার নির্দিষ্ট সময়টি আগমন করা মাত্র 'রেফারী' তার হুইসেল বাজিয়ে একেবারে পুরো খেলার মাঠটিকে এবং দর্শকপূর্ণ গ্যালারীকে বিশৃংখল পরিবেশে নিক্ষেপ করে খেলার দৃশ্য ও দর্শকদের একাকার করে ক্রমান্বয়ে মুছে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আমরা যদি আমাদের মহাবিশ্বটিকে (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে) খেলার মাঠ মনে করি এবং জীবনময় জগতগুলোকে ওতে খেলোয়াড় হিসেবে চিহ্নিত করি, আর 'আল্লাহ্ সুবহ-ানাহু তা'আলাকে' সর্বময় ক্ষমতাধারী রেফারী (বাস্তবেও তিনি পরাক্রমশালী) হিসেবে দেখতে চাই, তাহলে খুব সহজভাবেই দেখতে পাবো যে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে মহাবিশ্ব থেকে জীবনময় জগত তাদের স্থানীয় 'কিয়ামাত' বা ধ্বংসের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে এবং বহু পরে তাঁর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা মহাধ্বংসের মুহূর্তটি আগমন করা মাত্র গোটা 'মহাবিশ্ব'কে মহাপ্রলয়ের পরিবেশে নিক্ষেপ করে চূড়ান্তরূপে

খেলার মাঠের মত মুছে দিয়ে একেবারে অস্তিত্বহীন করে দিয়েছেন। আশা করছি বিষয়টি এবার সহজভাবেই বোধগম্যের সীমায় আগমন করেছে। এ ক্ষেত্রে অনেকেই বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা' মহাবিশ্ব ধ্বংসের পরেই জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করবেন। অতএব ওগুলো স্থায়ী হওয়ার পথে বাধা আর থাকে কোথায়? মহাবিশ্ব ধ্বংস হওয়ার পর আর তো কোন ধ্বংস নেই!' যারা এ ধরনের উক্তি করেন তারা সম্ভবতঃ এ বিষয়ে 'কুরআন' কি ঘোষণা করেছে তা তারা অবহিত নন্। দেখুন 'কুরআন' কি বলেছে- "তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন। আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।" (৫৭ ঃ ২১)

এবার জাহান্নামের ব্যাপারে লক্ষ্য করুন- "বিদ্রোহীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।" (৬৭ ঃ ৫)

"আমি জালিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে।" (১৮ ঃ ২৯)

এবং "ভয় কর সেই অগ্নিকে যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে অস্বীকারকারীদের জন্য।" (২ ঃ ২৪)

উল্লেখিত পবিত্র বাণীসমূহের আলোকে এখন এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আল্লাহ্ তা'আলা সপ্তাকাশ ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টির সাথে সাথে জান্নাত-জাহান্নামও তৈরী করে রেখেছেন, যা এখন বর্তমান আছে সপ্তাকাশের মাঝে। তাই পৃথিবীর 'কিয়ামাত' বা মহাবিশ্বের 'মহাধ্বংসে'র পরে জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টির কোন প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া স্পষ্ট করে তো বলাই হয়েছে যে 'আল্লাহ্র' অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

সুতরাং 'জান্নাত-জাহান্নাম' বিষয়ে ওগুলোর স্থায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আমরা কুরআনের বক্তব্যের আলোকে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে, সমগ্র পৃথিবীতে মানব সমাজ কোথাও মাত্র ১০০ কিংবা ২০০ বৎসর বাস করার কারনে ঐ ক্ষুদ্র সময়ের পরিসরকে

"সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য।" (৪০ : ৭৭)
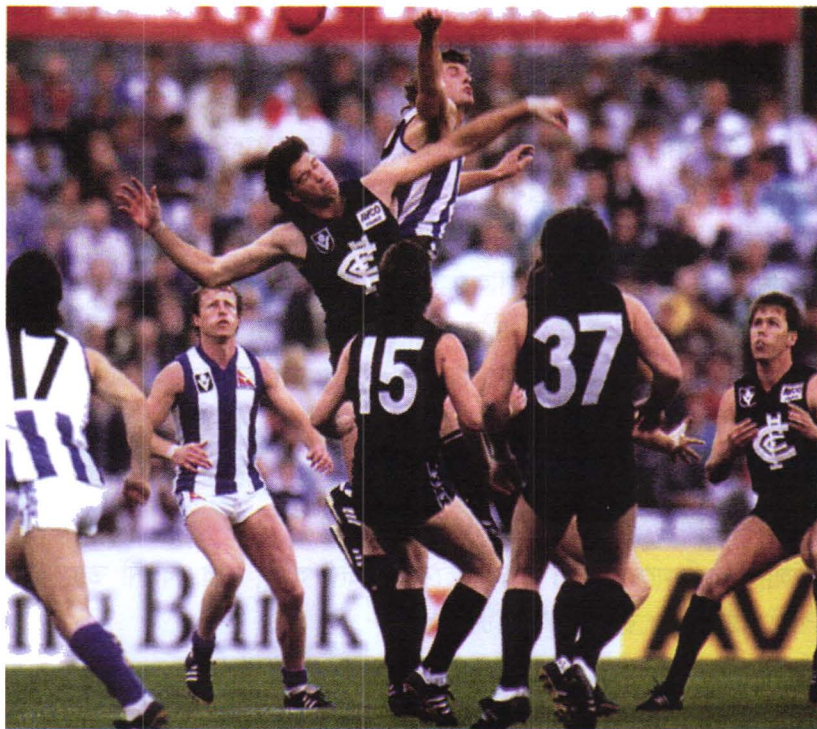
চিত্র–১৪২

– ওপরের ছবিতে আনন্দঘন পরিবেশে জমজমাট খেলার মাঠ দেখা যাচ্ছে। খেলার পরিচালক রেফারী খেলা চলাকালীন সময় মাঝে মাঝে লাল কার্ড দেখায়ে কোন কোন খেলোয়াড়কে খেলার মাঠ থেকে বিলীন করে দিচ্ছেন। ফলে তারা হারিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে খেলা চলতে চলতে এক সময় পূর্ব নির্ধারিত মুহূর্তটি আগমন করা মাত্রই পরিচালক রেফারী তাঁর বাঁশিটি বাজিয়ে সমগ্র খেলাটি ভেঙ্গে-চুরে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। ফলে তখন বর্তমান খেলা চলাকালীন পরিবেশটি আর থাকবে না নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে এ মহাবিশ্বে আল্লাহ্‌ তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঝে মাঝে জীবনময় জগতসমূহের এক এক করে কিয়ামাত ঘটাচ্ছেন। পরিশেষে এক সময় তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমগ্র মহাবিশ্বটিও ধ্বংসের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন এটাই সত্য কথা।

"সমগ্র মহাবিশ্বের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং আল্লাহ্র দিকে (তাঁরই নির্দেশে) সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৭ : ৫)

চিত্র–১৪৩

– ওপরের ছবিতে খেলা শেষে সমগ্র খেলার মাঠটিকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় পূর্বের আনন্দঘন খেলার পরিবেশটি আর দেখা যাচ্ছে না, তা সম্পূর্ণরূপে বদলে হারিয়ে গেছে।

আমাদের মহাবিশ্বটিকেও আল্লাহ্ তাঁর পূর্ব নির্ধারিত সময় আগমন করা মাত্র অনুরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় নিক্ষেপ করে ধ্বংসের মাধ্যমে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এতে তা যত লম্বা দূরত্ব স্কেলে থাকুক না কেন। এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত তাই, তা ঘটবেই। কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। মানুষ নগণ্য জ্ঞান দিয়ে ব্যাপারটি বুঝতে অক্ষম হলে তা তাদেরই দুর্বলতা মাত্র।

"তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তখন বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।" (৩৬ ঃ ৮২)
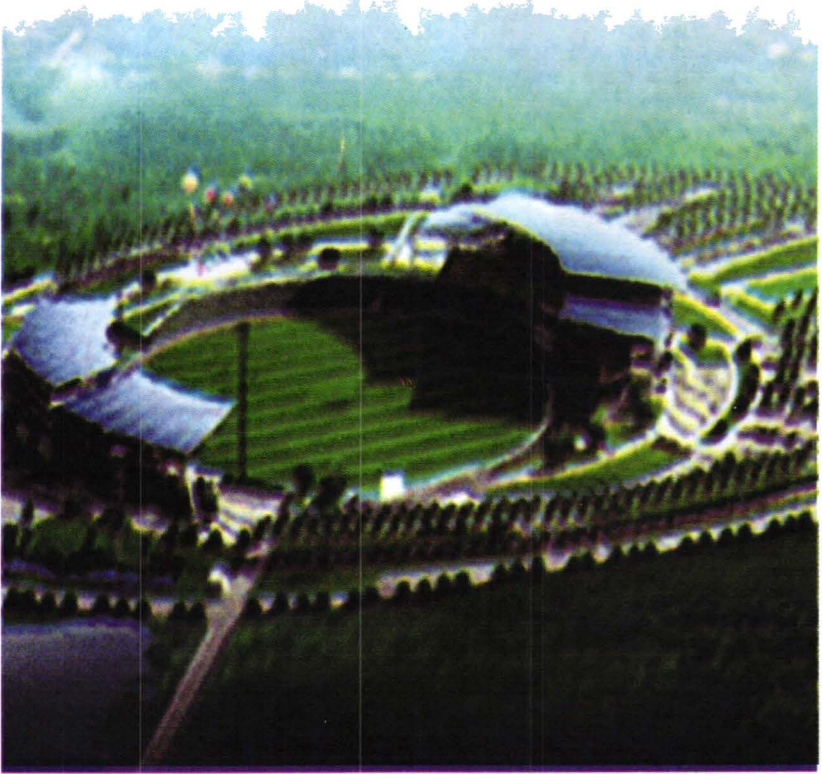
চিত্র-১৪৪

- ওপরের ছবিতে, শূন্য খেলার মাঠ দেখে মনেই হচ্ছে না যে, সেখানে ইতিপূর্বে দর্শকপূর্ণ কোন প্রকার আনন্দঘন খেলা চলতে ছিল। খেলার পরিচালক রেফারীর নির্দেশে নিঃসন্দেহে এমনটি হয়েছে।

একইভাবে আল্লাহ্‌র একক সিদ্ধান্ত ও নির্দেশে আমাদের এ মহাবিশ্বটি এক সময় মহাধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়ে মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা ছাড়া আর কিছুই অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকবে না। এতবড় একটি কাজ মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র জন্য কোন ব্যাপারই না। শুধু কমাণ্ড 'হও' পাস করলেই তা হয়ে যাবে। সুতরাং মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে মানব সমাজ কল্যাণ কিভাবে লাভ করতে পারে?

হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি না থাকায় পরকালে 'জান্নাত' এবং 'জাহান্নাম'-এ শত-সহস্র কোটি বৎসর অবস্থানের একটা নির্দিষ্ট সময়কে 'স্থায়ী' হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এখন এ পর্যায়ে এতটুকুন পথ অতিক্রম করে আসার পর যখন আমাদের বোধগম্য হল যে, টিক্ টিক্ করে করে সময় গড়িয়ে এমন একদিন আসবে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর 'একক অস্তিত্ব' ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখবেন না, সবকিছুই মহাধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করে চিরতরে বিলীন করে দেবেন, তখন আমাদের মাঝে অনেকেই ভাবেন উক্ত বিষয়টি সাধারণ মানুষের নিকট প্রকাশ করা ঠিক হবে না। কেননা তাতে তারা পরকালের প্রতি তথা জান্নাতের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে, পরিণামে পৃথিবীতে বিদ্রোহিতামূলক জীবন-যাপনের দিকে ঝুঁকে পড়বে। 'কুরআন' কিন্তু বিষয়টিকে এভাবে মূল্যায়ন করে না, আর সে কারণেই প্রতিবাদের তীব্র রোষে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে কুরআনের বাণী- "তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হবে, যে আল্লাহ্র বাণীকে জানতে পারল, অথচ মানুষের কাছে প্রকাশ না করে গোপন করে রেখে দিল?"

সুতরাং মহান আল্লাহ্ তাঁর মহাজ্ঞান দিয়ে যে সকল মহাকীর্তি সম্পাদন করে চলেছেন, তার সকল কিছুই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে মানব সমাজকে অবশ্যই অবহিত হতে হবে। কেননা একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীই তাদের প্রাপ্ত জ্ঞান দিয়ে এ মহাবিশ্বের জ্ঞানময় বিষয়গুলো যা মহাবিশ্বের প্রভুর মহাজ্ঞান দিয়ে পরিকল্পনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে, তা বুঝতে পারে না। আর সে ক্ষেত্রে মানুষ যদি তার প্রভুর কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, জ্ঞান এবং ক্ষমতার প্রচণ্ডতা বুঝতেই না পারে তাহলে 'প্রভু' সম্পর্কে জ্ঞানের অপূর্ণতার কারণে যথাযথভাবে তাঁর গোলামীর হক আদায় করতে পারবে না। এ অবস্থায় 'আল্লাহ্'র প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে না পারায় ক্রমান্বয়ে ধ্বংস এবং ব্যর্থতার দিকেই এগিয়ে যাবে বেশী। আর যেহেতু 'কুরআন' অবতীর্ণই হয়েছে মানব সমাজের ওপর, তাই মানব সমাজকে প্রতিটি বাণী হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে

হবে। নতুবা উক্ত দায়-দায়িত্ব থেকে পরকালে রেহাই পাওয়া যাবে না। এমনকি পৃথিবীতেও সৃষ্টির 'সেরা' পদবি ধূলোয় লুণ্ঠিত হবে।

এরপর যদি আবার কেউ একথা ভাবেন যে, 'জান্নাত' যখন আর চিরস্থায়ী নয় এবং আমরাও চিরস্থায়ী না হয়ে থাকলে ভাল-মন্দ আমল করে লাভ কি? নিজ ইচ্ছায় যা ভাল লাগে তাই করে যাই! 'নো চিন্তা ডু ফূর্তির' জীবনই কি উত্তম নয়? উত্তরে বলতে হয় 'না'। কেননা আমরা ভালো করেই জানি আমাদের এ পৃথিবীর জীবন মাত্র ১০০ বৎসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শত সহস্র চেষ্টা সাধনা করেও তাকে বর্ধিত করে ৫০০ বৎসরে উন্নীত করতে পারবো না। অথচ বর্ধিত করতে পারলে আমরা আমাদের সুন্দর সুন্দর অনেক পরিকল্পনা ইচ্ছামত বাস্তবায়ন করে চারদিকের পরিবেশকে স্বপ্নপুরীর রাজ কন্যার দেশে রূপান্তরিত করতে পারতাম। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হায়াতের (Life Cycle) কারণে তা পারছি না। তাই বলে ক্ষোভে, দুঃখে কিংবা রাগে আত্মহত্যার পথতো বেছে নেইনি! বরং ঐ স্বল্প সময়ের জীবনকে কিভাবে ফলপ্রসু করা যায়, কিভাবে সমাজে সবার ওপর দিয়ে সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, সবার প্রিয় হওয়া যায়, কিভাবে এক মিনিটের জন্য হলেও শান্তিতে বসবাস করা যায়, সে সকল চিন্তা এবং পেরেশানীতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত ও হন্যে হয়ে ছুটাছুটি করছি, অথচ পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বৎসর সমান পরকালের মাত্র এক দিন, সে দিনের মাস, সে মাসের বছর, আবার তাও শত-সহস্র কোটি বছরের পরকালীন জীবন, সে জীবনের দৈর্ঘ্য কি কল্পনায় আনা যায়? পরকালীন জীবন মানব জ্ঞানে, 'স্থায়ী' বলতে যা বুঝায় তার সকল প্রকার লিমিটেশনকেও সেখানে শত কোটি বার ছাড়িয়ে যায়, সে অনন্ত জীবনকে আমরা কিভাবে তুচ্ছ ভেবে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি? বিবেক সম্পন্ন মানুষ হয়ে কি এরূপ অবিবেচনা প্রসূত, বোকার মত আত্মঘাতী পদক্ষেপ নিতে পারি? তারপর কথা হলো পৃথিবীতে আমরা কি এক ঘণ্টার জন্যও দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে জীবিত অবস্থায় পুড়তে রাজী হবো, যদিও আমাদের চাহিদা মত বিনিময়ে সব কিছুই দেয়া হয়? নিশ্চয়ই রাজী হবো না! তাহলে কোন যুক্তি এবং সাহসে আমরা পরকালীন এক অনন্ত জীবনে অগ্নিময় কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তিকে আলিঙ্গন করার দুঃসাহস দেখাচ্ছি? আমাদের এই আচরণ

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে, আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। অবশ্যই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন।" (১৬ ঃ ১২)
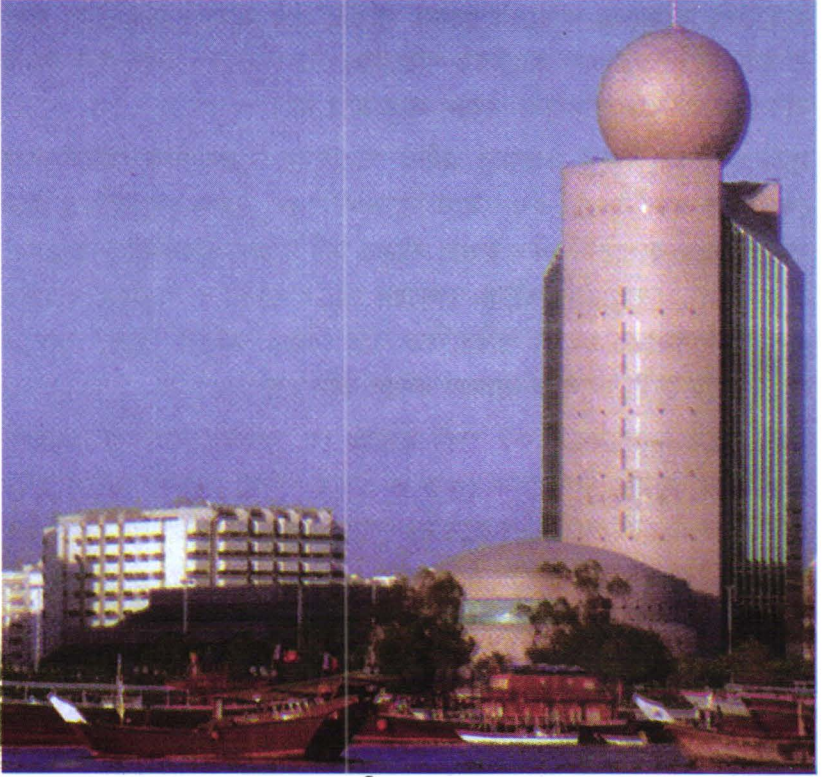
চিত্র–১৪৫

– মানুষ ভালো করেই জানে যে, সে এ পৃথিবীতে সর্বোচ্চ হয়তোবা ১০০ বৎসর বাঁচবে। এত সংক্ষিপ্ত সময় তার, তা নিশ্চিত জানার পরও সে তার প্রতিটি মুহূর্তকে সুখের ও আনন্দময় করার জন্য কত চেষ্টা-প্রচেষ্টাই না করে বেড়াচ্ছে। এরই আলোকে সে যদি পরকালের কোটি কোটি, কোটি কোটি বৎসরের জীবনকে সুখময় করার জন্য চেষ্টা–সাধনা না করে, তাহলে তাকে কি সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ বলা যাবে? কখনই বলা যাবে না।

সুতরাং পরকালের জীবন অস্থায়ী হলেও তা কোটি, কোটি, কোটি, কোটি বছর লম্বা হবে, যা কল্যাণময় করার চেষ্টা সবারই হওয়া উচিত।

প্রবঞ্চনার শামিল নয়? অতএব প্রতিটি ক্ষেত্রেই সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসেবে আমাদের চিন্তা-ভাবনা, কাজ-কর্মসহ সকল কিছুই শ্রেষ্ঠ মর্যাদার মোড়কে পরিচ্ছন্ন, পরিমার্জিত ও গঠনমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। নতুবা আমাদের মর্যাদা আমাদের নিজেদের কারণেই ধূলোয় লুণ্ঠিত হয়ে আমাদেরকে হেয়, তুচ্ছ ও মর্যাদাহীন করে এক অবাঞ্চিত পরিবেশে ঠেলে দেবে। তখন লক্ষ কোটি বার নিজকে ধিক্কার দিয়েও কোন লাভ হবে না।

সুতরাং 'সকল কিছুই ধ্বংসের অধীন' অধ্যায়ের 'কুরআনিক' আলোচনার শেষপ্রান্তে এসে বলতে এবং মেনে নিতে পারি যে, 'আল্লাহ্'র অস্তিত্ব ছাড়া সকল কিছুই ধ্বংসের অধীন হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট করা পরকালীন 'জান্নাতি' জীবন কিংবা 'জাহান্নামী' জীবন মানুষের জ্ঞানে 'ধারণা বা অনুমান' বহির্ভূত এক দীর্ঘ সময়ের স্কেলে পরিচালিত হবে বিধায় ওটাকে 'স্থায়ী' বলাতে কোন দোষ নেই, তবে অনন্তকাল বললে ভাল হয়।

সাথে সাথে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এক সময় শুধুমাত্র 'আল্লাহ্'র (এক ও একক পবিত্র সত্তার) অস্তিত্ব ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। সমগ্র মহাবিশ্ব মহাধ্বংসে নিমজ্জিত হয়ে চিরদিনের জন্যই বিলীন হয়ে যাবে।

এবার আমরা উল্লেখিত বিষয়টিকে বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও পর্যালোচনা করে দেখতে চাই।

বিজ্ঞান

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সঠিক বিজ্ঞান সকল সময় 'আল্-কুরআনকে' বাস্তবে প্রমাণ করার এক উত্তম মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। বিজ্ঞান হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এ পর্যন্ত অসংখ্য-অগণিত বিষয়ে আবিষ্কার এবং প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করে মানব জাতির ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর কল্যাণ সাধন করে চলেছে, যার বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না। বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞান আমাদের মহাবিশ্ব, এর সৃষ্টি -এর সম্ভাব্য আয়তন, এর সম্ভাব্য ধ্বংস বা সমাপ্তি ইত্যাদি বিষয়েও ব্যাপক 'তথ্য' ইতিমধ্যেই প্রদান

করতে সমর্থ হয়েছে। বিজ্ঞান জগত দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আমাদের মহাবিশ্বটি আজ থেকে প্রায় ১৪ বিলিয়ন (১৪০০ কোটি) বৎসর পূর্বে 'বিগ ব্যাংগ' মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দু (প্রায় ১০-৩৩ cm.) থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ বিন্দু থেকে বর্ধিত হয়ে মহাসম্প্রসারণের এক অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় বর্তমানে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার বিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মূলতঃ 'আলো' থেকে সৃষ্টি শুরু হয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ৬টি সময়কালে 'অটল পদার্থ' সৃষ্টি হওয়ার পরই কেবল মহাশূন্যে পর্যায়ক্রমে গ্যালাক্সি, কোয়াসার, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহসহ অন্যান্য অসংখ্য মহাজাগতিক বস্তু আবির্ভূত হয়ে বর্তমান মহাবিশ্বে রূপ নিয়েছে। ১৯২০ সনে আমেরিকান বিজ্ঞানী 'মিঃ হাবেল পাওয়েল' টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশের দরজা-জানালা খুলে দেন। তিনি টেলিস্কোপ দিয়ে মহাবিশ্বব্যাপী কোটি কোটি গ্যালাক্সিকে উড়ে যেতে দেখতে পেলেন। বিজ্ঞান প্রমাণ করলো আমাদের দৃশ্যমান আকাশ মহাবিশ্ব নয় বরং লক্ষ কোটি গ্যালাক্সির মধ্যে আমাদের 'মিল্‌কিওয়ে' (Milky Way) গ্যালাক্সির একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। একটি গ্যালাক্সি আবার গড়ে প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ জায়গা নিয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে আছে। মহাবিশ্বের মহাজাগতিক নিয়মে প্রতিটি গ্যালাক্সি (Star City) ঘূর্ণনরত অবস্থায় প্রচণ্ড গতিতে কেবলই মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানার দিকে উড়ে যাচ্ছে। উক্ত উড়ার গতি নির্দিষ্ট দূরত্বের পর প্রতি সেকেণ্ডেই প্রায় ৫০ মাইল হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে হিসেবে মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানায় পৌঁছে যাওয়া গ্যালাক্সিগুলোর গতি প্রায় আলোর গতির সমান হয়ে যায়। বিজ্ঞানীগণ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্ব পরেও গ্যালাক্সি ও কোয়াসার পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। ঐ দূরত্বের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সির সন্ধান লাভ করেছেন। বিজ্ঞান আরো জানাচ্ছে প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্ব পরে গ্যালাক্সি ও কোয়াসার সম্ভবত আলোর গতি (প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল) প্রাপ্ত হওয়ার কারণে ওদের মূল

"অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) একত্রে মিশে ছিল (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে? অতঃপর আমি (মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে) উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?" (২১ ঃ ৩০)
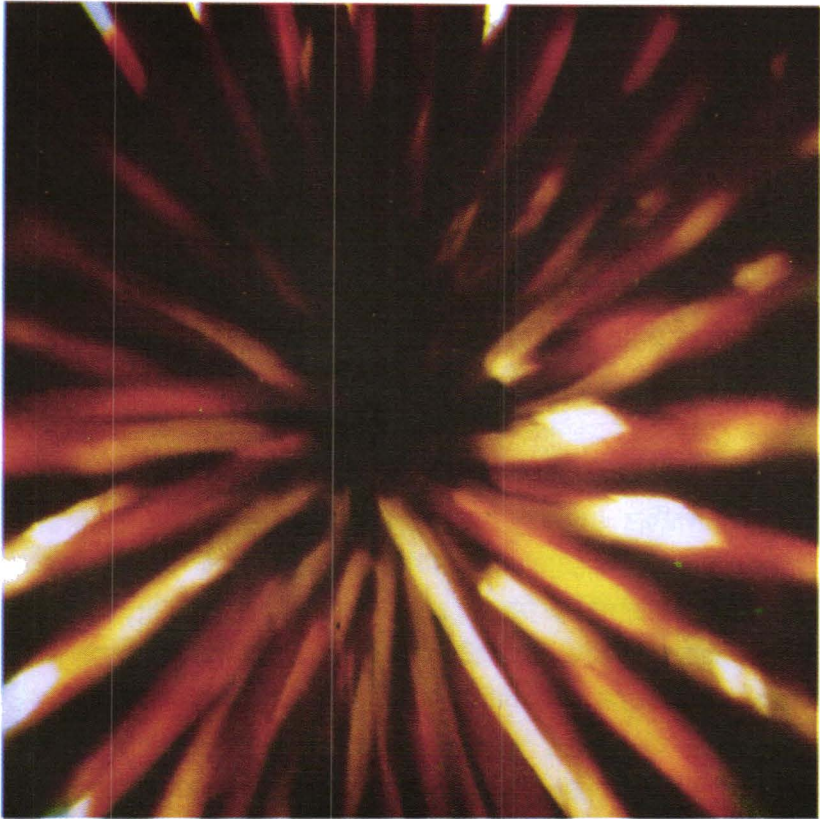
চিত্র–১৪৬

– 'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞান' একযোগে ঘোষণা করেছে যে, এ মহাবিশ্বটি এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং যার সৃষ্টি আছে, তার ধ্বংসও অনিবার্য। সমগ্র বিজ্ঞান বিশ্ব বর্তমানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে 'Big Bang' থিউরিকে মেনে নিয়েছে চূড়ান্ত বাস্তবতার নিরীখে। কুরআন ও বিজ্ঞানের এই অভিন্ন বক্তব্য এক আল্লাহ্‌র উপস্থিতিকে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

"আল্লাহ্, যিনি সমগ্র মহাবিশ্ব ও তার মধ্যে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয়টি সময়কালে। অতঃপর তিনি 'আরশের' অধীন প্রতিষ্ঠিত করে দেন। সমাসীন হন (এর সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে)।"(৩২ ঃ ৪)
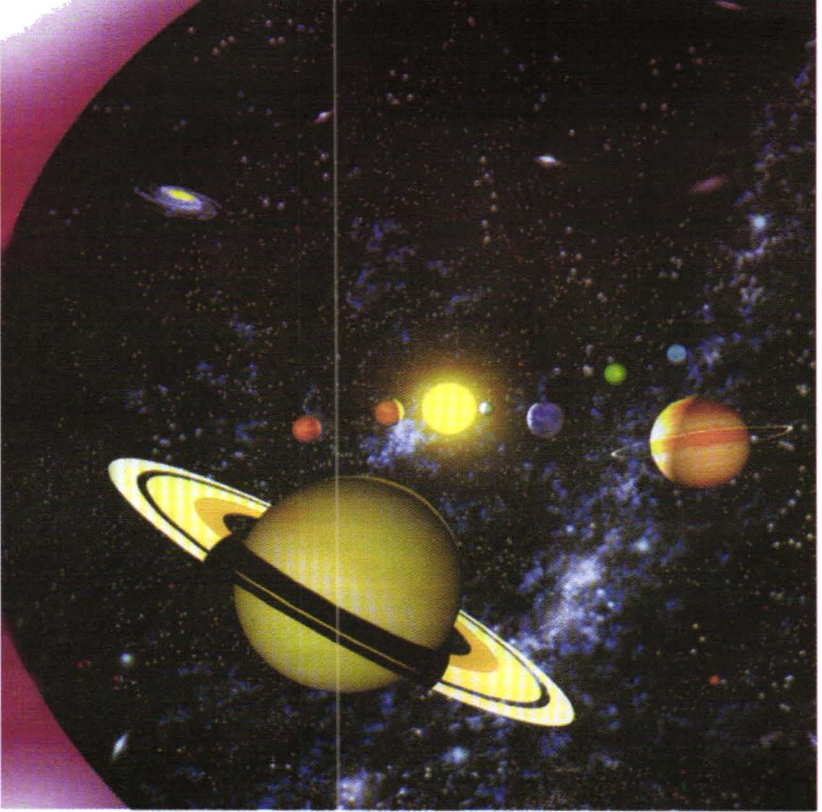
চিত্র-১৪৭

- আদিতে মহাসূক্ষ্ম বিন্দু $10^{-33}cm$ প্রায় এক মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়ে পর্যায়ক্রমে মহাসম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃতি নিয়ে বর্তমানে মহাশূন্যে ছড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তাই বিশাল এ মহাবিশ্বকে ধারণ করে আছে। এক সময় মহাবিশ্বটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তার মাঝেই আবার বিলীন হয়ে যাবে। তখন শুধু অবশিষ্ট থেকে যাবে মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতম সত্তা। আজকের বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাও সেকথাই প্রমাণ করছে।

"কত মহান তিনি, যিনি মহাকাশে সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্রপুঞ্জ (Star city তথা গ্যালাক্সি) এবং এতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।" (২৫ ঃ ৬১)
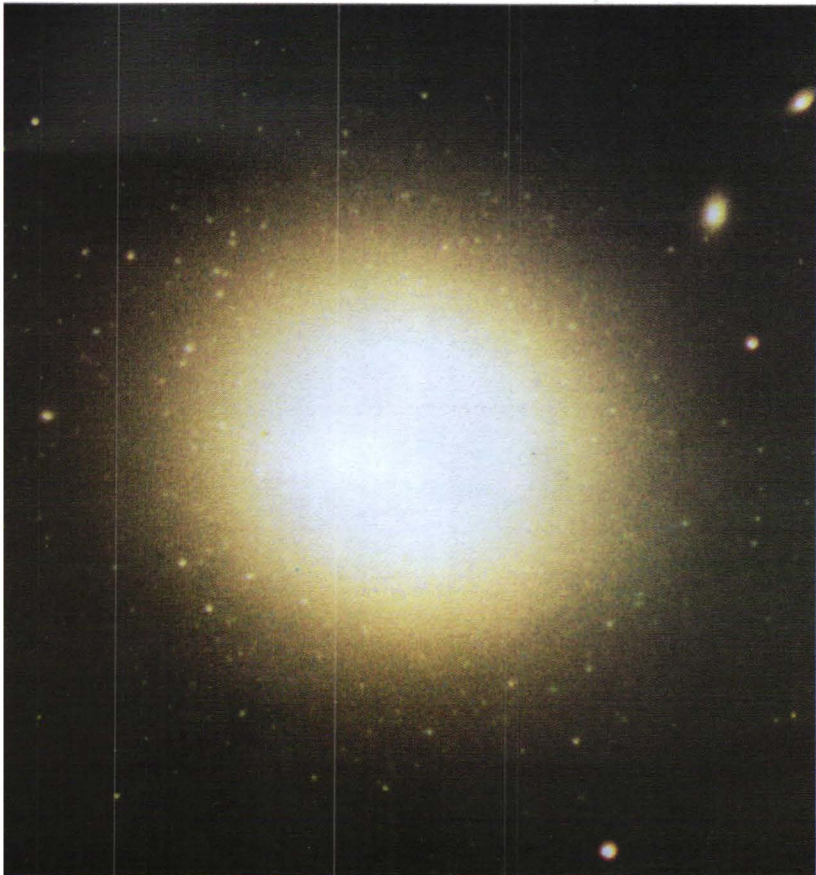
চিত্র–১৪৮

– আমাদের মহাবিশ্বে সবচেয়ে বড় সংগঠন হচ্ছে গ্যালাক্সিসমূহ। গ্যালাক্সি মূলতঃ এক ঝাঁক নক্ষত্র। যেখানে গড়ে প্রায় ৩০,০০০ কোটি নক্ষত্র দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। একটি গ্যালাক্সির ব্যাস গড়ে এক লক্ষ আলোকবর্ষ প্রায়। প্রস্থ প্রায় ১০,০০০ আলোকবর্ষ।

নক্ষত্রসমূহ গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে আবর্তন করে, গ্রহসমূহ আবর্তন করে নক্ষত্রকে, আবার উপগ্রহসমূহ আবর্তন করে গ্রহকে। এভাবে একে অপরকে আবর্তনের মাধ্যমে ভারসাম্য স্থাপন করে গ্যালাক্সির পূর্ণতা বিধান করে থাকে।

"আমি মহাকাশে সৃষ্টি করেছি নক্ষত্রপুঞ্জ (গ্যালাক্সি) এবং তাকে সুশোভিত করেছি প্রকৃত দর্শকদের জন্য।" (১৫ ঃ ১৬)

ছবি-১৪৯

- মহাবিশ্বে মূল সংগঠন হচ্ছে- গ্যালাক্সিসমূহ। এরা ভাসমান এবং চলমান। Big Bang বিন্দু থেকে গ্যালাক্সিসমূহ একইভাবে চতুর্দিকে ছুটে যাচ্ছে পরস্পর পরস্পর থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে।

এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীগণ আমাদের মহাবিশ্বে প্রায় ১০,০০০ কোটির ওপরে গ্যালাক্সির সন্ধান লাভ করেছেন। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সাথে এদের সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বর্ধিত হচ্ছে যথাযথভাবে অনুসন্ধানের কারণে।

গ্যালাক্সিসমূহ ক্রমান্বয়ে গতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে উড়তে গিয়ে মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানায় সঙ্কুচিত হয়ে ধ্বংস হয়ে কিয়ামাত সম্পন্ন করছে।

মুখে সঙ্কুচিত হয়ে হয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় গমন করায় ওদের অস্তিত্ব মুছে গিয়ে আর দেখা যায় না। বর্তমানে এভাবে গ্যালাক্সি এবং কোয়াসারের বিষয়টি টেলিস্কোপে ধরা পড়ায় বিজ্ঞান অনুমান করছে পূর্ব থেকে অনুরূপভাবে আরও লক্ষ কোটি গ্যালাক্সি ও কোয়াসার মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানায় পৌঁছে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) প্রবেশ করে থাকবে এবং ভবিষ্যতেও উক্ত ধারা বজায় থাকবে। আর সেজন্য বিজ্ঞান বিশ্বে মৃদু গুঞ্জরণও শোনা যাচ্ছে- 'Where are we going'? (আমরা যাচ্ছি কোথায়?) কারণ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমাদের 'মিলকি ওয়ে' গ্যালাক্সিটিও একদিন ঐ অবস্থায় প্রবেশ করবে মহাজাগতিক কঠিন নিয়মের বাধ্যবাধকতায়। বিজ্ঞান এ অবস্থা প্রাপ্ত গ্যালাক্সিদের তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব আঞ্চলিক বা স্থানীয় ধ্বংস হিসেবে তা বর্ণনা করেছে। কেননা বস্তুজগতের প্রান্তঃসীমানায় পৌঁছে যাওয়া গ্যালাক্সি ব্যতীত বাকী শত সহস্র কোটি গ্যালাক্সি তো তখন ধ্বংস হচ্ছে না। ওরা নির্বিঘ্নে তখনও ওদের জীবন পরিক্রমা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা পূর্বেও অবহিত হয়েছি যে, গ্যালাক্সিদের আভ্যন্তরীণ কাঠামোতে কোন কোন সৌরপরিবারের স্থানীয় 'ধ্বংস বা কিয়ামাত' আরও সাতটি পদ্ধতির যে কোন একটি পদ্ধতির মাধ্যমেও ঘটতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় তা হচ্ছে-

১. সূর্যের ধ্বংসের মাধ্যমে,

২. ধূমকেতু' পতনের মাধ্যমে,

৩. 'বড় ধরনের 'গ্রহানু' পতনের কারণে,

৪. 'সুপার নোভা' বিস্ফোরণের কারণে,

৫. 'ব্ল্যাক হোলের' মাধ্যমে,

৬. একাধিক নক্ষত্রের সংঘর্ষের কারণে,

৭. এবং গ্যালাক্সিদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে।

উল্লেখিত সাতটি পদ্ধতি এবং গ্যালাক্সিদের বস্তুজগতের প্রান্তঃসীমানায় সমগ্র 'গ্যালাক্সির শূন্যের কোঠায় গমন'সহ মোট ৮টি পদ্ধতিকে 'কিয়ামাত' বা 'স্থানীয় ধ্বংস' সাধনের জন্য বিজ্ঞান চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে।

বিজ্ঞানের বক্তব্য এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, বরং 'বিগ-ব্যাংগ' মহাবিস্ফোরণ বিন্দু থেকে আজ পর্যন্ত মহাবিশ্বের পরতে পরতে যথাসম্ভব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞান আরও একটি ভয়ঙ্কর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চিত্রও মানব সমাজের সামনে মেলে ধরেছে। আর তা হচ্ছে- একদিন সমগ্র মহাবিশ্বটির সম্পূর্ণরূপে 'মহাধ্বংস সাধন' ঘটবে। এ ব্যাপারে বর্তমান বিজ্ঞানী মহলের প্রায় সবাই চূড়ান্ত ধ্বংসের পদ্ধতিগত দিক থেকে ভিন্ন-ভিন্ন মত পোষণ করলেও কিন্তু মহাবিশ্ব 'ধ্বংসে'র ব্যাপারে সবাই একমত। বিজ্ঞানের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, 'যারই সৃষ্টি আছে, ধ্বংস তার জন্য অনিবার্য।' বিজ্ঞানীদের মধ্যে একদলের বক্তব্য হচ্ছে- যেভাবে 'বিগ-ব্যাংগ'-র মাধ্যমে মহাবিশ্বটি সৃষ্টি হয়ে মহাসম্প্রসারণের নেশায় ক্রমান্বয়ে চতুর্দিকে সমভাবে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে, সময়-দূরত্ব স্কেলে যতদূরেই হোক না কেন একদিন এই সম্প্রসারণ থেমে গিয়ে সর্বত্র এক মহাসঙ্কোচন শুরু হয়ে যাবে। ফলে মহাবিশ্বের তাবৎ 'বস্তুভর' (Mass) উল্টো তীর চিহ্নে অর্থাৎ 'বিগ ব্যাংগ' বিন্দুর দিকে ফিরে যেতে থাকবে 'মহাসঙ্কোচনের' তীব্র গতিতে। যে বিন্দুতে সৃষ্টি আবার সে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে এসে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে ঘটবে মহাধ্বংস, বিজ্ঞান এটাকে 'বিগ-ক্রাঞ্চ' (Big Crunch) নামে অভিহিত করেছে। আর একদল বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আমাদের মহাবিশ্বের 'লাইফ সাইকেলের' সর্বশেষ মুহূর্তে চূড়ান্ত মহাধ্বংস ঘটানোর কাজে প্রভাব ফেলবে 'ব্ল্যাক হোল' (Black-hole)গুলো। বড় বড় দুর্ধর্ষ 'ব্ল্যাক হোল'গুলো (Massive Black-hole) ঐ সময় একে অপরকে নিজের সাথে মিশায়ে মিশায়ে বৃহৎ থেকে বৃহদাকার 'ব্ল্যাক হোলে' রূপ নিতে থাকবে। শেষের দিকে সকল 'ব্ল্যাক হোল' একত্রিত হয়ে বিরাট-বিশাল, বর্ণনাতীত ভয়ংকরী চেহারার একটিমাত্র 'ব্ল্যাক হোল'-এ পরিণত হবে এবং মহাসঙ্কোচনে ঘনিয়ে আসা তাবৎ বস্তুভরকে (Mass) প্রচণ্ড রোষে গলধঃকরণ করে করে 'মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে' (Singularity তে) এনে আটকিয়ে দিবে। বিজ্ঞানের ভাষায় যা 'Singularity' মূলতঃ অদৃশ্য অবস্থা, যা দেখা যায় না। অর্থাৎ 'ব্ল্যাক হোল'গুলো মহাবিশ্বের চূড়ান্ত ধ্বংসের নিমিত্তে ওদের ভয়ংকর চেহারায় আবির্ভূত হয়ে সমগ্র

"যেদিন এই পৃথিবী (তার পারিপার্শ্বিকতাকে নিয়ে বিপর্যয়ের মাধ্যমে) পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং তদ্রূপ হবে আকামশগুলীও (সর্বোচ্চ প্রায় ৪টি আকাশ) এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে– যিনি একক, পরাক্রমশালী।" (১৪ ঃ ৪৮)
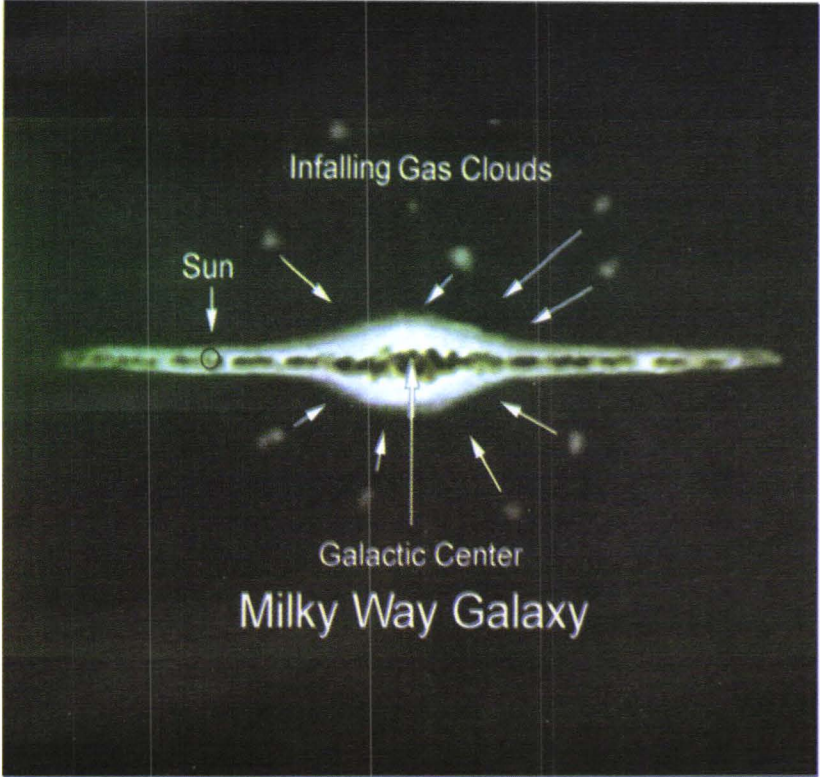
চিত্র–১৫০

– আমাদের পৃথিবী 'মিলকি-ওয়ে' গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে ৩০,০০০ হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বে প্রান্তঃসীমানার দিকে অবস্থিত। ফলে গ্যালাক্সির গতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ওর চাকতি আকারের গঠনের প্রান্তঃসীমার নক্ষত্রগুলো, চাপ খেয়ে প্রথমদিকে কক্ষচ্যুত হয়ে ভেতরের দিকে ছুটে যাবে। ফলে প্রান্তঃদিক থেকেই জীবনময় জগতগুলোর কিয়ামাত শুরু হয়ে যাবে। আমাদের সৌরজগত প্রান্ত থেকে মাত্র ২০,০০০ আলোকবর্ষ ভেতরের দিকে থাকায় স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরাও কিয়ামাতের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যাবো।

"সেদিন আকাশমণ্ডলীকে (সর্বোচ্চ ৪টি আকাশকে) গুটায়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর, যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই।" (২১ ঃ ১০৪)
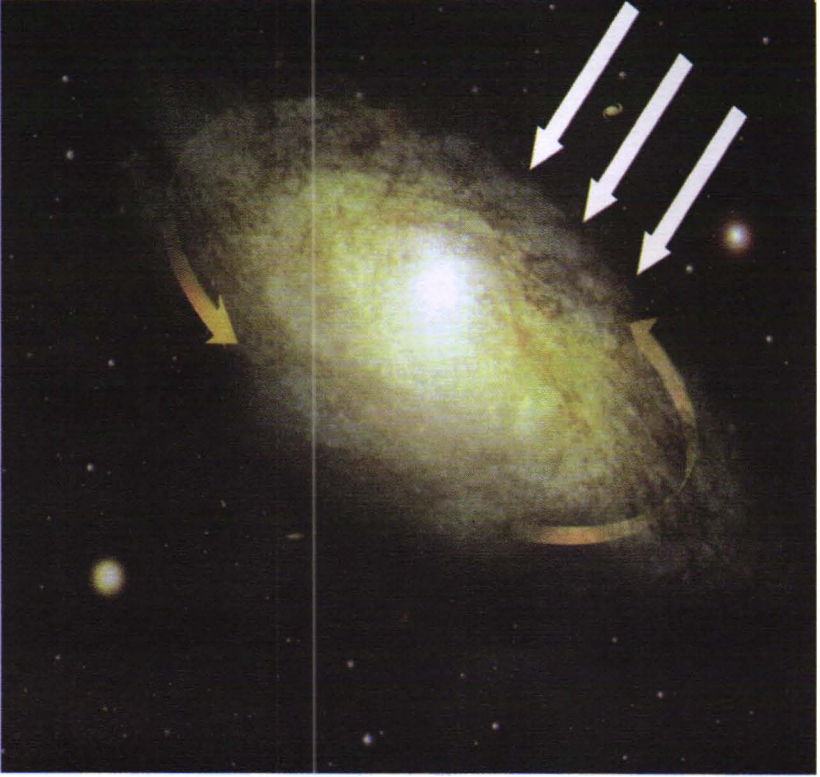
চিত্র–১৫১

– ওপরের ছবিতে একটি গ্যালাক্সি প্রচণ্ড গতিতে উড়তে গিয়ে গতিমুখের বিপরীতে বাধার কারণে সঙ্কুচিত হয়ে তার আদি আকৃতির বিপর্যয় ঘটানোর পথে চাকতি আকৃতির প্রান্তঃসীমার চতুর্দিকের নক্ষত্র পরিবারগুলো ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার জন্য যে ৮টি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে উক্ত পদ্ধতি একটি নির্ঘাত পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কেননা অন্য পদ্ধতিগুলো কোন জীবনময় জগতের ভাগ্যে ঘটতে পারে কিংবা নাও ঘটতে পারে। কিন্তু গ্যালাক্সি সঙ্কুচিত হয়ে কিয়ামাত ঘটা অবশ্যম্ভাবী এক ব্যাপার। এর হাত থেকে কোন জগতের পরিত্রাণ নেই।

"যখন সূর্য জ্যোতিহীন ও নিস্প্রভ হবে, যখন জ্যোতিষ্কসমূহ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।"
(৮১ ঃ ১, ২)

চিত্র-১৫২

– এ মহাবিশ্বের বড় সংগঠন গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত-ই নক্ষত্র বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে। বর্তমান বিজ্ঞানীদের ধারণা আমাদের সূর্যটি প্রায় সাড়ে চার'শ কোটি বছর পথ পাড়ি দিয়ে এ পর্যায়ে আগমন করেছে, সম্মুখে আর মাত্র বড় জোর এক'শ কোটি বছর সৌরজগতকে তাপ বিতরণ করতে সক্ষম হবে। এরপর লাল দানবে পরিণত হয়ে বর্ধিত দেহ দিয়ে সৌরজগতের প্রায় অর্ধেক গিলে ফেলবে। পরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সমগ্র সৌর ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। এটা একটা স্থানীয় কিয়ামাত, সমগ্র মহাবিশ্বের 'ধ্বংস' নয়। বিষয়টি বুঝার জন্য প্রথমেই বিশাল মহাবিশ্বকে অবশ্যই বুঝতে হবে।

"যখন ধূমকেতু বিক্ষিপ্তভাবে নিক্ষিপ্ত হবে।" (৮২ ঃ ২)

"শপথ আকাশের এবং আঘাতকারীর, তুমি কি জান আঘাতকারী বস্তুটি কি? ওটা একটি প্রজ্জ্বলমান জ্যোতিষ্ক।" (৮৬ ঃ ১-৩)

চিত্র-১৫৩

– মহাকাশীয় চরম বাস্তবতার কারণে এবং ১৯৯৪ সালের ১৬-ই জুলাই 'সু-মেকার লেভী-৯' ধূমকেতু বৃহস্পতি গ্রহকে আঘাত করায় বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীর একই তলে কখনও কোন ধূমকেতু আগমন করলে মুখোমুখী সংঘর্ষে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা পৃথিবীর স্থানীয় বিপর্যয় বা ধ্বংস হিসেবে ধরা যাবে। কেননা তাতে মহাবিশ্বের বাকী সকল ব্যবস্থা ও কাঠামো পূর্বের ন্যায়ই থেকে যাবে। ধ্বংস হবে না।

"তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছ, যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর পাথরের বহর প্রেরণ করবেন না!" (৬৭ ঃ ১৭)
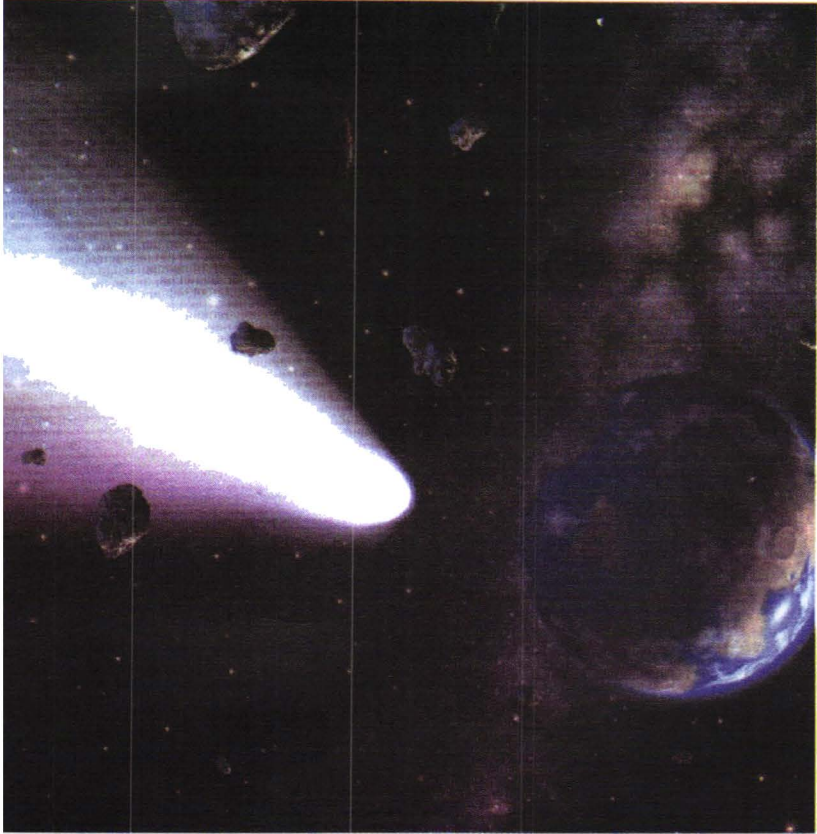
চিত্র–১৫৪

– সৌরজগতের ভিতরে–বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ভাসমান পাথর খণ্ড। তাছাড়া গ্যালাক্সি সঙ্কোচনের কারণে গ্যালাক্সির প্রান্তদেশ থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত সৌর ব্যবস্থার অসংখ্য পাথর ভিতরের দিকে ছুটে আসার কারণে বিক্ষিপ্তভাবে গ্রহগুলোকে আঘাত করবে। ফলে গ্রহগুলো তখন ধ্বংস হয়ে যাবে প্রচণ্ড আঘাতের কারণে। এ বিপর্যয় শুধুমাত্র ১টি গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে ঘটতে থাকবে সৌরপরিবারে, যা সীমিত পর্যায়ে থাকবে। এতে মহাবিশ্বের বাকী সকল ব্যবস্থা যথাযথই থেকে যাবে। ওরা এই বিপর্যয় টেরও পাবে না। সুতরাং তখন সমগ্র মহাবিশ্ব ধ্বংসের প্রশ্নই উঠে না।

"যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হয়ে যাবে।" (৭৭ ঃ ৮)
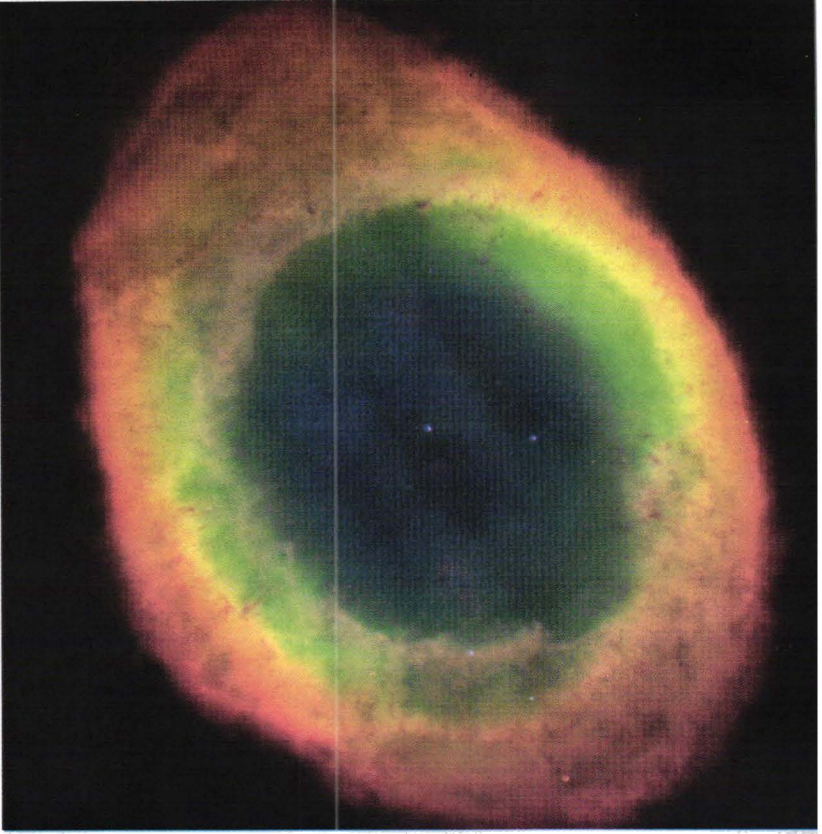
চিত্র–১৫৫

– 'সুপারনোভা' বিস্ফোরণও তার নিজস্ব গ্রহ ব্যবস্থা এবং বড় জোর নিকটবর্তী ২/৪টি সৌরব্যবস্থাকে আঘাত করে বিপর্যস্ত করে ওদের কিয়ামাত ঘটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তাতে সমগ্র মহাবিশ্বের কোন ক্ষতি করার বা ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে না। কেননা 'সুপারনোভা' বিস্ফোরণ কোন একটি গ্যালাক্সির আভ্যন্তরীণ বিপর্যয় মাত্র, কিন্তু বাকী সহস্র কোটি গ্যালাক্সিতো এর কোন খবরই পাবে না। ফলে তাতে মহাবিশ্ব ধ্বংসের প্রশ্নই আসে না। মহাবিশ্ব ধ্বংসের বেলায় গ্যালাক্সিতো দূরের কথা কোথাও একটি বালি কণাও আর অবশিষ্ট থাকবে না। সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবেন শুধু মহান আল্লাহ্। প্রমাণিত হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী সত্য ও সঠিক।

“আমি শপথ করছি নক্ষত্রসমূহের ধ্বংসপতন স্থানের। অবশ্যই এটা এক গুরুতর শপথ যদি তোমরা বুঝতে পারতে।” (৫৬ ঃ ৭৫, ৭৬)
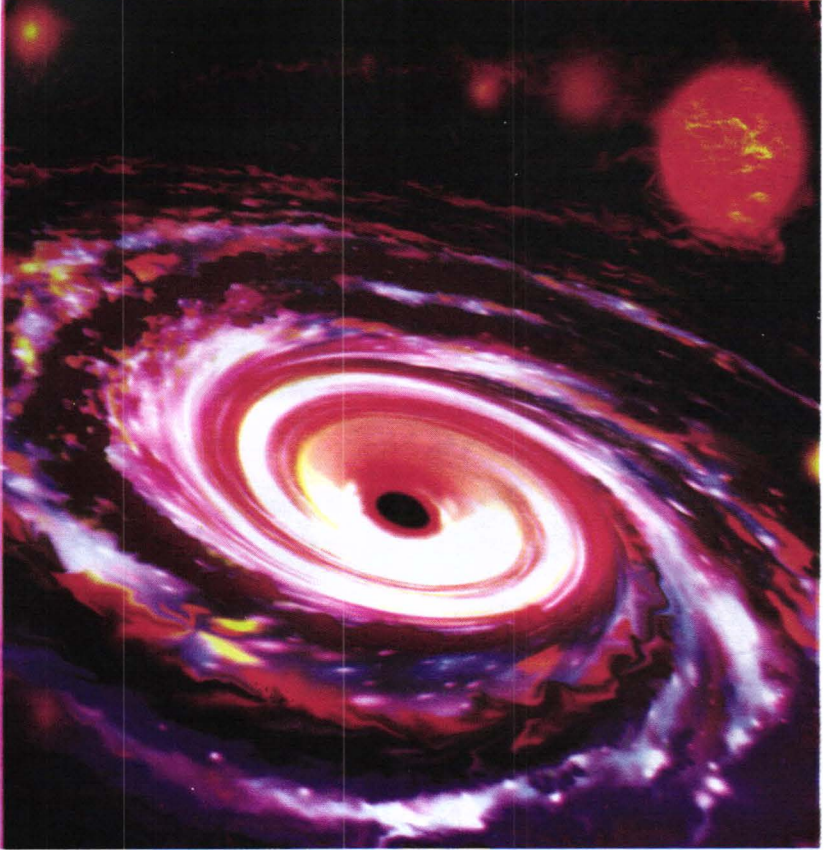
চিত্র–১৫৬

– বিজ্ঞানীদের শঙ্কা হচ্ছে– ভয়ঙ্কর ‘ব্ল্যাকহোল’–এ পতিত হলে পৃথিবীর ন্যায় গ্রহ ব্যবস্থাও মুহূর্তের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সেই ধ্বংসটি সংশ্লিষ্ট গ্রহ ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সমগ্র মহাবিশ্বটি তাতে কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে না। কেননা Black Hole বেশী হলে একাধিক সৌর পরিবারের সমান হতে পারে, কিন্তু সমগ্র মহাবিশ্বটি প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাপী কল্পনাতীতভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে। কুরআন যে সত্যগ্রন্থ, এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ আছে কী?

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা সকল নিদর্শনের প্রতি উদাসীন।" (১২ ঃ ১০৫)
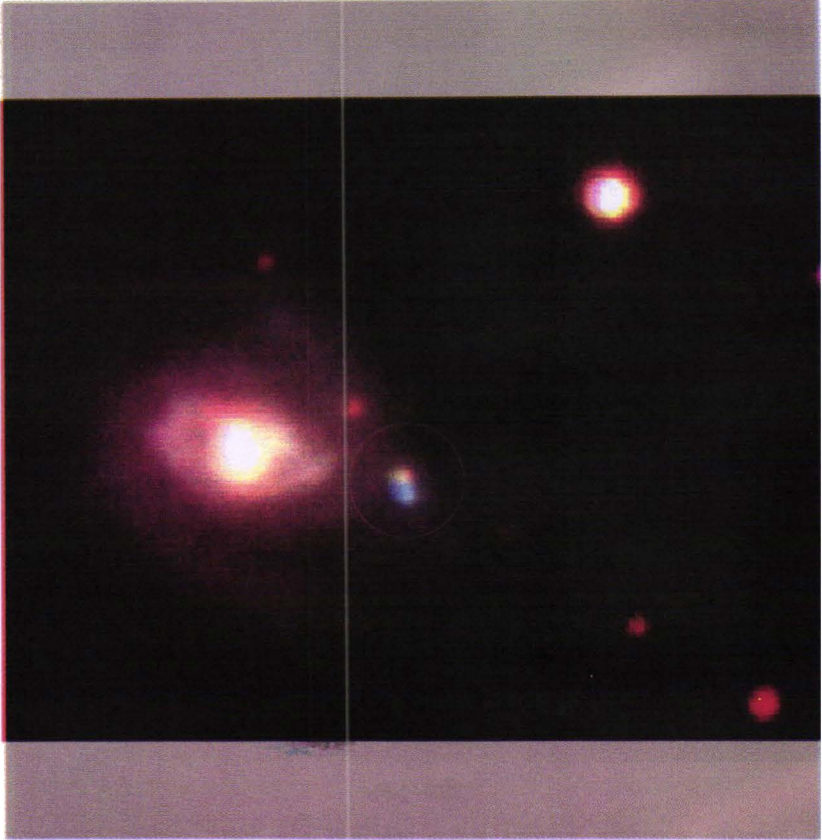
চিত্র–১৫৭

– একাধিক নক্ষত্র পারস্পরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে তাতে সংশ্লিষ্ট সৌরপরিবারের গ্রহ-ব্যবস্থা ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হতে পারে, যা ওদের স্থানীয় ধ্বংস হিসেবে বিবেচিত। এতে মহাবিশ্বতো পরের কথা সংশ্লিষ্ট ঐ গ্যালাক্সির বাকী নক্ষত্র জগতও কোন খবর পাবে না। তাই একটি গ্যালাক্সির ভেতর কোন প্রকার ধ্বংসকে সমগ্র মহাবিশ্ব ধ্বংস বলা যুক্তিযুক্ত নয়। বরং তাকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক ধ্বংস বলাই অধিকতর শ্রেয়। এতে প্রমাণ হচ্ছে, কুরআন এক মহাসত্য গ্রন্থ।

"ওরা আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবে এটা এক পুঞ্জীভূত মেঘ।"
(৫২ ঃ ৪৪)
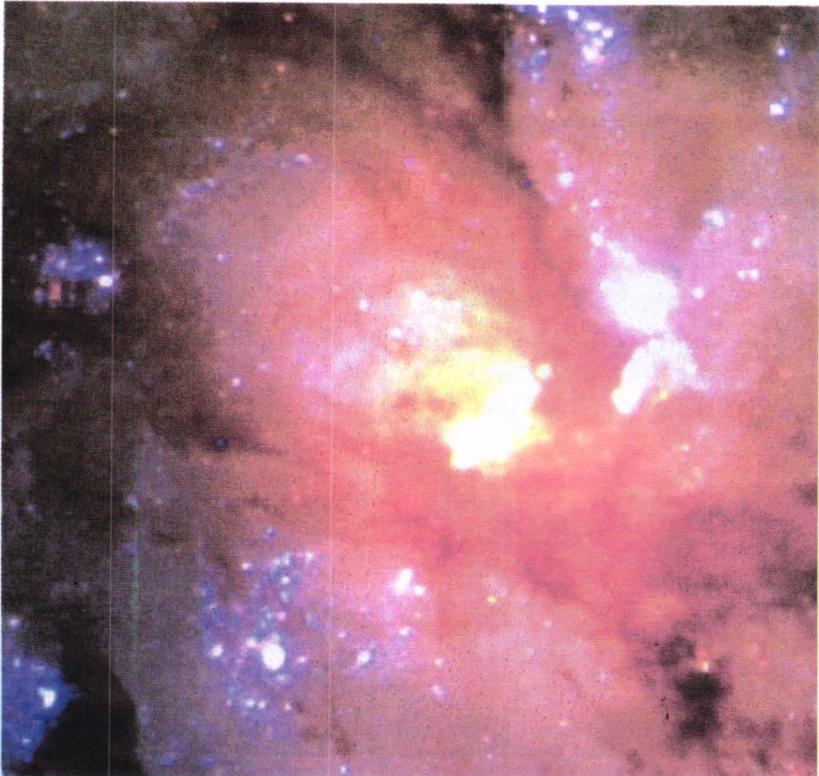
চিত্র–১৫৮

– একাধিক গ্যালাক্সির সংঘর্ষের কারণে মহাবিশ্বে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য সৌরজগত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা আমাদের গ্যালাক্সিতে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া অনুভব করছি না। এরূপ সহস্র কোটি গ্যালাক্সিও এ বিষয়ে কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে না।

তাই এ মহাবিশ্বে প্রতিটি মহাজাগতিক বস্তুর ধ্বংসকে স্থানীয় ধ্বংস বলা যায়, যা সমগ্র মহাবিশ্ব ধ্বংস হিসেবে চিত্রিত করা যায় না। সমগ্র মহাবিশ্বের ধ্বংস সংঘটিত হলে তখন কোথাও একটি বালিকণাও আর অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারবে না। সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ্র সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং জ্ঞানময় উল্লেখিত বক্তব্য প্রমাণ করছে 'আল্লাহ্' সত্য।

"আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট ।" (৫৩ ঃ ৪২)
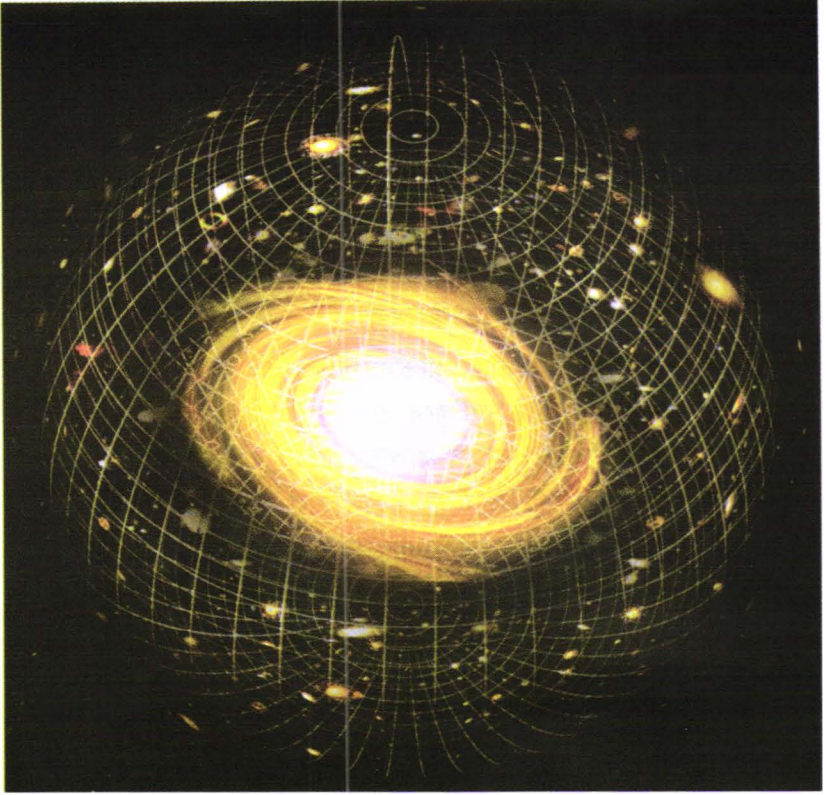
চিত্র–১৫৯

– একদল বিজ্ঞানী নিকট অতীতে বিশ্বাস করতেন যে, এ মহাবিশ্বের মহাসম্প্রসারণ গতিকে একদিন 'মহাকর্ষ' বল থামিয়ে দিয়ে স্প্রীংয়ের ন্যায় বিপরীতমুখী টান সৃষ্টির মাধ্যমে মহাসঙ্কোচন ঘটাবে । তাতে সমগ্র বস্তুভর একটি মাত্র বিন্দুতে ফিরে এসে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মহাবিশ্বের যবনিকাপাত ঘটাবে তারা এটাকে Big crunch নাম দিয়েছেন । এ জন্য অবশ্যই মহাসম্প্রসারণের গতির তুলনায় 'মহাকর্ষ' বল বেশী হতে হবে । আর 'মহাকর্ষ বল' বেশী হওয়ার জন্য অবশ্যই মহাবিশ্বে বস্তুর ঘনত্ব বর্তমানে আবিষ্কৃত পরিমাণের চাইতে আরো তিনগুন বেশী হতে হবে । যাই হোক বিজ্ঞানীগণও বিশ্বাস করছেন যে, সম্পূর্ণ মহাবিশ্বটি এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে । যা পূর্বেই কুরআন বলেছে ।

বস্তুভর (mass)কে মহাসঙ্কোচন পদ্ধতিতে ঘনীভূত করে করে এক পর্যায়ে অস্তিত্বের বাইরে অদৃশ্য করে দেবে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে। শেষ হয়ে যাবে মহাবিশ্বটি। অবশ্য বিজ্ঞানীগণ বলছেন, অদৃশ্য মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে আবার মহাজাগতিক নিয়মে প্রচণ্ড চাপ ও তাপের কারণে শর্ত পূরণ হয়ে নতুন করে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তাতেই নুতন করে আবার মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবে। এভাবেই একবার 'বিগ্-ব্যাংগ'-এর মাধ্যমে সৃষ্টি আবার ব্ল্যাক হোল-এর মাধ্যমে ধ্বংস পুনঃ পুনঃ ঘটতে পারে বলে বিজ্ঞান জগত বিশ্বাস করে এবং সে কারণেই তারা মহাবিশ্বটিকে 'ওসিলেটিং ইউনিভার্স' (Oscillating Universe) হিসেবেও অভিহিত করছেন।

এছাড়াও আরেকদল বিজ্ঞানী অতিসম্প্রতি আমাদের এ মহাবিশ্বের সম্পূর্ণরূপে মহাধ্বংস ঘটার ব্যাপারে ওপরে উল্লেখিত বিজ্ঞানীদের সাথে একমত পোষণ করলেও পদ্ধতির ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করছেন। তারা বলছেন যেহেতু মহাবিশ্বটি পূর্বে যে কোন এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে তাই ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে অবশ্যই এর পরিপূর্ণ ধ্বংস সাধন ঘটবেই, তবে পদ্ধতিটি হচ্ছে– 'প্রোটন অবক্ষয়' (Proton Decay)। মহাজাগতিক কোন এক অজ্ঞাত কারণে সমগ্র মহাবিশ্বের সকল প্রকার বস্তুর পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অন্যতম প্রধান উপাদান 'প্রোটন' (Proton) কণিকাগুলো বিবর্তনের মাধ্যমে নিজ অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করে মহাসূক্ষ্ম অন্যান্য কণিকায় রূপ নেবে। ফলে মুহূর্তের মধ্যেই সকল পদার্থের পরমাণুর অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার কারণে সমগ্র দৃশ্যমান মহাবিশ্বটি বিলীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। পদ্ধতি যা-ই ঘটুক মহাবিশ্বটিকে এক সময় নিশ্চিত যে ধ্বংস হতেই হবে বিজ্ঞান বিশ্ব বর্তমানে সে ব্যাপারে কিন্তু একমত।

ওপরে উল্লেখিত প্রথমে 'কুরআনিক' এবং পরে 'বৈজ্ঞানিক' দীর্ঘ আলোচনায় আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি যে, সমগ্র মহাবিশ্বের 'মহ-াধ্বংস' সাধনের ব্যাপারে উভয় বক্তব্যই এক ও অভিন্ন। ধ্বংসীয় বর্ণনার ধারা পৃথক পৃথক হলেও মূল বিষয় কিন্তু দুই নদীর একই 'মোহনায়' (এক জায়গায়) এসে মিলিত হওয়ার মত একাকার হয়ে গিয়েছে। সুতরাং স্থানীয় 'জগতসমূহের' কিয়ামাত বা ধ্বংস (Dooms Day) এক জিনিস এবং

"আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির ধ্বংস পতন স্থানের, অবশ্যই এটা এক গুরুতর শপথ যদি তোমরা জানতে পারতে!" (৫৬ ঃ ৭৫, ৭৬)
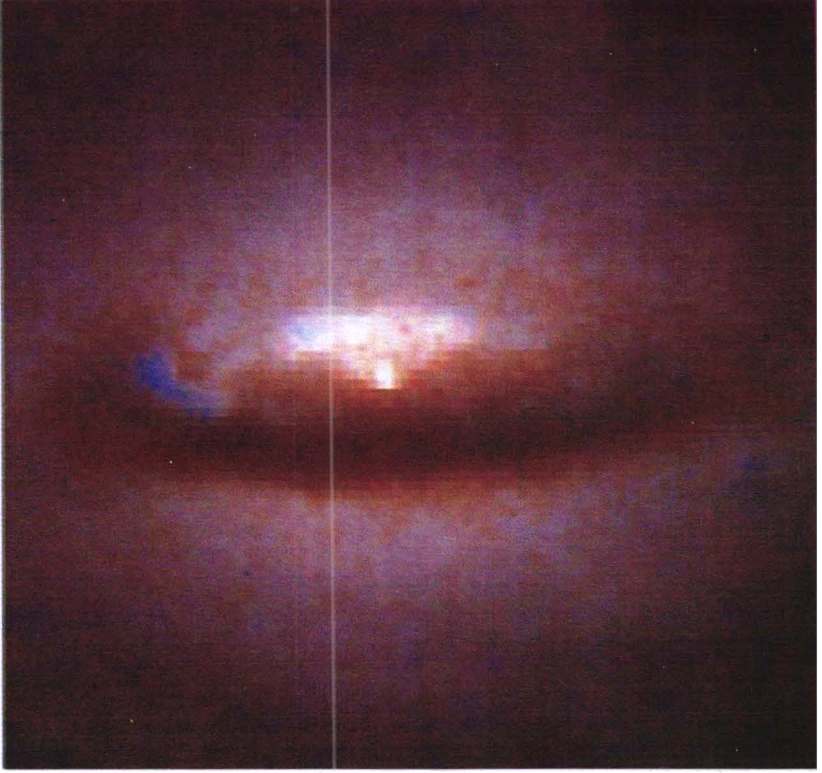
চিত্র–১৬০

– বর্তমান বিজ্ঞান তার গবেষণার মাধ্যমে আমাদের অবহিত করেছে যে, বিশাল এ মহাবিশ্বে রয়েছে লক্ষ কোটি 'Black Hole'। এরা মহাশূন্যে পরিভ্রমণরত অবস্থায় একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে একক বিশাল 'Black Hole'–এ রূপ নিতে পারে। যা হবে কল্পনাতীত ভয়ংকর এক ব্যাপার। ফলে বিশাল সেই 'Black Hole'–এর রাক্ষসী গ্রাসে পড়ে এক এক করে সকল গ্যালাক্সি হজম হয়ে যাবে। এক সময় ঐ 'Black Hole' ছাড়া মহাবিশ্বে আর কোন বস্তু থাকবে না। ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মহাবিশ্বটি।

বর্তমান বিজ্ঞানীদের একাংশের মতে উল্লেখিতভাবেও মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব এক সময় যে ধ্বংস হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

"সমগ্র মহাবিশ্বের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর-ই রয়েছে, এবং এর ধ্বংসের ব্যাপারতো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং উহা অপেক্ষাও সত্বর (দ্রুত)। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (১৬ ঃ ৭৭)
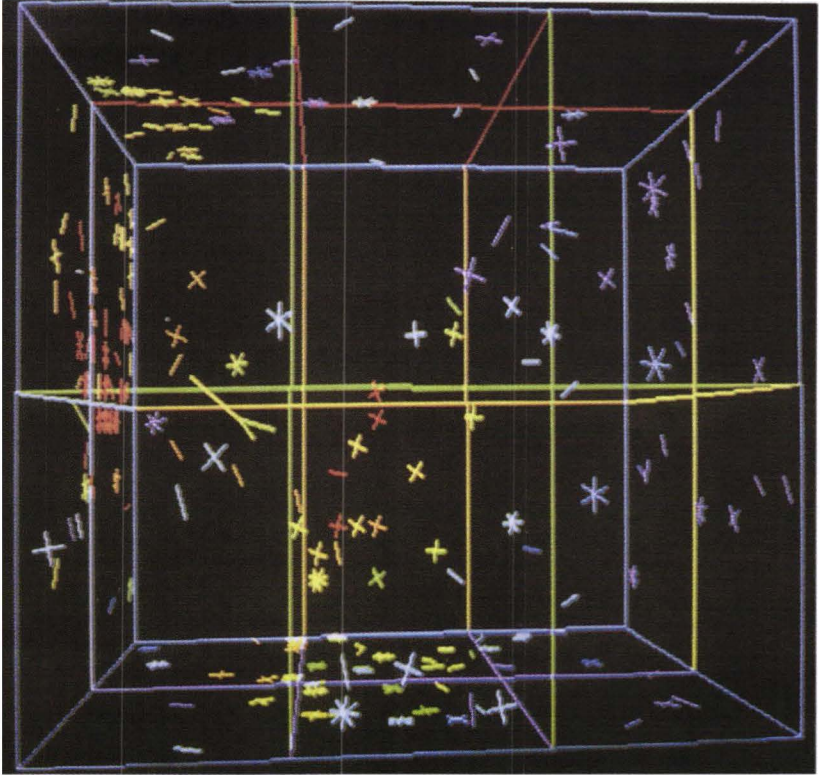
চিত্র-১৬১

– আমাদের মহাবিশ্বটি যে একদিন পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে, সে ব্যাপারে সকল বিজ্ঞানী একমত। তবে পদ্ধতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে।

একদল বিজ্ঞানীর মতে মহাবিশ্বের সকল বস্তুর মৌলিক একক 'পরমাণুর' মধ্যে নিউক্লিয়াসে যে 'প্রোটন' কণিকা রয়েছে, কোন কারণে যদি ঐ 'প্রোটন' কণিকাদের অবক্ষয় (Decay) ঘটে তাহলে, সেই Proton Decay -এর (প্রোটন অবক্ষয়ের) কারণে মুহূর্তের মধ্যেই নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে গিয়ে পরমাণু বিপর্যস্ত হবে। ফলে মহাবিশ্বের সকল প্রকার বস্তু তাদের দৃশ্যমান অস্তিত্ব হারিয়ে মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যাবে। সুতরাং বিজ্ঞান যে কুরআনের পথে চলছে তা কি অস্বীকার করা যায়?

"সমগ্র মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধুমাত্র তোমার প্রতিপালকের সত্তা ধ্বংসের অধীন নয়, যিনি মহিমময়, মহানুভব।" (৫৫ ঃ ২৬, ২৭)
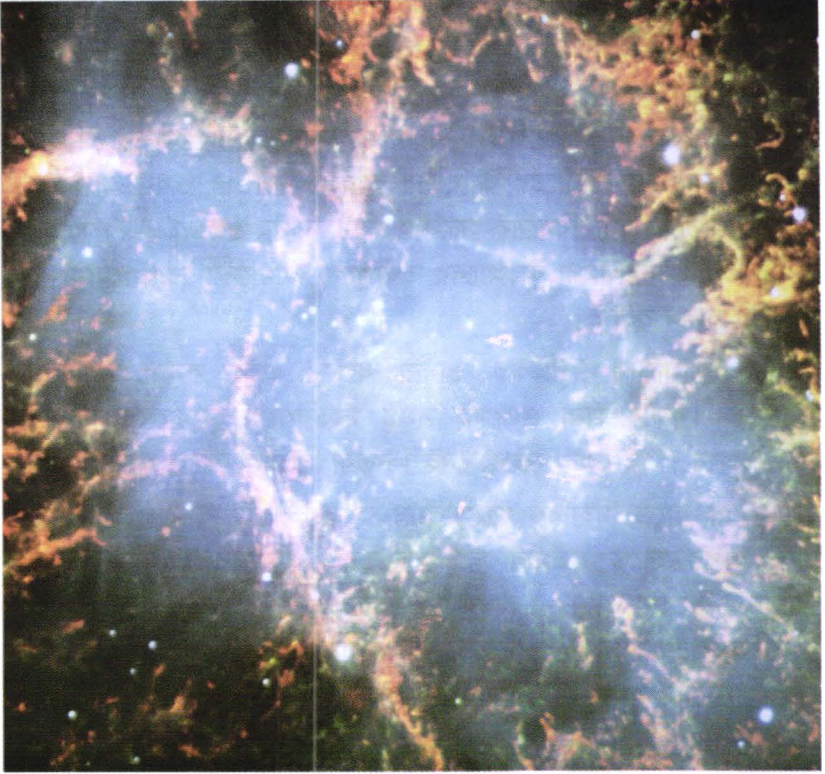
চিত্র–১৬২

– ওপরের ছবিতে আমাদের প্রিয় মহাবিশ্বটির মহাধ্বংসের মুহূর্তের কাল্পনিক ছবি দেখানো হয়েছে। যেভাবেই মহাবিশ্বটি ধ্বংস হোক না কেন, বর্তমান দৃশ্যযোগ্য গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ, ধূমকেতু নেবুলা ইত্যাদি সহ সকল কিছুকে নিয়ে মহাবিশ্বটি যে একদিন নির্ঘাত ধ্বংস হয়ে যাবে, বিজ্ঞান বিশ্ব তা মানব জাতিকে এক প্রকার নিশ্চিত করেছে।

সুতরাং কুরআন যে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই সে তথ্য মানব সম্প্রদায়কে অবহিত করেছে, এতে কি প্রমাণ হয় না যে আল্লাহ সত্য-সত্যই বর্তমান আছেন? তা না হলে এত বড় বৈজ্ঞানিক তথ্য কুরআন কিভাবে পেয়ে গেল? জ্ঞানী সমাজ একটু ভাববেন কী? সত্য-সঠিক পথটি গ্রহণ করতে সচেষ্ট হবেন কী?

মহাধ্বংস আরেক জিনিস, দু'টো বিষয় কখনই এক জিনিস নয়। আমাদের পৃথিবীর 'কিয়ামাত বা 'স্থানীয় ধ্বংস' এবং সমগ্র মহাবিশ্বের 'কিয়ামাত' বা মহাধ্বংসের বিষয়ে আমরা নিরেট বাস্তবতার আলোকে গবেষণায় নিয়োজিত হতে পারিনি বলেই এতোদিন এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ থেকে বঞ্চিত ছিলাম, যদিও 'কুরআন' বিষয়টি প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই আমাদেরকে অবহিত করেছে। একথাও সত্য যে এ ধরনের একাধিক বিষয়-ই সরাসরি বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর উৎকর্ষতার ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল, যে জন্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট 'তথ্য ও তত্ত্ব' উদ্‌ঘাটিত না হওয়ায় এতদিন আমরা কুরআনের তথ্যগুলো আমাদের বোধগম্যের মধ্যে আনতে সক্ষম হইনি।

আসলে আমাদের 'পৃথিবীর স্থানীয় ধ্বংস' এবং সমগ্র 'মহাবিশ্বের মহাধ্বংস' বুঝার জন্য প্রথমেই সমগ্র মহাবিশ্বকে বিজ্ঞানের আলোকে বুঝতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। নতুবা বিভ্রান্তি থেকে যাবেই।

এখন এক হাতে 'মহাবিশ্ব ধ্বংস' বিষয়ক কুরআনের অমোঘ বাণী সম্ভার এবং অপর হাতে বর্তমান সাফল্যে ভরা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতায় আবিষ্কৃত তথ্যের ভাণ্ডার এক ও অভিন্নভাবে একই বক্তব্য প্রদান করায় এ কথা কি প্রমাণ হয় না যে, মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্' যেমন মহাসত্য এক পবিত্র 'সত্তা', তেমনি মহাগ্রন্থ 'কুরআন'ও মহাসত্যতা সহকারে ভূ-পৃষ্ঠে অবতীর্ণ এক অনন্য ও অদ্বিতীয় আসমানী গ্রন্থ? অস্বীকার করার কোন পথ আছে কী? মানব সমাজের মধ্যে যারা 'সত্য'কে পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন তাদের জন্যই উদ্ধৃত বিষয়গুলো উজ্জ্বল নিদর্শন (Sign) হয়ে ঝলমল্ করছে। সৌভাগ্যবান সেই জ্ঞানীজন যারা কল্যাণের পথ মাড়াতে বিলম্ব করেন না।

সুতরাং এ কথা আজ অগ্রিম 'সত্যে' প্রমাণিত হয়েছে যে, এক সময় সমগ্র মহাবিশ্ব সকল কিছুসহ ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন এক ও একক 'আল্লাহ্' ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না।

এবার পুরো অধ্যায়টি আমরা এক নজরে দেখে নিই।

এক নজরে

বর্তমান বিজ্ঞান

১. বর্তমান সর্বোচ্চ সফলতায় পৌছার নিকটবর্তী হয়েও বিজ্ঞান সমগ্র মহাবিশ্ব ও এর ভেতরকার সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা কোনটা-ই রাখে না। বিজ্ঞানের পক্ষে এটা যে কখনও সম্ভবও নয় বিজ্ঞান তা স্বীকারও করে।

বিজ্ঞান তার যাত্রাক্ষণ থেকে এ যাবত যতকিছুই আবিষ্কার করেছে, এর কোন একটাও পূর্বেই দিন তারিখ ঘোষণা করে নির্দিষ্ট সময়ে তা সম্ভব করে তুলতে পারেনি। কেননা তা মূলতঃ বিজ্ঞানের হাতে ছিল না। আর সে জন্য কোন কোন বিষয়ে চেষ্টা সাধনা করতে করতে শত শত বৎসরও গড়িয়ে গেছে। এতে মহাবিশ্বব্যাপী সার্বিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অসহায়তাত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

তবে বিজ্ঞান বিশ্ব আশা পোষণ করছে ভবিষ্যতে মানব সম্প্রদায় এক এক করে মহাবিশ্বের অনেক সংবাদ-ই অবহিত হতে পারবে আবিষ্কারের মাধ্যমে।

পৃথিবীর বিজ্ঞান মহাবিশ্বের শুরুতে যেমন থাকার প্রশ্নই আসে না, তেমনি এক সময় সমগ্র মহাবিশ্বের চূড়ান্ত ধ্বংস মুহূর্তেও থাকার সম্ভাবনা

আল-কুরআন

১. "প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে।" (৬ ঃ ৬৭)

-অর্থাৎ সমগ্র মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার সকল বিষয়েরও যেহেতু নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ-ই করছেন নিজ তত্ত্বাবধানে, তাই পৃথিবীবাসী বিজ্ঞানের মাধ্যমে যা যা আবিষ্কার করছে- মূলতঃ তাও তিনিই তাঁর সিদ্ধান্তানুযায়ী ছাড় দিচ্ছেন বিধায় সম্ভব হচ্ছে। এভাবে তাঁর কারণেই বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানব সম্প্রদায় ভবিষ্যতেও এক এক করে সকল বিষয়ই অবহিত হবে।

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (৫৭ ঃ ৩)

-অর্থাৎ মহান 'আল্লাহ্'

শুরুতে একাই ছিলেন, আবার শেষ পর্যন্ত তাঁর পবিত্র 'সত্তা'-ই স্বগৌরবে একাকী বিরাজমান থাকবে, তখন আর অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব বজায় থাকবে না। ভবিষ্যতে কোন এক সময় সে মুহূর্তটিও এসে উপস্থিত হবে।

সমগ্র মহাবিশ্বে তিনি তাঁর কর্মতৎপরতার ভেতর দিয়ে যেমনিভাবে প্রকাশিত, তেমনি আবার আছেনও অদৃশ্যে লুকায়িত এবং এটা তাঁর মহাজ্ঞানের কারণে সর্ববিষয়ে জানেন বিধায় সম্ভব হচ্ছে।

নেই। কেননা, ঐ মুহূর্তের অনেক অনেক পূর্বেই 'মিল্‌কি ওয়ে' গ্যালাক্সি উড়ন্তাবস্থায় এক পর্যায়ে সঙ্কুচিত হয়ে পৃথিবীসহ সকল সৌরব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেবে এবং Singulaity তে প্রবেশ করবে।

বিজ্ঞান বিশ্বাস করে যে এক সময় সমগ্র মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।

পূর্বে একসময় যেমনি মহাবিশ্বটি বিরাজমান ছিল না, ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট করা সময়টি যখন এসে উপস্থিত হবে, তখন সম্পূর্ণ মহাবিশ্বটি ধ্বংসের মাধ্যমে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কোন কিছুরই তখন অস্তিত্ব থাকবে না। এটা এক ধ্রুব সত্য বিষয়।

২. *"তিনিই ছয়টি সময়কালে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আর্‌শের অধীন প্রতিষ্ঠা করেছেন। (৫৭ ঃ ৪)।*

-অর্থাৎ মহান স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা-ই তাঁর প্রচণ্ড শক্তি-ক্ষমতা ও মহাজ্ঞানের মাধ্যমে এ মহাবিশ্বকে সর্বমোট ছয়টি সময় কালের (Period) বা পর্যায়ের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করিয়ে এক প্রকার শূন্যাবস্থা থেকে বর্তমান দৃশ্য- যোগ্য অবস্থায় রূপ দিয়েছেন।

২. শতাব্দির পর শতাব্দির ধরে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে বিজ্ঞান বিশ্ব মাত্র এই সেদিন বিংশ শতাব্দিতে এসে আমাদের এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা পেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

বিজ্ঞান এখনও সরাসরি 'আল্লাহ্'কে স্বীকার না করলেও অনাকাঙ্খিতভাবে মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে 'আল্লাহ্'র দেয়া তথ্যের বাইরে যেতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। Big Bang Model-এর ওপর প্রায় বিগত শত বৎসর গবেষণা চালিয়ে 'আল্লাহ্'-র দেয়া তথ্যের অনুকুলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ে কেবল ছয়টি পর্যায় (Period) আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। যথা ঃ

এরপর মহাবিশ্বের একেবারে সূক্ষ্ম পর্যায় থেকে সর্ববৃহৎ সকল কাজের সুষ্ঠু তদারকের নিমিত্তে 'আরশের'- অধীন প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা অন্য কারও পক্ষে-ই সম্ভব নয়।

1. Plank Time or Time Zero.
2. Inflation Period.
3. Annihilation Period.
4. Proton & Neutron Period.
5. Atomic Nuclei Period.
6. Stable Atoms Period.

(বিস্তারিত জানার জন্য সিরিজ-১ দেখুন)

৩. "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (৪৬ ঃ ৩) -অর্থাৎ বর্তমান অস্তিত্বশীল এ প্রকাণ্ড মহাবিশ্বটি এক সময় ছিল না। এখন আছে, আবার এক সময় এর কিছুই থাকবে না। বর্তমানে দৃশ্যযোগ এ অবস্থা কতদিন থাকবে স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্ সৃষ্টির সময় 'একটা সময়' তিনি নিজ থেকেই নির্ধারণ করেছেন, যে সময়টি শেষ হওয়া মাত্র-ই তিনি সমগ্র মহাবিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবেন।

৩. আমাদের এ মহাবিশ্বকে বিজ্ঞান সৃষ্টি করেনি। বিজ্ঞান সে ধরনের অযৌক্তিক দাবীও কখনও করেনি।

বর্তমান বিজ্ঞান তার নিত্যনতুন উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের মাধ্যমে যথেষ্ট উৎকর্ষতা প্রাপ্তির পর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে মানব সমাজকে অবহিত করছে যে, এক সময় মহাবিশ্বটি যেমনিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক তেমনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর অবশ্যই এর চূড়ান্ত ধ্বংস সাধন ঘটবে। কেননা যার সৃষ্টির ইতিহাস আছে, তারই ধ্বংস অনিবার্য।

বর্তমান বিজ্ঞানী মহলে এ মহাবিশ্বের ধ্বংস বিষয়ক পদ্ধতি নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও কিন্তু মহাবিশ্বের ধ্বংসের ব্যাপারে তারা প্রায় সবাই একমত।

৪. "(মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে সমস্ত-ই নশ্বর (ধ্বংসের অধীন) অবিনশ্বর কেবলমাত্র তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব।" (৫৫ ঃ ২৬ ও ২৭)

৪. বিগত বিংশ শতাব্দিতেই সমগ্র বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনার ঝড় উঠেছিল তুলনামূলকভাবে বেশী। প্রথমদিকে বিভিন্ন প্রস্তাবের ব্যাপক চাপ থাকলেও শেষের দিকে উৎকর্ষিত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ফলপ্রসূ গবেষণা ও

পর্যবেক্ষণ চালিয়ে বিজ্ঞান বিশ্ব, সমগ্র মহাবিশ্ব যে এক সময় সত্যিকার অর্থেই একেবারে শূন্যাবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে এক সময় মহাবিশ্বটি মহাসূক্ষ্ম প্রতিটি কণিকাসহ সকল কিছুকে সাথে নিয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের মাধ্যমে চিরদিনের জন্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে সব তথ্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। এখন প্রায় সকল বিজ্ঞানী এ বিষয়ে একমত পোষণ করছেন যদিও বা চূড়ান্ত ধ্বংসের পদ্ধতি নিয়ে কিছু কিছু ভিন্ন মতামত রয়েছে।

"সেথায় (জাহান্নামে) তারা স্থায়ী হবে, যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্বটি) বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা-ই করেন।" (১১ ঃ ১০৭)

"পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেথায় তারা স্থায়ী হবে ততদিন, যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্বটি অস্তিত্ব নিয়ে) বিদ্যমান থাকবে। যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।" (১১ ঃ ১০৮)

আমাদের মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং এর পরিপূর্ণ ধ্বংসের ভেতর দিয়ে বর্তমান বিজ্ঞান জগতে এক নতুন ভাবনার উদ্রেক সৃষ্টি হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা কেন জানি এ ব্যাপারে একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী 'সত্তা'র অদৃশ্য হস্তক্ষেপকে খুঁজে পাচ্ছেন। যিনি এক ও একক আল্লাহ্। তিনি নিজ পরিকল্পনা মাফিক মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই নিয়ম-নীতি ও বাধ্যবাধকতার শিকলে যেন মহাবিশ্বটিকে বেঁধে রেখেছেন, ফলে একদা সৃষ্ট এ মহাবিশ্ব নির্বোধ শিশুর মত যেন এক পা এক পা করে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৫. "আর এও যে সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট।" (৫৩ ঃ ৪২)

৫. বিজ্ঞান এখনও সরাসরি এক 'আল্লাহ্'-তে বিশ্বাস স্থাপন না করলেও বর্তমানে উচ্চতর জ্ঞানময় তথ্যবহুল উদ্ঘাটনসমূহের মাধ্যমে অনুভব করছে যে সমগ্র মহাবিশ্ব এবং এর সকল কিছুর-ই পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও চূড়ান্ত পরিণতি

অর্থাৎ যে মহান সর্বময় ক্ষমতা-শক্তির অধিকারী ও মহাজ্ঞানী 'আল্লাহ্' এ

মহাবিশ্ব এবং এর ভেতর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার সকল কিছুই একদিন ধ্বংসের মাধ্যমে তাঁর নিকট-ই ফিরে যাবে। আর সেই প্রচণ্ড ও চূড়ান্ত ধ্বংসীয় কর্মটি তিনি নিজেই সম্পন্ন করবেন।

একটি সুতা দিয়ে যেন তুলনাহীন একটি উৎসের সাথে বাঁধা আছে। নতুবা কি করে এত প্রশস্ত মহাবিশ্ব (প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাপী চতুর্দিকে বিস্তৃত) এবং এর ভেতরকার সকল প্রকার শক্তি ও বস্তু একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির অধীন হয়ে সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে?

তাই বিজ্ঞান বিশ্বাস করে অদৃশ্য যে উৎস থেকে এ মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে, অবশ্যই মহাবিশ্বটি চূড়ান্ত ধ্বংসের মাধ্যমে একদিন সেই পরম উৎসে ফিরে যাবে। এতে কোন-ই সন্দেহ নেই।

উল্লেখিত প্রখর জ্ঞানময় বিষয়গুলো মানব সমাজের মধ্যে বসবাসরত প্রকৃত জ্ঞান তাপসদের সম্মুখে তাদের একমাত্র 'প্রভুর' বাস্তব উপস্থিতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন, সুতরাং কুরআনের ভাষায় বলা যায়, "এগুলোই প্রমাণ যে 'আল্লাহ্' "সত্য" (৩১ ঃ ৩০)। এবং "তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সঙ্গত। তাঁর বাণী কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয়-ই অবগত রয়েছেন।" (৬ ঃ ১১৫)

অতএব এক আল্লাহর পথেই রয়েছে মানব জাতির জন্য প্রকৃত কল্যাণ।
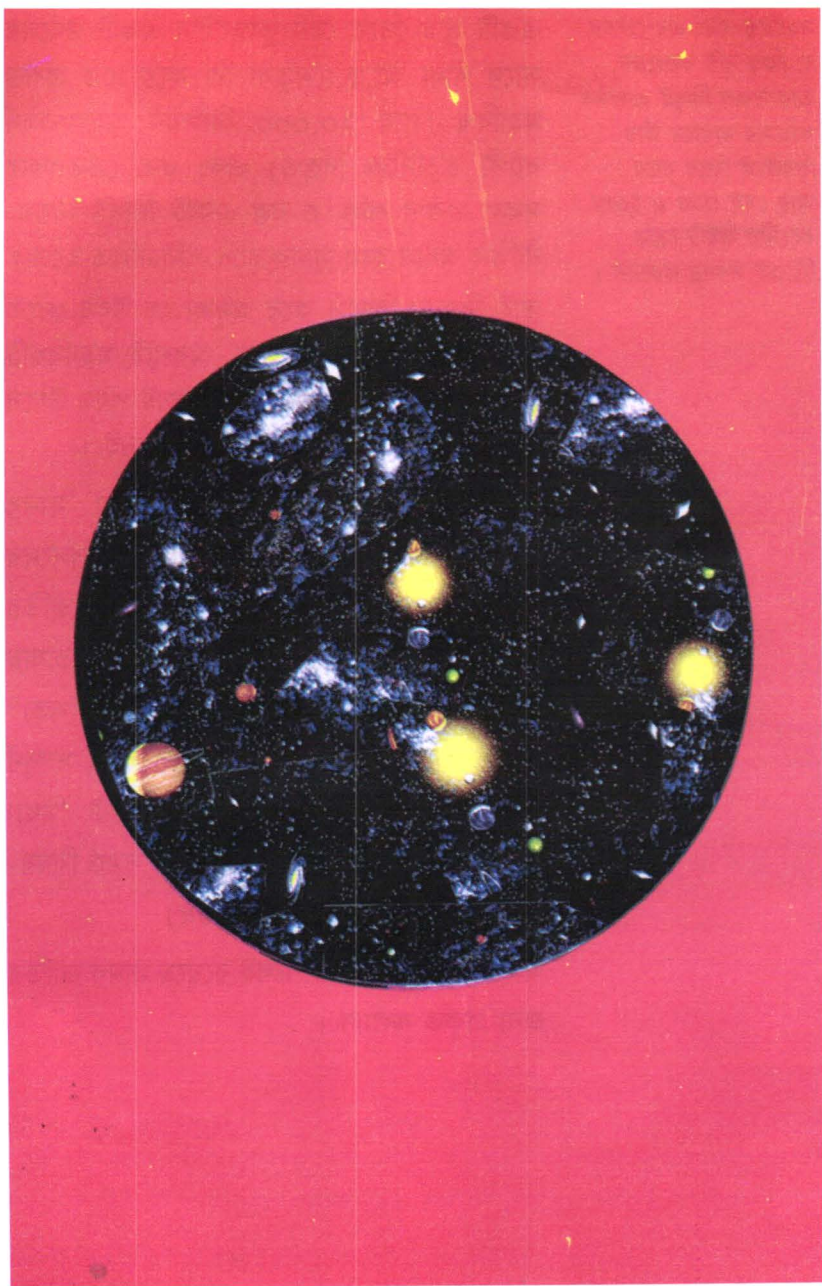
মহাবিশ্বের মহাধ্বংস কোন পথে?

আল্-কুরআন

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব) এবং ওদের অন্তরবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয়টি সময়কালে, আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" (৫০ ঃ ৩৮)

"আকাশমণ্ডলী (মহাবিশ্ব) নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই সম্প্রসারণ করছি।" (৫০ ঃ ৪৭)

"তাঁর আসন আকাশমলী ও পৃথিবীকে (মহাবিশ্বকে) পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এদের রক্ষণা-বেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।" (২ ঃ ২৫৫)

"(মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর (ধ্বংসের অধীন), অবিনশ্বর কেবলমাত্র তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব।

(৫৫ ঃ ২৬,২৭)

"আর এই যে,সমস্ত কিছুর সমাপ্তিতো তোমার প্রতিপালকের নিকট।"

(৫৩ ঃ ৪২)

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (৫৭ ঃ ৩)

"সেথায় (জাহান্নামে) তারা স্থায়ী হবে, যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন, তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন।" (১১ ঃ ১০৭)

"পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেথায় তারা স্থায়ী হবে, যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন, এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।"

(১১ ঃ ১০৮)

"তিনিই যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করেছেন, যখন তিনি বলেন, 'হও' তখনই হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য।" (৬ ঃ ৭৩)

"আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টা (মহাবিশ্বের) এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন, তখন শুধু বলেন, 'হও', আর অমনি ওটা হয়ে যায়।"

(২ ঃ ১১৭)

"আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে, আমার আদেশতো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত।" (৫৪ ঃ ৪৯-৫০)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্র-ই এবং (মহাবিশ্বের) ধ্বংসের আদেশ বস্তুতঃ চক্ষুর পলকের ন্যায় বরং তার চাইতেও দ্রুততর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (১৬ ঃ ৭৭)

মানব জাতির ইতিহাস প্রমাণ করে ভূপৃষ্ঠে আগত মানব জাতি কম-বেশী সবসময়ই পায়ের তলার পৃথিবী ও মাথার ওপর দৃশ্যমান জগত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে অগ্রসর হয়েছে। তবে উপায়-উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধার ওপর যে তাদের চিন্তা-চেতনা ও ভাবনার ফলাফল পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর সে কারণেই সভ্যতার প্রথমদিকে মানুষ নিজেদের ক্ষুদ্রপরিসরে শত চেষ্টা করেও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক তথ্য লাভে কূল-কিনারা করতে পারেনি। মানব জাতির এ অসহায়ত্বকে কোন অবস্থাতেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। ঘোর অমাবশ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব জাতির এহেন পরিস্থিতিতে তাদের একমাত্র প্রভু, সমগ্র মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা নিশ্চুপ হয়ে থাকতে পারেন না। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জ্ঞান রাজ্যে সৃষ্ট সমস্যার সার্বিক তথ্যসহ প্রকৃত সমাধান তথা নিরেট বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের 'মূলতত্ত্ব' তাদেরকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাথে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ দিয়ে সমৃদ্ধ গাইড বুক 'আল্-কুরআন' ও সাথে প্রতিনিধি প্রেরণ করে মানব জাতিকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতার শিকলে আবদ্ধ করে ফেলেছেন। মানব জাতি সুদীর্ঘ প্রায় ১৪০০ বৎসর থেকে

সমর্থ হলেও অধিকাংশ বিষয়ই যুগের চাহিদার সাথে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় আবিষ্কৃত হওয়ার ওপরই বোধগম্য হওয়া নির্ভর করেছে বেশী। যে কারণে সম্মানিত তাফসীরকারগণও বহু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব সম্বলিত আয়াতগুলোর উপর কোন প্রকার মন্তব্য করতে অপরাগতা প্রকাশ করেছেন নিঃসংকোচে। বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি আবিষ্কারই নিরেট বাস্তবতার কারণে কুরআনের পক্ষে চলে আসায় কুরআনের ঐ সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ মহাসত্যের আলোক উজ্জ্বল কিরণ ছড়িয়ে সমগ্র মহাবিশ্বকে উদ্ভাসিত করে দেয়ার সাথে সাথে মানব জ্ঞানের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতার বাঁধকে যেমন অপসারণ করতে সক্ষম হচ্ছে, তেমনিভাবে মানব সভ্যতাকেও প্রকৃত সত্যের দিশা দিয়ে বিস্ময়করভাবে ধন্য করছে। আমাদের বক্ষমান অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়টি যথার্থভাবেই ফুটে উঠেছে।

এখন প্রথমেই অধ্যায়ের শুরুতে উদ্ধৃত পবিত্র বাণীসমূহের মর্মকথা তুলে ধরতে চাই। পরে একই বিষয়ে বিজ্ঞানের সর্বশেষ রিপোর্টও পর্যালোচনার আমরা সুযোগ গ্রহণ করবো।

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর কিয়ামাত একটা স্থানীয় ধ্বংসযজ্ঞ যে ব্যাপারে আমরা এখানে আলোচনা করছি না। আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি মহাবিশ্বের সামগ্রিক ধ্বংসের পদ্ধতির ব্যাপারে।

উদ্ধৃত আয়াতগুলোর প্রথমটি থেকে সর্বশেষটি পর্যন্ত যে কথাগুলো আমাদের কর্ণকুহরে পৌছে দিতে চায়, তা হলো– আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন এক ও একক স্রষ্টা হিসেবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তথা দৃশ্যমান জগত এবং অদৃশ্য যত কিছুই আছে তার যা আমরা দেখতে সক্ষম হয়েছি আবিষ্কারের মাধ্যমে, আর যা এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে সকল কিছুই তিনি তাঁর মহাজ্ঞান ও প্রচণ্ড শক্তি-ক্ষমতা বলে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার আওতায় উল্লেখযোগ্য ৬টি পর্যায়ে বা সময়কালে (period) সৃষ্টি করেছেন। সূচনা থেকে মহাবিশ্বের পূর্ণাঙ্গরূপ গঠনের লক্ষ্যে তথা একেবারে অদৃশ্য-শূন্যাবস্থা থেকে পদার্থের আকার আকৃতি ও বিশেষ গুণাগুণসম্পন্ন অবস্থা লাভ করা পর্যন্ত অতিবাহিত 'সময়কাল' একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে থাকলেও

স্রষ্টা হিসেবে তাঁর কাছে এটা তেমন কোন ব্যাপারই না। মানব জ্ঞানের ক্ষুদ্রপরিসরে বিষয়টি নিশ্চয়-ই গুরুত্বের দাবী রাখে এবং মানব সম্প্রদায় এ বিষয়ে গবেষণার পর গবেষণা চালিয়ে পৃথিবী ধ্বংসের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মগ্ন থেকে শত বিস্ময়ের সমারোহে ও আয়োজনে হতবাক ও অভিভূত হলেও প্রকৃতপক্ষে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বিষয়টি একটি মামুলী ব্যাপার এবং সে জন্য তিনি কোন ক্লান্তিও বোধ করেন না।

শুধু তাই নয়। তিনি মহাজ্ঞান ও মহাক্ষমতা বলে মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করে সৃষ্টি-বিন্দু থেকে তাকে চতুর্দিকে এক প্রচণ্ড ও বিস্ময়কর গতিতে সুসমভাবে সম্প্রসারিত করেই চলেছেন। এই সম্প্রসারণ কখন, কোথায়, কিভাবে থেমে যাবে তা কারো জানার কথা নয়, যেহেতু বিষয়টি তিনি বিস্তারিত ও খোলা মেলাভাবে প্রকাশ করেননি। তবে মানবীয় জ্ঞানে সেই সম্প্রসারণের ব্যাপকতা তারা অবশ্যই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। সাথে সাথে একথাও উপলব্ধির সীমানায় পৌঁছুবে যে, তাদের প্রভুর পূর্ব ঘোষিত পবিত্র বাণীসমূহ মহাসত্যের এক দৃঢ় ও মজবুত ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট এ মহাবিশ্বটি যতই বিরাট-বিশাল ও সীমা-পরিসীমাহীন প্রকাণ্ড হোক না কেন মূলতঃ স্রষ্টার 'আসন' দিয়েই তা পরিপূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত ও আসনের মধ্যেই ধারণকৃত। মহাসম্প্রসারণের কারণে মহাবিশ্বটি যতই সম্প্রসারিত হয়ে বিশালত্ব লাভ করুক না কেন স্রষ্টার আসনকে তা ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম নয়। স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের এক সুনিপুণ হস্তে সকল কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যার ফলে মহাবিশ্বের সর্বত্র প্রতিটি বিষয়ের যথাযথ রক্ষণা-বেক্ষণও স্রষ্টার পক্ষ থেকে সাধিত হচ্ছে কোন প্রকার ক্লান্তি-অবসাদ ও ব্যর্থতা ব্যতিরেকে। আর এগুলো তাঁকে স্পর্শ করতে কখনই সক্ষম নয় যেহেতু তিনি সকল গুণে গুণান্বিত অতি উচ্চ এক মহান ও শ্রেষ্ঠ 'সত্তা'। যাঁর কোন তুলনা নেই, হতে পারে না।

যদিও আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ইচ্ছায় ও পরিকল্পনাতে বিরাট-বিশাল এ মহাবিশ্ব এবং ওর অভ্যন্তরে 'ইহকাল ও পরকাল' নামক দু'টি ভিন্ন বৈশিষ্ট সম্পন্ন জগত এবং উভয়ের মাঝে দৃশ্য-অদৃশ্য যত কিছুই সৃষ্টি করেছেন,

সকল কিছুই কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই টিকে থাকবে, স্রষ্টার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া সময় আগমন করার সাথে সাথে মহাবিশ্বটি ওর অভ্যন্তরে বিরাজমান সকল কিছুকে সাথে নিয়ে এক মহাধ্বংসের স্রোতে প্রবাহিত হয়ে এক অনিবার্য প্রলয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলার একক মহান সত্তার অস্তিত্ব ছাড়া সকল কিছুর অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য মুছে যাবে। এই অচিন্তনীয় ও জ্ঞান বহির্ভূত রূঢ় বাস্তব ধ্বংসীয় কাজটি মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতেই সম্পূর্ণরূপে পরিচালনা করবেন কঠোরভাবে। যেহেতু তিনিই এদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা, তাই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তিনি নিজ পবিত্র 'সত্তা' ব্যতীত সকল কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে অস্তিত্ব থেকে বিলীন করে দেবেন।

একটা দীর্ঘ সময় পরে হলেও আবার সর্বত্র একটি মাত্র ভাব ও অবস্থার সৃষ্টি হবে উল্লেখিত মহাবিশ্বের মহাধ্বংসীয় আয়োজনের মধ্য দিয়ে, আর তা হলো- "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত" (৫৭ ঃ ৩)। মহাবিশ্বের কোথাও নেই কোন কিছুর চিহ্ন, এমনকি কোন শক্তি, সময় ও মহাশূন্যতা বলতেও কিছুই আর টিকে থাকবে না। যা থাকবে, তা হলো মহান আল্লাহ্‌র এক ও একক পবিত্রতম 'সত্তা'। আল্লাহ্‌র পবিত্র 'সত্তা' কিভাবে, কোন পরিবেশে, কি আকারে থাকবে তা মানবীয় নগণ্যজ্ঞান কখনো-ই উপলব্ধি করার মত নয় বলেই সে সম্পর্কে আর তথ্য সরবরাহ করা হয়নি এবং মানুষের তা জানার প্রয়োজনও নেই। মহাবিশ্বের মাঝে একটি ক্ষুদ্র প্রাণী হিসেবে মানুষের জানা প্রয়োজন সৃষ্টির রহস্যাবলী, সৃষ্টির পেছনে লুকায়িত স্রষ্টার পরিচয় এবং সৃষ্টির নিকট স্রষ্টার চাওয়া-পাওয়া, আর এরই আলোকে সৃষ্টির সার্বিক তৎপরতা ও শেষ পরিণতি চালিয়ে যাওয়া। এতটুকুর মধ্যেই মানুষের সামগ্রিক কর্ম-কাণ্ড নিহিত রয়েছে।

মহাবিশ্বটি তখনই ধ্বংস করা হবে, যখন মানুষ তার ইহ্‌জগতের কর্ম-কাণ্ডের বিনিময়স্বরূপ শেষ পরিণতি নামক ভাল কর্মফলরূপে 'জান্নাত' এবং খারাপ কর্মফলরূপে 'জাহান্নামে' নির্দিষ্ট করা এক দীর্ঘ সময় (কোটি কোটি কোটি কোটি বৎসর যা মানবীয় জ্ঞানে হিসেব বহির্ভূত এক সুদীর্ঘ সময় পর)

অতিবাহিত করবে, ফলে ইহজগত ও পরজগত নামক দু'টি অংশে বিভক্ত মহাবিশ্বটি স্রষ্টার একটি মাত্র আদেশে-ই চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র একক অস্তিত্ব ছাড়া আরশ মুয়াল্লা, লৌহ-মাহফুয (মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র), পরজগতের জান্নাত ও জাহান্নাম এবং ইহ্‌জগতের গ্যালাক্সি, কোয়াসার, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহসহ সকল প্রকার বস্তু ও শক্তি বিলীন হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ রাব্বুর আ'লামিন এমন এক প্রচণ্ড ও মহাবিস্ময়কর প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পন্ন মহাজ্ঞানী সত্তা যে, তাঁর যে কোন ইচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁকে শুধু ইচ্ছা পোষণ করে 'হও' বলতে হয়। আর তাতেই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যা যা হওয়া দরকার তার সকল কাঙ্খিত অবস্থাটি যথাস্থানে যথাযথভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে থাকে। এর প্রকৃত রহস্য মানব জ্ঞানে এখনো অজানা, তবে ইতিমধ্যেই তিনি আমাদেরকে দয়া করে যতটুকুন তথ্য বিজ্ঞানের বর্তমান সর্বশেষ উদ্‌ঘাটিত বিষয়ের মাধ্যমে অবহিত করেছেন, তারই আলোকে বিষয়টি আগত পরবর্তী সিরিজে দ্রুত প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করছি, ইন্‌শাআল্লাহ্। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বাস্তবায়নের পথে তা সৃষ্টিকার্য হোক অথবা ধ্বংসকার্যই হোক, কোন প্রকার বাধা দান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার মত পরিবেশ কখনই তৈরী হয় না অথবা কেউ তৈরী করার মত ক্ষমতাও রাখে না। স্রষ্টার প্রতিটি কাজই অপ্রতিরোধ্য, বাধাহীন ও অবশ্যম্ভাবী সফলতার মোড়কে পরিবেষ্টিত এবং এতই স্বল্প সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে যে, মানবীয় কল্পনাকেও হার মানায়। বস্তুজগতে মানুষ সময়ের ক্ষুদ্রাংশাকে বুঝাবার জন্য সাধারণতঃ চোখের পাতার নড়া-চড়াকে বুঝিয়ে থাকে, আল্লাহ্‌র আদেশের বাস্তবায়ন মানুষের চোখের পাতার ঐ নড়া-চড়া অপেক্ষা আরও দ্রুত কার্যকর হয়ে থাকে। যেহেতু তিনি সকল ব্যাপারেই সর্বশেষ জ্ঞানে গুণান্বিত ও সকল কিছুর গোপন রহস্য (একমাত্র) তিনিই জানেন (স্রষ্টা হিসেবে জানাই স্বাভাবিক) তাই তাঁর যে কোন আদেশই 'হও' উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই ক্ষুদ্রতম

ভগ্নাংশের এক মহাসূক্ষ্ম অংশেই ব্যাপারটি নিস্পত্তি হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে মানব সমাজের জ্ঞানে বিষয়টির সূচনা মহাসূক্ষ্ম সময় অর্থাৎ $১০^{-৪৩}$ সেকেণ্ড প্রায়, ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে বিজ্ঞানের বদৌলতে। "তোমরাতো জানো কিভাবে প্রথম সৃষ্টির সূচনা করা হয়েছে, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?" (৫৬ ঃ ৬২)

তাই মানবকুলের জ্ঞানীদেরও বুঝা দরকার যে, মহাবিশ্বের 'সৃষ্টি মুহূর্তকালের' মত মহাবিশ্বের 'ধ্বংস মুহূর্তকালটিও' অনুরূপভাবে সময় স্কেলের এক মহাসূক্ষ্ম সময় মানে-ই চোখের পলকের চেয়েও দ্রুততর সংঘটিত হয়ে সমগ্র মহাবিশ্বকে বিলীন করে দেবে।

এখানে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এমন একটি পদ্ধতিকে বাছাই করে নিজের কাছে গোপন রেখেছেন, যে পদ্ধতিকে কার্যকর করে একদিন তিনি মহাবিশ্বকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন ও বিলীন করে দেবেন। তিনি 'হও' নির্দেশ দেয়া মাত্র এক মহাসূক্ষ্ম সময়ে 'মহাবিশ্ব' তার দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুকে সংগে নিয়ে মহাধ্বংসে হারিয়ে যাবে। এক আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই কোথাও বিরাজমান থাকবে না। চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হবে- "নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান"। (১৬ ঃ ৭৭)

ওপরে কুরআনের বাণীসমূহের পর্যালোচনায় আমাদের নিকট 'মহাবিশ্বের ধ্বংস বিষয়ক' যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে এসেছে আমরা তা সাজিয়ে নিতে চাই। যথা ঃ-

১. আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন তুলনাহীন এক ও একক মহাজ্ঞানী ও প্রচণ্ড শক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন মহান 'সত্তা' ও মহাবিশ্বের 'সৃষ্টিকর্তা'।

২. কোন কিছু সৃষ্টি করতে কিংবা ধ্বংস করতে তাঁকে শুধু ইচ্ছা পোষণ করে 'হও' নির্দেশটি প্রদান করতে হয়। আর অমনি তা সংঘটিত হয়ে স্রষ্টার নির্দেশ পালিত হয়।

৩. তাঁর 'হও' নির্দেশটি প্রদানের পর-পরই বিষয়টি এত দ্রুত নিস্পন্ন হয় যে, তা চোখের পলকের (পাতা) নড়া-চড়ার চেয়েও দ্রুততর।

৪. মহাবিশ্বের মাঝে ইহ্জগত ও পরজগত একত্রে সন্নিবেশিত করে সাজিয়ে যথাযথরূপে মহাবিশ্বকে অস্তিত্ব দান করতে মোট ৬টি পর্যায় কালকে কাজে

লাগিয়েছেন, যদিও মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনাসম্পন্ন হয়েছে মহাসূক্ষ্ম এক সময়কালে (১০$^{-৪৩}$ সেকেণ্ড প্রায়)।

৫. সমগ্র মহাবিশ্বটি (ইহজগত ও পরজগতসহ) আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র আসন দ্বারা সার্বিকভাবে পরিবেষ্টিত ও ধারণকৃত। তিনি তাঁর মহাজ্ঞান ও ক্ষমতা বলে কোন প্রকার ক্লান্তি-অবসাদ ছাড়াই এদের রক্ষণা-বেক্ষণ করেন।

৬. তিনি মহাসূক্ষ্ম এক সময়ে (১০$^{-৪৩}$ সেকেণ্ড প্রায়) যেমন মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা ঘটিয়েছেন, তেমনিভাবে ধ্বংসের ব্যাপারেও 'হও' নির্দেশ দিয়ে মহাসূক্ষ্ম এক সময়ের মধ্যেই মহাবিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধন করে চিরতরে নিশ্চিহ্ন ও বিলীন করে দেবেন। তাঁর আদেশের কোন ব্যক্তিক্রম হয় না, হতে পারে না।

নির্দিষ্ট করা সময়টি আগমন করা মাত্র ওপরে উল্লেখিতভাবে 'মহাবিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস' করার পর সর্বত্র এক ও একক 'সত্তা' হিসেবে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতম 'সত্তাই' বিরাজিত থাকবে। তিনি ইচ্ছা করে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, ঐ নির্দিষ্ট সময়টি আগমন করা মাত্র সকল কিছুকে ধ্বংস করে আবার পূর্বের একাকিত্বে তিনি ফিরে যাবেন স্বপ্রশংসায়, স্বগৌরবে ও স্বগরিমায়, সুবহানাল্লাহ্।

'কুরআন' থেকে আমাদের এ মহাবিশ্বের চূড়ান্ত মহাধ্বংসীয় বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ দিকটি যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে 'হও' নির্দেশটি প্রদানের সাথে সাথে 'চোখের পলকের চেয়েও দ্রুততর' মহাসূক্ষ্ম এক সময়কালে সংঘটিত হবে বলে যে ধারণা লাভ করেছি, এখন সে বিষয়ে বর্তমান উৎকর্ষিত বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কৃত তথ্যের আমরা পর্যালোচনার সুযোগ গ্রহণ করবো। দেখি প্রিয় বিজ্ঞান আমাদেরকে এ বিষয়ে কোথায় নিয়ে যেতে চায় এবং কি ধারণা দিতে চায়!

বিজ্ঞান

প্রথমদিকে বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত না হওয়ায় মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে ব্যাপক মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছিল। তখন বড় বড় বিজ্ঞানীদের মাঝে কেউ বলেছেন যে, এ মহাবিশ্ব বিশৃংখল এক পরিবেশের ভেতর দিয়ে জন্ম লাভ করেছে, কেউ বলেছেন এর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই নিজ থেকেই স্বতস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, আবার কেউ বলেছেন, না কারো কথাই ঠিক নয়, বরং এ মহাবিশ্বটি সৃষ্টি না হয়ে পূর্ব থেকে তথা অনাদিকাল থেকেই এভাবে আছে এবং কখনও ধ্বংস না হয়ে আবার অনন্তকাল পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। ফলে সমগ্র বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হয়েছিল এ মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যাপক ধূম্রজাল। মানব সমাজ তাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনেক ব্যাপারেই এ মহাবিশ্বের সঠিক তথ্যের ওপর নির্ভরশীল বলে উদ্ভুত পরিস্থিতির শিকার হয়ে হতাশার সাগরে হাবু-ডুবু খেতে থাকে। অবশেষে বিংশ শতাব্দির প্রথম সিকিভাগে বেলজিয়াম পদার্থবিদ 'লি মেইটর' প্রথমবারের মত ঘোষণা করেন যে, এ মহাবিশ্বটি শূন্যাবস্থা থেকে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে জন্ম লাভ করে (এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন 'আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-১; কুরআন সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিগ-ব্যাংগ-এ)।

এ সময় অসংখ্য বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির কারণে প্রস্তাবটি তেমন গুরুত্ব লাভ করতে পারেনি, তবে ১৯৪০ সনে দিকে বিজ্ঞানী 'গামো' এ প্রস্তাবের অনুকুলে অংক কষে প্রমাণ করে মতামত ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া সেই বিস্ফোরণে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া তাপমাত্রা (Back ground radiation) 3K. এখনো মহাবিশ্বে বিরাজ করছে। যথাযথভাবে অনুসন্ধান করা গেলে এখনও সেই তাপমাত্রা পাওয়া যেতে পারে।

এরপর একদিন-দু'দিন করে সময় গড়িয়ে যেতে থাকে এবং ১৯৬৫ সনে আমেরিকান দু'জন বিজ্ঞানী 'আরনো পেনজিয়াস' ও 'রবার্ট উইলসন' তাদের নিজস্ব কাজের জন্য তৈরী এন্টেনাতে কাজ করার সময় প্রায় হঠাৎ করেই এক প্রকার বিশৃংখল চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পেয়ে কৌতূহলবশতঃ ঐ শব্দকে তাপশক্তিতে স্থানান্তরিত করে দেখতে পান তা 2.73K. প্রদর্শন

"অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) একত্রে মিশে ছিল (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি ওদেরকে (মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে) পৃথক করে দিলাম!" (২১ ঃ ৩০)

চিত্র–১৬৩

– ১৯৩৩ সালে বিজ্ঞানী 'জর্জ লি' মেইটর' এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে সর্বপ্রথম 'Big Bang' তথ্য উত্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালে বিজ্ঞানী 'গামো' প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং অংক কষে দেখান যে, ঐ মহাবিস্ফোরণে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপমাত্রা (Back ground radiation) এখনও মহাবিশ্বে প্রায় 3K. বিরাজমান আছে।

১৯৬৪ সালে আমেরিকান দু'বিজ্ঞানী তাদের নিজেদের তৈরী এন্টেনাতে পরীক্ষা করার সময় হঠাৎ করে 2.73K. (কেলভীন) উক্ত তাপমাত্রা আবিষ্কার করেন। প্রমাণ হয়ে যায় Big Bang তথ্য সত্য ঘটনা।

"তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন?" (২৯ : ২০)
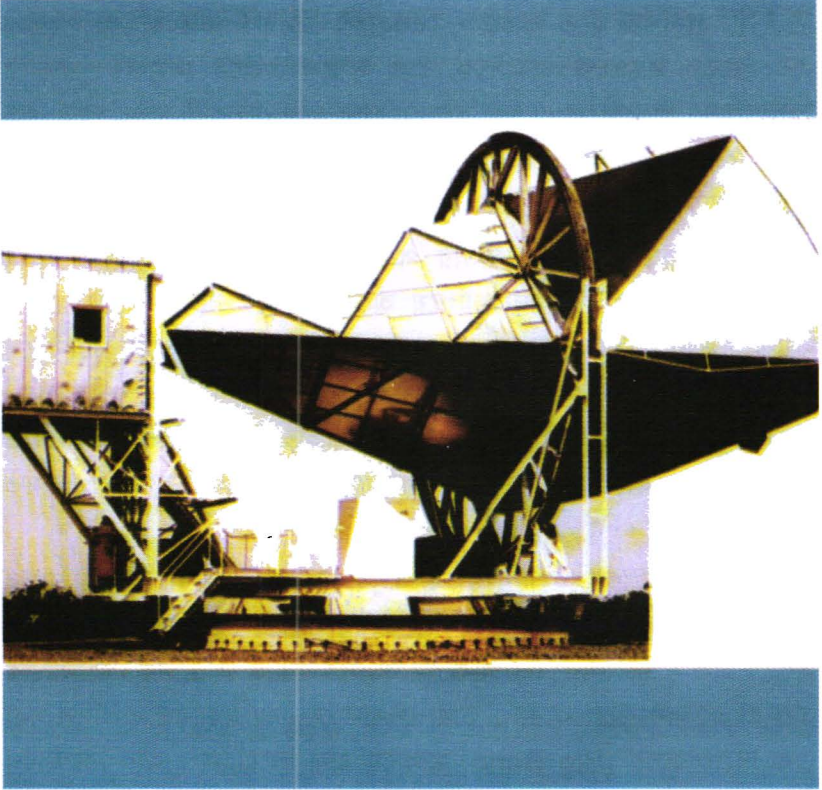
চিত্র-১৬৪

– ১৯৬৪ সালে আমেরিকান Bell Telephone কোম্পানীতে চাকুরীরত অবস্থায় বিজ্ঞানী 'মিঃ আরনো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন' তাদের কাজের প্রয়োজনে তৈরী এন্টেনাতে কাজ করার সময় এক প্রকার হঠাৎ করেই অদ্ভুত ধরনের শব্দ শুনতে পান। পরক্ষণে তারা ঐ শব্দকে তাপমাত্রায় পরিবর্তন করার সাথে সাথে 2.73k. প্রদর্শন করতে থাকে। তারা তাদের এন্টেনাকে মহাকাশের যেদিকেই ঘোরাতে থাকেন, সকল দিক থেকেই 2.73k, প্রদর্শিত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী একযোগে স্বীকৃতি লাভ করে যে 'সৃষ্টিতত্ত্ব 'Big Bang' সত্য ঘটনা। তার এর ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ্ যে সত্যই আছেন এবং তাঁর বাণী যে মহা সত্য, সে বিষয়ে এরপর আর কোন সন্দেহ থাকে কী?

করছে। তারা তাদের এন্টেনাকে এবার মহাবিশ্বের চতুর্দিকে ঘুরাতে লাগলেন কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না, সকল দিকেই তাপমাত্রা 2.73K. প্রদর্শিত হতে থাকলো, বিশ্বব্যাপী বিষয়টি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো এবং প্রমাণ সাপেক্ষে একদিকে তারা দু'জন একত্রে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন, অপরদিকে এ মহাবিশ্ব যে প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রায় শূন্যাবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সে তথ্যও Big Bang নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অতঃপর বিগত প্রায় ৩৫ বৎসর পর্যন্ত Big Bang modle-র ওপর বিজ্ঞানীগণ ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে অনেক বিষয়ে বহু তথ্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হলেও এ মহাবিশ্বের যবনিকাপাত কোন পথে, কিভাবে ঘটবে সে ব্যাপারে দলীলভিত্তিক (প্রমাণ সাপেক্ষে) কোন তথ্য দিতে পারেননি। তবে যেহেতু মহাবিশ্বটি সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু এ মহাবিশ্ব যে নির্ঘাত ধ্বংসের তাণ্ডবে পতিত হবে সে ব্যাপারে প্রায় সকল বিজ্ঞানী একমত পোষণ করছেন।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীগণ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে বসে না থেকে তাদের গবেষণামূলক কাজ চালিয়ে যান এবং মানব সমাজের প্রখর জ্ঞানময় দৃষ্টির সম্মুখে এক নূতন আঙ্গিকে মহাবিশ্বের ধ্বংস সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক এক প্রতিবেদন তুলে ধরেন। তাঁরা দেখান যে– এ মহাবিশ্ব একদিন মহা এক বিস্ফোরণের (Big Bang) মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিল। আর বিস্ফোরণ বিন্দু থেকে প্রচণ্ড ধাক্কায় (thrust) মহাবিশ্ব চতুর্দিকে ব্যাপক গতিবেগ প্রাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, ফলে সৃষ্ট গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সিপুঞ্জগুলো দারুণ গতিবেগে একে অপরের নিকট থেকে এখনও দূরে সরে যাচ্ছে। ১৯২৯ সনে আমেরিকান আকাশ বিজ্ঞানী 'মিঃ ইডুইন হাবেল' টেলিস্কোপে-র সাহায্যে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখান যে, গ্যালাক্সিদের মধ্যকার দূরত্বের ব্যবধান যত বেশী হবে দূরে সরে যাওয়ার গতিবেগ ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ বৃদ্ধির হার প্রতি ৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর প্রায় ৭৫ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। এ মহাবিশ্বে উক্ত বিস্তৃতির শক্তিকে বাধা দান করার জন্য মহাকর্ষ জাত আকর্ষণ-শক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে রয়েছে। মহাকর্ষ

"ওরা কি লক্ষ্য করে দেখে না, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন? এটা তো আল্লাহর জন্য সহজ।" (২৯ ঃ ১৯)
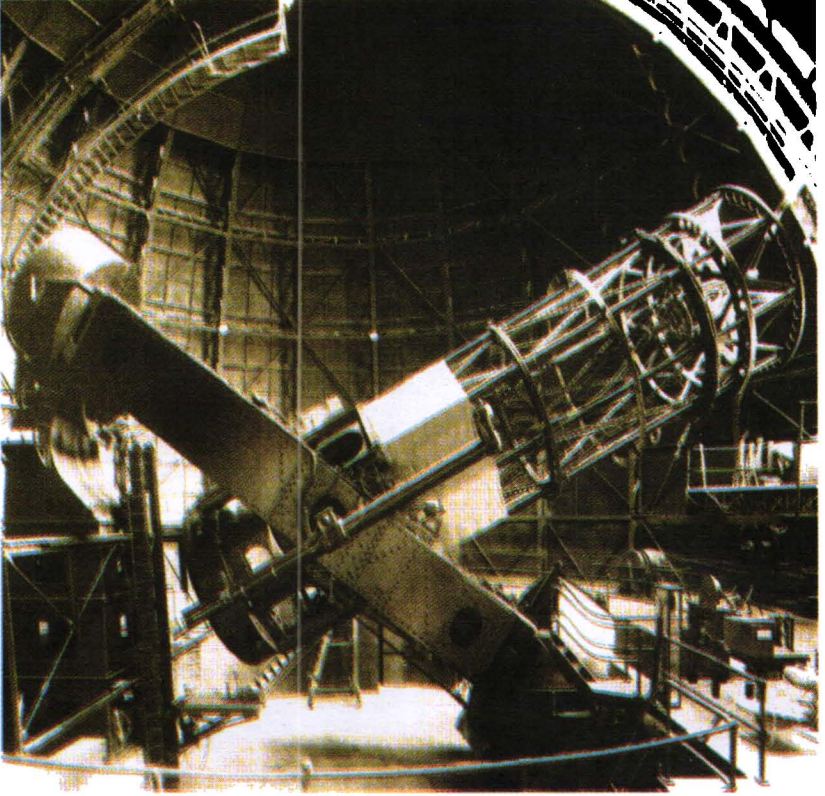
চিত্র—১৬৫

– ১৯২০ সনে আমেরিকান আকাশ বিজ্ঞানী 'মিঃ ইডুইন হাবেল পাওয়েল' মাউন্ট উইলসন টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে প্রথমবারের মত আকাশের গোপন রহস্য উন্মোচন করতে সক্ষম হন। তিনি লক্ষ্য করে দেখতে পান যে, লক্ষ-কোটি গ্যালাক্সি মহাকাশে উড়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে এবং প্রতিটি গ্যালাক্সি পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে গতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে। তাঁর এ রিপোর্টই মূলতঃ 'Big Bang' তথ্যের বীজ বপন করে। এতে প্রমাণ হচ্ছে– শুরুতে সকল গ্যালাক্সির বস্তুভর নিঃসন্দেহে একটি বিন্দুতে সঙ্কুচিত হয়ে জমা ছিল। পরে তা বিস্ফারিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে এবং গ্যালাক্সিগুলো বহির্মুখী চাপে চতুর্দিকে উড়ে যাচ্ছে।

"যারা উপদেশ গ্রহণ করে আমি তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে প্রদর্শন করেছি।"
(৬ ঃ ১২৬)

চিত্র—১৬৬

– বর্তমান বিজ্ঞানের সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আমাদের এ মহাবিশ্বে প্রায় ১০,০০০ কোটির ওপর গ্যালাক্সি বিরাজমান আছে। এরা সবাই যেন একটি বিন্দু থেকে চতুর্দিকে ক্রমশঃ গতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে সরে যাচ্ছে। প্রতি ৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ অতিক্রম করার সাথে সাথে গ্যালাক্সিদের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার হারে বেড়ে যায়। এভাবে উড়তে গিয়ে ক্রমান্বয়ে যখন আলোর গতিবেগ লাভ করে তখন মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানার দিকে গ্যালাক্সি সঙ্কুচিত হয়ে Singularity–তে পৌঁছে যায়। ফলে প্রচণ্ড চাপ এবং তাপে পুনরায় বিস্ফোরণ ঘটে নতুন জগত তৈরী করে। সুতরাং আল্লাহ্ এবং তাঁর বাণী মহাসত্যের ওপর যে প্রতিষ্ঠিত, এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই।

"(মহাবিশ্বসহ) প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করছে।" (৩৬ ঃ ৪০)
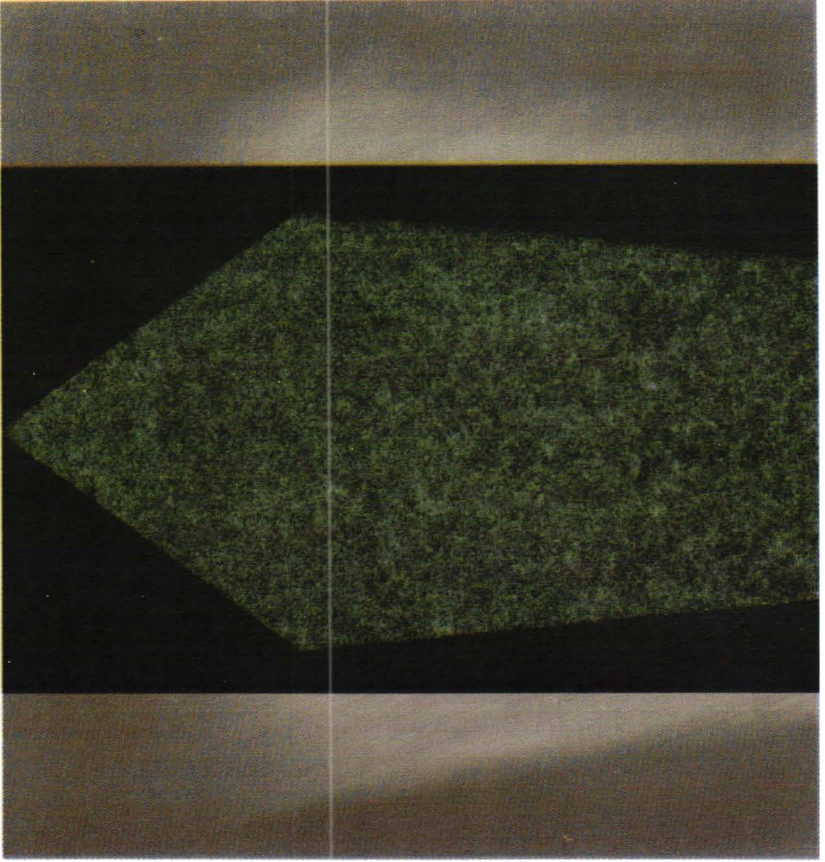
চিত্র–১৬৭

– আমাদের এ মহাবিশ্বটির অভ্যন্তরে ইহজগত ও পরজগতের যাবতীয় সকল প্রকার মহাজাগতিক বস্তুসমূহ যেমনিভাবে প্রতিনিয়ত বিরামহীনভাবে মহাশূন্যের মাঝে পরিভ্রমণ করে চলেছে, তেমনিভাবে সমগ্র মহাবিশ্বটিও একক ইউনিট হিসেবে নিজেও নিজ অক্ষের ওপর ভর করে প্রতিনিয়তই পাক খাচ্ছে। অর্থাৎ সমগ্র মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার সকল মহাজাগতিক বস্তু কেউ স্থির নেই বরং সবাই স্রষ্টার নির্ধারিত হিসেবে প্রতিনিয়তই পরিভ্রমণরত আছে। কুরআনের সেই যুগান্তকারী দাবী বর্তমান বিজ্ঞানও স্বীকার করছে। বিস্ময়কর নয় কী?

জাত আকর্ষণ-শক্তির কারণে গ্যালাক্সিপুঞ্জ এবং একক গ্যালাক্সি একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মহাকর্ষ শক্তির কারণে বিস্তৃতির গতির অনুপাতকে নিম্মাত্রায় ধরে রেখেছে। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল মহাবিশ্বে ক্রিয়াশীল হয়ে রয়েছে দু'টি বিপরীতধর্মী শক্তি, যথা ঃ মহাকর্ষ শক্তি ও বিস্তৃতি শক্তি। এখনও পর্যন্ত বিস্তৃতি-শক্তি মহাকর্ষ শক্তির ওপর প্রভুত্ব বজায় রেখে আসছে বলেই গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের নিকট থেকে পশ্চাদ দিকে চলে যাচ্ছে। উক্ত বিস্তৃতি শক্তি বিশ্বজগতের ওপর যদি প্রাধান্য বজায় রেখেই চলে তাহলে বিস্তৃতিও বিরামহীন অবস্থায় বিরাজমান থাকবে। এ সম্প্রসারণ বা বিস্তৃতির অনুপাত হয়তোবা কমের দিকে একদিন যেতেও থাকবে। কিন্তু বিশ্বজগত অনবরত বিস্তৃত হয়েই চলবে এবং উন্মুক্ত (Open) থাকবে। অপরপক্ষে যদি মহাকর্ষ শক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তাহলে এমন একদিন আসবে যখন বিস্তৃতির গতির অনুপাত কমতে থাকবে এবং কমতে কমতে অবশেষে শুন্যে নেমে আসবে। তাতে বিশ্বজগত একদিন উল্টো সঙ্কুচিত হতে থাকবে এবং অবশেষে সকল বস্তুভর সঙ্কুচিত হতে হতে অতিক্ষুদ্র ও অতিঘন মহাসূক্ষ্ম এক বিন্দুতে সংঘর্ষের মাধ্যমে ধ্বংস সাধন ঘটাবে।

আবার উভয় শক্তি নির্ভর করছে মহাবিশ্বে বিরাজমান বস্তুর গড় ঘনত্বের ওপর। যদি গড় ঘনত্ব (Average density) পরিবর্তিত অবস্থা (Critical value) অপেক্ষা কম হয়, তাহলে বিস্তৃতি শক্তি প্রাধান্য লাভ করবে এবং মহাসম্প্রসারণ দুর্বার গতিতে চলতেই থাকবে। কখনও তা থামবে না। আর গড় ঘনত্ব (Average density) যদি পরিবর্তিত অবস্থা (Critical value) অপেক্ষা বেশী হয়, তাহলে এক সময় সম্প্রসারণ থেমে গিয়ে মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে মহাকর্ষ শক্তি প্রাধান্য লাভ করার কারণে। তখন সকল গ্যালাক্সি পুনরায় বিপরীত দিকে Big-Bang বিন্দুর দিকে ছুটে আসতে শুরু করবে। ফলে এক সময় সকল বস্তুভর (mass) একটি বিন্দুতে প্রচণ্ড শক্তিতে সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে মহা এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। বিজ্ঞান এই বিষয়টিকে 'Big-Crunch' নামে অভিহিত করেছে।

"নিশ্চয়ই মহাবিশ্বের সর্বত্র (আল্লাহ্‌র উপস্থিতির অকাট্য বৈজ্ঞানিক) নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।" (৪৫ : ৩)
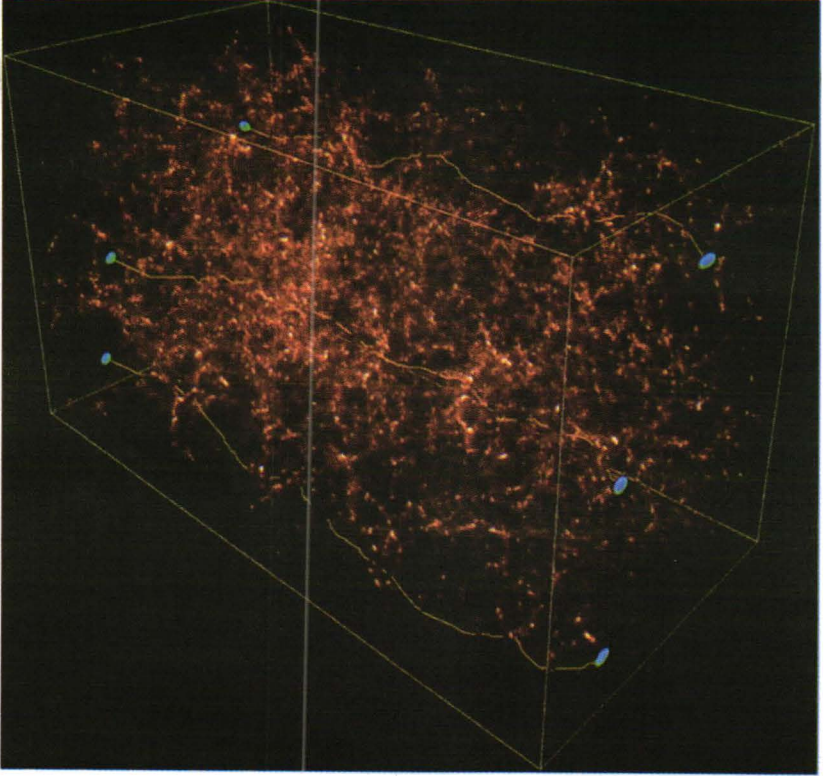
চিত্র-১৬৮

– ওপরের ছবিটি Computer Simulation-এ তৈরী, ছবিতে মহাবিশ্বের অভ্যন্তরস্থ দু'টি বিন্দুতে আলোর চলার পথ কিভাবে 'Dark Matter'-এর কারণে মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বেঁকে যাচ্ছে তা দেখানো হয়েছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে মহাবিশ্বে 'Dark Matter' উপস্থিতি বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যালাক্সিসমূহ এবং অনুমানকৃত 'Dark Matter' বিবেচনায় নিলেও বস্তুর 'গড় ঘনত্ব' (Average density) বস্তুর পরিবর্তিত অবস্থার (Critical Value) মাত্র ৩০%, তাই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ শক্তিকে 'মহাকর্ষ বল' থামিয়ে দিয়ে সঙ্কোচন ঘটাবার মত ক্ষমতা রাখে না। তাই 'Big Crunch' ঘটার সম্ভাবনাও নেই। মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে ঠিকই, তবে অন্য কোন পদ্ধতিতেই তা ঘটবে।

বিজ্ঞানের উক্ত রিপোর্টে সকল বিজ্ঞানী একমত হতে পারেননি। যারা দ্বিমত পোষণ করেছেন তারা দেখিয়েছেন যে, আমাদের এ মহাবিশ্বে বস্তুর ঘনত্বের তুলনায় পরিবর্তিত অবস্থা (Critical Value) প্রতি ঘন আলোকবর্ষে মাত্র চন্দ্রের দেহ-বস্তুর (mass) সমান। ফলে আবিষ্কৃত প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি সমেত সকল পরিচিত বস্তুর দেহ-বস্তুকে বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে, 'গড় ঘনত্ব' (Average density) পরিবর্তিত অবস্থা (Criatcal value)-র মাত্র ৩০% হবে। এ অবস্থায় মহাবিশ্ব অনবরত বিরামহীনভাবে শুধু বিস্তৃতি লাভ করারই কথা এবং তাই যদি হয়, তাহলে তো মহাবিশ্বটি অবশ্যই 'সমতল মহাবিশ্ব' (Flat Universe)। সুতরাং তাদের কথা মতো কখনই Big-Crunch ঘটার সম্ভাবনা নেই।

অপরদিকে 'Big-Crunch' পক্ষের বিজ্ঞানীদের বক্তব্য হচ্ছে মহাবিশ্বটি দৃশ্যমান গ্যালাক্সি, অগণিত সংখ্যক নক্ষত্র গিলে খাওয়া বিশাল বিশাল ভয়ংকর 'ব্ল্যাক হোল' ও দৃশ্যের চেয়ে অধিক পরিমাণে অদৃশ্য বস্তু ('Drak matter') দিয়ে সমৃদ্ধ। ফলে এদের সবার সমষ্টিগত গড় ঘনত্ব অবশ্যই Criatcal value অপেক্ষা অধিক হবে। অতএব এমন একদিন আসবে যখন মহাবিশ্বের বর্তমান সম্প্রসারণ বা বিস্তৃতি থেমে গিয়ে উল্টো সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। এক পর্যায়ে সমস্ত বস্তুভর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে আগমনের চেষ্টা করার কারণে পরস্পর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মহা এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মহাবিশ্বের যবনিকাপাত ঘটাবে।

পক্ষের বিজ্ঞানীগণের মধ্যে আমেরিকান বিজ্ঞানী 'ফ্রিম্যান ডাইসন' বিষয়টিকে এভাবে তুলে ধরেন যে, Big-Crunch-এর প্রায় এক বিলিয়ন বছর পূর্বেই গ্যালাক্সিপুঞ্জের মধ্যকার শূন্য জায়গা (Space) সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। অতঃপর Big-Crunch-এর প্রায় একশত মিলিয়ন বছর পূর্বে একক গ্যালাক্সিদের মধ্যকার শূন্য জায়গা (Space) সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। অতঃপর Big-Crunch-এর প্রায় একশত মিলিয়ন বছর পূর্বে একক গ্যালাক্সিদের মধ্যকার শূন্য জায়গা (Space) সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করবে। তখন সমগ্র মহাবিশ্ব আর গ্যালাক্সিরূপে না থেকে পুরোটাই নক্ষত্র

দিয়ে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং নক্ষত্রগুলো একে অপরের কাছাকাছি এসে পড়বে। তারপর Big-Crunch-র প্রায় এক লক্ষ বছর পূর্বে সমস্ত নক্ষত্রগুলো মহাসঙ্কোচনের কারণে এতই নিকটবর্তী হয়ে পড়বে যে, সেগুলো একত্রে এক সঙ্গে একটা বিশালকায় সূর্যের মত হয়ে কিরণ বিচ্ছুরিত করবে। পরবর্তীতে 'Big-Crunch-র প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে নক্ষত্রদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ ঘটবে, যার ফলে অসংখ্য Black hole তৈরী করে তারই মধ্যে মহাবিশ্বের সঙ্কুচিত হয়ে আসা সমস্ত বস্তুভরকে প্রচণ্ড ঘনায়নের ভেতর দিয়ে এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity-তে) জমিয়ে দিবে। তাতে সফল হবে Big-Crunch। Big-Crunch-র পক্ষে বিজ্ঞানীগণ ১৯৯০ এর আগ পর্যন্ত উক্ত অভিমত প্রকাশ করে সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের অনুকূলে ধরে রাখতে সমর্থ হলেও বর্তমান বিজ্ঞানের উজ্জ্বল পরিবেশে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে একান্ত প্রমাণিত তথ্যের আলোকে।

আমাদের মহাবিশ্বটি যে 'বদ্ধ মহাবিশ্ব' (Closed Universe) নয় এবং সমস্ত বস্তুভর (mass) একসময় সম্প্রসারণ থেমে যাওয়ার কারণে বিপরীত দিকে মহাসঙ্কোচনের সৃষ্টি করে একটি বিন্দুতে তথা 'অনন্য'তে (Singularity-তে) আগমন করে অনিবার্যরূপে 'Big-Crunch-র মাধ্যমে ধ্বংস সাধন যে ঘটাবে না, সে ব্যাপারে অতি সম্প্রতি কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় (Experiment) বিপক্ষের বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, এর জন্য বিজ্ঞানীগণ 'BOOME RANG' টিম নামে কয়েকটি প্রকল্প (Project) হাতে নিয়েছিলেন যেগুলো নীচে পর পর তুলে ধরছি। যেমন–

১. COBE SATELLITE : বিজ্ঞানীগণ ১৯৯২ সনে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত COBE (Cosmic Background Explorer) স্যাটেলাইট দিয়ে Big-Bang মহাবিস্ফোরণের পরক্ষণে নবীন মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়া Cosmic Microwave Background (CMB)-এর মসৃণ ক্ষুদ্র তরঙ্গ' (Ripple) গুলোর ছবি সমগ্র আকাশ জুড়ে ধারণ করেন এবং তা যথাযথভাবে গবেষণা করে দেখতে পান Big-Bang বিস্ফোরণ সম্পূর্ণরূপে ১০০ ভাগই সমতা বজায় রাখেনি। ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁচকানো ভাঁজগুলো (Tiny Fluctuations)

"সমগ্র মহাবিশ্বের ওপর পূর্ণ আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই রয়েছে।" (৪৫ ঃ ২৭)
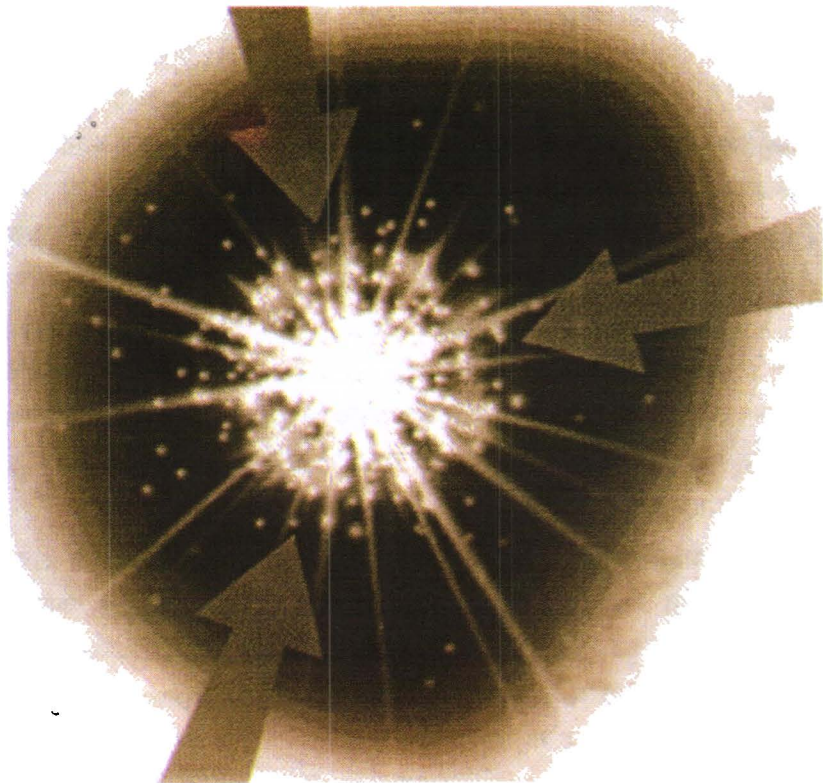
চিত্র-১৬৯

– যেহেতু বিজ্ঞানের সর্বশেষ পর্যবেক্ষণগুলোতে (যা একটু পরেই পর্যায়ক্রমে দেখানো হয়েছে) প্রমাণ হয়েছে আমাদের মহাবিশ্বটি বদ্ধ (closed) নয় বরং সমতল (flat)। তাই দীর্ঘদিন থেকে বিজ্ঞানীগণ যে Big crunch'-এর কথা বলে আসছিলেন এখন তা আর বলছেন না। মহাবিশ্বের মহাসম্প্রসারণ এখনও যে হারে ঘটছে বলে পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞানীগণ নিশ্চিত হয়েছেন, তাতে অদূর ভবিষ্যতে তা থামার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। তাই মহাবিশ্বের যবনিকাপাত ঘটার জন্য Big Crunch ধারণা সত্য নয়। কুরআনও Big crunch-এ সায় দেয় না। কেননা এখনই Big crunch শুরু হলে তা সম্পন্ন হতে সময় লাগবে প্রায় ১৫০০ কোটি বছর। অথচ কুরআন বলছে- আল্লাহ্‌ 'হও' বলতেই তা ঘটে যাবে। সুতরাং Big crunch এ ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নয়। অন্য কোন পদ্ধতিতে তা ঘটবে।

"যখনই তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন তাদের নিকট প্রকাশিত হয় তখনই তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ এর পেছনে যে একজন স্রষ্টা কার্যরত আছেন এবং এটা যে পরিকল্পিত একটা কাজ তা তারা মেনে নেয় না)।" (৩৬ ঃ ৪৬)
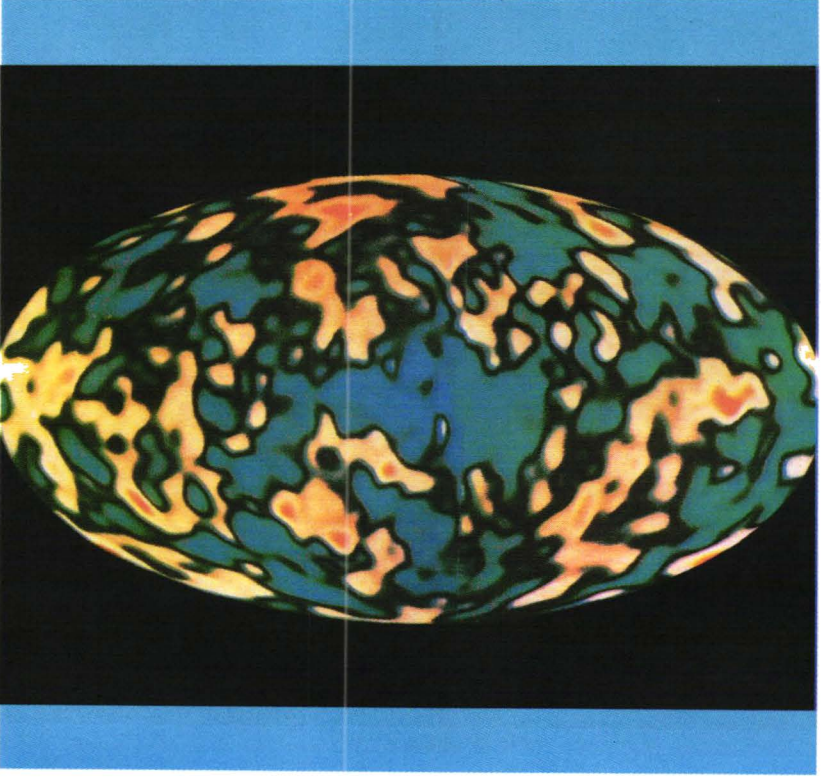
চিত্র–১৭০

– ওপরের ছবিতে নবীন মহাবিশ্বে সম্প্রসারণশীল অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁচকানো লাল অংশগুলো খুবই উত্তপ্ত এবং কালো অংশগুলো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে উত্তপ্ত লাল অংশে গ্যালাক্সিগুচ্ছ জন্ম নেয় এবং অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা কালো অংশ 'মহাশূন্যে' (Space) রূপ নেয়। অতএব শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মহাবিশ্বের সর্বত্র ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁচকানো ভাঁজগুলো (Subtle Ripples) একই সমতা রক্ষা করায় প্রমাণিত হচ্ছে মহাবিশ্বটি 'Flat' (সমতল)। যেহেতু মহাবিশ্বটি closed (বদ্ধ) নয়, তাই Big Crunch ঘটবে না। অতএব Big Crunch এখন পরিত্যক্ত।

"এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে (তোমার প্রতিপালকের উপস্থিতির), কিন্তু তাদের অধিকাংশই তারপরও বিশ্বাস স্থাপন করে না।" (২৬ ঃ ১৩৯)
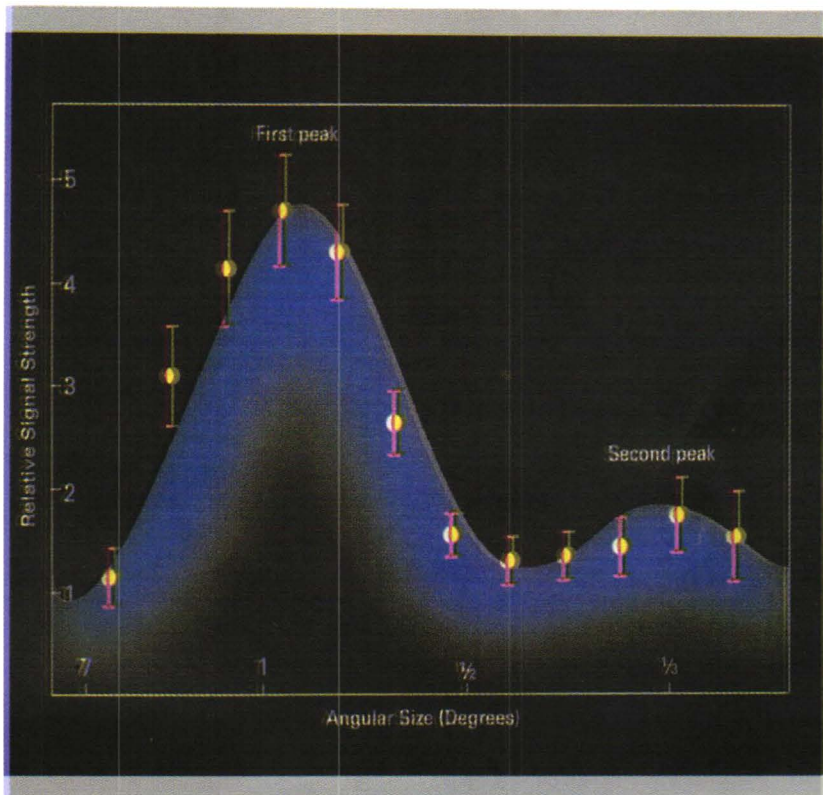
চিত্র–১৭১

– The microwave background peaks at several angular sizes where the signal is stronger. The peaks correspond to the average angular size of hot and cold spots in the microwave background. The biggest peak shows up at 1°, which is where it should be in a flat universe (সমতল মহাবিশ্ব). *The second peak is smaller than expected, which could mean there is more atomic-type matter in the universe.*

সুতরাং সমতল মহাবিশ্বে Big Crunch ঘটবে না। ঘটবে অন্য কোন ব্যবস্থা।

'অগ্নি গোলক' (Fireball) নামে নবীন সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বকে মাঝে-মাঝে খুবই উত্তপ্ত (Hotter) অংশে ও মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা (Colder) অংশে বিভক্ত করে রাখে। উল্লেখিত উত্তপ্ত অংশগুলোই পরবর্তীতে গ্যালাক্সিগুচ্ছের 'ভ্রুণ' বা 'বীজ' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উত্তপ্ত ও ঠাণ্ডা অংশের (Hot and cold patches) মসৃণ ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলো (Ripples) এক পাশ থেকে অপর পাশ পর্যন্ত ৭^{O} (7^{0}) প্রদর্শন করে যা প্রায় ১৪টি পূর্ণ চন্দ্রের সমান চওড়া। অতঃপর ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে COBE satellite principle investigator 'George smoot' সিদ্ধান্ত দেন যে, CMB–র ছবির 'মসৃণ ক্ষুদ্র তরঙ্গ (Subtle ripples) প্রমাণ করছে আমাদের মহাবিশ্বটি বদ্ধ (closed) নয় বরং 'সমতল' (Flat), কেননা ছবিতে সর্বত্র 'মসৃণ ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলো (Subtle ripples) একই সমতা রক্ষা করায় মহাবিশ্বে 'স্ফীতকরণ' (Inflation) এর নিদর্শন তুলে ধরেছে, আর তাই যদি হয়, তাহলে মহাবিশ্বটি কেবলই দুর্বার গতিতে চতুর্দিকে বর্ণনাতীত এক মহাসম্প্রসারণে বর্ধিত হয়ে চলেছে, সুতরাং Big-Bang বিস্ফোরণের প্রায় ৩০০,০০০ বৎসর পর যখন মহাবিশ্বটি উপ-আণবিক (Sub-Atomic) পদার্থ কণা (Particle) ও বিকিরণের (Radiation) মিশ্রিতরূপে বিরাজমান ছিল, তখন নবীন মহাবিশ্বের সর্বত্র তাপমাত্রা (Big-Bang বিস্ফোরণের পরবর্তী পরিত্যক্ত তাপমাত্রা) একই জাতীয় অবস্থার সৃষ্টি করে বিরাজিত থাকায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে মহাবিশ্বটি 'সমতল' (flat), আর সে কারণে অনন্ত কালের জন্য সম্প্রসারণ চলতেই থাকবে বন্ধ হবে না, ফলে Big Crunchও ঘটার সম্ভাবনা নেই।

২. **BALLON FLIGHT** : BOOMERANG (Baloon Observations of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics) টীম পরবর্তীতে বিষয়টির সত্যতা নিরূপণের জন্য ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে প্রায় ১০ দিনের জন্য বড় আকৃতির প্রায় ৮০০,০০০ কিউবিক মিটার বেলুনে ১৪০০ কিলোগ্রাম ওজনের 'বুমেরাং' টেলিস্কোপ পুরে দিয়ে বেলুনটিকে এ্যান্টারটিকার প্রায় ৩৫ কিলোমিটার ওপর দিয়ে উড়ে মহাবিশ্বে এখনও চিহ্ন হিসেবে বিরাজমান Cosmic Microwave Back Ground-এর

ছবি ধারণ করার কাজে নিয়োজিত করেন। বেলুনটি ১০.৫ দিন আকাশে উড়ার সময় Big-Bang ঘটার পরবর্তী সময়ে উদ্ধৃত তাপমাত্রা যা এখনও Sound Wave হিসেবে মহাকাশে পরিভ্রমণ করছে তা বেলুনে রক্ষিত ১.২ মিটার আয়না (mirror) এবং ডিটেকটর্স (ditectors) দিয়ে চার প্রকারের Sound Waves-র (90,150,240, 3400 GHz) সামঞ্জস্য বিধান (tuned) করে প্রথম উড়ার স্থান থেকে প্রায় ৩১ কিলোমিটার দূরে নির্দিষ্ট প্লাটফরমে অবতরণ করান। বিজ্ঞানীগণ পরবর্তীতে ঐ সকল Sound Wave Frequenciesগুলোকে তাপমাত্রায় পরিবর্তন করে তার ছবি গ্রহণ করলে পূর্বে ধারণকৃত 'COBE' Space Probe কর্তৃক 'তাপমাত্রার মসৃণ ক্ষুদ্র তরঙ্গ' (temparature ripples) অপেক্ষা প্রায় ৪০ গুন বেশী স্বচ্ছ ও উন্নত তথ্য সরবরাহে সক্ষম হয়। Boomerang Baloon কর্তৃক উক্ত ধারণকৃত ছবিটি দেখতে অনেকটা আমাদের সূর্যের 'Sun Spot'-এর তোলা ছবির মতই দেখায়। ছবিতে কিছু অংশ খুবই উত্তপ্ত (hotter) অগ্নিগোলকের ন্যায় এবং কিছু অংশ ঠাণ্ডা (colder) যা অন্ধকার কালো চিহ্ন হিসেবে ধরা দিয়েছে।

উত্তপ্ত অগ্নিগোলকগুলোই পরবর্তীতে বিবর্তনের মধ্যদিয়ে গ্যালাক্সি-গ্যালাক্সিগুচ্ছে রূপ নিয়েছে এবং কালো অন্ধকার চিহ্নগুলো 'শূন্যস্থানে' (void) পরিণত হয়েছে। তাপমাত্রার উক্ত পার্থক্য মাত্র ১°-এর হাজার মিলিয়ন সেলসিয়াস ভাগের এক ভাগ (00001). (The variations are only one hundred millionth of a degree celsius.) বুমেরাং টিম উক্ত ছবিকে ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ (analysis) করে দেখতে পান যে উক্ত Cosmic Microwave Back Ground-ই সুনির্দিষ্ট পরিমাপে Space Time Geometry কে নির্ধারণ করেছে যা দৃঢ়ভাবে নির্দেশ করে মহাবিশ্বের জ্যামিতি (geometry of the Universe) হচ্ছে 'সমতল' (flat), বদ্ধ (closed) নয়, উক্ত ফলাফলও মহাবিশ্বের 'Inflationery' Theory-এর সাথে ঐক্যমত পোষণ করছে।

'Inflationery' তথ্য মতে সমগ্র মহাবিশ্বটি Big-Bang মহাবিস্ফোরণ পরবর্তী সূক্ষ্ম সময়ে মহাসম্প্রসারণশীল মহাসূক্ষ্ম উপ-আণবিক এলাকা

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, তিনি তোমাদেরকে দ্রুত দেখাবেন তাঁর উপস্থিতির নিদর্শন; তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে (জ্ঞানের মাধ্যমে)।" (২৭ : ৯৩)
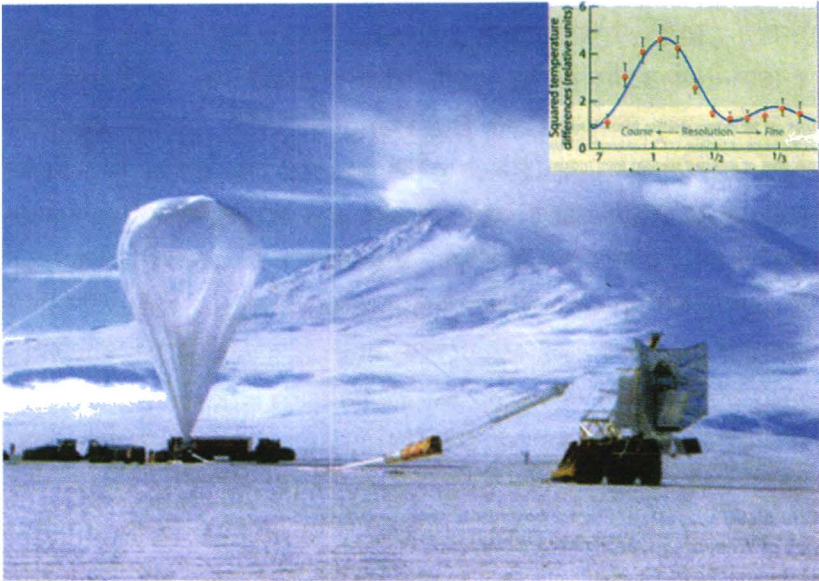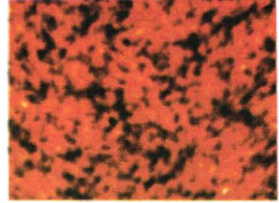
চিত্র–১৭২

– ১৯৯৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ১০ দিনের জন্য 'Boomerang' টিম একটি বড় আকৃতির প্রায় ৮০০,০০০ কিউবিক মিটার বেলুনে ১৪০০ কেজি ওজনের 'বুমেরাং টেলিস্কোপ' সংযুক্ত করে এন্টার্টিকার প্রায় ৩৫ কিলোমিটার ওপর দিয়ে উড়ার ব্যবস্থা করেন। যাতে এ সময় Cosmic Microwave Background –এর ছবি ধারণ করা যায়। ফলে উক্ত বেলুনে ধারণকৃত স্বচ্ছ ছবিগুলো পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীগণ সিদ্ধান্ত দেন যে, মহাবিশ্বের জ্যামিতি হচ্ছে সমতল (flat), বদ্ধ (closed) নয়। তাই Big Crunch ঘটার সম্ভাবনা মোটেই নেই। মহাবিশ্বের যবনিকাপাত ঘটবে অন্য কোন পদ্ধতিতে।

(tiny sub atomic region) থেকেই বর্তমান বিশাল আকৃতিতে রূপ লাভ করেছে, যা শুধু 'সমতল' (flat) মহাবিশ্বেরই ধারণা দেয়, 'বদ্ধ' মহাবিশ্বের (Closed Universe) ধারণা তিরোহিত করে। ফলে Big Crunch সংঘটিত হওয়ার জন্য 'বদ্ধ মহাবিশ্ব' অবশ্যই জরুরী বিধায় সে ধারণা বর্তমানে দাঁড়াতে পারছে না।

৩. MAXIMA : MAXIMA (Millimeter Anisotropy Experiment Imaging Array) আমেরিকান NASA-র আরেকটি বেলুন প্রজেক্ট টেক্সাস (Texas) অঙ্গরাজ্যের ১৩০,০০০ ফুট ওপর দিয়ে প্রায় ৭ দিন পরিচালনা করে মহাকাশের ২২টি খণ্ডের (প্রতিটি খণ্ড চিত্রই পূর্ণ চন্দ্র অপেক্ষা বৃহৎ) তাপমাত্রা, যা Big-Bang বিস্ফোরণ পরবর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর অবশিষ্ট তাপমাত্রা হিসেবে নবীন মহাবিশ্বে যে 'বীজ'রূপে আবির্ভূত হয়েছিল, তার ছবি সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেন যে, ধারণকৃত 'কসমিক মাইক্রোওয়েভ বেকগ্রাউণ্ড অবয়ব' (Cosmic Microwave Background Features) সর্বত্র একই নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পরিবেশ রক্ষা করে চলেছে, যদিও বিলিয়ন বিলিয়ন (শত-সহস্র কোটি কোটি কোটি) বছর ধরে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ (Radiation) মহাকাশে পরিভ্রমণ করছে। এ সম্পর্কে উক্ত (Maxima) প্রজেক্ট প্রধান মিঃ পাওল রিচার্ড (Mr. Paul Richard, Astrophyscist, University of California at Berkeley. USA) বলেন, 'That Tells us that Light travels in straight lines' অর্থাৎ 'CMB' ছবি আমাদেরকে বলে যে বিকিরণ (আলো) মহাকাশে সরল রেখায় পরিভ্রমণ করছে। 'This is only kind of Space in which you can have two parallel lines that will never meet and that is a flat, continuously expanding Universe'- অর্থাৎ, এ অবস্থায় শুধুমাত্র এক ধরনের মহাশূন্যই ধরা যায়, যেখানে দু'টি সমান্তরাল রেখা রয়েছে এবং কখনই তারা পরস্পর মিলিত হতে পারে না, আর সে জন্যই বলা চলে এটা সমতল মহাবিশ্ব, যা অনবরতই সম্প্রসারণশীল। "Such a Universe will grow forever, never fall back and obliterate itself in a Big-Crunch." -অর্থাৎ

"মহাবিশ্বে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে (জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে), কিন্তু তারা এ সকল নিদর্শনের প্রতি উদাসীন।" (১২ ঃ ১০৫)
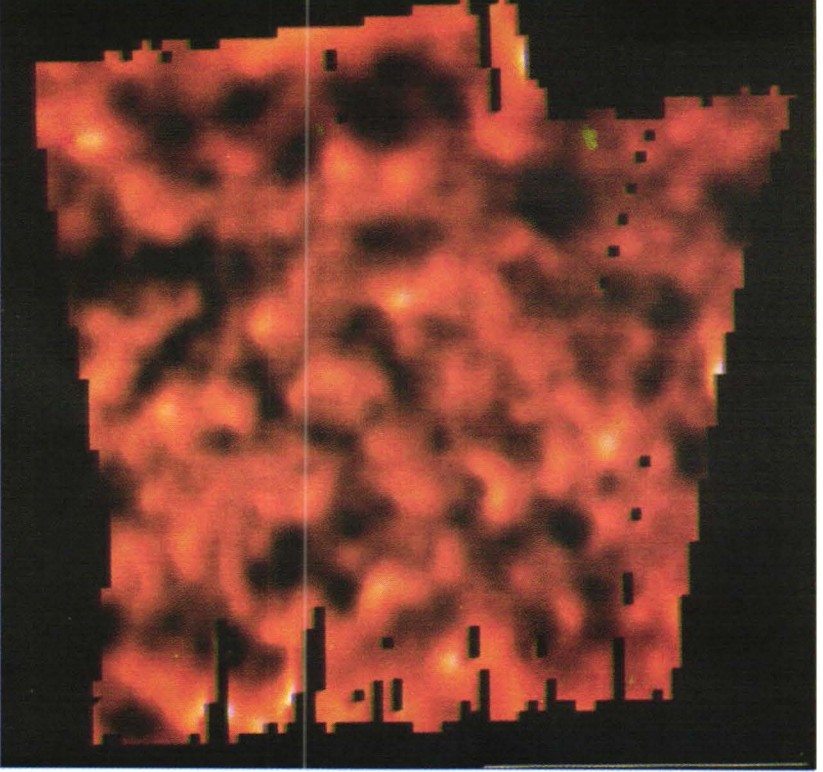
চিত্র-১৭৩

– আমেরিকান NASA'র 'MAXIMA' নামক আরেকটি বেলুন পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয় টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ওপর দিয়ে অনবরত ৭ দিন পর্যন্ত। এতে মহাকাশের ২২টি চিত্র ধারণ করে পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যে, মূলতঃই আমাদের মহাবিশ্বটি 'সমতল' (flat), 'বদ্ধ' (closed) নয়। কেননা Microwave background radiation –এর কাঠামো (features) কোটি কোটি কোটি বছর থেকে কোন রূপ পরিবর্তন না ঘটিয়ে একইভাবে চলে আসছে, যা সমতল স্পেসেরই প্রমাণ পেশ করে এবং যা অনবরত সম্প্রসারণ ঘটাতেই থাকবে। সুতরাং Big crunch ঘটবে না। এ পর্যায়ে Big crunch কে কুরআনও সমর্থন করে না।

"তিনি তোমাদেরকে তাঁর কাজের নিদর্শনাবলী দেখায়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?" (৪০ ঃ ৮১)
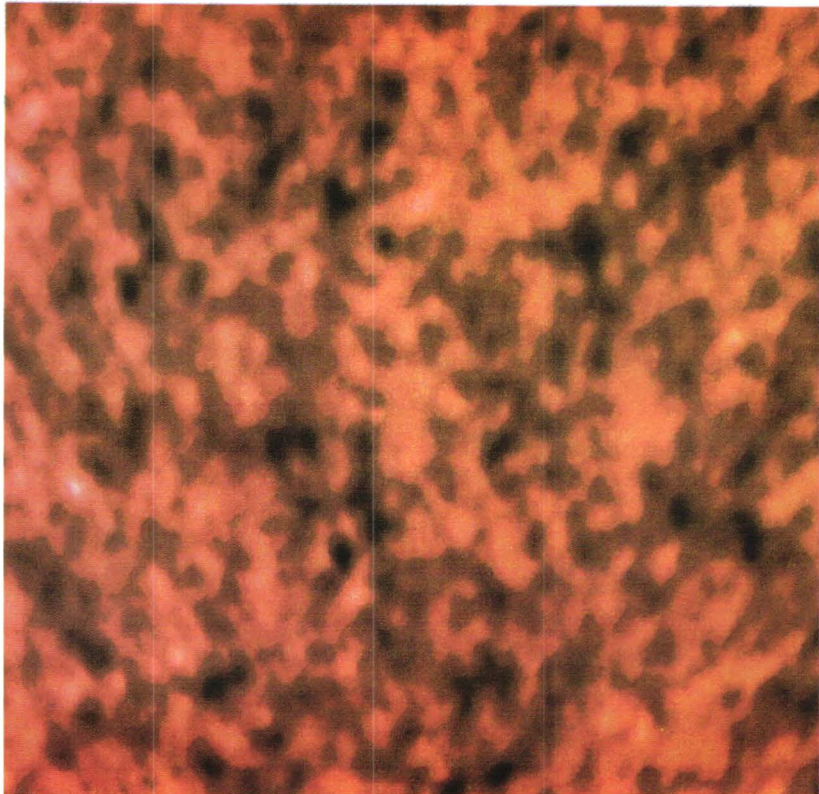
চিত্র-১৭৪

– ওপরের ছবিটি আদি মহাবিশ্বের, যখন মহাবিশ্বের বয়স মাত্র ৩০০,০০০ বৎসর। ছবিতে উত্তপ্ত লাল অংশগুলোই পর্যায়ক্রমে গ্যালাক্সিতে রূপান্তর ঘটে এবং কালো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা অংশগুলো শূন্যস্থানে পরিণত হয়ে মহাবিশ্বের বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। ওপরের ছবিটি পর্যালোচনা শেষে বিজ্ঞানীগণ একমত হন যে, আদি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মহাবিশ্বটি মূলতঃ 'স্ফীতকরণ' (Inflation) থিউরী মতই এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে 'শক্তি' এবং 'বস্তুর' দিক থেকে তাকালে দেখা যায় মহাবিশ্বটি 'সমতল' (flat) মহাবিশ্বের অনুকূলে। সুতরাং Big Crunch ঘটছে না। বর্তমান বিজ্ঞান মূলতঃ কুরআনকেই অনুসরণ করছে।

এ ধরনের মহাবিশ্ব শুধু বর্ধিত-ই হতে থাকবে অনন্তকালের জন্য, কখনও বিপরীত দিকে মোড় নিয়ে 'Big-crunch'-র মাধ্যমে নিজেকে ধ্বংস করবে না, সুতরাং 'Big-crunch' ধারণা মিথ্যা, সত্য নয়।

8. GRAVITATIONAL LENSING : 'Institute–d' Astrophysique de Pairs'-এ জ্যোতির্বিদ কর্তৃক পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক দল চিলিতে ব্যবহৃত চারটি বৃহৎ টেলিস্কোপের (Very large Telescope array) মধ্যে উৎকর্ষিত Opitics সম্পন্ন 8.2m. ANTU Telescope ব্যবহার করে তাদের গবেষণা কাজ শুরুর মধ্য দিয়ে প্রথম বারের মত নির্ভুলভাবে মহাবিশ্বে 'ডার্ক মেটার' (Dark matter) বণ্টন ব্যবস্থা (distribution) পরিমাপ করতে সমর্থ হন।

তারা তাদের এ কাজে মহাকাশের ৫০টি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে প্রায় 70,000 গ্যালাক্সির ছবি ধারণ করেন। অতঃপর তারা কষ্টসাধ্য বিশ্লেষণের (Pains taking analysis) মাধ্যমে ঐ সকল গ্যালাক্সিদের অবস্থান যারা মহাকাশে বিচ্ছিন্ন বা উদ্দেশ্যহীন ও এলোমেলো (randomly oriented) নয় বরং একটা নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতির (some ways) মহাকাশীয় ব্যবস্থার ভেতর দিয়েই যে ব্যবস্থিত ওদের নির্ণয় করেন। আর তাদের এই বিরাট সফলতাটি এনে দেয় 'মহাকর্ষজনিত দৃষ্টির' (Gravitational lensing) তারতম্যের প্রমাণসমূহ। বিষয়টি এ রকম যে, যখন কোন দূরবর্তী উৎস-গ্যালাক্সি থেকে আলোর রেখা (light rays) পৃথিবীর দিকে আসতে থাকে, তখন চলার পথে বৃহৎ কোন গ্যালাক্সি অতিক্রম করে আসার সময় ঐ গ্যালাক্সির চিত্রের অগ্রভূমির (Foreground Galaxy) 'মহাকর্ষ বল' আলোক রেখাকে একপাশে সরিয়ে দেয়, যার ফলে তাতে আগত আলোর মূল উৎসটির সামান্য বিকৃত ছবি (Slightly distorted image) তৈরী করে।

জ্যোতির্বিদগণ তাদের ধারণকৃত মহাকাশের ৫০টি এলাকার ছবির প্রত্যেকটিতেই গ্যালাক্সিদের ছবি যে দৃশ্যমান রেখার খুবই সামান্য হলেও বিকৃতরূপে সরিয়ে দিয়েছে (Galaxies images were all stretched very slightly in the same direction) অদৃশ্য Lensing বস্তুসম্ভার,

"কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে, যারা তা দর্শন করা মাত্র সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।" (৩২ ঃ ১৫)
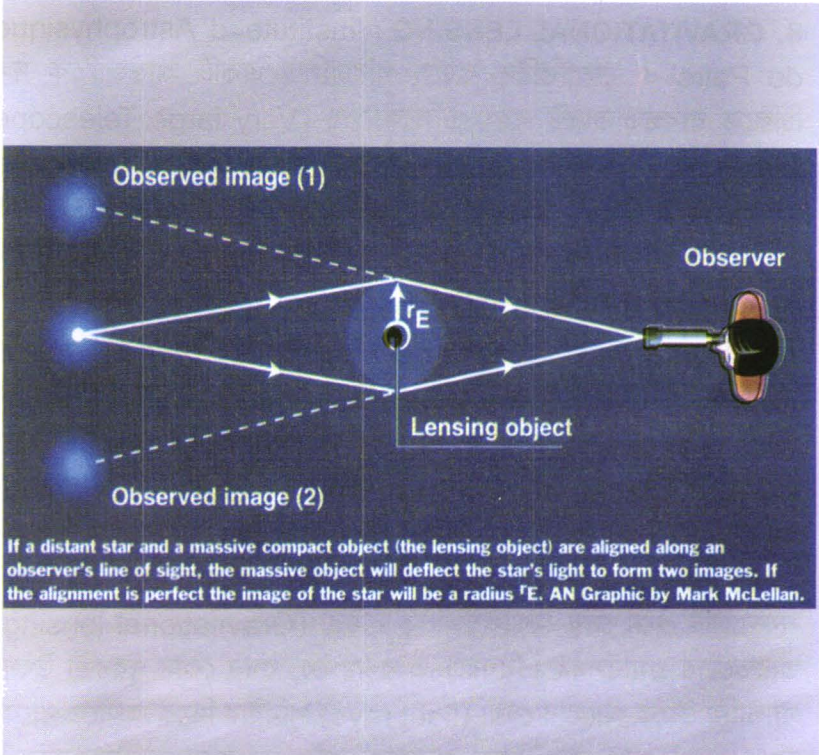
চিত্র–১৭৫

– ওপরের ছবিতে একজন দর্শক দূরের একটি গ্যালাক্সিকে দর্শন করতে গিয়ে তার সম্মুখের গ্যালাক্সির কারণে সঠিকভাবে যে দর্শন করতে পারছেন না, তা দেখানো হয়েছে। এখানে সম্মুখের গ্যালাক্সির 'ডার্ক মেটার' দূরের গ্যালাক্সির আগত আলোক রেখাকে 'মহাকর্ষ' বলের মাধ্যমে বাঁকিয়ে দিয়ে একটির পরিবর্তে দু'টি ছবি সম্মুখ গ্যালাক্সির দু'পাশে প্রদর্শন করছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে– মহাবিশ্বে দৃশ্য বস্তুর সাথে সাথে অদৃশ্য বস্তুসম্ভারও (ডার্ক মেটার) আছে এবং এদের সম্মিলিত 'গড় ঘনত্ব' (average density) মহাবিশ্বে বস্তুর পরিবর্তিত অবস্থার (critical value) মাত্র ৩০% যা সম্প্রসারণ থামিয়ে দিয়ে মহাসংকোচন (big crunch) ঘটাতে সক্ষম নয়।

"মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো। সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বলো না।" (২১ ঃ ৩৭)
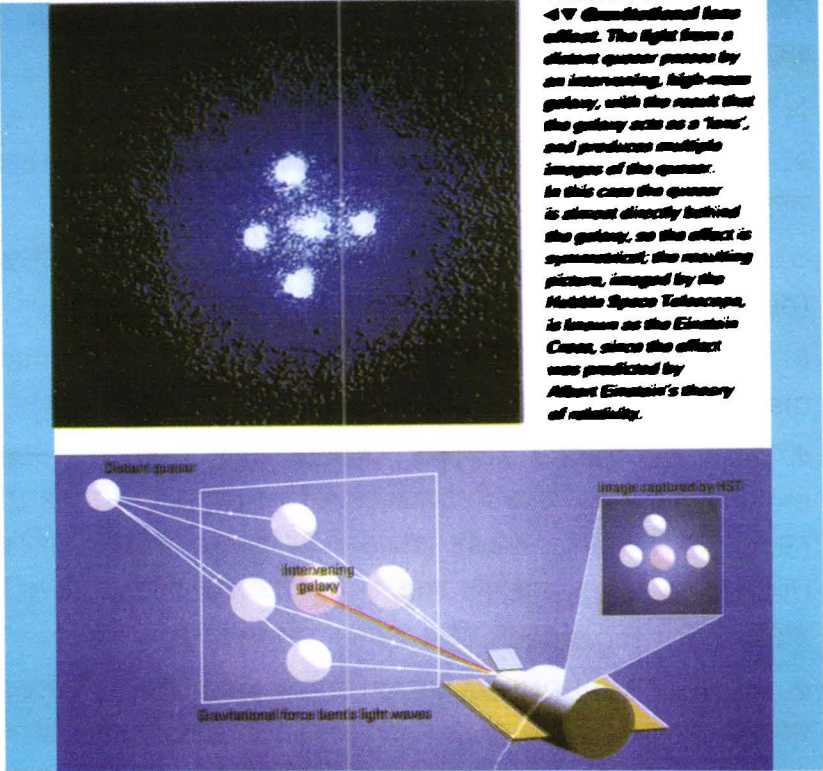
চিত্র–১৭৬

– ওপরের ছবিতে মধ্যস্থানের গ্যালাক্সি দর্শকের সম্মুখে অবস্থানকারী গ্যালাক্সি। ওর চারদিকের ৪টি ছবি মূলতঃ দূরের ১টি গ্যালাক্সির 'পরিবর্তিত' ছবি যার আলো দর্শকের কাছে আসার পথে 'ডার্ক মেটার'-এর 'মহাকর্ষ বল' বিকৃত করে বাঁকিয়ে দেয়। ফলে ৪টি ছবিতে রূপ নেয়। বিজ্ঞানীগণ দৃশ্যমান গ্যালাক্সিসমূহ এবং ডার্ক মেটার ও শক্তিকে যোগ করে দেখতে পান যে এদের *average density* মহাসম্প্রসারণের *critical value*-এর (পরিবর্তিত অবস্থার) মাত্র ৩০%। যার কারণে মহাবিশ্বের 'মহাকর্ষ বল' মহাসম্প্রসারণকে থামিয়ে দিয়ে মহাসঙ্কোচন ঘটাবার মত ক্ষমতা রাখে না। ফলে *Big crunch* ঘটবে না।

তা তারা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন। আর অদৃশ্য ঐ বস্তুসম্ভার যে "ডার্ক মেটার" (dark matter) তা বিশ্বব্যাপী ইতোমধ্যেই স্বীকৃত। উক্ত বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীগণ একাধারে বেশ কয়েকটি ব্যাপারেই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হন। যেমন–

১. মহাবিশ্বের সর্বত্র 'ডার্ক মেটার'-এর উপস্থিতি নির্ণয়।

২. "ডার্ক মেটার" (dark matter) কি পরিমাণ শক্তিশালী ও গুরুভার সম্পন্ন তা নির্ধারণ!

৩. কোন পদ্ধতিতে "ডার্ক মেটার" (dark matter) মহাবিশ্বে বণ্টিত (distributed) হয়েছে তা অবহিত হওয়া!

৪. মহাবিশ্বে "ডার্ক মেটার" ও 'নরমাল মেটার' (dark & normal matter)-এর সম্মিলিত ঘনত্ব (total density) নির্ণয় এবং সবশেষে–

৫. মহাবিশ্বের অভ্যন্তরে ধারণকৃত বস্তুভরের সমষ্টি (dark+normal matter) তার নিজস্ব প্রচণ্ড সম্প্রসারণকে থামিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট যে নয়, তা প্রমাণিতকরণ। অতএব আমাদের মহাবিশ্ব যে সমতল মহাবিশ্ব (flat Universe) তা প্রমাণিত হচ্ছে যা শুধু চতুর্দিকে বর্ধিত হয়েই ছুটে যাবে। সুতরাং Big crunch ঘটার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নেই।

৫. DISTANT SUPERNOVA MEASURED : ১৯৯৯ সালে দু'টি পৃথক গবেষক দল (research team) মহাবিশ্বের প্রায় প্রান্তঃসীমানার দিকে 'Ia type supernova'-র ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দেন যে, মহাবিশ্বটি অনন্তকালের জন্য দুর্বার গতিতে কেবল সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। 'Big crunch' ঘটবে না।

গবেষক দল দু'টি পৃথিবী থেকে নিকটবর্তী সুপারনোভা-র সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা প্রকাশের সময়ের সাথে দূরবর্তী অঞ্চলের 'সুপারনোভা' (super nova)-র সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা ছড়াবার সময়ের তুলনা করেন। দেখা গেছে নিকটবর্তী 'সুপারনোভার' তুলনায় দূরবর্তী অঞ্চলের 'সুপারনোভা' তাদের সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা ছড়াবার জন্য গড়ে ২.৫ দিন সময় কম নেয়। ফলে গবেষক দল দু'টি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'সুপারনোভা' মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের

"মহাবিশ্বের মাঝে (পরতে পরতে) নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ।" (৪৫ ঃ ৩)

চিত্র–১৭৭

– ওপরের ছবিতে একটি গ্যালাক্সির মধ্যে ঘটে যাওয়া 'super nova' দেখা যাচ্ছে । বিজ্ঞানীগণ নিকটবর্তী super nova-র সাথে দূরবর্তী super nova-র তুলনা করে দেখতে পান যে, নিকটবর্তী সুপারনোভার তুলনায় দূরবর্তী অঞ্চলের সুপারনোভা তাদের সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা ছড়াবার জন্য গড়ে ২.৫ দিন সময় কম নেয় । এতে প্রমাণিত হচ্ছে দূরবর্তী সুপারনোভা 'সময় ও লম্বা দূরত্ব পথে' বিবর্তনশীল হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, যা flat Universe-এর ধারণা দেয় । ফলে মহাবিশ্বটি সমতল বলে মহাসম্প্রসারণ অনবরত চলছে ।

সুতরাং কথিত Big crunch ঘটবে না বা ঘটার সম্ভাবনাও নেই ।

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র (এদের সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে আছে জ্ঞানময় বিষয়) ।" (৪১ ঃ ৩৭)
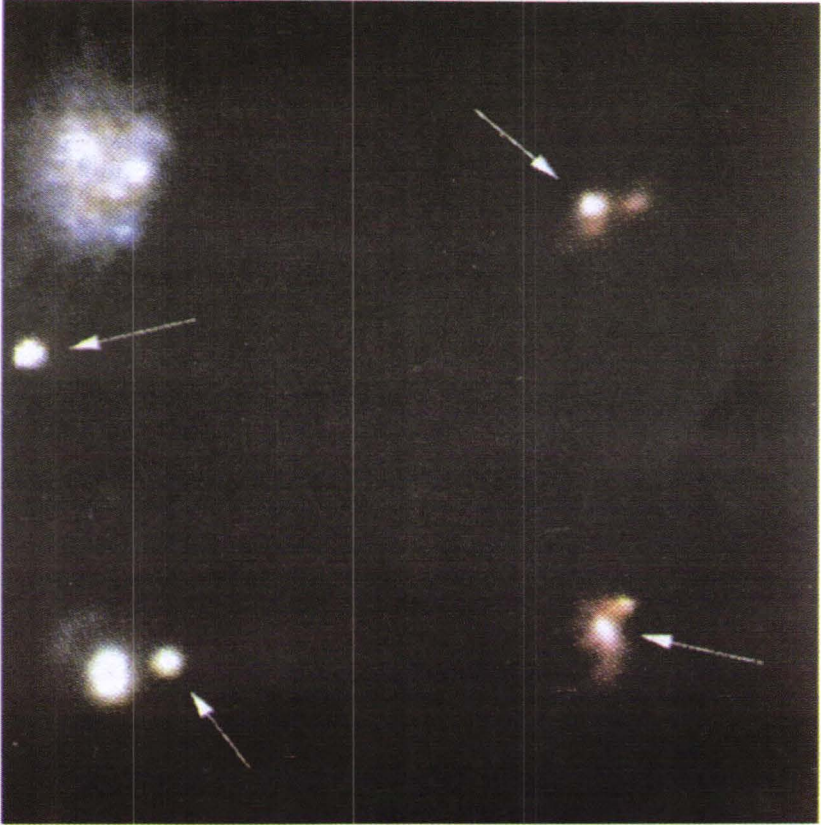
চিত্র–১৭৮

– ওপরের ছবিটি ধারণ করা হয়েছে– 'most distant type 1a supernova' থেকে । বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন– নিকটবর্তী সুপারনোভার তুলনায় দূরবর্তী অঞ্চলের সুপারনোভার সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা ছাড়াবার জন্য গড়ে ২.৫ দিন কম সময় নেয় । এতে প্রমাণ হচ্ছে– দূরের সুপার নোভা সহজে বেশী বিবর্তনশীল (evolve) হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে flat Universe–এর কারণে । তাই মহাবিশ্ব closed নয় বরং flat । আর সে জন্য Big crunch কখনই ঘটবে না । অর্থাৎ দীর্ঘ কোন পদ্ধতিতে মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে না । কুরআনের তথ্য মত চোখের পলকেই ঘটবে মহাধ্বংস ।

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের (সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত) নিদর্শনাবলী দেখতে পেয়েও তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে হবে?" (৩২ ঃ ২২)
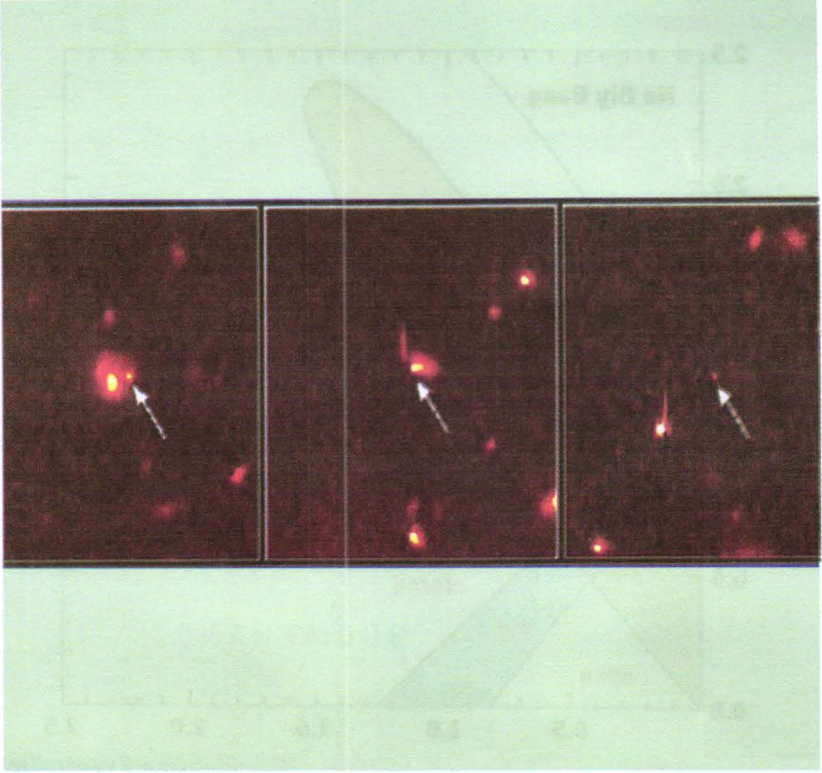
চিত্র-১৭৯

– These three Hubble space telescope images show some of the most distant detectable supernova-stellar explosion, five to seven billion light years away, which occured before the Sun was formed. As recently reported, the apparent brightness and expansion velocities associated with these and other distant supernova are beginning to suggest that the expansion rate of the Universe has not slowed but increased over time and that the expansion of the Universe is destined to continue. তাই সমতল মহাবিশ্ব হওয়ার কারণে *Big crunch* ঘটবে না। কেননা মহাবিশ্ব কখনও সঙ্কুচিত হবে না।

"কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে। যারা তা দর্শন করা মাত্র সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।" (৩২ ঃ ১৫)
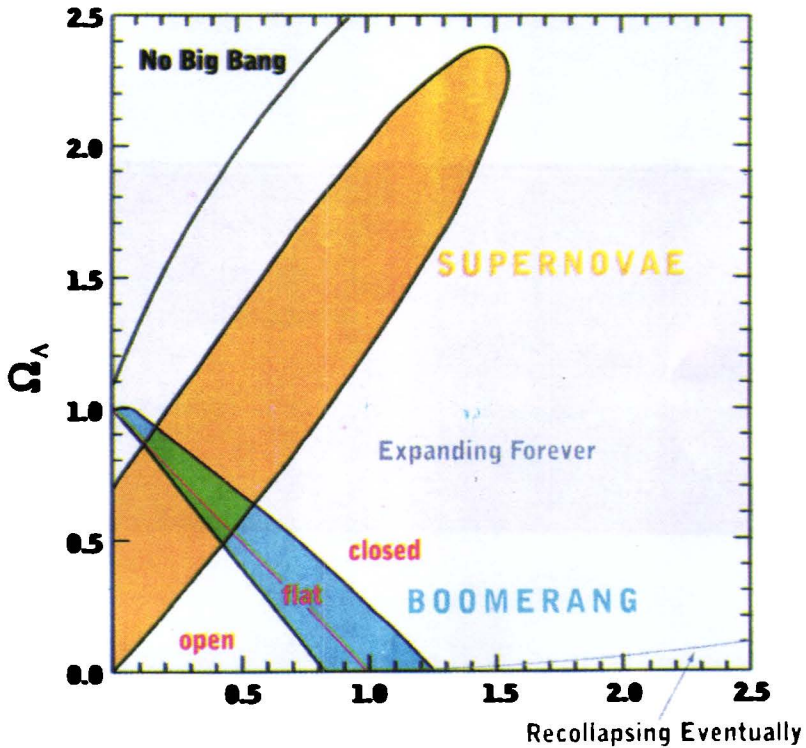
চিত্র–১৮০

– The 'BOOMERANG' results can be compared with recent supernova data that imply a small acceleration of the Universe. The graph shows curved Universes (open or closed) and the flat Universe case. All the 'BOOMERANG' results cluster around flat possibilities, The supernova data suggested many possible fates for the cosmos. Combined, only the cosmic geometries in the green area are possible, almost all flat cases. তাই মহাসম্প্রসারণও থামবে না এবং *Big crunch*ও ঘটবে না।

"প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা বলে ছিলে ও অহংকার করে ছিলে, আর তুমি তো ছিলে অবিশ্বাসীদের একজন।" (৩৯ ঃ ৫৯)
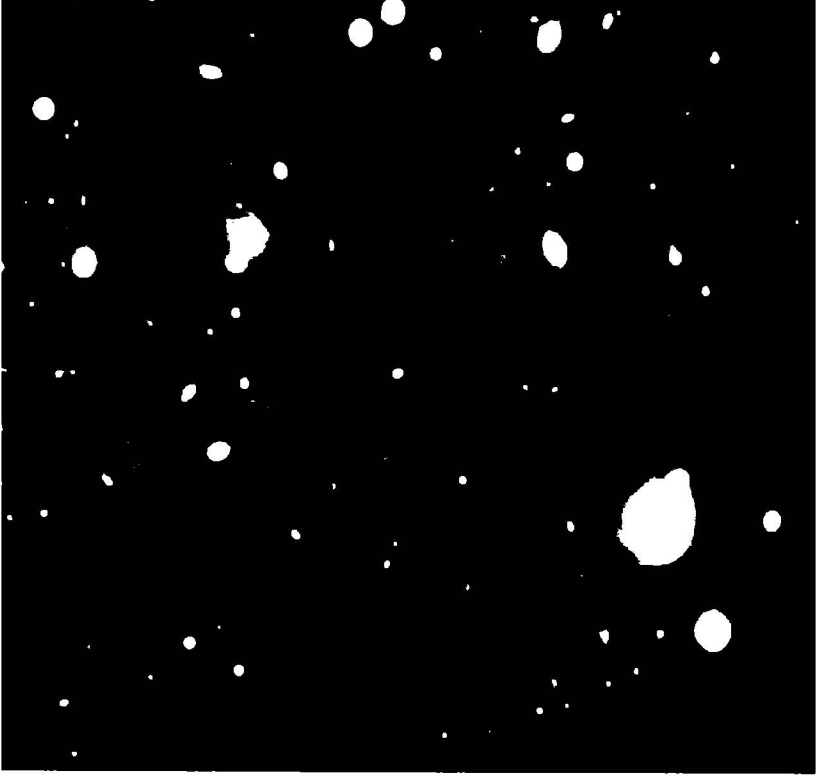
চিত্র-১৮১

– In 1929, famed astronomer Edwin Hubble discovered that galaxies are speeding away from one another at velocities that increase with distance. The Hubble constant (H_0) is a number that represent the rate at which those speeds increase. In other words, H_0 measures the expansion rate of the Universe.

বর্তমানে উক্ত H_0 (Hubble constant) দিয়েও প্রমাণিত হচ্ছে মহাবিশ্ব 'সমতল' যে কারণে মহাবিশ্বের সর্বত্র মহাসম্প্রসারণ চলছেই। তাই Big crunch ঘটবে না।

"অবিশ্বাসীরাই আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে (যদিও স্বচোখে তা দেখতে পায়); সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।" (৪০ : ৪)
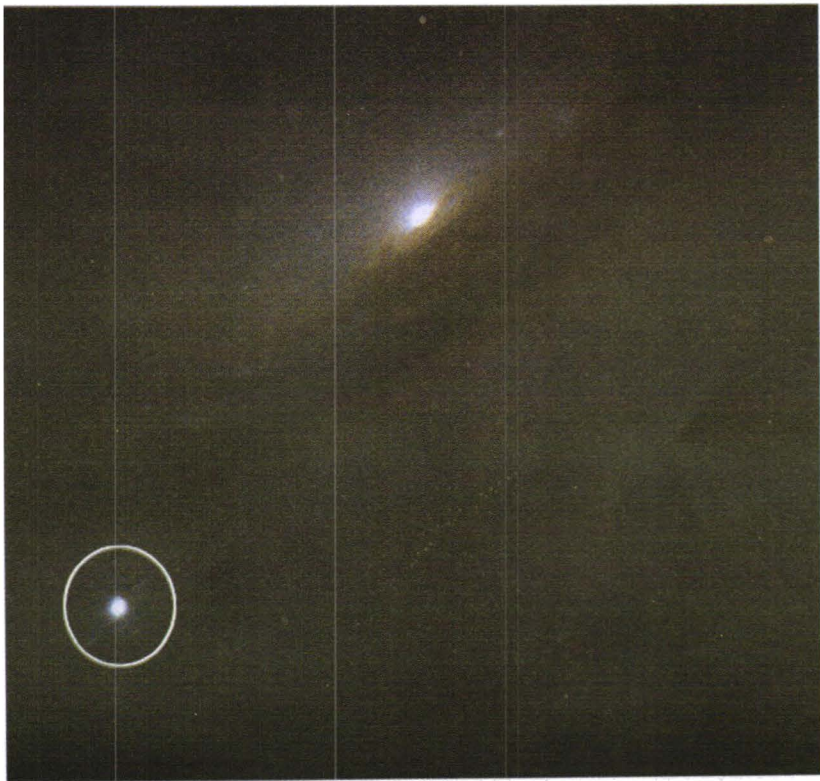
চিত্র–১৮২

– By observing type Ia supernova such as this one in galaxy NGC 4526 (bright spot at lower left), two teams of astronomers have found avidence that the expansion of the Universe is accelerating.

যেহেতু বিজ্ঞানীদের দ্বারা Hubble constant-এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের প্রতিনিয়ত মহাসম্প্রসারণ নির্ণীত হচ্ছে এবং খুব সহসা এর থেমে যাওয়ার কোন লক্ষণও নেই, তাই Big crunchও ঘটবে না। যা ঘটবে তা হলো মহাবিশ্বের মহাসম্প্রসারণ থাকাবস্থায়ই কোন এক পদ্ধতিতে তা ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে যাওয়া।

"তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী (এক এক করে) দেখান (যেন তোমরা আল্লাহর উপস্থিতির প্রমাণ পেত পার)।" (৪০ ঃ ১৩)।

চিত্র-১৮৩

– Our Universe is expanding. Distant galaxies appear to recede from us at ever-increasing speeds. What is the rate of expansion? How long has it been expanding? What will be its ultimate fate? Two groups of astronomers are searching vigorously for answers to these fundamental questions using the Hubble Space Telescope (HST). The teams have recently announced conflicting measurements of the Hubble constant, a number which represents the expansion rate of the Universe. Astronomer Wendy Freedman and her collaborators have used

pulsating stars called Cepheids to measure the distance to galaxies like the Fornax cluster barred spiral galaxy NGC 1365 shown above. The ground based photo (left) shows an inset locating the HST image (right) which Freedman and team have used to identify some 50 Cepheids. Their distance and velocity measurements determine Hubble's constant to be about 80 kilometers per second per megaparsec which means that galaxies one megaparsec (3 million lightyears) distant appear to recede from us at a speed of 80 kilometers per second. এতে প্রমাণ হচ্ছে মহাবিশ্ব সমতল। নতুবা প্রতি সেকেণ্ডে দূরের গ্যালাক্সির গতি ৮০ কিলোমিটার হারে বাড়ছে কিভাবে? বিজ্ঞানীগণ এ তথ্য বর্তমানে হাতে-কলমে প্রমাণ করেছেন।

সুতরাং Flat Universe বলেই মহাসম্প্রসারণ দুর্বার গতিতে কেবল ঘটে চলেছে, যে কারণে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ Big crunch ঘটবে বলে মনে করেন না। মহাবিশ্ব সমতল হওয়ার কারণে মহাসম্প্রসারণ কখনো থামবে না আর এই সম্প্রসারণ থাকা অবস্থায় একদিন হঠাৎ করেই মহাবিশ্ব মহাধ্বংসে নিপতিত হবে।

আল-কুরআনও Big crunch সমর্থন করে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে শুধু 'হও' বলতেই সব হয়ে যায়, সেখানে বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর ধরে Big crunch ঘটার সুযোগ কোথায়? আল্লাহ্ মহাবিশ্ব ধ্বংস করার ইচ্ছা করে 'হও' বলতেই মুহূর্তে তা ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য। এভাবে বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে- (কুরআনের কথাই সত)- Big crunch ঘটছে না।

"আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই এর মহাসম্প্রসারণ ঘটাচ্ছি।" (৫১ ঃ ৪৭)
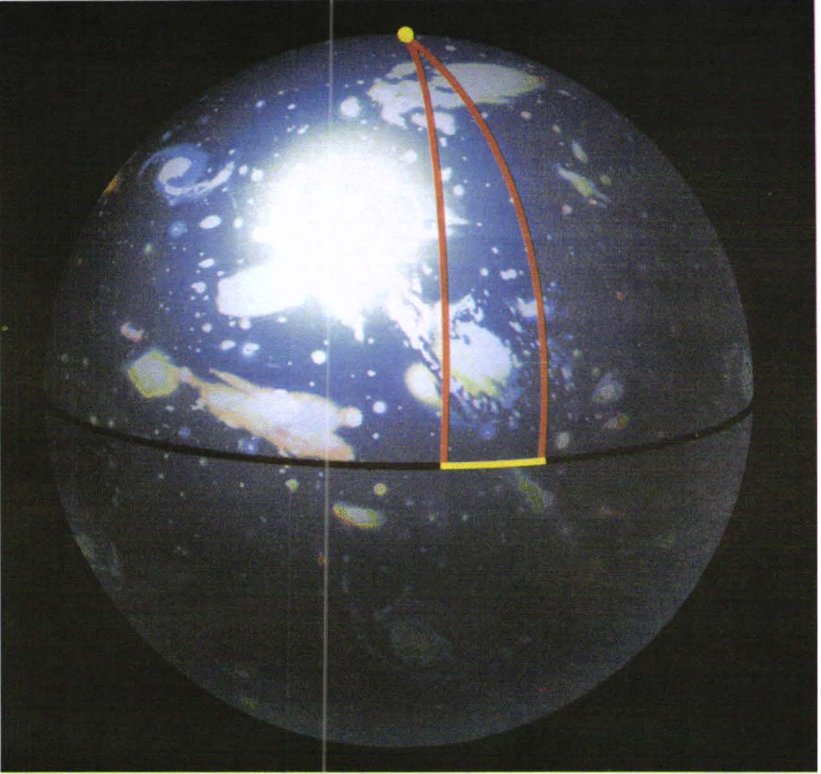
চিত্র-১৮৪

– সম্প্রতি কয়েকটি বছরে বিজ্ঞানীগণ নানানভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চালিয়ে অসংখ্য প্রমাণ সৃষ্টি করে দাবী করেছেন যে, আমাদের মহাবিশ্বটি কোন অবস্থাতেই 'বদ্ধ' (closed) নয়। ফলে পূর্বের ধারণাকৃত 'Big crunch' সম্পর্কে বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ আর আগ্রহী নন। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাই তাদের পূর্বের ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে এবং এক নতুন অথচ বাস্তব 'সত্য' তথ্যের দিকে তারা এখন এগিয়ে যাচ্ছেন দৃঢ় পদক্ষেপে। আর সেই 'সত্য' তথ্যটি হচ্ছে কুরআনের-ই দাবী অনুযায়ী, চোখের পলকেই মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে এবং আল্লাহ্ নিজে সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছেন বলে তা থেমেও যাবে না।

"আমি প্রত্যেক কিছু (মহাবিশ্ব ও তার ভেতরকার সমস্ত কিছুই) সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে (অপরিকল্পিত ও লাগামহীন ভাবে নয়) ।" (৫৪ ঃ ৪৯)
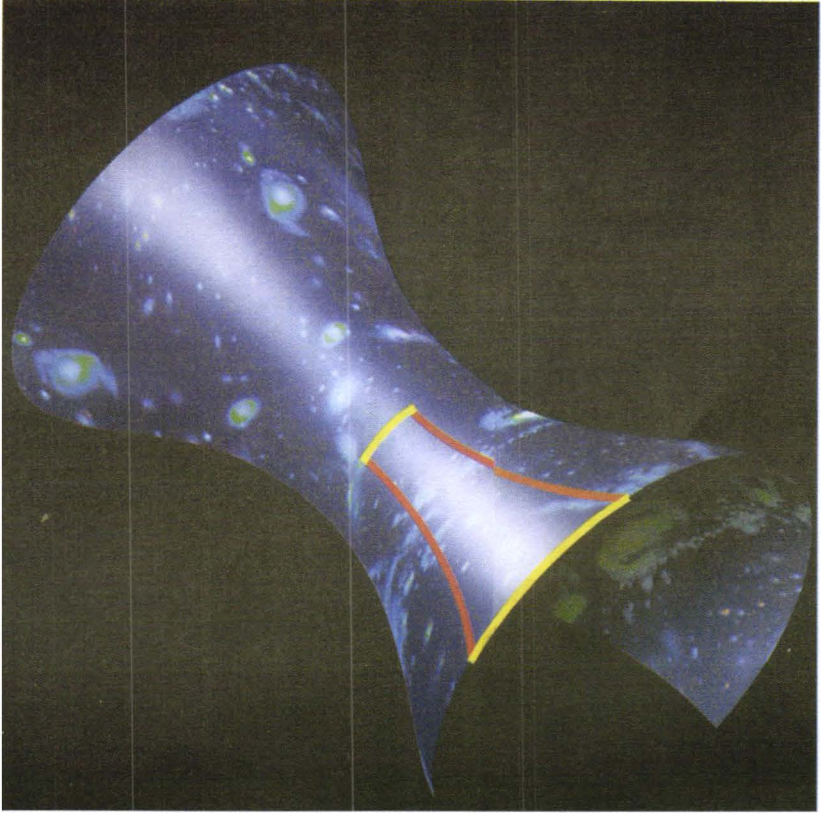
চিত্র–১৮৫

– আমাদের মহাবিশ্ব একদিকে যেমন 'বদ্ধ' (closed) নয় । তেমনি অন্যদিকে 'খোলা' বা উন্মুক্তও (open) যে নয় তা ওপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে । বিজ্ঞানীগণ পূর্বের স্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে একান্ত বাস্তব প্রমাণ লাভ করার কারণে, যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ আর তাদের নেই ।

সুতরাং Big crunch ঘটার পক্ষে কোন পরিবেশ সৃষ্টি হবে না । উল্লেখিত তথ্যসমূহে প্রমাণিত হচ্ছে – মহান আল্লাহ্ সত্য এবং তাঁর বাণী সর্বশেষ গ্রন্থ আল্–কুরআনও সত্য গ্রন্থ ।

"আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই এর মহাসম্প্রসারণ ঘটাচ্ছি। (৫১ : ৪৭)
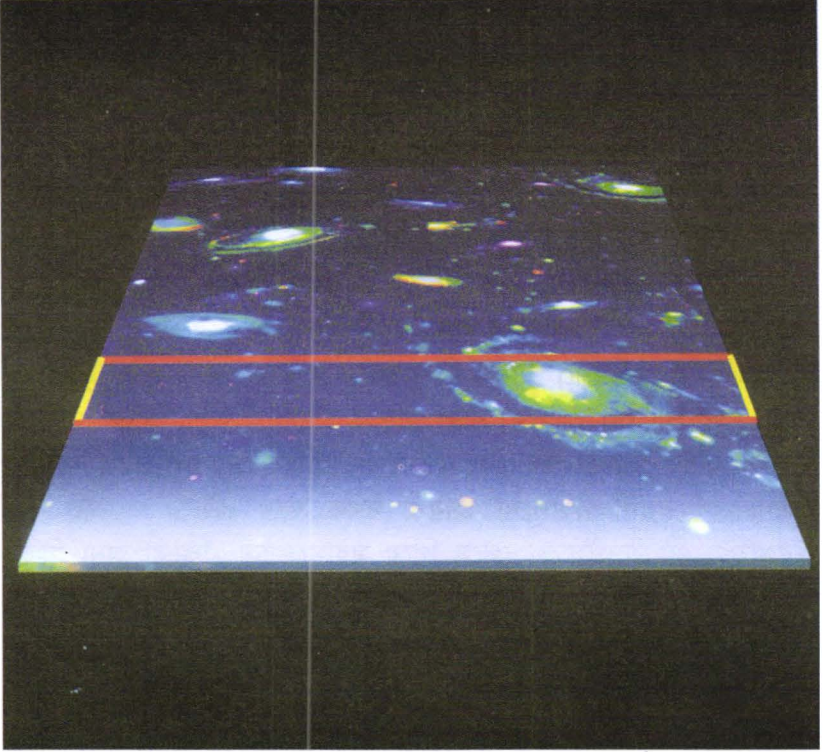
চিত্র–১৮৬

– ওপরের ছবিটি Flat Universe প্রদর্শন করছে। যেখানে দু'টি সরল রেখা কখনই মিলিত হওয়ার সুযোগ নেই। আজ প্রায় সমগ্র বিজ্ঞান বিশ্ব একযোগে ঘোষণা করছে– New observation of the cosmic microwave background and gravitational lensing, distant supernova, and also Hubble constant etc, suggest that the Universe is flat and will expand forever at an accelerating rate. So, there is no chance for 'Big crunch' in our Universe.

সুতরাং আল্লাহ্‌র দাবী– "তিনি এর সম্প্রসারণ ঘটিয়ে চলেছেন", তা আবারও সত্যে পরিণত করলো বিজ্ঞান দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে। অতএব, আল্লাহ্ যে এ মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, তাতে আর কোন সন্দেহ আছে কী?

কারণে 'সময় ও লম্বা দূরত্ব পথ' পাড়ি দিয়ে বেশ বিবর্তনশীল হয়ে তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ে সর্বোচ্চ বিকিরণজাত আলো ছড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে। Closed Universe হলে এ সুযোগ পাওয়া যেত না, flat বা সমতল Universe বলেই এ সুযোগ পাচ্ছে, অতএব মহাবিশ্ব 'বদ্ধ' (closed) নয় বরং 'সমতল' (flat), তাই এর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া সম্প্রসারণও প্রবল থেকে প্রবলতর, যার জন্য 'Big-crunch' ঘটার নিমিত্তে সম্প্রসারণ থেমে গিয়ে যে মহাসঙ্কোচন শুরুর কথা বিজ্ঞানীগণ প্রথম প্রথম ধারণা করেছিলেন তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে বর্তমান উন্নততর পরীক্ষ-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। বর্তমান বিজ্ঞান তার উন্নততর ও উৎকর্ষিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদেরকে অবহিত করেছে যে, আমাদের মহাবিশ্বটি 'Big-Bang' নামক বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়ে বিগত প্রায় ১৫০০ কোটি (15 Billion Years) বছর থেকেই চতুর্দিকে আশ্চর্য রকম গতিতে কেবলই বর্ধিত হয়ে চলেছে এবং বর্তমানে চতুর্দিকে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাপী মহাশূন্যে জায়গা দখল করে ছড়িয়ে পড়েছে। এ অবস্থায়ও এর সম্প্রসারণ থেমে গিয়ে মহাসঙ্কোচন (কিংবা অন্য কিছু) ঘটার সম্ভাবনা বিজ্ঞানীগণ দেখতে পাচ্ছেন না। ফলে নতুন করে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে মহাবিশ্বের যবনিকাপাত ঘটবে কিভাবে বা কোন পদ্ধতিতে?

৬. Proton Decay ঃ নিরেট বাস্তবতার আলোকে ১৯৯০ সন থেকে বর্তমান বিজ্ঞান বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চালিয়ে পূর্বের ধারণাকৃত 'Big-crunch' কে বাতিল ঘোষণা করার এবং নতুনভাবে সৃষ্ট প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য এবার এগিয়ে এলেন সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের বিজ্ঞানীগণ। 'Yoji Totsuka' নামে টোকিও ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসরের নেতৃত্বে একটি গবেষক দল টোকিও শহরের ২৫০ কিলোমিটার পশ্চিমে 'কামিওকা' (Kamioka) শহরে 'Hyper-Kamiokande' নামে ৩৪৪.৮ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে একটি 'Proton Decay' প্রজেক্ট সহসা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যেখানে মাটির নীচে বিশাল পানির ট্যাঙ্ক (Giant under ground water tank)

স্থাপন করা হয়েছে, যার মাঝে ৮টি ভাগ (section) থাকছে, প্রতিটি ভাগই ৫০ বর্গ মিটার এবং পানির ট্যাঙ্কে সর্বোচ্চ প্রায় এক মিলিয়ন বিশুদ্ধ পানি (Pure water) ভর্তি করা হয়েছে। উক্ত পানি প্রজেক্ট চালু করার পর 'প্রোটন ডিকে' (Proton decay)-র সময় 'Cerenkov radiation'-এর আলামত শনাক্ত করা হবে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত বিজ্ঞানী মহল ইতোমধ্যেই একটি বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যা মহাবিশ্বের সকল পদার্থের বিল্ডিং ব্লক হিসেবে 'পরমাণুর নিউক্লিয়াসে' অবস্থানরত 'প্রোটন' কণিকাকে 'বিবর্ণ' বা অবক্ষয় (decay) ঘটাবার মধ্যদিয়ে মহাবিশ্বকে যে মুহূর্তের মধ্যেই বর্তমান অস্তিত্ব থেকে চিরদিনের জন্যই বিলীন করে দেয়া সম্ভব, তা নির্দেশ করবে। (Tokyo University scientists have developed an experiment designed to prove that the universe will eventually cease to exist by showing that protons the elemental building blocks of all matter decay.)

'প্রোটন' কণিকা প্রজেটিভ চার্জযুক্ত উপ-আণবিক কণিকা হিসেবে সব ধরনের পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বিরাজমান আছে। তাই, যদি 'প্রোটন' কণিকাকে কোন প্রকারে বিবর্ণ বা অবক্ষয় ঘটানো যায় তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই প্রোটন অবক্ষয়ের মাধ্যমে পদার্থের পরমাণু ভেঙ্গে গিয়ে সকল পদার্থের অস্তিত্ব-ই বিলোপ হতে বাধ্য। (A Proton is a positively charged sub-atomic particle in the Nucleus of all atom. If Protons decay, atoms would break down, which would result in all materials decaying soonar).

জাপানী বিজ্ঞানীদের সরবরাহকৃত উক্ত তথ্যে বৈজ্ঞানিক দলীল বেশ মজবুত, তার কারণ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকা আবার তিনটি কোয়ার্কের মাধ্যমে, আবার (Quarks) কোয়ার্কগুলো 'গাম' হিসাবে Strong N/Force-এর ক্ষুদ্র কণিকা 'গ্লুওনের' (gluon) সাহায্যে একত্রিত হয়ে তৈরী হয়েছে। পরিশেষে কণিকাদ্বয়ের গঠন ও 'নিউক্লিয়াসের' বর্তমান গঠন এবং নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে কক্ষপথে 'ইলেকট্রন' (Electron) কণিকাকে ধরে রাখার

"আমার আদেশ তো একটি কথায় (আদেশে) নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত দ্রুততর।"
(৫৪ : ৫০)
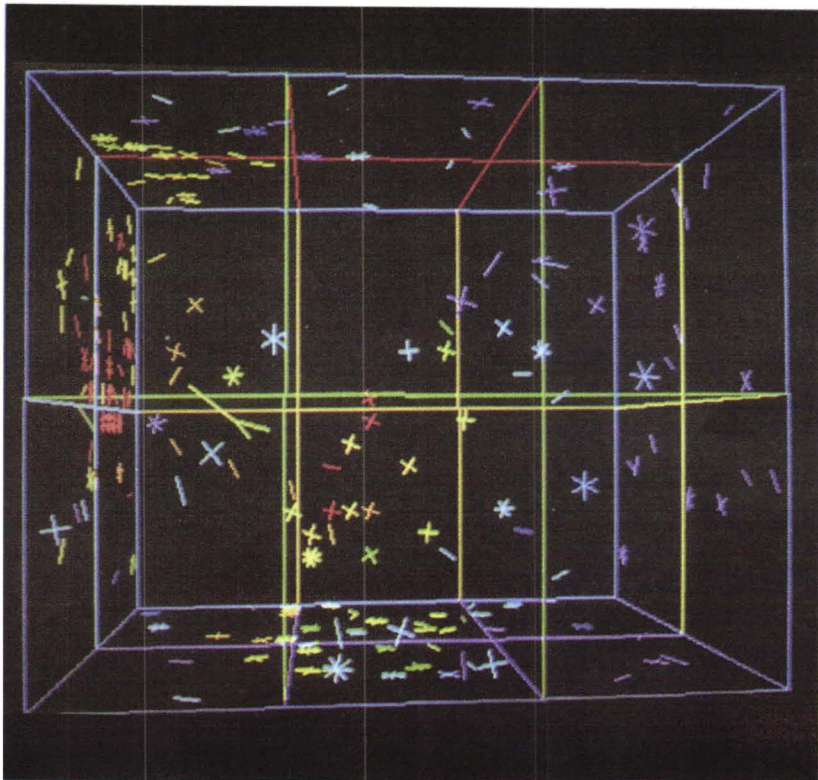
চিত্র-১৮৭

- The rarest event in the Universe (above). An electronic display of a simulated proton decay in an IBM detector. It simulated a possible simple form of proton decay in which a proton decays into a positron and a neutral pion, which move in opposite direction. The tracks of the decay particles are reconstructed in the left-hand part of the cube a positron (short yellow track) and a pion, which immediately decay. উল্লেখিত প্রোটন ডিকের মাধ্যমে পরমাণুর প্রোটন অবক্ষয় ঘটাতে সক্ষম হওয়ায় বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করছেন যে এ পদ্ধতিতে মহাবিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য ও বিলীন করে দেয়া সম্ভব।

"তাঁর ব্যাপার তো শুধু এই যে, তিনি যখন 'কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।" (৩৬ ঃ ৮২)
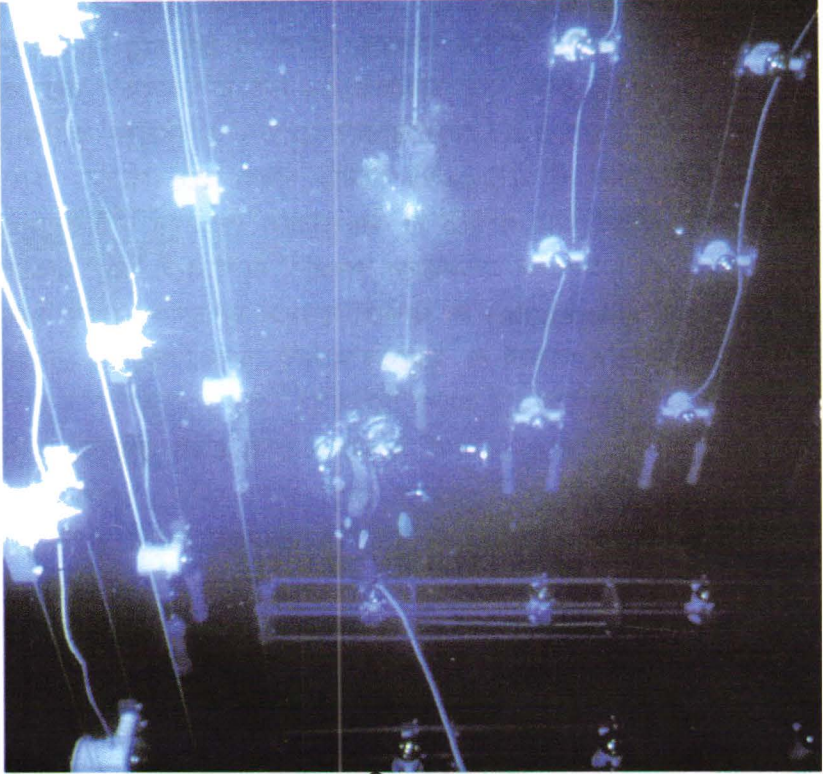
চিত্র–**১৮৮**

– ওপরে ছবিটির মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করতে চান যে, এ মহাবিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে প্রোটন কণিকা রয়েছে, এই প্রোটন কণিকাকে যদি কোনভাবে (ফ্লেভার-এর রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কোয়ার্ককে প্রভাবিত করে) অবক্ষয় ঘটানো বা বিবর্ণ করে দেয়া যায় তাহলে মহাসূক্ষ্ম সময়ের ভেতরই সমস্ত পরমাণু ভেঙ্গে গিয়ে অস্তি ত্ব হারিয়ে ফেলার কারণে মহাবিশ্বটি বিলীন হয়ে যাবে। দৃশ্যমান কোন বস্তুর কাঠামো আর থাকবে না। পর্যায়ক্রমে সব আবার আলোতে ফিরে যাবে।

সুতরাং আল্লাহর কথাই সত্য। তিনি 'হও' বলতেই নির্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন হয়ে যায়। অস্বীকার করার সুযোগ আছে কী? বিজ্ঞানীগণ এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তকে হয়তোবা খুঁজে পেয়েছেন, যা 'প্রোটন অবক্ষয়' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

করছে Electro magnetic Force. এখন কোন কারণে উল্লেখিত শক্তির কার্যকারিতা যদি নষ্ট করে দেয়া যায়, তাহলে নিউক্লিয়াসের মূল উপাদান 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' এবং 'ইলেকট্রন' কণিকাসমূহ চার্জ হারিয়ে পৃথক হয়ে পড়ায় পরমাণুও অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে, কিংবা ঐ Strong Nuclear Force যদি উঠিয়ে নেয়া যায় তাহলেও ওর দূত কণিকাস্বরূপ মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'গ্লুওন' (Gluon) এর অনুপস্থিতিতে 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকার মূল উপাদান 'কোয়ার্ক' (Quark) তিনটি পৃথক হয়ে পড়বে, ফলে কণিকাদ্বয়ের অস্তিত্ব আর থাকবে না, না থাকলে পরমাণুর নিউক্লিয়াসও থাকার কথা নয়। অতঃপর একইভাবে 'পরমাণু' না থাকলে 'অণু' থাকবে না এবং 'অণু' (Molecule) না থাকলে বর্তমান দৃশ্যযোগ্য (অণু দিয়ে গঠিত) এ মহাবিশ্বও থাকবে না, মুহূর্তের মধ্যেই চোখের পলকের চেয়েও দ্রুত সমস্ত কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। প্রশ্ন হতে পরে 'কোয়ার্ক' তো থেকে যাচ্ছে! বাস্তবে 'কোয়ার্ক' থাকলেও তারা এতই ক্ষুদ্র যে, দেখা যায় না, শুধু তাত্ত্বিকভাবেই আমরা মেনে নিয়ে থাকি। (অপরদিকে ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় পদার্থ কণা বিজ্ঞানীগণ জানিয়েছেন যে, বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ 'কোয়ার্ক' নয় বরং কোয়ার্কেরও গঠন উপাদান রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তারা এর বাস্তব প্রমাণ হাজির করার চেষ্টায় Particle Labroatory তে কঠোর পরিশ্রমের সাথে সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন)।

বতর্মান বিজ্ঞানের আরও ভাষ্য হচ্ছে– 'দুর্বল নিউক্লিও শক্তি' (Weak Nuclear Force) কে যদি বর্তমানের তুলনায় ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করে দেয়া যায় তাহলে ঐ শক্তির দূত কণিকা '$W^{\pm}$' এবং 'Z^{0}' কণিকাসমূহ প্রভাবশালী হয়ে সমগ্র মহাবিশ্বে বিরাজমান 'পরমাণু' জগত ও 'কোষ' জগতে কর্মরত সকল নিউক্লিও-বলের কণিকা 'গ্লুওন' (Gluon)কে বিবর্তনের মাধ্যমে কোয়ার্কসমূহকে প্রভাবিত করবে, ফলে কোয়ার্কের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কারণে 'পরমাণুর' এবং 'কোষের' কেন্দ্রীয় 'নিউক্লিয়াস বিপর্যস্ত হবে। এতে পরমাণু এবং কোষও মুহূর্তের মধ্যে অস্তিত্ব হারিয়ে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাবে। কেননা কোয়ার্কের

"মহাবিশ্বের (সকল প্রকার বস্তু ও শক্তির ওপর) সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (৩ ঃ ১৮৯)
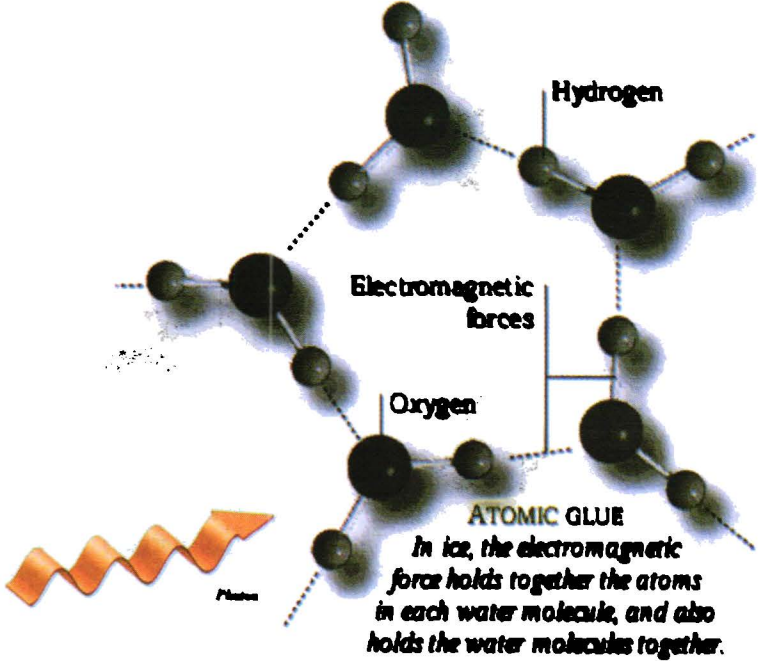
চিত্র-১৮৯

– বিজ্ঞান বিশ্ব প্রায় শত বৎসর অধ্যবসায়ের সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ মহাবিশ্বের সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে ৪টি মৌলিক শক্তিকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে 'Electromagnetic force' এর কাজ হচ্ছে বস্তু কণিকাসমূহকে পজেটিভ কিংবা নেগেটিভ চার্জ সরবরাহ করা। যেমন– প্রোটন কণিকাকে পজেটিভ ও ইলেকট্রন কণিকাকে নেগেটিভ চার্জ প্রদান করা। এর ফলে 'পরমাণু' পূর্ণ অটল কাঠামো লাভ করে মহাবিশ্বটিকে দৃশ্যমান কাঠামোতে ধরে রাখতে সমর্থ হচ্ছে। এখন কোনভাবে যদি এ শক্তিকে মুহূর্তের জন্য তুলে নেয়া যায় তাহলে কোন প্রকার চার্জ না থাকায় পরমাণু ভেঙ্গে পড়ার কারণে মহাবিশ্বটিও নিমিষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র কথাই যে চূড়ান্ত এবং চির সত্য এবার তা মেনে নিতে মানব সমাজের দ্বিধা না থাকার-ই কথা।

"মহাবিশ্বে এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে (বস্তু এবং শক্তিরূপে), তার সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই। এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (৫ ঃ ১২০)
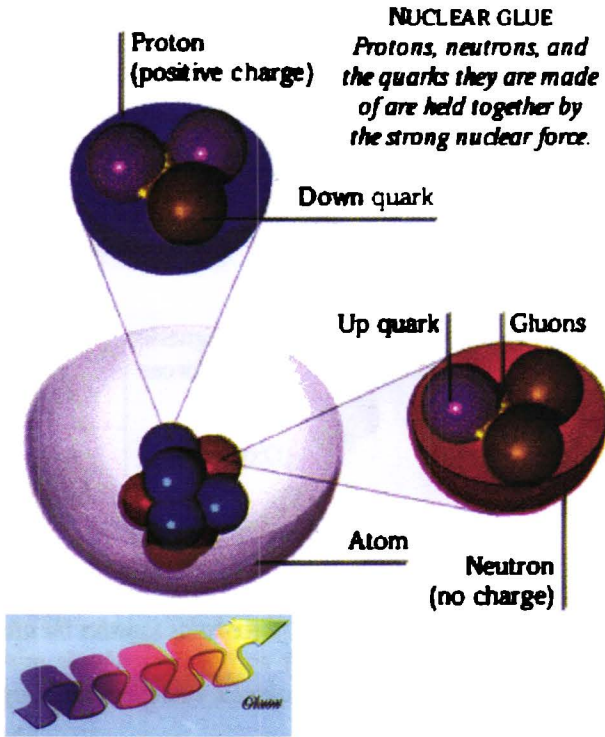
চিত্র-১৯০

– এ মহাবিশ্বের মাঝে মূল একক ইউনিট 'পরমাণুর' নিউক্লিয়াসে তিনটি কোয়ার্ককে একত্রিত করে 'প্রোটন' কিংবা 'নিউট্রন' কণিকা সৃষ্টিতে মূল ভূমিকা পালন করে Strong Nuclear Force-এর দূত কণিকা 'গ্লুওন' (Gluon)। বিজ্ঞান আমাদের অবহিত করেছে যদি কোনভাবে উক্ত শক্তিকে তুলে নেয়া যায় তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই 'পরমাণু' ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে অণু, পদার্থ, বিশ্ব ও মহাবিশ্ব কিছুই আর অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারবে না। ফলে সাথে সাথেই নিশ্চিহ্ন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে মহাবিশ্বটি।

কুরআনের এ দাবী পূর্বে বিজ্ঞান আমলে না আনলেও বর্তমানে কিন্তু স্বীকার না করে পারছে না। সত্যি নয় কী? আল্লাহ্‌র বাণী এভাবেই জ্ঞানের বেলাভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে।

"মহাবিশ্বের শক্তিসমূহ আল্লাহ্র-ই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (৪৮ ঃ ৪)
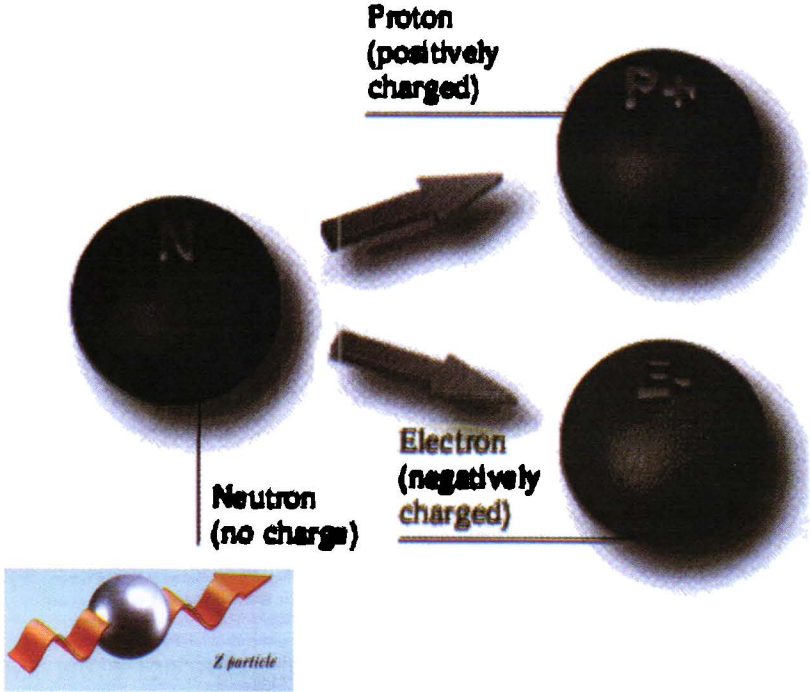
চিত্র-১৯১

– বিজ্ঞান বিশ্ব বর্তমানে বিশ্বাস করে যে, মহাবিশ্বে কার্যরত মৌলিক ৪টি শক্তির মধ্যে Weak Nuclear Force-কে যদি ব্যাপকভাবে প্রভাবশালী করে দেয়া যায়, তাহলে ঐ শক্তির কার্যরত দূত কণিকা W^+, W^- ও Z^0 পরমাণুর ভেতর কোয়ার্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রোটন ও নিউট্রন কণিকাদের অবক্ষয় ঘটিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই মহাবিশ্বকে অস্তিত্বহীন করে দেবে। ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মহাবিশ্বের দৃশ্যমান বর্তমান রূপ। ধ্বংস হবে মহাবিশ্ব।

উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণে একমাত্র আল্লাহ্ই সক্ষম। কেননা তিনিই সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান একমাত্র সত্তা। মানুষ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। সুতরাং আল্লাহ্র কথাই পরিপূর্ণরূপে 'সত্য' ও বাস্তব।

বিভিন্ন উপ-আণবিক মহাসূক্ষ্ম কণিকায় রূপান্তর ঘটবে। বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, একটি 'প্রোটন' কণিকা বিবর্তিত হয়ে রূপান্তর ঘটলে তাতে ব্যাপক আকারে 'গামা-রে' (Gamma-ray) নির্গত হয়ে থাকে। আমাদের সূর্যের অভ্যন্তরে 'প্রোটন-প্রোটন চেইন রিয়েকশান' (Proton-Proton chain reaction) এ অনুরূপ ঘটে থাকে।

ফলে মুহূর্তের মধ্যেই সমগ্র মহাবিশ্ব বিকিরণে (Gamma-ray) পূর্ণ হয়ে যাবে। পরে গামা-রে (Gamma-ray) কণিকা মূল আলোকশক্তি বা নূরে ফিরে যাবে।

অতএব, উল্লেখিত তথ্যে প্রমাণিত হচ্ছে যে, যদি 'দুর্বল নিউক্লিও শক্তি' (Weak Nuclear Force) কে ব্যাপকভাবে প্রভাবশালী করে দেয়া যায়, তাহলেও 'W ±' ও 'Z'º কণিকা ফ্লেভার-এর রং পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে কোয়ার্কসমূহকে পরিবর্তিত করে 'Proton-decay' ঘটিয়ে দিবে, ফলে পরমাণুর 'নিউক্লিয়াস' তার কর্মক্ষম কাঠামো হারিয়ে বিপর্যস্ত হবে, এতে করে পরক্ষণে পরমাণু না থাকা পরিবেশে 'অণু' থাকবে না। 'অণু' না থাকা পরিবেশে 'বস্তু' এবং 'বস্তু' না থাকা পরিবেশে মহাবিশ্ব থাকা কল্পনা-ই করা যায় না।

সুতরাং সমগ্র মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বিপন্ন করে অস্তিত্বহীন করে দেয়ার জন্য যে কোন পদ্ধতিতে সকল বস্তুর ভিত্তি 'পরমাণু'র 'Proton decay' ঘটানো-ই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও কার্যকর, যা স্বল্প সময়ে অর্থাৎ চোখের পলকেই মহাবিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্যে নিয়ে যাবে।

পুরো বিষয়টি এমন যে, মনে করা যেতে পারে একটি বিরাট বিল্ডিং, যার পুরো কাঠামো দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড় করানো হয়েছে, এখন আবার যদি পূর্বের সৃষ্টি পদ্ধতি অনুযায়ী একটি একটি করে ইট খুলে নিয়ে বিল্ডিংকে নিশ্চিহ্ন করতে হয়, তাহলে পূর্বের মত দীর্ঘ সময় ব্যয় হবে। আর যদি কৌশলে একটি মাত্র 'ডিনামাইট' দিয়ে বিল্ডিংকে উড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে পুরো বিল্ডিংটি মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হবে যে পূর্বে যে, এ স্থলে কোন বিল্ডিং দাঁড়িয়ে ছিল, তা পরিবর্তিত অবস্থার দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মনেই হবে না।

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (৫৭ ঃ ৩)
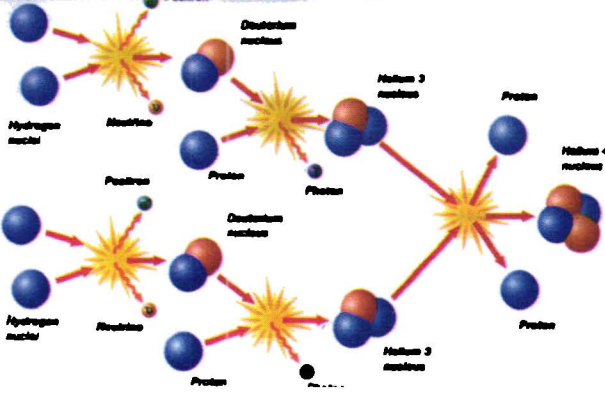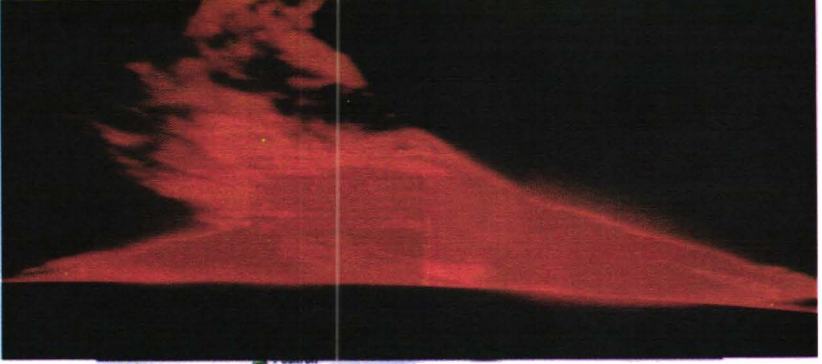
চিত্র–১৯২

– আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্র সূর্যে প্রতি মুহূর্তে 'প্রোটন প্রোটন চেইন রিয়েকশানে' প্রোটন অবক্ষয়ের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে গামা-রে (Gamma-ray) সৃষ্টি হয়ে কোটি কোটি মাইল এলাকাব্যাপী আলোকশক্তির বন্যায় পরিপূর্ণ করে রেখেছে। যে আলোকশক্তি পরবর্তীতে সমগ্র সৌরজগতকে জীবনী শক্তি দান করে টিকিয়ে রেখেছে।

সুতরাং মহাবিশ্বব্যাপী 'Proton decay' কিংবা অন্য কোন প্রকারে পরমাণু ভেংগে বিপর্যস্ত হলে সকল পদার্থ ও শক্তি ধ্বংস হয়ে সমগ্র মহাবিশ্বটি শুধু আলোক শক্তিতেই ভরে যাবে। পারমাণবিক বিস্ফোরণও এর বাস্তব উদাহরণ বটে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে ঐ আলোক শক্তিও কোন এক পদ্ধতিতে ঐ সময়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন অবশিষ্ট থাকবে শুধু তাঁর পবিত্রতম সত্তা।

"সমগ্র মহাবিশ্বের অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর-ই রয়েছে এবং (সমগ্র মহাবিশ্ব) ধ্বংসের ব্যাপারতো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও দ্রুততর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (১৬ ঃ ৭৭)
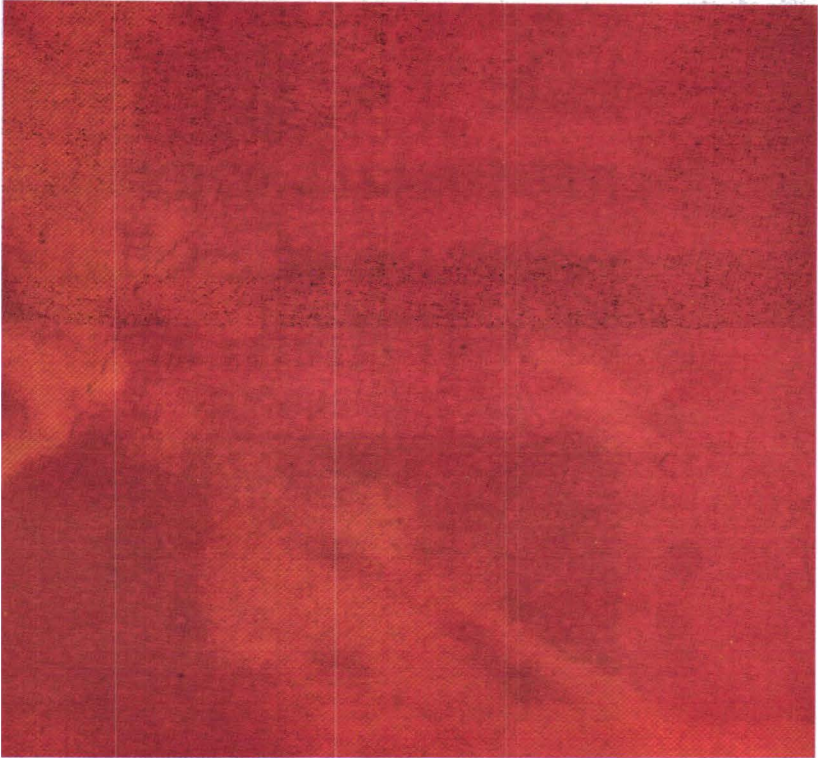
চিত্র-১৯৩

– 'Proton decay' অথবা ৪টি মৌলিক শক্তির যে কোন একটি কিংবা সবকটি লুপ্ত করে দিয়ে পরমাণুকে ভেঙ্গে ওর অস্তিত্ব 'বিপর্যস্ত' করার মাধ্যমে মহাবিশ্বটিকে বিলীন করে দেয়া হলে সকল বস্তু ও শক্তি কণিকা-ই পূর্বের আদি মৌলিক 'আলোক' শক্তিতে রূপান্তর ঘটবে।

যেহেতু আলোক শক্তির আগের কিছুই আমাদের জ্ঞানে জানা নেই, তাই বলা যায় উল্লেখিত আয়াত অনুসারে আল্লাহ মৌলিক আদি আলোক শক্তিকেও তার অস্তিত্ব থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন চোখের পলকে আমাদের অজানা কোন এক পদ্ধতিতে। অবশিষ্ট থেকে যাবেন একমাত্র তাঁর পবিত্রতম একক সত্তা।

"সমগ্র মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই ধ্বংসের অধীন। কেবলমাত্র তোমার প্রতিপালকের সত্তা ধ্বংসের অধীন নয়। যিনি মহিমময়, মহানুভব।" (৫৫ : ২৬, ২৭)
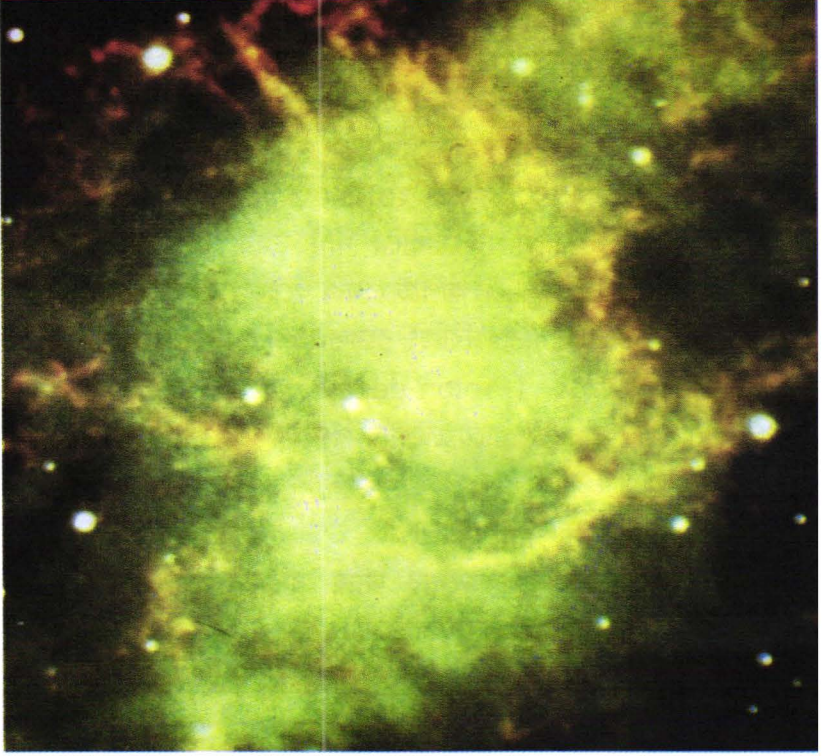
চিত্র–১৯৪

– বিজ্ঞান তার অপরিপক্কতার পরিবেশে 'Big crunch' প্রস্তাব সমর্থন করেছিল, কিন্তু বর্তমান পরিপক্কতার পরিবেশে যুক্তিসঙ্গত কারণে বিজ্ঞান তার পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসেছে এবং ঘোষণা করেছে 'Proton decay' কিংবা ৪টি মৌলিক শক্তির মধ্যে যে কোন একটি উঠিয়ে নিলেই মুহূর্তের মধ্যে মহাবিশ্বের দৃশ্যমান অস্তিত্ব বিপর্যস্ত হয়ে বিলীন হয়ে যাবে।

সুতরাং আল্লাহ্ সর্বময় ও সর্বশক্তিমান পবিত্র সত্তা হিসেবে মহাবিশ্ব ধ্বংসের ব্যাপারে যে তথ্য প্রদান করেছেন, আজকের উৎকর্ষিত বিজ্ঞান কি হুবহু সে কথাই প্রমাণ করেনি? এরপরও আল্লাহ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ আছে কী? মূলতঃ তিনিই একমাত্র স্রষ্টা ও রব। বর্তমান সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও সে কথাই সত্যায়ন করছে।

জাপানী বিজ্ঞানীগণ তাত্ত্বিকভাবে বিষয়টি 'প্রোটন ডিকে' (Proton deacy)-র মাধ্যমে নিষ্পত্তি হতে পারে বলে যে দাবী করেছেন তা প্রমাণ করতে সক্ষম হলেও একথা সম্মানিত পাঠক সমাজের মনে করা ঠিক হবে না যে, মানুষ বুঝি তার কলা-কৌশল বা প্রযুক্তি দিয়ে উল্লেখিতভাবে মহাবিশ্বটিকে মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে! আসলে এ ব্যাপারে মানুষ একেবারেই ক্ষমতা রাখে না। বিজ্ঞানীগণ শুধু একটা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন যে, আমাদের এ বিশাল মহাবিশ্বটি 'Big-crunch'-এর মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে ধ্বংস হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রমাণ হয়েছে তা সম্ভবও নয়, কিন্তু যদি কোন প্রকারে মহাবিশ্বের বিল্ডিং ব্লকের তথা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের উপাদানে 'প্রোটন ডিকে' (Proton decay) ঘটানো যায় তাহলে সাথে সাথেই মহাবিশ্বটি বর্ণিত উপায়ে চোখের পলকের চেয়েও দ্রুততার সাথে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যাবে। এ হচ্ছে বর্তমান বিজ্ঞানের 'মহাবিশ্ব' ধ্বংসের উদ্ঘাটিত একেবারে তরতাজা তথ্য।

এখন আমরা কুরআনের বক্তব্যের ন্যায় বর্তমান সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক রিপোর্টের দীর্ঘ পর্যালোচনার পর মূল পয়েন্টগুলোকেও সাজিয়ে নিতে চাই। যেমন–

১. আমাদের এ মহাবিশ্বটি প্রায় ১৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে 'Big-Bang' নামক এক প্রচণ্ড মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাসূক্ষ্ম একটি বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

২. সৃষ্টি মুহূর্ত থেকেই মহাবিশ্বটি চতুর্দিকে দুর্বার গতিতে শুধু বৃদ্ধি (expansion) ঘটে চলেছে।

৩. Big-Bang মহাবিস্ফোরণে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া তাপমাত্রা (Background radiation) ধারণকৃত উত্তপ্ত ও অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা (hotter & colder) এলাকার বিভক্ত 'মসৃণ ক্ষুদ্রতরঙ্গ' (Subtle ripples) নবীন মহাবিশ্বে সর্বত্র একই জাতীয় অবস্থার সৃষ্টি করে বিরাজমান ছিল। যা 'Inflation' তথ্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং তাতে মহাবিশ্বটি যে 'সমতল' (flat) তা নির্দেশ করে। 'COBE

ও 'Boomerang Projects সে প্রমাণগুলো বাস্তবভাবে হাজির করেছে।। অতএব 'Big-crunch'-ঘটবে না বা সে পরিবেশও তৈরী হবে না, এটা নিশ্চিত সত্য কথা।

৪. 'Super nova Ia'-র নিকটবর্তী ও দূরবর্তী এলাকায় সংঘটিত ধ্বংসপ্রাপ্ত জঞ্জালের (ramnent) সর্বোচ্চ তাপ বিকিরণের সময়ের তুলনামূলক ব্যবধান প্রমাণ করেছে যে, দূরবর্তী এলাকার সুপারনোভা নিটকবর্তীর চেয়ে বেশী বিবর্তন লাভ করার সুযোগ পেয়েছে মহাবিশ্বের সমতলতার (flat) কারণে। সুতরাং মহাবিশ্বটি কেবলই সম্প্রসারিত হচ্ছে, যা অদূর ভবিষ্যতে থামবে না এবং পরিণামে -'Big-crunch'-ও ঘটবে না।

৫. Gravitational Lensing পরীক্ষায় 'dark matter' ব্যাপকভাবে আবিষ্কৃত হলেও এখনও পর্যন্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য মিলে বস্তুর গড় ঘনত্ব (Average density) পরিবর্তিত অবস্থার (Critical value-র) চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম, যা মহাবিশ্বের বর্তমান সম্প্রসারণ থামিয়ে দিয়ে মহাকর্ষ শক্তির প্রাধান্য সৃষ্টি করে মহাসঙ্কোচন ঘটাবার জন্য তা যথেষ্ট নয়, তাই 'Big-crunch'-ও ঘটার সম্ভাবনা নেই।

৬. আমাদের মহাবিশ্বটি 'Closed Universe' নয় বরং 'open ও flat Universe.

৭. আমাদের মহাবিশ্বটির মহাধ্বংস সাধনের জন্য 'প্রোটন' কণিকার বিবর্ণ তথা অবক্ষয় (Proton decay) ঘটানোই যথেষ্ট, তাতেই মহাবিশ্বের বিল্ডিং ব্লক পরমাণুর 'নিউক্লিয়াস' ভেংগে সকল প্রকার বস্তু অস্তিত্বহীন হয়ে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের (fraction of second) মধ্যেই বিলীন হয়ে যাবে। পরিত্যক্ত 'Big-crunch' প্রস্তাবের ন্যায় দীর্ঘ সময়ের (প্রায় ১৫০০ কোটি বৎসরের) প্রয়োজন হবে না।

ওপরের 'কুরআনিক' ও 'বৈজ্ঞানিক' দীর্ঘ পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়েছে এ মহাবিশ্বের মহাধ্বংস মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের 'হও' (কুন) নির্দেশ প্রদানের সাথে সাথেই চোখের পলকের চাইতেও দ্রুততর (fraction of second) সংঘটিত (ফায়াকুন) হয়ে যাবে।

সুতরাং আল্-কুরআন এক মহাসত্যতার ডালি নিয়ে মানব জাতির দ্বারপ্রান্তে

আগমন করেছে তাদেরই সত্য প্রতিপালকের নিকট হতে, যে পবিত্র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই।

"আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটা এক মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

এবার আমরা 'এক নজরে' ছকে বক্ষমান গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচিত 'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞান'-এর মহামূল্যবান তথ্যগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে নিতে চাই।

এক নজরে

আল-কুরআন

১. "আমি সমগ্র মহাবিশ্ব এবং ওর মাঝে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয়টি সময়কালে, আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" (৫০ঃ ৩৮)

২. "তাঁর আসন সমগ্র মহাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এদের রক্ষণা-বেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।" (২ ঃ ২৫৫)

৩. "তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করেছেন, যখন তিনি বলেন 'হও', তখনই তা হয়ে যায়। তাঁর কথাই

বর্তমান বিজ্ঞান

১. বর্তমান বিজ্ঞানবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ 'Big Bang' কে মেনে নিয়েছে এবং মহাবিশ্ব সৃষ্টি মুহূর্ত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দৃশ্যমানরূপ ধারণ করতে যে মোট ৬টি পর্যায় অতিক্রম করেছে, তা একবাক্যে স্বীকার করছে।

২. বিজ্ঞানীগণ মহাবিশ্বের বর্তমান ব্যাস প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ বলে অনুমান করছেন এবং কল্পনাতীত বৃহৎ হলেও এর যে একটা বাস্তব কাঠামো এবং সীমানা আছে তা স্বীকার করছেন।

৩. আমাদের এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক Big Bang Model গবেষণা করে বিজ্ঞানীগণ জানিয়েছেন মহাবিশ্বটি $১০^{-৪৩}$ সেকেণ্ড প্রায়, এক মহাসূক্ষ্ম সময়ে অর্থাৎ এক সেকেণ্ডের ১০ কোটি,

সত্য।" (৬ ঃ ৭৩)
"আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন, তখন শুধু বলেন 'হও', আর অমনি ওটা হয়ে যায়।" (২ ঃ ১১৭)

৪. "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (৫৭ ঃ ৩)
"(মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর (ধ্বংসের অধীন), অবিনশ্বর কেবলমাত্র তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব।" (৫৫ ঃ ২৬-২৭)
"আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট।" (৫৩ ঃ ৪২)
"জাহান্নামে তারা স্থায়ী হবে ততদিন, যতদিন মহাবিশ্ব বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন, তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন।" (১১ ঃ ১০৭)
"পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে,

১ ভাগ সময়কালে সৃষ্টির সূচনা ঘটিয়েছে। এ তথ্য আবিষ্কার হওয়ার পর শুধু বিজ্ঞান বিশ্বের বিজ্ঞানীগণই নয় সমাজের জ্ঞানীজনও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। একটু করে ভাবার সুযোগ পান– তাহলে কি স্রষ্টার দাবী ও তাঁর সবরবাহকৃত তথ্য সবটাই সত্য! আসলেও বিষয়টি তা-ই!

৪. সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ 'Big Bang' তথা মহাবিস্ফোরণ তথ্য প্রমাণিত হওয়ায় বর্তমান বিজ্ঞানজগত স্বীকার করছে এ মহাবিশ্ব এক সময় ছিল না, প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে মহাবিশ্বটি, আলোক শক্তির প্রচণ্ড ঘনায়নের মাধ্যমে সঙ্কুচিত হয়ে এক পর্যায়ে মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মপ্রকাশ লাভ করে।

যেহেতু মহাবিশ্বটি সৃষ্টি হয়েছে এবং সৃষ্টির ব্যাপারটি প্রমাণিতও হয়েছে, তাই বিজ্ঞান বিশ্বাস করে একদিন অবশ্যই মহাবিশ্বটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পূর্বের মত অদৃশ্যে মিলিয়ে যাবে, কেননা যার সৃষ্টি আছে, তার একদিন ধ্বংসও অনিবার্য।

বিজ্ঞান আরও বিশ্বাস করে সৃষ্টি বলতে যা বুঝায়, তার সমস্তই এ মহাবিশ্বের মাঝে অবস্থিত, মহাবিশ্বের সীমানার বাইরে কোন প্রকার সৃষ্টির অস্তিত্ব নেই। তাই মহাবিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে বিলীন হয়ে গেলে ওর সাথে সাথে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ধ্বংস হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কোথাও কোন কিছুরই আর অস্তিত্ব থাকবে না।

সেখায় তারা স্থায়ী হবে ততদিন, যতদিন মহাবিশ্ব বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন, এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার ।" (১১ ঃ ১০৮)

মানব সমাজ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হোক কিংবা না হোক, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কৃত তথ্যে কিন্তু এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, একদিন মহাবিশ্বটি নির্ঘাত ধ্বংস হয়ে যাবে ।

৫. "আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে, আমার আদেশতো একটি কথায় নিষ্পন্ন হয়ে যায় চক্ষুর পলকের মত দ্রুততর ।" (৫৪ ঃ ৪৯-৫০)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) অদৃশ্য বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই আছে এবং (মহাবিশ্বের) ধ্বংসের আদেশতো বস্তুতঃ চক্ষুর পলকের ন্যায় বরং তার চেয়েও দ্রুততর কার্যকর হবে । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (এ তথ্যটি মানব জাতির স্মরণে থাকা বাঞ্ছনীয়) ।" (১৬ ঃ ৭৭) –অর্থাৎ মহাবিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই আছে মহাবিশ্বের সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, যা আর কারও নেই । মহাবিশ্বকে যেমনিভাবে এক মহাসূক্ষ্ম সময়ে তিনি সৃষ্টি

৫. 'Big Bang Model' গবেষণাকারী বিজ্ঞানীগণ জানিয়েছেন যে, মহাবিশ্বটির সৃষ্টি মুহূর্ত থেকে এর প্রতিটি বিষয়ে রয়েছে কল্পনাতীত পরিমাণ ও পরিমাপমিতি । একটি বিষয়ও এলোমেলো কিংবা উদ্দেশ্যবিহীন নয় । প্রতিটি বিষয়ই উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও পরিকল্পনার এক মহা সূক্ষ্ম সুতোয় যেন বাঁধা ।

আবার মহাবিশ্বটি সৃষ্টির ব্যাপার যেমনিভাবে দৃষ্টির ঝলকের চেয়ে দ্রুততর $১০^{-৪৩}$ সেকেণ্ড সময় যে নিয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে মহাবিশ্বটি ধ্বংসের ব্যাপারেও যে মহাসূক্ষ্ম এক সময় মানই গ্রহণ করবে, সে বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞানী সমাজও একমত পোষণ করছে । প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাকে ব্যবহার করে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ দেখিয়েছেন যে, যেহেতু মহাবিশ্বটি closed (বদ্ধ) মহাবিশ্ব নয় এবং দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুভর-এর সম্মিলিত ঘনত্ব বর্তমান সম্প্রসারণকে থামিয়ে দিতে যথেষ্ট নয়, তাই Big crunch ও ঘটবে না ।

বিজ্ঞানীগণ এক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, মহাবিশ্বটি যে নিশ্চিত মহাসূক্ষ্ম এক সময় মানে

করেছেন, তেমনিভাবে আবার চক্ষুর পলকের চেয়েও দ্রুততর এক মহাসূক্ষ্ম সময়ে মহাবিশ্বকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন। তাঁর সিদ্ধান্ত সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস যে কোন ব্যাপারেই কার্যকরী হয়ে থাকে। কেননা তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে যাবে, তা ঘটবে সম্ভবত নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতিতে। যেমন–

(১) মৌলিক ৪টি শক্তি কিংবা শুধু 'প্রবল নিউক্লিয় শক্তির' অবলুপ্তির মাধ্যমে।

(২) অথবা পদার্থের মৌলিক ভিত্তি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন কণিকার অবক্ষয় (Proton decay) ঘটানোর মাধ্যমে।

সুতরাং প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে এক অবিজ্ঞান যুগে 'আল্-কুরআন' বিশাল এ মহাবিশ্বের সৃষ্টির সাথে সাথে ওর অনিবার্য ধ্বংসের এবং তা যে মহাসূক্ষ্ম এক সময়মিতিতেই ঘটবে বলে পৃথিবীবাসীকে অবহিত করেছিল, পূর্বে বিষয়টি না বুঝার কারণে অস্বীকার করা হলেও বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল পরিবেশে কি তা আর অস্বীকার করা চলে? চলে না। এখন তা অস্বীকার করতে চাইলে অবশ্যই অতি বিজ্ঞানপ্রিয়দেরকে প্রথমে বর্তমান উৎকর্ষিত বিজ্ঞানকেই পুরোপুরি অস্বীকার করতে হবে। আর এমন স্ববিরোধী কাজটি যদি কেউ করেন তা হলে সমাজে অবশ্যই তিনি সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হিসেবে বিবেচীত হতে পারেন না।

'বিজ্ঞান' বর্তমান সময়ে অনেক পরিপক্ক (matured), তাই বিজ্ঞানীদের খামখেয়ালিপনাকে বিজ্ঞান এখন আর পূর্বের মত প্রশ্রয় না দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে সত্য-সঠিক আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের বেল্টে বেঁধে ক্রমান্বয়ে মহাসত্য প্রভু এক ও অদ্বিতীয় 'আল্লাহ্'-র পানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে

জন্যই কুরআন এবং বিজ্ঞানের বর্তমান ধারায় কোন বৈপরিত্য, গরমিল কিংবা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না।

"তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায় সংগত। তাঁর বাণী কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয় অবগত রয়েছেন।" (৬ ঃ ১১৫)

অতএব, "আল্লাহ্ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ আছে কি যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) একমাত্র স্রষ্টা?" (১৪ ঃ ১০)

"সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতেই অবতীর্ণ। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।" (১৮ ঃ ২০)

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন আমাদের মানব সমাজকে তাঁর পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে সৃষ্ট এবং তাঁরই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত এ মহাবিশ্বের সকল বিষয়ে সঠিক তথ্য বোঝার এবং সে অনুযায়ী জীবন নির্বাহ করার তৌফিক দিন। আমীন!

সমাপ্তি কথা

বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে বসবাসকারী সমাজের অবিশ্বাসী জ্ঞানী-গুণীজন এবং অবিশ্বাসী বিজ্ঞানী সমাজ মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও স্রষ্টার ব্যাপারে নিজেদের কল্পনাপ্রসৃত এমন এমন সব উদ্ভট তথ্য ও তত্ত্বের উদগীরন করে নিজেদের নেহায়েত স্বল্প বুদ্ধির প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছেন যে, তাতে মনে হয় তারা বুঝি এ মাত্র পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীর নিয়ে আকাশ থেকে সরাসরি পৃথিবীতে পদার্পণ করেছেন। এ জন্য তাদেরকে কখনও মাতৃগর্ভে থাকতে হয়নি। ছোট কচি শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হতে হয়নি। দারুন অসহায় অবস্থায় কান্না আর কান্না করে সময় কাটাতে হয়নি। অবুঝ শিশু অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে জ্ঞানবান পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে হয়নি। এ জন্যই তারা তাদের সৃষ্টির প্রতিটি পর্যায়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্কে এবং তাঁর মহাজ্ঞান ও মহাশক্তি-ক্ষমতার হস্ত ক্ষেপকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন না। তারা তাই সামান্য একটি তর্জনী উঁচিয়ে এ বিশাল মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টাকে এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সকল কিছুকেই অস্বীকার করতে চাচ্ছেন।

তা না হয়ে যদি সত্যি তারা অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়ে পর্যায়ক্রমে মানব শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে পরে এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকেন, তাহলে কি করে ভাবতে পারেন যে, স্রষ্টা বলতে কিছু নেই? স্রষ্টা যদি না থাকেন, তবে পানি থেকে কে তাদের মানব শিশুর আকৃতি প্রদান করলো? কে তাদের মাতৃগর্ভে যথাযথভাবে লালন-পালন করে দেহের সার্বিক বৃদ্ধি ঘটালো? কে তাদেরকে প্রায় ১০টি মাস মাতৃগর্ভে রেখে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করে পরে পৃথিবীর আলো-বাতাসে নিয়ে এলো? কেন মাতৃগর্ভে কাউকে পাঁচ বছর, কাউকে ১০ বছর কিংবা কাউকে

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা তখন কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।" (১৬ ঃ ৭৮)
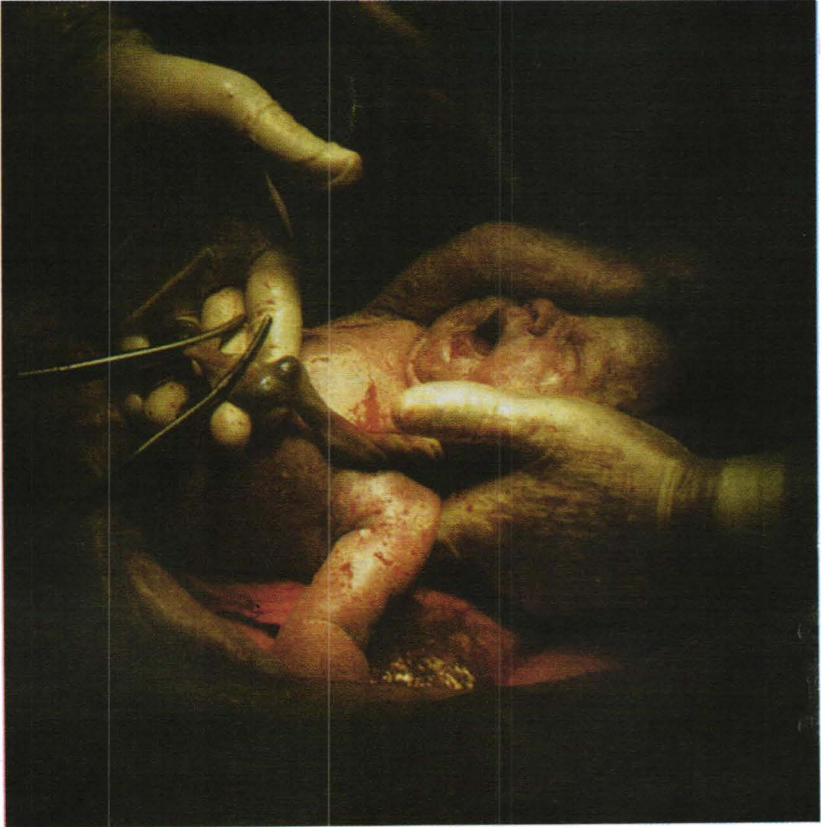
চিত্র–১৯৫

– মাতৃগর্ভে এক ফোটা পানি থেকে বিস্ময়ের বিস্ময় মানবশিশু এক পূর্ণাঙ্গ অবয়ব নিয়ে এ পৃথিবীর পরিবেশে যে আগমন করলো, তাতে কি প্রমাণ হয় না যে, এর পেছনে মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান একজন স্রষ্টা কার্যরত আছেন? তা না হলে লক্ষ কোটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সুন্দর এ মানব শিশু সৃষ্টি হলো কিভাবে? তাও একটি মাত্র নয় বরং প্রতিদিন কোটি কোটি হিসেবে।

নিরপেক্ষ জ্ঞান স্রষ্টার এ কৃতিত্বকে অস্বীকার করতে পারে কী?

৫০ বছর রাখা হল না? সকল মানব সন্তানের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় প্রায় ১০ মাস কে ধার্য করলো? নিজ থেকেই কোন বিষয় কি এভাবে সবার ক্ষেত্রেই একই রকম হতে পারে? অবুঝ অসহায় ভূমিষ্ঠ শিশুকে ক্রমান্বয়ে কে বিবেক-বুদ্ধি, দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি ও কর্মশক্তি নীরবে দান করলো? পরে শৈশব-কৈশর, ক্রমান্বয়ে পাড়ি দিয়ে আজকের ভরা যৌবনে পদার্পণ করে নিজ শরীরের দিকে তাকিয়ে সুগঠিত-সুঠাম ও শক্তিশালী নিজ দেহখানা দর্শন করে পরম তৃপ্তিতে অতীতের সকল অবস্থাগুলোকে বেমালুম ভুলে গিয়ে তারা বলতে লাগলো-কোথায় স্রষ্টা? স্রষ্টা বলতে আবার কিছু আছে না কী? থাকলে তাঁর কাজ কী? তাঁর কোন প্রয়োজন আছে বলেতো মনে করি না! সমগ্র মহাবিশ্বটি নিজ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এবং নিজ থেকেই পরিচালিত হচ্ছে, ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে কি তার পরবর্তী অবস্থা হতে পারে। মানুষসহ সকল প্রাণীরও ঐ একই অবস্থা। নিজ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এবং নিজ থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন। সুতরাং যে যার ইচ্ছামত চলবে এটাই স্বাভাবিক।

অথচ কিছু সংখ্যক এ জাতিয় জ্ঞানপাপীর বিকৃত মস্তিষ্ককে যথাযথভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে জায়গামত বসিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানব শিশুকে ছোট বেলায়-ই কৌশলে কিছু বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন, যে জ্ঞানের প্রভাবে ছোট শিশুটি মায়ের কোলে বসেই জিজ্ঞাসা করে-ঐ সুন্দর চাঁদটাকে কে বানিয়েছেন? পাখীগুলোকে কে সৃষ্টি করেছেন? গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী এদেরকে কে এভাবে সৃষ্টি করলেন? দিনের বেলায় সূর্য কেন এবং রাতের বেলায় চাঁদ কেন? সূর্যের আলো এত বেশী কেন? চাঁদের আলো কম কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি। এভাবে প্রকৃত স্রষ্টার সন্ধানে কচি মন জানার ব্যাকুলতায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার, যে বয়সে উল্লেখিত বিষয়গুলোর সঠিক উত্তর জ্ঞানের ছত্রছায়ায় যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব, ঠিক সেই সময়ই উল্লেখিত শ্রেণীর মানুষগুলো বিভ্রান্ত হয়ে উল্টো ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রোগীর প্রলাপের মতই চিৎকার করছে- 'There is no God. There is no planning. We are same as animal, We have no other special quality.' etc, etc.

"আল্লাহ্-ই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।" (২১ ঃ ৩৩)
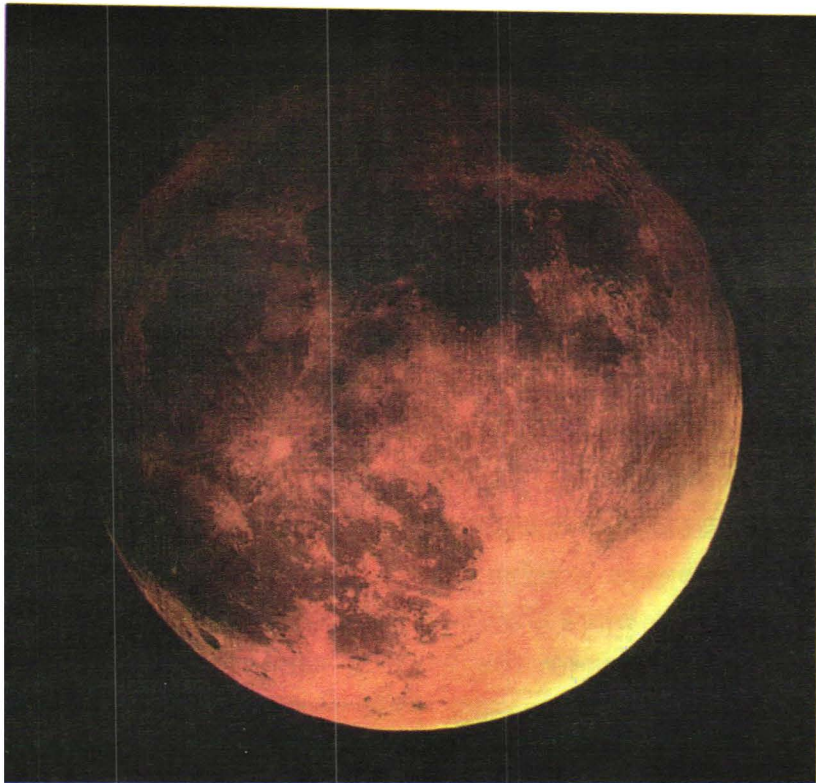
চিত্র–১৯৬

– মাতৃকোলে থাকাবস্থায়-ই ছোট শিশুটি মাকে প্রশ্ন করে কে চাঁদকে এত সুন্দর সুষমা দিয়ে সৃষ্টি করেছে? এত ছোট অবস্থায় শিশুটি স্রষ্টা সম্পর্কীয় প্রশ্ন জানার এবং উপস্থাপন করার কথা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ কৌশলে এ ব্যবস্থা করেছেন শুধুমাত্র সমাজের জ্ঞানীদের বিবেককে একটুখানি নাড়া দেয়ার জন্য, যাতে করে বিভ্রান্ত জ্ঞানী সমাজ স্রষ্টা বিষয়ক মৌলিক সত্য তথ্যটি শিশুর মুখে শুনে পরে তাদের উচ্চতর জ্ঞানের বেষ্টনিতে ধারণ করে প্রকৃত কল্যাণের পথে পা বাড়াতে পারে।

অতএব, হে জ্ঞানী সমাজ! আল্লাহ্কে স্বীকার কর এবং তাঁকে ভয় কর! এতেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।

"তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন পাখীদের প্রতি? আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ-ই সেগুলোকে স্থির রাখেন না। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য।" (১৬ ঃ ৭৯)

চিত্র-১৯৭

– কে পাখী বানিয়েছে? ছোট শিশুর এ অভিব্যক্তি সমাজের জ্ঞানীদের সত্যিকার অর্থেই ভাবিয়ে তোলে। আল্লাহ্ তাঁর পরিচয় প্রকাশের জন্য বৃহৎ কোন নিদর্শনের প্রয়োজন বোধ করেন না বলেই ছোট শিশুর মুখ নিঃসৃত ছোট কথায় বিরাট তাৎপর্য লুকিয়ে রেখেছেন। যারা প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানবান, তারা এই ছোট্ট প্রশ্নটির উত্তর পেতে আগ্রহী হলে, নিঃসন্দেহে মহাবিশ্বের এক ও একক স্রষ্টাকে উদ্‌ঘাটন করে ধন্য হতে পারেন। সমাজে এ জাতীয় জ্ঞানবান কেউ আছেন কী?

"তিনিই চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারসমূহ সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য এতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা হতে তোমরা আহার করে থাক।"
(১৬ ঃ ৫)

চিত্র–১৯৮

– কে ওগুলো বানিয়েছে? ছোট সোনামণির ছোট্ট একটি প্রশ্ন, অথচ বিশাল, বলা যায় সর্ববৃহৎ এক উত্তর এর বিপরীতে মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য লুকিয়ে রয়েছে।

সমাজে এমন কোন জ্ঞানীজন আছেন কী, যিনি এর উত্তরে বলতে পারবেন যে, 'এগুলো আমরাইতো সৃষ্টি করেছি'? বস্তুতঃ মানুষ এগুলোর স্রষ্টা নয় তাই আজ পর্যন্ত সে কথা কেউ দাবীও করেনি।

সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানী সমাজ তারাই, যারা সকল অবস্থায় স্রষ্টার কৃতিত্বকে স্বীকার করে এবং সে পথেই কেবল এগিয়ে চলে। এদের জন্যই রয়েছে সকল প্রকার কল্যাণ।

অথচ বর্তমান বিজ্ঞানবিশ্ব তার নব নব আবিষ্কার দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব 'Big Bang', পৃথিবীর ধ্বংস তথা Dooms day, সমগ্র মহাবিশ্বের একদিন যবনিকাপাত, বস্তু জগতের লাইফ সাইকেলসহ অসংখ্য-অগণিত ঘটনা উদঘাটন করে প্রমাণ করছে যে এ সবের পেছনে একজন মহান সর্বময় ও সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী সত্তার উপস্থিতি এবং তাঁর ক্রিয়াশীল হস্ত সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত আছে। তা না হলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট নিয়ম, ক্রম ও শৃংখলা কখনই কার্যকর হত না। একবিংশ শতাব্দির শুরুতে 'Genetic Engineering' তার আবিষ্কার দিয়ে প্রমাণ করছে প্রাণীকোষের মহাসূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৩৩০ কোটি জিনের (Gene) অকল্পনীয় ও বিস্ময়কর ক্ষুদ্রত্বে উপস্থিতি এবং কর্মকাণ্ড একজন মহান স্রষ্টা শুধু যে আছেন তা-ই নয় বরং তিনি সত্যি-সত্যিই শক্তি-ক্ষমতায় পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানের মাপকাঠিতে অবশ্যই মহাজ্ঞানী, যে জ্ঞানের কল্পনা করাও মানব সমাজের সাধ্যাতীত ব্যাপার। আল্-কুরআন মাত্র একটি বাক্যে সে কথা সৃষ্টির সেরা মানুষকে অবহিত করেছে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই, যেন মানুষ তার স্রষ্টাকে জ্ঞান দিয়ে কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারে। আর মানুষের পক্ষে সেই উপলব্ধির জন্য মহাবিশ্বের দিকে এবং নিজ দেহের দিকে জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করে তাকালেই বুঝতে সব সহজ হয়ে যাবে। কুরআন বলছে–

"আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং ওদের নিজেদের মধ্যে ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে ওটাই (আল-কুরআন) সত্য, এতে কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত?" (৪১ ঃ ৫৩)

সুতরাং মহাবিশ্বে মহাজাগতিক অসংখ্য বস্তু, শক্তি ও বিষয়ের উপস্থিতি এবং আবিষ্কার বা উদঘাটন এবং মানুষের নিজেদের শরীরের মধ্যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অদৃশ্য লক্ষ-কোটি বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড প্রমাণ করছে এ মহাবিশ্বের জন্য একক মহান স্রষ্টা অবশ্যই আছেন। বিজ্ঞানের বর্তমান উন্নততর জ্ঞানময় পরিবেশে যা অস্বীকার করা একেবারে হাস্যস্পদ ব্যাপার বৈ কি!

"আমি ওদের জন্য আমার (উপস্থিতি ও অদৃশ্য কর্মকাণ্ডের বাস্তব) নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং ওদের নিজেদের (শরীরের গঠন উপাদান ও তার মহাসূক্ষ্মতায় জ্ঞানময় ব্যবস্থাপনার) মধ্যে, ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে 'ওটাই (প্রভুর উপস্থিতি ও অতুলনীয় আল-কুরআন) সত্য, এটা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত।" (৪১ ঃ ৫৩)
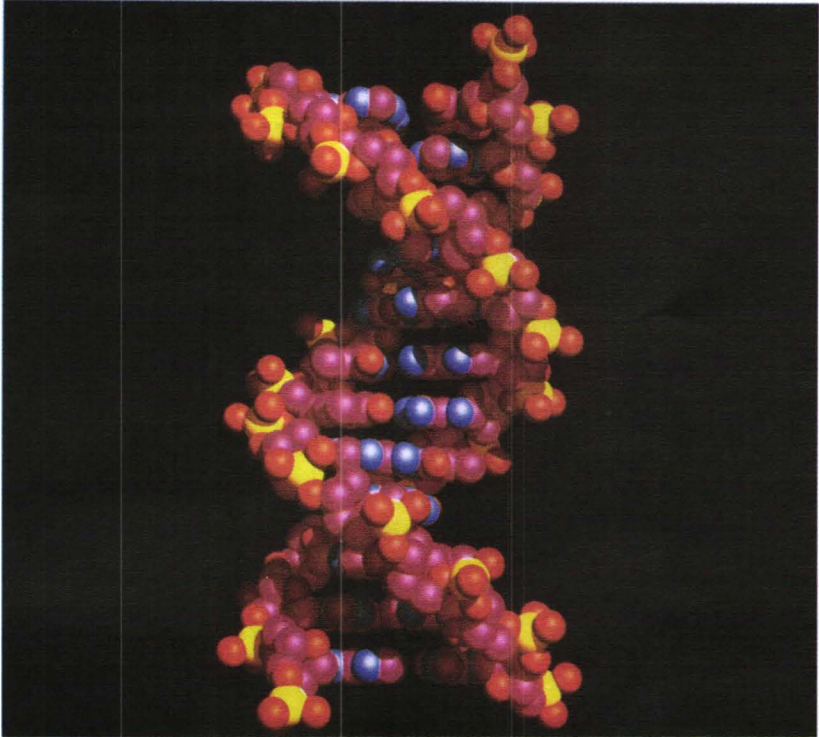
চিত্র-১৯৯

– ছবিতে দৃশ্যমান মানব দেহের বিস্ময়কর গঠন ও কলা-কৌশলের ধারক DNA–Helix কে দেখা যাচ্ছে। এই DNA-এর চার প্রকার এসিড কণিকায় আছে প্রায় ৩৩০ কোটি জিন পেয়ার। এই জিনগুলো তাদের বিন্যাসের মাধ্যমে মানুষের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় বহন করে থাকে এবং মানব দেহের প্রয়োজনে প্রায় পাঁচ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ 'প্রোটিন' তৈরী করে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে। সাথে সাথে আমাদেরকে মহাজ্ঞানী স্রষ্টার সম্মুখে অবনত হতে আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে। এরপরও কি আমরা নত হব না? সত্যকে অস্বীকার করে আমরা প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হতে পারবো না।

মানুষ তাদের নিজেদের শরীরের দিকে তাকালেও যে মহান আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বাস্তবভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছেন– বর্তমন বিজ্ঞান বিশ্বের প্রথম সারির অন্যতম বিজ্ঞানী 'মিঃ স্টিফেন হকিংস।' তার জীবনের মাঝপথে অর্থাৎ যৌবনকালে তিনি বিশেষ রোগের কারণে পঙ্গুত্ব বরণ করেন এবং ডাক্তার তার জীবনের আশা ছেড়ে দেন। আর এ সময় তিনি আল্লাহ্‌দ্রোহী বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। এ অবস্থায় আল্লাহ্‌ তাকে মহাবিপদে ফেলে দিয়ে পরক্ষণে আবার ঐ পঙ্গু, অসহায় ও বিপর্যস্ত শরীরকে যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর শরীরে রূপান্তর ঘটালেন। আল্লাহ্‌ নীরবে যেন ডেকে বলতে চাইলেন, 'হে আমার বান্দাহ বিজ্ঞানী স্টিফেন! তুমি এবং তোমার ডাক্তার যে শরীর সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়েছিলে, সেই বিপর্যস্ত শরীরকে পৃথিবীর কোন্‌ মানবীয় সত্তা এত বড় বিজ্ঞানীর দেহে রূপান্তর করলেন? এটা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? বিজ্ঞানের মাধ্যমে আবিষ্কৃত 'Black hole' ও 'Big Bang' গবেষণায় কৃতিত্বস্বরূপ যে সুনাম তুমি অর্জন করেছ, তাতো বস্তুতপক্ষে আমারই অদৃশ্য কৌশল ছিল, যেন তুমি বুঝতে পার একজন মহান প্রভু আছেন, যিনি ইচ্ছা করাতেই তোমার মত বিপর্যস্ত একজন মানুষকেও তিনি বিজ্ঞান বিশ্বে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। তোমার নিজ শরীরের দিকে তাকিয়ে কি তা তুমি অনুধাবন করতে পার না? প্রথম দিকে তুমি মহাবিশ্বের প্রভুকে অস্বীকার করায়, আমার এ সিদ্ধান্ত (তোমাকে পঙ্গ করেছি) তোমার ওপর কার্যকর করা হয়েছে। এবার তোমার নিজের দিকে তাকিয়ে প্রভুকে চিনতে পেরেছ আশা করি!' তাই এবার মাথা নত করবে কী?

সুধীপাঠক! বাস্তবে বিষয়টি অনেকটা এ রকম-ই ঘটেছে বলে মনে হয়, কেননা ইদানিং বিজ্ঞানী 'মিঃ স্টিফেন হকিংস' বিভিন্নভাবে মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টার উপস্থিতির পক্ষে অনেকটা নমনীয়ভাব প্রদর্শন করছেন, সে বিষয়ে আমরা একটি বিশেষ খণ্ডে ব্যাপক আলোচনার আশা পোষন করছি।

পরিশেষে এরই আলোকে আমাদের কামনা থাকবে যারা এখনো মহান সত্তা 'আল্লাহ্‌'কে অস্বীকার করছেন, তারা বিজ্ঞানের বর্তমান আবিষ্কারের অগ্রযাত্রায় পূর্বের গোঁড়ামিপূর্ণ সিদ্ধান্তে অটল না থেকে বরং বিজ্ঞানের

"বল কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন অথবা শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি কার কর্তৃত্বাধীন? কে জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করেন এবং মৃতুকে জীবিত হতে নির্গত করেন? কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? উত্তরে ওরা বলবে, 'আল্লাহ্ । তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?" (১০ ঃ ৩১)
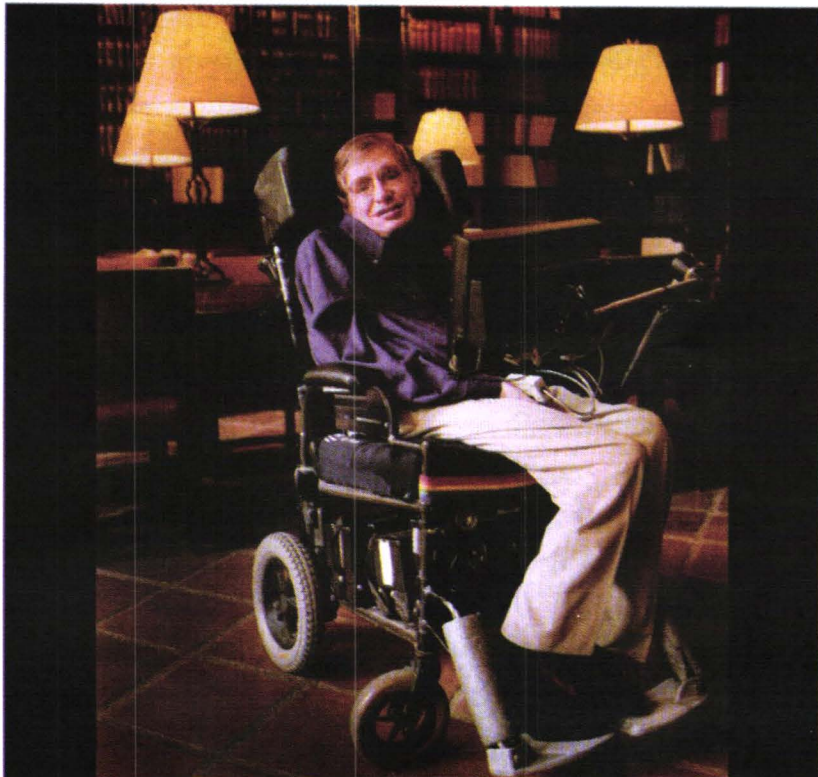
চিত্র-২০০

– ছবিতে বিপর্যস্ত শরীর নিয়ে বেঁচে থাকা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী মিঃ স্টিফেন হকিংসকে হুইল চেয়ারে বসা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে ।

'আল্লাহ্' হকিংস- এর শরীরকে যৌবনকালেই প্রথমে এমনভাবে বিপর্যস্ত করেন যে, সবাই তখন তার মৃত্যুর প্রহর গুনতে ছিল । যদি তাদের কথামত প্রকৃতিই সব নিয়ন্ত্রণ করতো, তাহলে ঐ অবস্থায় ক্রমান্বয়ে তার মৃত্যু ঘটাই স্বাভাবিক ছিল ।

কিন্তু যেহেতু 'আল্লাহ্' আছেন, তাই তাকে মৃত্যু না দিয়ে ঐ অবস্থায় তাকে রক্ষা করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীতে পরিণত করলেন ।

কল্পনাতীত জ্ঞানপূর্ণ উদ্‌ঘাটনের ভেতর দিয়ে জ্ঞানচক্ষুর মাধ্যমে মহাবিশ্বব্যাপী এক আল্লাহ্‌র উপস্থিতিকে দর্শন করবেন এবং কচি কচি নিষ্পাপ শিশুদের মত স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করে ধন্য হবেন। বর্তমান সময়ের এটাই হচ্ছে প্রকৃত দাবী।

ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

Glossary – (পরিভাষা সংগ্রহ)

Atom (পরমাণু) ঃ বস্তুর উপাদানের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

Asteroid (গ্রহানু) ঃ ছোট পাথুরে বস্তু বা শীলাখণ্ড যা সূর্যকে কেন্দ্র করে এর চতুর্দিকে আবর্তন করে থাকে। সৌরজগতের ভিতর মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে লক্ষ-লক্ষ শীলাখণ্ড দিয়ে বিরাট বেল্ট তৈরী হয়ে আছে। তাছাড়া শনি গ্রহের চতুর্দিকেও অনুরূপ পাথুরে-শীলাখণ্ডের বেল্ট বর্তমান আছে।

Astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান) ঃ মহাবিশ্ব এবং এর অভ্যন্তরে যত প্রকার বস্তু বর্তমান আছে, এদের বিজ্ঞানভিত্তিক (Scientific) পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ-ই (Study) হচ্ছে 'এ্যাস্ট্রোনোমি' (জ্যোতির্বিজ্ঞান)।

Atmosphere (বায়ুমণ্ডল) ঃ মহাকাশে নক্ষত্র, গ্রহ বা উপগ্রহের চতুর্দিকে পরিবেষ্টনকারী গ্যাসীয় স্তরকে Atomosphere (বায়ুমণ্ডল) বলা হয়।

Aurora (মেরু জ্যোতি) ঃ গ্রহের মেরুদ্বয়ের নিকটবর্তী স্থানে সূর্যের প্রবাহমান উত্তপ্ত বায়ু (Solar wind)-র দ্বারা উর্ধ্ব আবহমণ্ডলে আলোর যে বৈচিত্র্যময় রংয়ের প্রদর্শনী সৃষ্টি হয়, এটাকেই Aurora বা মেরুজ্যোতি বলা হয়। মেরুজ্যোতি সবসময়ই নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করে থাকে।

Big Bang (মহাবিস্ফোরণ) ঃ যে মতবাদ কল্পনাতীত এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কীয় ধারাবাহিক বর্ণনা পেশ করে, এটাই 'Big Bang' নামে পরিচিত।

Binary Star (যুগ্ম নক্ষত্র) ঃ খুবই পাশাপাশি অবস্থানরত দু'টি নক্ষত্রের একটি অপরটিকে ঘিরে যদি আবর্তন করে এবং পরস্পর পরস্পরের অভিকর্ষ (Gravitation) বল দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাহলে ঐ নক্ষত্রদ্বয়কে Binary star বলা হয়। অধিকাংশ নক্ষত্রই Binary পদ্ধতিতে মহাকাশে আবর্তিত হচ্ছে।

Black hole (নক্ষত্র ধ্বংসস্থান) ঃ মহাকাশে বৃহৎ নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ-এর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া বাস্তব অথচ অদৃশ্য এমন স্থান যেখানে অভিকর্ষ বল (Gravitation) অকল্পনীয় টানে (Enormous pull) সকল কিছুকে কেন্দ্রের দিকে টানতে থাকে। এই টান থেকে সবচেয়ে দ্রুততম 'আলোকরশ্মি'ও আত্মরক্ষা করতে পারে না, ব্ল্যাক হোলের মুখে পড়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। Black hole মহাকাশে 'মৃত্যুকূপ এর' ভূমিকায় রত।

Cluster (গুচ্ছ) ঃ বহু সংখ্যক নক্ষত্র কিংবা গ্যালাক্সির কাছাকাছি নিকটে 'গ্রুপ' হয়ে অবস্থান করাকে ক্লাসটার বলা হয়।

Comet (ধূমকেতু) ঃ ধূলাবালি, শিলাখণ্ড ও পাথর কুঁচি এবং বরফের সমন্বয়ে গঠিত বস্তু খণ্ডকে 'ধূমকেতু' বলে। ধূমকেতু উপবৃত্তাকারে (Oval orbit) সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে।

Coma (কোমা) ঃ ধূমকেতুর বরফাচ্ছাদিত কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে সূর্যের কিরণে সৃষ্ট ব্যাপক গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জকে 'Coma' বলে।

Constellation (নক্ষত্রপুঞ্জ) ঃ খুবই নিকটবর্তী হয়ে অবস্থানগ্রহণকারী একগুচ্ছ তারকা, যা পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে দেখতে কোন জিনিসের একটা আকৃতির মত দেখায়, এটাই নক্ষত্র পুঞ্জ (Constellation) নামে পরিচিত। পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাশূন্য জুড়ে সর্বমোট ৮৮টি Constellation নির্দিষ্ট আছে।

Core (মধ্যবর্তী স্থান) ঃ নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ কিংবা Asteroid বা Comet-এর কেন্দ্রীয় অংশকে বলা হয়, যা এর চতুর্দিকের একাধিক স্তরের বিভিন্ন পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

Corona (কোরোনা) ঃ সূর্যের আবহমণ্ডলের বাইরের দিকে সবচেয়ে দূরের (Outermost part) অংশকে 'Corona' বলা হয়।

Cosmic ray (মহাজাগতিক রশ্মি) ঃ খুবই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অতিক্ষুদ্র বস্তুকণা (Highly energetic particles) যা মহাশূন্যে প্রায় আলোর গতিতে ভ্রমণ করে থাকে। Gamma-ray, X-ray, Ultra violet ray সবই Cosmic ray-র অন্তর্ভুক্ত।

Cosmology (সৃষ্টিতত্ত্ব) ঃ মহাবিশ্বের সকল প্রকার মহাজাগতিক বস্তু সম্পর্কে 'গবেষণাই' হচ্ছে' Cosmology।

Day (দিন) ঃ কোন গ্রহ তার অক্ষের উপর একবার পূর্ণ ঘূর্ণনে (Spin around once) যে সময়ের প্রয়োজন হয়, এর সমষ্টিকে দিন (Day) বলা হয়।

Dwarf Star ঃ আমাদের সূর্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট সূর্যকে Dwarf star বলা হয়।

Eclipse (গ্রহণ) ঃ মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় আবর্তন করতে গিয়ে কখনও একটি বস্তু কর্তৃক অপর কোন বস্তু পূর্ণ বা আংশিক ঢেকে যায়, এটাই 'Eclipse'। যেমন চন্দ্র যখন সূর্যের সম্মুখ দিয়ে গমন করে, তখন পৃথিবী থেকে সূর্যকে পরিপূর্ণরূপে দেখা যায় না, ঐ অবস্থাকেই তখন সূর্য গ্রহণ (Eclipse) বলে।

Electron (ইলেকট্রন) ঃ সকল পরমাণুর ভিতর নেগেটিভ চার্জযুক্ত বস্তুকণিকা যা নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে অনবরত পরিভ্রমণ করতে থাকে। সংখ্যায় এরা সবসময় নিউক্লিয়াসের উপাদান 'প্রোটন' কণিকার সমান সংখ্যক হয়ে থাকে। এদের ওজন প্রায় $9.1 \times 10^{-31} kg.$

Element (উপাদান) ঃ একই রকম পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত পদার্থ। যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ।

Escape Velocity (মুক্তিগতি) ঃ কোন বস্তুর পৃষ্ঠদেশের আওতাভুক্ত এলাকা থেকে সম্পূর্ণরূপে পালিয়ে যেতে সর্বনিম্ন যে গতির প্রয়োজন হয়, তাই Escape velocity। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মহাশূন্যে পূর্ণরূপে পালিয়ে যাওয়ার সর্বনিম্ন 'মুক্তিগতি' হচ্ছে ১১.২ কিঃ মিটার/সেকেণ্ড।

Event horizon ঃ ব্ল্যাক হোলের চতুর্দিকে সৃষ্ট 'বাউণ্ডারী' (Boundary) যেখানে 'মুক্তিগতি' (Escape velocity) আলোর গতির সমান প্রায়। এই স্থানে কোন বস্তু আসার পর আর তার রক্ষা নেই, বস্তুটি মুহূর্তের মধ্যেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে 'ব্ল্যাক হোলে' চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়।

Gas Giant ঃ তুলনামূলকভাবে ছোট কোর (Core) বিশিষ্ট এবং ঐ কোরকে ভিত্তি করে চতুর্দিকে গ্যাস ও তরল পদার্থ দিয়ে সৃষ্ট গ্রহকে 'গ্যাস জায়ান্ট' বলা হয়।

Light Second (আলোক সেকেণ্ড) ঃ এক সেকেণ্ড সময়ে আলোকরশ্মি যতটুকু পথ অতিক্রম করতে পারে, ঐ দূরত্বকে এক লাইট সেকেণ্ড বলা হয়। এক সেকেণ্ডে আলোকরশ্মি প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে।

Galaxy (নক্ষত্র শহর) ঃ নক্ষত্রসমূহ, ধূলা-বালি ও গলিত পদার্থের মেঘপুঞ্জ (নেবুলা), স্টার ক্লাস্টার, গ্লোবুলার ক্লাস্টার ইত্যাদির একত্রে মিলিত এক বিরাট দল বা গ্রুপকেই বলা হয় গ্যালাক্সি। বিজ্ঞানীগণ এ পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সির সন্ধান লাভ করেছেন।

Gaint Star ঃ আমাদের সূর্যের চাইতে অপেক্ষাকৃত বড় সূর্য হচ্ছে 'Giant Star'.

Gravitation (অভিকর্ষ) ঃ যে শক্তি (The force of Attraction) বস্তুসমূহকে পরস্পরের দিকে টানে, তাই অভিকর্ষ বল বা Gravitation, উদাহরণস্বরূপ পৃথিবী ও চাঁদ উভয় সবসময় অভিকর্ষ (Gravitation) বলের টানে আবদ্ধ হয়ে আছে।

Gamma-ray (গামা-রে) ঃ সবচেয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wave length) বিশিষ্ট হাই এনার্জি রেডিয়েশান (High energy radiation), যা জীব এবং প্রাণীর দেহকোষের সংস্পর্শে আসা মাত্র কোষগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে ধ্বংসাধন করে থাকে। সকল প্রকার আলোকরশ্মির মধ্যে Gamma-ray সবচেয়ে বেশী ভয়ংকর ও বিপদজনক।

Light Minute (আলোক মিনিট) ঃ পূর্ণ এক মিনিটে আলোকরশ্মি যে দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, ঐ দূরত্বকে এক লাইট মিনিট বলে।

Light Year (আলোকবর্ষ) ঃ আলোকরশ্মি (Ray of light) এক বৎসর সময়ে যতটুকু পথ যেতে পারে, ঐ দূরত্বকে 'এক আলোকবর্ষ' (One light year) বলা হয়। প্রমাণিত হয়েছে এক আলোকবর্ষ সমান দূরত্ব হচ্ছে ১০ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার (৬ ট্রিলিয়ন মাইল)।

Magnitude ঃ মহাশূন্যে নক্ষত্রসমূহের 'উজ্জ্বলতা'কে বলা হয়।

Moon (চাঁদ) ঃ ধূলা-বালি, শিলাপ্রস্তর দিয়ে তৈরী প্রায় দুই হাজার মাইল ব্যাস সম্পন্ন বিরাট বল, যা নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে থাকে।

Meteor (উল্কা) ঃ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাথর কণা বা কুঁচি যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করা মাত্র বাতাসের সাথে ঘর্ষণে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আলোর ফুলকি সৃষ্টি করে, যা Shooting Star হিসাবেও পরিচিত।

Meteorite (ভূপাতিত উল্কা) ঃ যে সকল উল্কা বায়ুমণ্ডলে পুড়ে-পুড়ে পুরোপুরি ধ্বংস না হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ পর্যন্ত আঘাত করে এদেরকে Meteorite বলা হয়।

Meteoroid ঃ যে সমস্ত উল্কা আকারে একটু বড় এবং সূর্যকে কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে, এদেরকেই বলা হয় Meteoroid।

Meteor shower ঃ পৃথিবী যখন কোন ধূমকেতুর কক্ষপথ ছেদ করে পরিভ্রমণ করে তখন ঐ ধূমকেতু থেকে নির্গত ব্যাপক Meteor (উল্কা) পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশ করে (স্বল্প সময়ের জন্য) বাতাসের সাথে ঘর্ষণে পুড়ে পুড়ে বিরাট এলাকা নিয়ে একই সাথে যে ব্যাপক আলোর ফুলঝুরি প্রদর্শনীর সৃষ্টি করে ওটাই Meteor shower।

Matter ঃ বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ, যা দিয়ে মহাবিশ্বের সকল বস্তু অস্তিত্ব ধারণ করেছে।

Molecule (অণু) ঃ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে একাধিক পরমাণু মিলিত হয়ে 'অণু' গঠিত হয়। অণুকেই সাধারণত বস্তুর মৌলিক এক হিসেবে ধরা হয়।

Milky Way Galaxy ঃ আমাদের এই সৌরজগত যে গ্যালাক্সির অন্তর্গত, তাকেই Milky

galaxy বলা হয়। গ্যালাক্সিটির মাঝখানে অত্যধিক বিকিরণের কারণে দুধের মত সাদা ধবধবে পথের ন্যায় চিহ্ন থাকায় ঐ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

NASA (নাসা) ঃ The National Aeronautics and Space Administration যা আমেরিকান সরকারের নির্দেশে মহাকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারের পিছনে সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টায় নিয়োজিত।

Nebula (নেবুলা) ঃ ধূলা-বালি এবং গ্যাসের সমন্বয়ে বিশাল মেঘপুঞ্জ, যে মেঘপুঞ্জ থেকে বৃষ্টি নামে না, কিন্তু জন্ম নেয় শত-সহস্র নক্ষত্র। অর্থাৎ, নক্ষত্র সৃষ্টির কাঁচামাল হচ্ছে নেবুলা।

Neutron (নিউট্রন) ঃ বস্তুর ক্ষুদ্রতম Unit- 'এ্যাটমিক নিউক্লি'-র ভিতর এক প্রকার ক্ষুদ্র কণিকা (Sub atomic particle) যা নিরপেক্ষ, চার্জবিহীন (Zero electric charge) এবং এদের ওজন হচ্ছে প্রায় $1.67\times10^{-27}kg$ । পরমাণুর ভিতর প্রোটনের সাথে মিলিত হয়ে 'এ্যাটমিক নিউক্লি' তৈরী করে।

Neutron Star (নিউট্রন স্টার) ঃ বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্র (Supergiant Star) ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তাদের ধ্বংসাবশেষে ছোট আকারের যে প্রচণ্ড গতিতে আবর্তনশীল অংশটি (Small spinning part) থেকে যায়, তাকেই 'নিউট্রন স্টার' বলা হয়। এটা 'নিউট্রন' নামক ক্ষুদ্র কণিকাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।

Nova (নোভা) ঃ যে সকল নক্ষত্র হঠাৎ করে ব্যাপক থেকে ব্যাপক হারে উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে পরবর্তীতে বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গিয়ে চিরতরে ম্লান হয়ে যায়, ঐ নক্ষত্রগুলোকে নোভা বলা হয়।

Nucleus ঃ জ্যোতিশাস্ত্রে গ্যালাক্সির মধ্যস্থানে ঘন সন্নিবিষ্ট অংশকে 'Nucleus' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ধূমকেতুর সম্মুখে ঘন সন্নিবিষ্ট অংশকেও Nucleus হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

Nuclear Fusion ঃ যে বিগলন পদ্ধতিতে নক্ষত্রের ভিতর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্যাসীয় কণা (Atoms) পরস্পর মিলিত হয়ে বড় বড় ভারী বস্তুকণা সৃষ্টি করে, ঐ পদ্ধতিকেই 'Nuclear fusion' বলা হয়। উক্ত পদ্ধতি সংঘটিত হওয়ার সময় ব্যাপক-বিশাল পরিমাণে তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) উৎপন্ন হয়ে থাকে।

Orbit (কক্ষপথ) ঃ মহাশূন্যের মাঝে কোন একটি বস্তু যে কাল্পনিক পথের উপর দিয়ে পরিভ্রমণরত অবস্থায় আরেকটি বস্তুর চারদিকে আবর্তন করে ঐ পথটিকেই 'Orbit' বা কক্ষপথ বলে। যেমন পৃথিবী তার কক্ষপথের উপর দিয়ে সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে থাকে।

Planet (গ্রহ) ঃ নক্ষত্রের চতুর্দিকে পরিভ্রমণরত অপেক্ষাকৃতভাবে বড় বস্তুকে গ্রহ বলা হয়। নক্ষত্রের মত এদের ভিতরে তাপ এবং আলো সৃষ্টি হয় না। আমাদের সৌরপরিবারে এ পর্যন্ত ৯টি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

Pulsar (পালছার) ঃ নিউট্রন স্টার থেকে নির্গত আলোকরশ্মি (Radiation), যা নক্ষত্রের অক্ষের চতুর্দিকে প্রচণ্ড গতিতে আবর্তিত হয়ে থাকে।

Planetary nebulae ঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রের বাইরের দিকের স্তরের নিক্ষিপ্ত উত্তপ্ত গ্যাসপুঞ্জ যা মহাশূন্যে মেঘের ন্যায় ছড়িয়ে থাকে বিরাট এলাকা জুড়ে।

Prominence ঃ সূর্যের পৃষ্ঠদেশ থেকে বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত উত্তপ্ত অগ্নিশিখা, যা কখনও লম্বায় প্রায় চার লক্ষ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় আট হাজার মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে।

Protostar ঃ একটি পূর্ণ নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার পথে 'প্রাথমিক একটা পর্যায়', যে পর্যায়ে তখনও ঐ নক্ষত্রের কেন্দ্রে 'নিউক্লিয়ার ফিউশান' শুরু হয়ে পারমাণবিক চুল্লী চালু হয়নি।

Proton (প্রোটন) ঃ পরমাণুর অভ্যন্তরে পজেটিভ চার্জযুক্ত ক্ষুদ্র কণিকা, যা নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সাথে মিলিত হয়ে অবস্থান করে। এর ওজন হচ্ছে $1.67 \times 10^{-27} kg$ ।

Photon (ফোটন) ঃ আলোর ক্ষুদ্রতম কণিকাই হচ্ছে 'ফোটন'। মহাশূন্যে এর চলার গতি হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল।

Parsec (পারসেক) ঃ ৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ সমান এক 'Parsec'। মহাশূন্যে ব্যাপক-বিশাল দূরত্বের হিসাবকে সংক্ষিপ্ত করে সহজ করার নিমিত্তে 'পারসেক' হিসাবের অবতারণা করা হয়েছে।

Quasar (কোয়াসার) ঃ টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণকৃত সীমানার প্রায় প্রান্তে আবিষ্কৃত খুবই উজ্জ্বল মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক, যা দেখতে একটি নক্ষত্রের মত কিন্তু এটা উজ্জ্বলতা ছড়ায় প্রায় ১০,০০০ মিলিয়ন গড় গ্যারাক্সির তেজস্ক্রিয়তার সমান এবং আলো ছড়ায় প্রায় ১০০টি গড় গ্যালাক্সির আলোর সমান।

Radiation (তেজস্ক্রিয়তা) ঃ কোন বস্তু থেকে নির্গত তাপ যা শক্তি হিসেবে ঢেউয়ের (Wave) মত চলার পথে অগ্রসর হয়ে থাকে।

Red gaint (লাল বামন) ঃ আমাদের সূর্যের চেয়ে অনেক অনেক গুন বড় নক্ষত্রের ধ্বংস হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত, যখন তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কমে গিয়ে আয়তনে বহুগুনে বেড়ে যায়।

Satellite (উপগ্রহ) ঃ মহাশূন্যে কোন গ্রহকে অপর কোন বস্তু কক্ষপথে আবর্তন করতে থাকলে ঐ আবর্তনকারী বস্তুটিকে উপগ্রহ বলা হয়। যেমন চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। মানুষের তৈরী উপগ্রহ ও মহাশূন্যে (Satellite) পৃথিবীকে, চাঁদকে আবর্তন করছে, তবে শর্ত হচ্ছে উপগ্রহের আবর্তনগতি আবর্তনকৃত বস্তুর কমপক্ষে 'মুক্তিগতির' সমান হতে হবে।

Solar System (সৌরজগত) ঃ একটি নক্ষত্রকে ঘিরে যে কয়টি গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ও গ্রহানু চতুর্দিকে আবর্তন করে এবং নক্ষত্রের অভিকর্ষ বলের আকর্ষণে আবদ্ধ থাকে, নক্ষত্রসহ ঐ সকল গ্রহ ও উপগ্রহ, ধূমকেতু ও গ্রহানুগুলোকে একত্রে সৌরজগত বলা হয়ে থাকে। এ কথায় নক্ষত্রের চারদিকে কক্ষপথে আবর্তনশীল সকল বস্তুকে একত্রে সৌরজগত নামে অভিহিত করা হয়।

Solar wind ঃ সূর্যের পৃষ্ঠদেশ (Surface) থেকে মহাশূন্যে অদৃশ্য ক্ষুদ্র বস্তুকণার (Invisible particles) অনবরত যে আলোক ধারা (Stream) প্রবাহিত হতে থাকে, এটাই Solar wind।

Space Craft ঃ মহাশূন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান কার্যে পরিভ্রমণ করার জন্য যা আকাশযানরূপে তৈরী করা হয়।

Space probe ঃ মনুষ্যবিহীন আকাশযান, এর কাজ হচ্ছে মহাশূন্যে মহাজাগতিক জ্যোতিষ্কসমূহের বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা এবং পরক্ষণে তা পৃথিবীতে বিজ্ঞানীদের নিকট প্রেরণ করা।

Space Shuttle ঃ যে আকাশ যানের (Space craft) মাধ্যমে নভোচারী এবং প্রয়োজনীয় মালামাল মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়, তাকে Space shuttle বলে। একে রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করা হয় কিন্তু অবতরণ করে বিমানের মত। Space shuttle বার বার ব্যবহার করা যায়।

Space Station ঃ এটা বড় ধরনের মনুষ্যবাহী উপগ্রহ বা Satellite মহাশূন্যের মধ্যে, মহাশূন্যে দীর্ঘ সময় ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান কার্য চালাবার জন্য একে ভাসমান ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

Universe (মহাবিশ্ব) ঃ মহাশূন্যে বিরাজমান সকল প্রকার মহাজাগতিক বস্তুসমূহ যে আয়তনের জায়গায় বিস্তৃত হয়ে আছে, ঐ স্থান এবং বস্তুসমূহসহ পুরোটাকেই মহাবিশ্ব বলা হয়।

Sun (সূর্য) ঃ একটি মাঝারি ধরনের নক্ষত্র, যা আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে এর অভ্যন্তরে 'ফিউশান' পদ্ধতিতে প্রতিনিয়ত উৎপন্ন তাপ ও আলো ছড়িয়ে গোটা সৌরজগতকে ভাসিয়ে রাখছে।

Supergiant star ঃ খুবই উজ্জ্বলতা সম্পন্ন বৃহৎ নক্ষত্র। এদের আয়ুষ্কাল মাত্র কয়েক মিলিয়ন বৎসর। নক্ষত্র যত বড় হবে তার আয়ুষ্কাল তত কম হবে।

Supernova (সুপারনোভা) ঃ বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রের (Supergiant star) ধ্বংসজনক 'মহা বিস্ফোরণ-ই হচ্ছে 'সুপারনোভা', যা কল্পনাতীত আলো এবং উত্তাপ সৃষ্টি করে থাকে। এই সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নেয় 'নিউট্রন স্টার' কিংবা 'ব্ল্যাক হোল'।

Star (নক্ষত্র) ঃ অবিরত বিস্ফোরণশীল গ্যাসীয় বল যার ভিতর থেকে উৎপন্ন হয় আলো এবং তাপ (Light and heat)। আমাদের সূর্য অনুরূপ একটি নক্ষত্র।

X-ray (এক্সরে) ঃ খুবই সংক্ষিপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Short Wave length) বিশিষ্ট 'ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশান', জীব এবং প্রাণীদেহের জন্য খুবই বিপদজনক আলোকরশ্মি।

Year (বৎসর) ঃ একটি গ্রহ সূর্যের চারিদিকে কক্ষপথে একবার আবর্তন করে আসতে যে সময় প্রয়োজন হয়, ঐ সময়ের দৈর্ঘ্যকেই 'বৎসর' বলা হয়। পৃথিবী ৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট ও ৪৭ সেকেণ্ডে সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে একবার ঘুরে আসে, যা গণনায় এক বৎসর ধরা হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

1. আল-কুরআনুল কারীম– ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ইং
2. The Holy Quran- Darussalam Publishers & Distributors, Riyadh, Saudi Arabia.
3. The Translation of The Holy Qur'an in Simple English- SMH, QADRI.
4. তাফহীমুল কুরআন– সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
5. Guide to Space-Peter Bond-1999.
6. Night Sky-Discovery Channel-1999.
7. A Photographic Tour of the Universe-Gabriele Vanin- 1996.
8. The Search for Infinity-Gordon Farser, Egil Lillestor & Inge sellevag- 1999.
9. The Universe Revealed-Pam Spence- 1996.
10. Astronomy From the Earth to the Universe-Pasa Choff-1995.
11. Stars & Planets-Ian Ridpath-1997.
12. Astronomy & Space-Lisa Miles and Alastair Smith- 1999.

13. Astronomy Dictionary-Philip's – 1999.
14. Inventions-G.I.Brown – 1996.
15. Man in Space – Eugene A. Cernan – 1999.
16. The Changing Universe, Big Bang and After-Trinh Xuan Thuan – 1993.
17. Astronomy & Astrophysics – Zeilik, Gregory – 1998.
18. Space Atlas – Robin Kerrod – 1996.
19. Embracing Earth – Payson R. Stevens and Kevin W. Kelley – 1992.
20. The Universe Explained – Colin Ronan – 1994.
21. The Visual Dictionary of the Universe – Eywitness Visual Dictionaries - 1994.
22. How the Universe Works-Eyewitness Science Guides-1994.
23. Inventors and Discoveres-Changing Our World-1988.
24. LIFE-Eyewitness Science-1996.
25. ECOLOGY-Eyewitness Science-1995.
26. Guinness Book of Knowledge-1997.
27. Force & Motion- The Science Museum, London-1993.
28. MATTER-The Science Museum-1992.
29. Time & Space-Eyewitness Science-1994.
30. Astronomy- Eyewitness Science – 1995.
31. Atlas of the Universe – Patrick Moore – 1999.
32. Qur`an for Astronomy and Earth Exploration from Space- S. Waqar Ahmed Husaini-1996.
33. আল-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-১ কাজী জাহান মিয়া
34. আল-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-২ কাজী জাহান মিয়া
35. বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান- ড. মরিস বুকাইলি-১৯৮৬
36. মহাকাশের হাজারো জিজ্ঞাসা – সুধাংশু পাত্র-১৯৮৫
37. চল্লিশ জন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব– অনুবাদক ঃ সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান–১৯৯৫
38. The Universe Seen Through The Quran – Mir Anees-ud-din – 1999.
39. Great Scientific Discoveries – Chambers Compat Reference-Gerald Messadie – 1992
40. Astronomy Magazine (U.S.A), from July – 1998 to June 2000.
41. Astronomy Magazine (England), from July 1998 to June 2000

"এক পর্যায়ে তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা তখন ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি আকাশ ও পৃথিবীর আকৃতি ধারণ করার জন্য আদেশ করলেন 'তোমরা উভয়ে ধূঁয়া থেকে অস্তিত্ব ধারণ কর ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছায়'। ওরা অনুগত হয়ে আদেশানুযায়ী সাড়া দিয়ে অস্তিত্ব ধারণ করলো।"

সূরা ঃ হা-মীম-আস-সিজদা ঃ ১১